স্বপ্ন দেখেন কেন

সারস্বতকুঞ্জ
১১বি, নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

● প্রকাশক ঃ
সারস্বতকুঞ্জ
১১বি, নবীনকুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

● প্রথম সংস্করণ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ

● প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীবলরাম প্রকাশনী
১০১বি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

● মুদ্রক ঃ
ওরিয়েন্ট প্রেস, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মাতৃভূমি, বাংলাদেশ আর প্রবাসের
স্বপ্নদেখা মানুষকে

ভূমিকা

মানুষের জীবনে স্পষ্ট দুটি ভাগ, জাগ্রত জীবন ও স্বপ্নের জীবন। জাগ্রত জীবনকে যদি আমরা বাস্তব বলি, স্বপ্নের জীবন তা হলে কী? বহু যুগ ধরে তার ব্যাখ্যা খোঁজা হচ্ছে, আজও সঠিক কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

প্রতিদিনের বাস্তব জীবনকেই আমরা সাধারণ ভাবে বেঁচে থাকা বলি, অথচ স্বপ্ন না দেখলে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তা হলে স্বপ্নকে অবাস্তব বলা যায় কী করে? মানুষ নিজেকে যুক্তিবাদী প্রাণী মনে করে. (যদিও প্রচুর কুযুক্তি, পূর্ব সংস্কার ও গোঁড়ামি বহু ক্ষেত্রে তার যুক্তিকে নস্যাৎ করে) স্বপ্নের জীবনে সে সমস্ত যুক্তির বাঁধন খুলে দেয়। যেন বাস্তব জীবনের ঘড়ির কাঁটা স্বপ্নের মধ্যে ঘুরতে থাকে উল্টোদিকে। যুক্তির একটা ভার আছে, জাগ্রত অবস্থায় যুক্তি তার ঘাড়ে সিন্দবাদের বোঝার মতন চেপে থাকে, স্বপ্নের মধ্যে সে মুক্ত হয়, তখন সে প্রকৃত স্বেচ্ছাচারী। জাগ্রত জীবন ও স্বপ্নের জীবন তাই পরস্পরের পরিপূরক। দুর্বোধ্য স্বপ্ন মানুষকে সুস্থ রাখে।

প্রতিটি মানুষই যে স্বপ্ন দেখে এবং কী ভাবে দেখে, তা নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বেশিদিন আগে নয়, মাত্র ১৯৫৩ সালে। ঘুমিয়ে পড়ার ঘন্টাখানেক পরে চোখ বোঁজা অবস্থাতে হঠাৎ দ্রুত চক্ষু স্পন্দিত হতে শুরু করে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও দ্রুত হয়, মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে, ইংরেজিতে যাকে বলে র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট, সংক্ষেপে আর ই এম, সেই অবস্থাটাই যে স্বপ্ন-জীবন তা প্রমাণিত হয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় এরকম বারবার হয়। কারুর স্বপ্ন অতি সংক্ষিপ্ত, কারুর কিছুটা দীর্ঘ, তবে ধারাবাহিক উপন্যাসের মতন কখনই সুদীর্ঘ নয়। কেউ কেউ স্বপ্নের কথা জাগ্রত অবস্থায় মনে রাখতে পারে না, তার প্রয়োজনও নেই। কেউ কেউ কিছুটা পারে, জেগে ওঠার পরই সম্পূর্ণ স্বপ্নটি জ্বলজ্বল করে, তারপর আয়নার ওপর জলের আঙুলে আঁকা ছবির মতন একটু একটু করে মিলিয়ে যায়, কিছুক্ষণ পরে একেবারেই মনে থাকে না। স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গেলে অনেকে সামান্য সূত্র ধরে কিছুটা বানিয়ে বলতে থাকে, জাগ্রত জীবনের যুক্তি তাতে সামঞ্জস্য দিতে চায়। কোনও কোনও মানুষ অন্যদের তুলনায় বেশি স্বপ্ন দেখে, কোনও কোনও স্বপ্ন এমনই গভীর ভাবে ছাপ ফেলে যা জলে আঁকা ছবির মতন মিলিয়ে যায় না, সারা জীবন সঙ্গী হয়ে থাকে।

স্বপ্নে মানুষ দারুণ ভয় পায়, আবার কারুর কারুর দেবদর্শন হয়। কেউ পেয়েছে রাজ্য জয়ের ইঙ্গিত, কেউ পেয়েছে প্রেমিকার সন্ধান। আবার কেউ কেউ ইলিয়াড মহাকাব্যের আগামেমননের মতন স্বপ্নে পায় ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশ। কে কী রকম স্বপ্ন দেখবে, তার শ্রেণী বিভাগ সম্ভব নয়। মানুষের অবচেতনের জটিলতার গ্রন্থিমোচন এখনও মনে হয় সুদূরপরাহত। অ্যারিস্টটল থেকে ফ্রয়েড এবং আরও অনেকে নানাভাবে স্বপ্নের কারণ বা গঠনরীতি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনওটাই পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, আমি নিজেও মেনে নিতে পারি না।

স্বপ্ন থেকে যে অনেক বিখ্যাত সাহিত্য ও চিত্রকলার উপকরণ পাওয়া গেছে, এ কথা বহু বিদিত। কোলরিজের 'কুবলা খান' কিংবা আর. এল. স্টিভেনসনের 'ডক্টর জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড' স্বপ্ন থেকে পাওয়া। কবি ব্লেকের ছবিগুলি স্বপ্ন জগতের। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের সূত্র পেয়েছিলেন ট্রেন যাত্রার সময় এক স্বপ্নে। এরকম উদাহরণ আরও বহু। শুধু সাহিত্য-শিল্প নয়, কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও স্বপ্ন দ্বারা প্রভাবান্বিত। এফ. এ. কেকুলে ভন স্ট্রাডোনিৎস নামে একজন জার্মান কেমিস্ট দাবি করেছেন যে তিনি একদিন একটা সাপের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সাপটা তার লেজ মুখের মধ্যে পুরে গোল হয়ে আছে। তার থেকেই তিনি বেনজিন মলিকিউলের গঠন আবিষ্কার করেন। আর একজন

জার্মান ফিজিওলজিস্ট অটো লোউই দেখেছিলেন ব্যাঙের স্বপ্ন। ব্যাঙের স্নায়ুতন্ত্রের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি পেয়েছেন নোবেল প্রাইজ।

স্বপ্নের রহস্য নিয়ে মানুষের কৌতূহলেরও শেষ নেই। স্বপ্নচর্চাও শুরু হয়েছে বহু প্রাচীন কাল থেকে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ব্যাবিলনের সম্রাট ছিলেন অসুরবানিপাল, নিনিভে শহরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাঁর পাথরে খোদাই করা যে গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে রয়েছে স্বপ্নচর্চা-বিষয়ক গ্রন্থ। আমাদের অথর্ব বেদেও রয়েছে স্বপ্ন ব্যাখ্যার শ্লোক।

বাংলায় এই চর্চা তেমন হয়নি। গিরীন্দ্রশেখব বসুর অত্যুত্তম বইটি বড়ই সংক্ষিপ্ত। এই বিষয়টি নিয়ে শ্রী শ্যামল চক্রবর্তীই বাংলায় প্রথম একটি সবিস্তার গ্রন্থ রচনা করলেন। তিনি পেশায় চিকিৎসক, কিন্তু মনস্তত্ত্ব তাঁর বিষয় নয়, তাঁর মন এই দিকে আকৃষ্ট হয়েছে হয়তো নিজেরই স্বপ্ন-রহস্য উন্মোচনের বাসনায়। এই গ্রন্থটি রচনার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছে। এই বিষয়ে আমার কৌতূহল ও আগ্রহ অসীম। আমাকে ভূতগ্রস্তের মতন স্বপ্নগ্রস্ত বলা যেতে পারে। আমার স্ত্রী বা চেনাশুনো, বন্ধুবান্ধবদের তুলনায় আমি বড় বেশি স্বপ্ন দেখি। এবং অনেক স্বপ্নই আমার মনে গেঁথে যায়। সেইসব স্বপ্নের কোনও ব্যাখ্যাই আমার মনঃপূত হয় না। কোনও কোনও রাত্রির তৃতীয প্রহরে কোনও প্রগাঢ় স্বপ্ন দেখার পর জেগে উঠে আমি বিমূঢ় হয়ে বসে থাকি। আমার জীবনযাপনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, যে পরিবেশ আমি কখনও দেখিনি, যে-সব মানুষ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, এই সব নিয়ে কী করে গড়ে ওঠে স্বপ্ন? বিদ্যুৎ ঝলকের মতন এক একটি দৃশ্য, অচেনা বাড়িঘর, সেগুলির স্থপতি কে? এক একটি স্বপ্ন দেখার পর এই উপলব্ধি হয় যে আমাদের বিদ্যা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা পৃথিবীর অনেক কিছু জেনে ফেললেও আমরা নিজের সম্পর্কেই সবচেয়ে কম জানি।

গ্রন্থটি রচনার পরিকল্পনা ও পর্ব বিভাগ আমি গোড়া থেকেই জেনেছি। তারপর দেখেছি, কী বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে শ্যামল চক্রবর্তী এর উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন। শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, শুধু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ নয়, এই গ্রন্থকার সমাজের নানান স্তরের মানুষের কাছে গিয়েছেন, তাদের স্বপ্ন এবং স্বপ্ন সম্পর্কে ধারণা লিখে এনেছেন। কোনও বিদেশি গ্রন্থের অনুসরণ নয়, এই গ্রন্থের উপজীব্য বাংলার মানুষ, কিংবা বলা যেতে পারে বাঙালির স্বপ্ন, এর মধ্যে রয়েছে জীবনের স্পন্দন। এই তরুণ চিকিৎসকটির বিশেষ সাহিত্য প্রীতি আছে বলে তাঁর ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল ও স্বাদু।

বাংলায় এরকম একটি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ রচনার জন্য শ্যামল চক্রবর্তীকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

সুচি

স্বপ্ন দেখেন কেন

স্বপ্নের দেশ

নদীয়া জেলার রানাঘাট। রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাচ্ছেন সুনীল গাভাসকার। সামনের রডে বসে জয়। কবি জয় গোস্বামী। কলকাতার তারাতলার মোড়। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীবোঝাই একটা ডবল ডেকার বাস। দরজার বদলে বাসের জানালা দিয়ে নামতে গেছেন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোককে চেনেন অনেকেই। পণ্ডিত ভীমসেন যোশী। শরীরটা আটকে গেছে জানালায়। চিৎকার করে ডাকছেন বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকা এককালের ছাত্র কুমার রায়কে। কুমার ছুটে গেলেন। বহু কসরত করে টেনেহিঁচড়ে বার করলেন পণ্ডিতজিকে। এদিকে কলকাতার ময়দানে বসে বাদামভাজা খাচ্ছেন মারাদোনা। বাংলায় তাঁর আত্মজীবনী লিখতে অনুরোধ করছেন পাশে বসা মতি নন্দীকে। কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না মতি।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারি। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর বসেছে ভারতে। সবুজ ঘাসে ঢাকা অচেনা একটা মাঠ। আধশোয়া হয়ে বসে আছেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যান অর্জুনা রনতুঙ্গা। পরনে দলের গাঢ় নীল পোশাক। ব্যাট, প্যাড, গ্লাভস পড়ে আছে পাশে। অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা মারলেন ক্রিকেটপাগল যুবক সিঙ্গুরের দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এদিকে গড়িয়াহাটের মোড়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাজামা পরে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। চারপাশে অনেক ছেলেবুড়ো জড়ো হয়ে ট্রাফিক জ্যাম। তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন এক ট্রাফিক সার্জেন্ট। মস্ত বড় একটা কাঁচি দিয়ে ঘুড়ির সুতোটা দিলেন কেটে। অভূতপূর্ব এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কবি প্রমোদ বসু।

দোহারা চেহারার শান্তিপ্রিয় যুবক বাবলু দাস। বেজায় ভয় পান ষাঁড়কে। একরাতে হুগলি জেলার চন্দনপুরের মাঠে বাবলুকে তাড়া করেছিল পেল্লায় সাইজের একটা ষাঁড়। ষাঁড়টা শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে বাবলুর দিকে। ভয়ে তো ওর গলা শুকিয়ে কাঠ। ষাঁড়টা কাছাকাছি আসতেই অবাক কাণ্ড! ষাঁড়টা মুহূর্তে হয়ে গেল মালগাড়ির ইঞ্জিন। গ্রামের সবুজ ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন এগিয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে।

দেশ ছেড়ে চলুন বিদেশে। মেলবোর্নের বিখ্যাত ক্রিকেটমাঠ। ব্যাট করছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. টেক.-এর ছাত্র পীযূষ রায়। সামলাচ্ছেন বিশ্ব সেরা তাবড় বোলারদের। ম্যাকডারমট, কোর্টনি ওয়ালশ, ওয়াসিম আক্রম, শ্যেন ওয়ার্ন থেকে শুরু করে কার্টলি অ্যামব্রোস। তাজ্জব ব্যাপার! এমন বাঘাবাঘা বোলারদের বলে চৌকা আর ছক্কার ফুলঝুরি। ব্রায়ান লারার তিনশো পঁচাত্তরের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। অস্ট্রেলিয়া থেকে চলুন ইংল্যান্ড। কেমব্রিজের এক পার্কের সবুজ লনে কাকভোরে এসে বসল তিনটে ময়ূর। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল পরিষ্কার বাংলায়। হঠাৎ একটা গুম্‌গুম্ আওয়াজ। আওয়াজ শুনে ওরা এক সঙ্গে বলে উঠল, 'এবার আমরা যাই'। উড়ে চলে গেল তিন ময়ূর।

এরকম অদ্ভুত সব ঘটনা অবিরাম ঘটে চলেছে একটা দেশে। দেশটা আমাদের চেনা পৃথিবীর বাইরে নয়। ভেতরেই। স্বপ্নের দেশ। এদেশে উদ্ভট সব কাণ্ডকারখানা ঘটে যখন তখন। স্বপ্নের দেশে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল মহাশ্বেতা দেবীর। একটা সময় প্রায় রোজ রাতে। একটানা বহুদিন। কলকাতার রাজপথ দিয়ে টানারিক্সায় চেপে কোথাও যাচ্ছেন মহাশ্বেতা। ওঁকে নিয়ে রিক্সার সিটটা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে ওপরে। উঠছে তো উঠছেই। রিক্সাচালক রিক্সা টানছে পিচরাস্তা ধরে। অনেক ওপর থেকে সিটের ওপর বসা মহাশ্বেতা দেখতে পাচ্ছেন ওকে। যে কোনও সময় পড়ে যেতে পারেন। তবু পড়ে যাননি।

স্বপ্নের দেশ হাজার স্বপ্ন দিয়ে গড়া। সে দেশের কিছু উপাদান আমাদের চেনা পৃথিবী থেকে নেওয়া। বাকিটা স্বপ্নের কল্পনা। স্বপ্নের ঘরবাড়ি, মানুষজন, পশুপাখি সবাই কেমন যেন চেনাচেনা। তবু অচেনা।

বিচিত্র রঙের মেলা সে দেশটার এখানে ওখানে। আশ্চর্য, অদ্ভুত নানা রঙের দেখা মেলে স্বপ্নের দেশে। লেখিকা বাণী বসু কিছুদিন আগে গিয়েছিলেন সেই দেশে। একটা লেকের পাশে রামধনুর সবকটা রঙের বাইরে কত না অচেনা রঙের খেলা। মুগ্ধ বিষয়ে রঙের খেলা দেখছিলেন বাণীদেবী। প্রখ্যাত চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্যর অভিজ্ঞতা আরও মজার। স্বপ্নের দেশে বিকাশ দেখা পান গা সিরসিরে নীল রঙের স্বপ্নের সমুদ্রের। আজও সেই নীল রঙের জাদুকর বিকাশ ফোটাতে পারেননি তাঁর আঁকা কোনও ছবির ক্যানভাসে। স্লেট রঙের আকাশ, পিচকালো মাটি, মেরুন রঙের গাছ বা নীল রঙের সিংহ—কিছুই অসম্ভব নয় স্বপ্নের দেশে।

'আমি স্বপ্ন খুব বেশি দেখি।' সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেশ কয়েকবার আমাকে একথা বলেছেন। সুনীল একা নন। সব মানুষই স্বপ্নের দেশে বেড়াতে বেড়াতে 'স্বপ্ন দেখেন'। স্বপ্ন শোনেন না। কারণটা সবাই জানেন। স্বপ্নে দেখাটাই আসে বেশি। তাই বলে স্বপ্ন তো আর নির্বাক চলচ্চিত্র নয়। নির্বাক স্বপ্ন বিরল, তবে অসম্ভব নয়। স্বপ্নের দেশে ব্যতিক্রমী দু-চার জন মানুষ গন্ধ পান। কেউ পান ছোঁয়া। কেউ বা স্বাদ।

বাস্তবের দেশে আমাদের ভাবনাচিন্তায় বা কল্পনায় আসে মানুষ, জীবজন্তু বা জড়বস্তুর ছবি। আসে কথা, ছোঁয়া, গন্ধ। স্বপ্নে 'ইমেজ' বা ছবি আসে সবচাইতে বেশি। কথা আসে তুলনায় অনেক কম। একটা তুলনা টানা যেতে পারে। মোটাদাগের হিন্দি কাহিনীচিত্রে শুধু কথা আর কথা। হইচই। যখন-তখন মারপিট। ফুলের বাগানে ঘুরতে ঘুরতে নায়িকার মুখে ফুলের গন্ধে সুখের আবেশ। ছবি, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের 'ককটেল' এই ছবিগুলো যেন জেগে থাকা মানুষের চিন্তাভাবনা। পাশাপাশি স্বপ্নের ভাবনা যেন উন্নতমানের কোনও শৈল্পিক চলচ্চিত্র। আর্ট ফিল্ম। ছবি যেখানে অনেক কথা বলে দেয়। কথা আসে কম, আরও কম ছোঁয়া।

স্বপ্ন কি? এককথায় এর উত্তর দেওয়া কঠিন। স্বপ্নকে বলা যেতে পারে ঘুমন্ত অবস্থার ভাবনাপ্রবাহ। বা ঘুমিয়ে থাকা মানুষের চিন্তার চলচ্চিত্রায়ন। সিনেমাটাইজেশান। জেগে থাকা মানুষের মতো স্বপ্ন দেখতে থাকা মানুষের মনেও নানা অনুভূতি খেলা করতে থাকে। স্বপ্নে ভয় করে, সুখ হয়, আনন্দ লাগে। দুঃখে ভরে যায় মন। কখনও বা কান্না পায়। স্বপ্নের দেশে ঘুরতে ঘুরতে স্বপ্নের দর্শক হেসে ওঠেন। রেগে যান। বাঁকুড়ার ১৮ বছরের প্রতিবন্ধী যুবক সুদীপ্ত ব্যানার্জি। স্বপ্নে মাঝেমধ্যে মাংসভাত খায় সুদীপ্ত। আর এরকম স্বপ্নের ভোজ খেয়ে খুব আনন্দ হয় ওর। চার বছরের সময়িতা একরাতে দেখে অদ্ভুত একটা দুঃখের স্বপ্ন। একটা ইঁদুর বড় হতে হতে 'বিরাট' হয়ে গেল। আর ওর বাবা ছোট হতে হতে হয়ে গেল 'এইটুকু'। ইঁদুরটা খেয়ে ফেলল ওর বাবাকে। আর তাই দেখে 'খুউব দুঃখ হল' সময়িতার।

দশ বছরের টুপুর পড়ে লা-মার্টিনিয়ার স্কুলে। ক্লাস ফাইভে। একরাতে স্বপ্নের দেশে টুপুরকে তাড়া করে একটা ভূত। ভয়ে ছুটতে ছুটতে পড়ে গিয়ে ঘুম ভেঙে যায় টুপুরের। হারিয়ে যাওয়া মৃত বন্ধুদের ফিরে পেয়ে স্বপ্নে 'ভারী আনন্দ' পান সাতাশি বছরের যুবক কবি অরুণ মিত্র। স্বপ্নের দেশে গিয়ে মাঝেমধ্যে নিজের মৃত্যুদৃশ্য দেখতে পান লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য। এরকম স্বপ্ন দেখলেই মনটা 'কষ্টে ভরে যায়' সুচিত্রার। কয়েকবছর আগে স্বপ্নে নিজের মৃত দাদুকে আবার মারা যেতে দেখে কষ্টে কেঁদে ফেলেন ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য। চোখের জলে ঘুম যায় ভেঙে।

জেগে থাকা অবস্থায় আপনার আমার চিন্তার জগৎ মোটামুটি একটা শৃঙ্খলায় বাঁধা। সেই জগতে আছে নানা ধরনের ভাব। ফিলিংস। বহুদিন বাদে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। মনে খুব আনন্দ হল। ভিড়বাসে কেউ পা মাড়িয়ে দিল। রাগ চেপে গেল মাথায়। কাছের মানুষের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত কোনও কথা শুনতে হল। দুঃখ ছেয়ে ফেলল মনের আকাশ। জেগে জেগে করা ভাবনায় এরকম অনুভূতিগুলো 'স্বাভাবিক'। যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে যা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। স্বপ্নের দেশে অনুভূতির এই শৃঙ্খলা, এই যুক্তিবোধ হারিয়ে যায় যখন তখন। 'অদ্ভুত', 'অস্বাভাবিক' নানা অনুভূতি দেখা দিতে পারে স্বপ্ন দেখতে থাকা মানুষের মনে।

একজন শিক্ষক দেখলেন জানালা দিয়ে পাড়ার এক বন্ধু এসে তাঁকে ডাকছেন। এতে ভালো লাগার কথা। বাস্তবে তাই হয়। স্বপ্নে বন্ধুকে দেখে বেজায় ভয় পেয়ে গেলেন ভদ্রলোক। এক লেখিকার

ছেলেমেয়েকে পড়াতেন এক দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা। ভদ্রমহিলার সঙ্গে ওঁর তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। একবাতে দেখলেন, মহিলা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছেন ওঁর দিকে। এতে ভয় পাবার কোনও কারণ ছিল না। অথচ স্বপ্নে এই দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড ভয়ে আতঙ্কে পিছু হটতে শুরু করলেন লেখিকা।

মুখোমুখি বাঘের সঙ্গে দেখা হলে ভয় পাবেন যে কোনও মানুষ। স্বপ্নের দেশে সামনাসামনি বাঘ দেখে ভয়ের বদলে অবাক লাগা বা আনন্দ হওয়া বিচিত্র নয়। কম বয়সে সেই দেশে বেড়াতে গিয়ে বহুবার বাঘের দেখা পেয়েছেন সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। খেলার মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখা হয়ে যেত পাশের বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বাঘের সঙ্গে! একটুও ভয় করত না বাঘ দেখে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন। যেন কতদিনের চেনা বন্ধু!

একটা পিচবাঁধানো রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটছিলেন একজন মানুষ। একটা সাইকেলসুদ্ধ দুজন পড়ে গেল মানুষটার ওপর। সাইকেল চাপা পড়া মানুষটার হাল দেখে দুঃখ হবারই কথা। আজব ব্যাপার। দুঃখের বদলে হাসি পেয়ে গেল স্বপ্নের দর্শকের। ঘুমের মধ্যে সে কি হাসি! হি-হি দিয়ে শুরু হয়ে একেবার অট্টহাসি।

লেক টাউনের এক গৃহবধূ একরাতে স্বপ্নে তাঁর স্বামীকে মারা যেতে দেখলেন। যন্ত্রণা বা দুঃখের বদলে 'অদ্ভুত একটা অনুভূতি' দেখা দিল ওঁর মনে। এক মহিলা এক দুপুরে স্বপ্নের দেশে দেখা পেলেন এক পুরুষ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। প্রথমে বাঘটাকে দেখে খুব ভয় করছিল মহিলার। একটু বাদে ভয়টা চলে গেল। অপূর্ব এক ভালো-লাগায় ভরে উঠল মন। সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর অভিজ্ঞতা আবও বিচিত্র। বমাপদবাবুর এক দীর্ঘস্বপ্নের শেষদৃশ্য। দেখা দিল একটা ছায়াশরীর। ওই চেহাবাটাকে দেখে প্রচণ্ড আতঙ্ক হচ্ছিল রমাপদবাবুর। তাজ্জব ব্যাপার! তখনই ঘুম ভেঙে চোখের সামনে একই চরিত্র। স্বপ্নের দেশের ভয়ের চরিত্রকে বাস্তবে দেখে 'বেশ ভালো লাগল' বর্ষীয়ান লেখকের। ভাবের, অনুভূতির এরকম অসঙ্গতি স্বপ্নে দেখা দিতে পারে যখন তখন।

স্বপ্নের অনুভূতি বাস্তবের অনুভবের চাইতে আলাদা। সবসময় না হলেও বেশিরভাগ সময়। অথচ স্বপ্ন দেখতে থাকা স্বপ্নের পর্যটকের মনের ভাব বা বোধ প্রায়শই খুব তীব্র। ১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসের এক রাতের শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখলেন মা সারদাদেবীকে। সারদাদেবী মারা গেছেন এই ঘটনার বহু বছর আগে। স্বপ্নে অনুভবের তীব্রতা আর বোধের স্বচ্ছতা পরিষ্কার হয় কবির কলমে মাকে নিয়ে দেখা ওই স্বপ্নের বর্ণনায়। বালক বয়সে মাতৃহীন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'কাল রাতে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি।—মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময় চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে এক মুহূর্তে আমার কি হল জানিনে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে, মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম।'

কিছুই অসম্ভব নয় স্বপ্নের দেশে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেশ কয়েকবার স্বপ্নের ভ্রমণে ঘুরে এসেছেন স্বর্গ থেকে! ছেলেবেলায় গ্রামের একটা বিরাট অশথ গাছের একটা সবুজ পাতা ধরে ঝুলেছেন কবি রতনতনু ঘাটি! এক পুরুষ নাট্যকর্মী স্বপ্নের দেশে বেশ কয়েকবার বাজার করতে গেছেন মেয়েদের মতো শাড়ি ব্লাউস পরে! চাকরিজীবী তরুণ বসু একবার সারারাত ধরে দু'হাতে অ্যাটলাসের মতো করে আটকে রেখেছেন আকাশটাকে। পাছে মাথায় ভেঙে পড়ে আকাশ। সিংহের গায়ের রঙ আর যাই হোক নীল হয় না। স্বপ্নের দেশে সবই সম্ভব। একসময় একটা নীল রঙের সিংহ দেখা দিত লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নে। নীল সিংহটা উড়ে উড়ে এগিয়ে আসত শীর্ষেন্দুর দিকে!

গল্পের নয়, স্বপ্নের গরুকে আকাশে উড়তে দেখেছেন সত্তর অতিক্রান্ত বৃদ্ধ জ্যোতিপ্রকাশ নাথ। এক কলেজপড়ুয়া যুবকেব স্বপ্নে একদুপুরে একটা হলঘর হয়ে গেল বিশাল একটা কেক। কয়েকশো ছাত্র মিলে ওটার ওপর বসে খেতে শুরু করল কেকটাকে! স্বপ্নের এরকম ঘটনাগুলোকে ঘুম ভেঙে উদ্ভট আর আজগুবি মনে হয়। অথচ স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্নের দর্শকের কাছে সব ঘটনাই পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য। বিশ্বাসের এতটুকু অভাব নেই স্বপ্নের দর্শকের মনে!

স্বপ্ন ঘুমন্ত মানুষের চেতনার চিন্তাপ্রবাহের চিত্রিত বিবৃতি। পিকটোরিয়াল স্টেটমেন্ট অফ স্লিপিং

মাইন্ড। স্বপ্নের ছবিগুলো দ্রুতলয়ে এগোতে থাকে স্বপ্নের দর্শকের মনের পর্দায়। আর স্বপ্নের দেশে বেড়াতে যাওয়া মানুষের মনে দেখা দিতে থাকে অবাস্তব নানা ভাবনাচিন্তা। এক মহিলা সাংবাদিক কয়েকবাব দেখেছেন, তাঁর স্বামীর বিয়ে হচ্ছে অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে। বাস্তবে এরকম দেখা তো দূরের কথা, ভাবলেই যন্ত্রণায়, ঈর্ষায় ভরে উঠবে একজন মহিলার মন। স্বপ্নের দেশের নিয়মকানুন বাস্তবের চাইতে আলাদা। সেখানে নিজের স্বামীর বিয়ে দেখতে দেখতে খুব মজা লাগতে পারে স্বপ্নের দর্শকের। এক সাংবাদিক স্বপ্নে দেখলেন তিনি মারা গেছেন। শবযাত্রীদের কাঁধে চড়ে তিনি চলেছেন শ্মশানের দিকে। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন, 'আমি তো মারা গেলাম। এবার আমার স্ত্রী একা একা সংসার, ছেলেমেয়ে সব সামলাবে কি করে?' এরকম অদ্ভুতুড়ে চিন্তা বাস্তবে নয়, স্বপ্নের দেশেই সম্ভব।

স্বপ্নের দেশে গিয়ে স্বভাব বদলে যায় অনেক মানুষের। একচল্লিশ বছরের শিক্ষিকা সুতপা চৌধুরী বাস্তবে খুব শান্ত আর নরম প্রকৃতির। স্বপ্নের দেশে গিয়ে মাঝেমধ্যে সুতপা বদলে যান পুরোদস্তুর। সবকিছু ভেঙেচুরে, ওলটপালট করে দিতে ইচ্ছা করে ওঁর। অন্যায় দেখে প্রতিবাদে চিৎকার করতে গিয়ে ঘুম যায় ভেঙে। বোলপুরের গৃহবধূ শিপ্রা চৌধুরী। বাস্তবে নির্বিবাদী, শান্ত। স্বপ্নের দেশে যখন-তখন তর্ক জুড়ে দেন এর-ওর সঙ্গে। কখনও বা তর্কে কোণঠাসা করে ফেলেন একদল মানুষকে। শান্ত, আত্মগত স্বভাবের সাংবাদিক সুমিত দে। 'সানন্দা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। একরাতে স্বপ্নের দেশে সুমিত খুন করে বসেন একজন মানুষকে। মানুষটা খুন হন স্ত্রী-পুত্রের সামনেই। স্বপ্নের খুনী ওঁদের বোঝায়, 'তোমাদেব কোনও ভয় নেই!' ওঁর মনে হয়, ওই লোকটা বেঁচে থাকলে আরও অনেক লোকের অনেক ক্ষতি হয়ে যেত! স্বপ্নের দেশে বেড়াতে আসা মানুষের ভাবনাচিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে আজব দেশের আজব নিয়মকানুন।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্নের দর্শক দেখা পান হাজার হাজার অদ্ভুত, অচেনা বাড়ির। লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্নে বারবার ঘুরেফিরে আসে অচেনা একটা বাড়ি। সেখানে কাউকে যেন খুঁজেছেন তিনি। সারাজীবন ধরে স্বপ্নপর্যটন করে চলেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। দেখা পেয়েছেন হাজার হাজার অচেনা, বিচিত্র বাড়িব। মাঝেমাঝে দেখতে পান নিজের বাড়ি বা ঘরটাকেও। বাস্তবের বাড়ি বা ঘরেব সঙ্গে তাব মিল নেই কোথাও। তবু সুনীলের অনুভূতি বলে দেয়, এই বাড়িটা, এই ঘরটা তাঁরই বাড়ি, তাঁবই ঘব। স্বপ্নে নিজের বাড়িটাকে বেশ কয়েকবার দেখেছেন রমাপদ চৌধুরী। সেই বাড়িটা তাঁর বাস্তবেব বাড়ির থেকে একেবারে আলাদা, অন্যরকম। স্বপ্নের বাড়ি বড় অদ্ভুত, বিচিত্র।

স্বপ্নের দর্শকের মন তীব্রভাবে সজাগ। সচেতন। সক্রিয় মনের নানা অনুভূতি। স্বপ্নেব দ্রুতলয়ে ছুটতে থাকা ছবিগুলো স্বপ্নের দর্শকের মনে তৈরি করতে থাকে একের পর এক প্রতিক্রিয়া। সেই ছবিতে তিনি থাকেন। অথচ সবসময় দেখা পান না নিজেব। কখনও বা দেখা পেয়ে যান নিজের শৈশবেব, কৈশোরের। স্বপ্নের দেশে ঘুরে বেডানো মানুষের মনের গতি, ভাবনাচিন্তার গতি স্বপ্নের মতোই দ্রুতগামী। হয়তো সকালে উঠে মনে হল, সারারাত ধরে দেখেছেন দীর্ঘ এক স্বপ্ন। আসলে সেই স্বপ্নের স্থায়িত্ব হয়তো মাত্র কয়েক মিনিট। লেখক বুদ্ধদেব গুহ একরাতে স্বপ্নে পশ্চিম আফ্রিকার কঙ্গো নদীর উৎসমুখ থেকে যাত্রা শুরু করে ছোট্ট নৌকা 'ক্যানো'য় ঘুরে বেড়িয়েছেন কয়েকশো মাইল পথ। স্বপ্নেব গতিকে শব্দের নয়, হয়তো তুলনা করা যায় আলোর গতির সঙ্গে। আধুনিকতম প্রযুক্তির সেলুলয়েডের গতিও হার মানে স্বপ্নের কাছে।

স্বপ্নের দেশে অদ্ভুত নানা ক্ষমতা তৈরি হয় স্বপ্নের দর্শকের। চিত্রকর যোগেন চৌধুরী স্বপ্নে উড়ে বেড়ান যখন তখন। পৃথিবীর মাটির অনেক ওপর দিয়ে পাখির মতো উড়ে বেড়াতে বেড়াতে খুব আনন্দ পান যোগেন। ভাস্কর সোমনাথ হোর স্বপ্নের দেশে একলাফে মাটির ওপর দিয়ে পার হয়ে যান দু-এক মাইল পথ। এক গৃহবধূ সিঁড়ির ওপর দিয়ে গ্লাইড করে পৌঁছে যেতে পারেন একতলা থেকে দোতলায়। ব্যালকনি থেকে লাফ দিয়ে অক্ষতদেহে নেমে আসতে পারেন রাস্তায়। দুষ্কৃতীদের তাড়া খেয়ে এক যুবক ওদের হাত থেকে বাঁচতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সটান উঠতে শুরু করেন ওপরে। সাংবাদিক সুদেষ্ণা বসু লিফট ছাড়াই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যান একশো ষাট তলা বাড়ির সবচাইতে ওপরতলায়। একবারও না থেমে, কয়েক মুহূর্তে। এতটুকু ক্লান্ত না হয়ে! এরকম নানা 'বিশেষ ক্ষমতা' অনেক মানুষ পেয়ে যান স্বপ্নের দেশে।

স্বপ্নের স্থানকালের নিয়মকানুন ভারী অদ্ভুত। হয়তো ভিক্টোরিয়ার বাগান ধরে হাঁটছেন আপনি। একটু এগোতেই শুরু হয়ে গেল সুন্দরবনের জঙ্গল। এক সঙ্গীতশিল্পী একরাতে স্বপ্নে চলে গেলেন ফরাক্কার সেকেণ্ডারি স্কুলে। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে দুপা এগোতেই চলে এল দক্ষিণ ভারতের কোনও এক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। এক কবি প্রায়ই দেখতে পান তাঁর ছেলেবেলাটাকে। হাফপ্যান্ট পরা চেহারা, স্কুলে পড়েন। অথচ তাঁর স্ত্রী রয়েছেন। রয়েছে ছেলেও। রেলকর্মী সৌম্যেন্দু ভট্টাচার্যর বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল স্বপ্নে দীঘা বেড়াতে গিয়ে। দীঘায় উঠেছেন একটা হোটেলে। হোটেলের কাছেই ওঁদের গল্ফগ্রীনের বাড়িটা। বাড়িটাই যেন ওঁর বর্ধমানের কাছাকাছি বর্তমান কর্মস্থল। বাস্তবের স্থানকালের বোধ বা ধারণা স্বপ্নে বাতিল হয়ে যায় যখন তখন।

স্বপ্নের পরিবেশ, আবহ আর চরিত্র

স্বপ্নের পরিবেশ মায়াবী। কুয়াশা কুয়াশা। কুয়াশামাখা ময়দানের বুক চিরে চলতে থাকা ট্রামের মতো। মরা জ্যোৎস্নার রাতে সীমাহীন প্রান্তর ধরে হেঁটে চলা এক মানুষের মতো। স্বপ্নে মানুষ, প্রকৃতি, পশুপাখি সব ছবিই বাস্তবের চাইতে আলাদা। কেমন যেন অস্পষ্ট। স্বপ্নের পরিচিত কোনও মানুষ যেন 'অবশ্যই ওই মানুষটা, তবু ঠিক ওই মানুষটা নন।' ধরুন একটা রেললাইন ধরে দৌড়চ্ছেন অপরিচিতা এক নারী। বাস্তবে রেললাইন, তার চারপাশ, মেয়েটার জামাকাপড়, মুখ, হাত, পা, গায়ের রঙ—সবই আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে কয়েক মুহূর্তে। স্বপ্নে একই ছবি এলে তা আসবে বেশ খানিকটা অন্যভাবে। অনেকটা সিনেমার কেটে কেটে জোড়া ফিল্মের অংশগুলোর মতো। প্রথমে হয়তো শুধুই রেললাইন দেখলেন। তারপরই রেললাইন ধরে ছুটতে থাকা এক মানবী। তার শরীরের আদল, তার শাড়ির রঙ—সবই জোরে ছুটতে থাকা কোনও ট্রেনের মতো আবছা আবছা। তারপর হয়তো একঝলক রেললাইনের পাশের ঝিল, সবুজ মাঠ। হলুদ রঙের একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি।

স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয় অনেকের। আলখাল্লা গায়ে সেই দীর্ঘ, সুদর্শন, সাদা দাড়িতে মুখ ঢাকা রবীন্দ্রনাথ। অথচ ছবির মতো স্পষ্ট হন না কখনও। কেউই আপাদমস্তক দেখতে পান না কবিকে। পাঠক নিজের স্বপ্নের একজন মানুষকে মনে করার চেষ্টা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। যেন বিরাট একটা ল্যান্ডস্কেপ। সাধারণ ক্যামেরায় একবারে গোটাটা কিছুতেই আসছে না। স্বপ্নের ক্যামেরা হয়তো অতি সাধারণ, পুরনো আমলের একটা ক্যামেরা। তাই একটা গোটা দৃশ্যকে ধরতে এক-একবার টুকরো টুকরো একটা অংশের ছবি পরপর ধরে নেয় এই ক্যামেরা। কখনও বা বারবার দেখা দেয় শুধু একটা মুখ। বাকি শরীরটা ধরে নেয় স্বপ্নের অনুভূতি।

একজন লেখক হয়তো দেখছেন লেখার স্বপ্ন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রাইটিং প্যাডটা। একটা টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। অথচ টেবিল নেই। কাগজের ওপর এসে পড়া আলোটা পরিষ্কার, টেবিল ল্যাম্পটা নয়। পেনের নিবটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অথচ পেনের ওপরদিকটা যেন নেই। শিল্পীরা যেমন আঁকতে আঁকতে হঠাৎ করে ছেড়ে দেন, অনেকটা সেরকম। একজন মানুষকে দেখছেন স্বপ্নে। মুখের এক-একটা ব্যাপার পরিষ্কার অনুভব করলেন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, লম্বা নাক, এমনকি ভুরুর ওপরকার কাটা দাগটা পর্যন্ত। তবু গোটা মুখটা অস্পষ্ট রয়ে গেল। অধরা রয়ে গেল মানুষটার গোটা অবয়ব। এর ব্যতিক্রম হয় না তা নয়। তবে স্বপ্নে এরকমটাই স্বাভাবিক।

স্বপ্ন দেখতে থাকা মানুষের কল্পনা উদ্দাম, বাঁধনহীন। স্বপ্নের কল্পনা কখনও কোনও মানুষের, গাছপালা, পশুপাখি বা জড়বস্তুর পুরোপুরি ছবি আঁকে না। আঁকে একটা 'রাফ-স্কেচ'। যেটুকু না আঁকলে কোনও জীব বা জড়বস্তুকে চিনতে পারে না আপনার আমার মন। একজন দক্ষ কার্টুন-আঁকিয়ে যেমন দ্রুত কিছু রেখায় একজন মানুষকে ধরে ফেলেন, অনেকটা সেইরকম। কার্টুনিস্টের ছবি যেমন ছবির ভাষায় অনেক কথাই বলে দেয়, স্বপ্নের ছবিও ঠিক তাই। স্বপ্নে ছবি (Visual Image) অনেক কথা বলে দেয় বলেই কথা আসে কম। বাস্তবের কোনও কিছুকেই হুবহু নকল করতে চায় না স্বপ্নের কল্পনা। তাই শুধু ছবি নয়, বাস্তবের কথার সঙ্গে স্বপ্নের কথার ফারাক অনেক। স্বপ্নের মানুষদের মুখের কথাগুলো যেন আবছা, ভাসা ভাসা। হয়তো সামান্য কয়েকটা জড়ানো জড়ানো শব্দ। স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নের অনুভূতিতে কিন্তু কথাগুলোর অর্থ পরিষ্কার।

স্বপ্নে ছোঁয়া বা গন্ধ এমনিতেই আসে কম। মৃত মা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন হস্টেলের ছাত্র অরিন্দমের। বাস্তবে, মা এলে হস্টেলবাসী ছেলের মাথায় গায়ে হাত বোলাতেন অনেকক্ষণ ধরে। স্বপ্নে

শুধুই 'একটুকু ছোঁয়া লাগে'। আর তাই নিয়েই স্বপ্নের তীব্র অনুভূতি 'রঙেরসে' বুনে চলে কল্পনার 'জাল'। শুধু ঘুম ভেঙে উঠে নয়, বহুদিন অরিন্দমের মনে থেকে যায় মায়ের সেই স্পর্শের ভালোবাসা, আবেশ, অনুভূতি। স্বপ্নকে শক্তিশালী এক শিল্পমাধ্যম বা খুব উন্নতমানের এক শিল্প অবশ্যই বলা যায়। ভ্যান গগের ছবির মতো। ছবি যেখানে শুধু ছবি নয়, ছবিকে ছাড়িয়ে একটা বিশেষ বোধ জারিত হয় দর্শকের মনে। শঙ্খ ঘোষের কবিতার মতো। শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যেখানে শব্দোত্তর এক বোধে উত্তীর্ণ হন কবিতার পাঠক।

চিন্তা, কল্পনা, স্বপ্ন আর দিবাস্বপ্ন

শুধু ঘুমিয়ে নয়, অনেকে স্বপ্ন দেখেন জেগে-জেগেও। আদর্শগত স্বপ্ন বা বড় হবার স্বপ্ন নয়। সত্যিকারের সত্যি স্বপ্ন। সাধারণত খুব বেশি অনুভূতিপ্রবণ মানুষের এরকম হতে পারে। লেখক, কবি, শিল্পী, চিত্রকর বা ভাস্কর। অথবা কল্পনাপ্রবণ সাধারণ মানুষ। এঁদের মনে জেগে থাকা অবস্থাতে অনেক সময় স্বপ্নের মতো একটা 'ঘোর' তৈরি হয়। দেখা দেয় দিবাস্বপ্ন। 'ডে-ড্রিমিং'। সংস্কৃতে 'জাগরস্বপ্ন'। বাংলা সাহিত্যের এক খ্যাতনামা লেখিকা হব-হব সন্ধ্যায় তাঁর ফ্ল্যাটের ছাদে উঠলেই দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ছাদে পায়চারি করতে করতে পৌঁছে যান নাচের স্টেজে। হল-ভর্তি লোকের সামনে নাচেন। পারফরম্যান্স হয় অপূর্ব! কখনও বা তাঁর গলার সুর খুব কঠিন একটা তান বা মীড়কে ধরে ফেলে। বড় বড় ওস্তাদরাও যা সহজে পারেন না।

সাংবাদিক দীপান্বিতা নায়ার বাসে বা ট্যাক্সিতে যেতে যেতে প্রায়ই পৌঁছে যান অনেক দূরের কোনও এক নির্জন সি-বিচে। হাঁটতে থাকেন সি-বিচ ধরে। সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একবার ভরদুপুরে চুঁচুড়া থেকে হাঁটছিলেন ব্যান্ডেল গেটের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে পৌঁছে যান বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সেই পরিত্যক্ত 'জনপদ' গ্রামে। চারপাশ জনমানবহীন। বেশ কিছু খড়ের আর টিনের চালের সেই আমলের ঘর। কোনও বাড়িতে চালের ওপর উঠে যাওয়া লাউগাছ। একটা দাতব্য চিকিৎসালয়। মহামারীতে জনশূন্য এক গ্রাম ধরে সেদিন অনেকক্ষণ ধরে হেঁটেছিলেন শ্যামলবাবু। কবি অনীক রুদ্র এক সকালে পৌঁছে গিয়েছিলেন হিমযুগ শুরু হয়ে যাওয়া কলকাতায়। শুধু এঁরা নন আরও অনেক মানুষ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেন। দিবাস্বপ্ন বোধহয় সবচাইতে বেশি দেখেন কবিরা। আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে।

'আমি স্বপ্ন দেখলাম' বোঝাতে অনেককে বলতে শোনা যায়, 'একটা স্বপ্ন এলো'। 'স্বপ্ন আসা'র এই ধারণাই একদিন মানুষকে বুঝিয়েছিল যে স্বপ্ন আমাদের ভেতর থেকে আসে না। স্বপ্ন পাঠায় অতিমানবিক কোনও শক্তি। বিজ্ঞান বলে, স্বপ্ন তৈরি হয় ঘুমন্ত চেতনায়। আর স্বপ্ন আসে ঘুমন্ত চেতনার ভাবনাচিন্তা থেকে। মনের ভেতর থেকে। বাইরে থেকে নয়। স্বপ্নকে কোনও বড় দেশের প্রতিরক্ষা দপ্তরের নজরদারি বিভাগের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই নজরদারির ব্যাপারটা নির্ভর করে বেশ কিছু 'গোয়েন্দা এজেন্সি'র কাজকর্মের ওপর। এই নজরদারি বিভাগ হল আমাদের মন। যা নানা সূত্রে আসা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটা ধারণা তৈরি করে তাকে 'স্বপ্ন' নামের চলচিত্রে তুলে ধরে। আর 'এজেন্সি'গুলো হল স্বপ্নদ্রষ্টার মনের নানা ধরনের অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির ছবি।

জেগে থাকা অবস্থায় আপনি যা চিন্তা করেন, তা থেকে একটা 'ধারণা' বা 'ভাবনা' (Idea) তৈরি হয় আপনার মনে। চিন্তা করলেন, আজ ছুটির দিন। জম্পেশ করে দুপুরের লাঞ্চটা সারতে হবে। অমনি বাজার যাওয়া, বাজার থেকে মাছ-মাংস, সবজি, মিষ্টি কেনা, পকেটের অবস্থা—এসব নিয়ে দ্রুত একটা ভাবনা তৈরি হল আপনার মনে। বা ভাবলেন রান্নাবান্নার পাট বন্ধ রেখে আজ বরং কোনও চাইনিজ রেস্তোরাঁয় সপরিবারে লাঞ্চ সারা যাক। কোন রেস্তোরাঁয় যাবেন, কি হবে লাঞ্চের মেনু এসব নিয়ে ভেবে নিলেন দ্রুত। স্বপ্নে এরকম ভাবনা আপনি ভাবেন ছবির ভাষায়। চিন্তার সূত্রে নয়।

স্বপ্নের ছবির ভাষা কিছুটা জটিল আর বিমূর্ত। হয়তো দেখলেন, বাজার করছেন আপনি। তারপরই মাছ-মাংস-মিষ্টিতে সাজানো ডাইনিং টেবিলের ছবি। অনেক দূরে থাকা পুরনো এক বন্ধু আর তাঁর স্ত্রীও রয়েছেন আপনার সঙ্গে। আপনার বন্ধু হাফপ্যান্ট পরে, ওর বয়সটাও স্কুলের। আবছা-আবছা কথাবার্তা। রান্নার তারিফ করছেন বন্ধু। এখান থেকে হঠাৎ করে হয়তো বসবার ঘরে। আপনি আর আপনার বন্ধু

গল্প করছেন। স্বপ্নের ছবি কথা বলে দিল অনেকটাই। তবু জড়ানো কিছু কথা ছিল। ছিল পুরনো বন্ধুকে কাছে পাবার তীব্র ভালোলাগা। ভীমনাগের সন্দেশ খাবার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল স্বপ্নে। হয়তো টেবিলে বসে পেয়েছিলেন বিরিয়ানির গন্ধও।

বাস্তবের ভাবনার সঙ্গে স্বপ্নের ফারাক তাহলে কোথায়? এককথায়, কোনও ভাবনা অলীক কিছু ছবি, কথা, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ—এসব মেশানো একটা চলচ্চিত্র ধরনের ছবিতে রূপ নেয় স্বপ্নে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একজন মানুষের চিন্তা বা ভাবনার নাট্যায়ন (Dramatisation), আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় চলচ্চিত্রায়ন (Cinematisation) ঘটে স্বপ্নে। এখানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার। স্বপ্নে ছবি আসে সবচেয়ে বেশি। তারপর কথা। স্পর্শ কম। আরও অনেক কম গন্ধ আর স্বাদ। ছবি কম থাকা বা একেবারে না থাকার অভাব মেটাতে কথা আর স্পর্শ তুলনায় বেশি আসে দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্নে।

ছবি আর কথা দিয়ে তৈরি স্বপ্ন একটা পরিবেশ তৈরি করে ঘুমন্ত চেতনায়। যে পরিবেশে ঘটে-চলা ঘটনা, বলা কথাবার্তা আর মনের বিচিত্র ভাব পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে স্বপ্নের দর্শকের মনে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে আপনি আমি বিশ্বাস করি, যে আমরা কিছু 'দেখছি'। আমরা যে কিছু ভাবছি, এরকম চিন্তা আমাদের মাথায় আসে না মুহূর্তের জন্যও। ঘুমন্ত চেতনার অলীক চিত্রায়ন আর শব্দায়নকে 'অবাস্তব' বলে মনে হয় না স্বপ্নের দর্শকের। তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন যে, যা তিনি দেখছেন বা শুনছেন, সেটাই বাস্তব। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার আগে পর্যন্ত আপনি ভাবতেই পারেন না যে আপনি কিছু 'দেখছিলেন না'। আপনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চিন্তা করছিলেন 'বিশেষ এক পদ্ধতি'তে।

ঘুমিয়ে চিন্তা করবার 'এই বিশেষ পদ্ধতি'র ব্যাপারটা মাথায় রেখে জেগে থাকা মানুষের কল্পনা আর স্বপ্নের কল্পনার মধ্যে একটা সীমারেখা হয়তো টানা যায়। সৃষ্টিশীল, অনুভূতিপ্রবণ মানুষের কথাই ধরা যাক। কবি, গদ্যকার, চিত্রকর, ভাস্কর বা অনুভূতিপ্রবণ সাধারণ মানুষ। অনেকসময় জেগে জেগেই কল্পনার জগতে চলে যান এঁরা। এক লেখিকা কোনও কারণে ভোরের শতাব্দী এক্সপ্রেসে আগে থেকে ঠিক করা সফর স্থগিত রাখলেন। বাড়িতে বসে জেগে জেগেই কল্পনায় পৌঁছে গেলেন হাওড়া স্টেশনের সেই প্ল্যাটফর্মে।

নীল সাদা রঙের শতাব্দী এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন ছাড়বার আগে যাত্রীদের ব্যস্ততা, কুলিদের হইচই, ট্রলি ঠেলার আওয়াজ, ড্রাইভার আর গার্ডের প্রস্তুতি—সবই মহিলা তীব্রভাবে অনুভব করছেন কল্পনায়। বাস্তবের ট্রেন কল্পনায় বাঁশি বাজায় ছাড়বার। বিদায় জানাতে আসা মানুষের হাত নাড়াকে পেছনে ঠেলতে ঠেলতে ছেড়ে যায় শতাব্দী এক্সপ্রেস। এ তো স্বপ্ন নয়, এ কল্পনা। কল্পনার জাল বুনে স্বপ্নের মত একের পর এক ছবি আর শব্দ তৈরি হচ্ছে লেখিকার মনে। তবু তিনি জানেন যে তিনি কল্পনা করছেন। 'দেখছেন না'।

কল্পনার ওপর সাধারণত কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকে মানুষের। ইচ্ছে করলেই কল্পনার স্রোতকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন একজন মানুষ। স্বপ্নের গতিকে এভাবে অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। 'প্রায়' শব্দটা ব্যবহার করছি ইচ্ছে করেই। স্বপ্ন নিয়ে কাজ করা কিছু মনোবিদ বলেন, যথেষ্ট অনুশীলন করলে একজন মানুষ স্বপ্নের গতি ফেরাতে পারেন সচেতনভাবে। স্বপ্নগবেষক গিরীন্দ্রশেখর বসু লিখছেন, 'আমি অনেক সময়েই স্বপ্নের গতি ইচ্ছামতো ফিরাইতে পারিয়াছি; আমার মতন আরো অনেকেই বোধহয় ইহা পারেন। ইহা যেন অনেকটা ইচ্ছা করিয়া স্বপ্ন দেখা। নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া এ অবস্থার ধারণা করা কঠিন।'

ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন আর অনুভূতিপ্রবণ মানুষের এরকম কল্পনার ছবির ফারাকটা কি শুধু অনুভবের? কল্পনা একটা স্তর পর্যন্ত অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন একজন মানুষ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে হয়, 'জেগে জেগে যেসব স্বপ্ন দেখি আমরা, আসলে তা তো স্বপ্ন নয়, তা হল কল্পনা। ইচ্ছেমতো একে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।' কবি জয় গোস্বামী ঘুমোবার আগে শুয়ে শুয়ে একের পর এক ছবি দেখতে থাকেন। ওঁর কথায়, 'অদ্ভুত সব ছবি—মাঝেমধ্যে এই ছবিগুলোর মধ্যে চলে আসে কবিতার দু-একটা লাইন—'। জয়ের দেখা এই ছবিগুলো আসলে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় জয়ের মনের ভাবনার চিত্ররূপ। 'ট্রানসফর্মেশান অফ আইডিয়া ইনটু ইমেজ'।

এখানে একটা প্রশ্ন এসে যায়। কেন কিছু মানুষ জেগে জেগে এভাবে পুরোপুরি কল্পনার জগতে চলে যেতে পারেন, অন্যরা সেভাবে পারেন না? তবে কি এরকম কল্পনা স্বপ্ন দেখার মতোই মানবমনের এক বিশেষ ক্ষমতা? 'হয়তো তাই!' মনে হয় 'বর্ষীয়ান তরুণ কবি' অরুণ মিত্রের। 'আমি যে লিখি সে তো স্বপ্নের কথাই লিখি। চিত্রকর যে ছবি আঁকেন সে তো স্বপ্নেরই ছবি'। কল্পনাপ্রবণ মানুষের হয়তো জেগে জেগে কল্পনার রাজ্যে চলে যাবার 'বিশেষ ক্ষমতা' থাকে। যা সব মানুষের সমান থাকে না। তাই বলে কল্পনার স্বপ্ন দেখার আর স্বপ্নের কল্পনার কোনও ফারাক নেই তা কি করে হয়? স্বপ্নের উদ্ভটভাব বা বিমূর্ততা কি একভাবেই আসে সৃষ্টিশীল একজন মানুষের কল্পনার ছবিতে?

বোধহয় না। একজন শিল্পীর কল্পনার জগৎ চলে তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনের 'বিশেষ পদ্ধতি'তে। এই পদ্ধতি স্বপ্ন দেখার 'বিশেষ পদ্ধতি'র থেকে একেবারে আলাদা। তা না হলে কল্পনার শতাব্দী এক্সপ্রেস ছেড়ে যাবার ছবিগুলো এত নিয়ম মেনে, সুশৃঙ্খল ভাবে আসত না 'শতাব্দী এক্সপ্রেস' গল্পের লেখিকার কল্পনায়। হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দী এক্সপ্রেস। একঝলক এই দৃশ্য দেখবার পরই হয়তো মুহূর্তে চলে আসত ভিলাই স্টেশন। তারপর দেখা যেত অচেনা একটা রাস্তা। রাস্তা ধরে হয়তো মায়ের সঙ্গে হাঁটছেন তিনি। এই জায়গাতে কল্পনার ছবি আর স্বপ্নের ছবির অমিল অনেক।

কল্পনার ছবিই কি দিবাস্বপ্ন? অনেকে তাই ভাবেন। আমার অভিজ্ঞতা বলে, দিবাস্বপ্ন কল্পনার ছবির চাইতে আলাদা। জেগে জেগে কল্পনায় ছবি আঁকা আর স্বপ্নের মাঝামাঝি কোনও একটা জায়গায় তৈরি হয় দিবাস্বপ্ন। ক্ষুরধার মেধা আর তীব্র অনুভূতির ব্যতিক্রমী কবি শঙ্খ ঘোষেরও মনে হয় অনেকটা এরকম। 'হয়তো জেগে করা কল্পনা আর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার মাঝে একটা স্তর রয়েছে। অনুভূতির এই স্তরে মানুষ দিবাস্বপ্ন দেখে।' আগে বলা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের দিবাস্বপ্নে দেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের মহামারীতে জনশূন্য গ্রামটার ছবি আজও এই সাহিত্যিকের স্মৃতিতে ছবির মতো পরিষ্কার।

তিনি আজও ভাবেন, সত্যি সত্যি ভরদুপুরে ওরকম একটা গ্রামের ভিতর দিয়ে হাঁটছিলেন। একে আর যাই হোক কল্পনার ছবি বলা যায় না। কল্পনায় ওই গ্রামে পৌঁছে গেলে শ্যামলবাবু অবশ্যই বুঝতে পারতেন, গ্রামটা বাস্তবে আসেনি, এসেছিল কল্পনায়। তাহলে ব্যান্ডেল স্টেশনে পৌঁছে ঐ গ্রামটার কথা তাঁর সঙ্গী আত্মীয়কে কেন জিজ্ঞাসা করবেন তিনি? কেন পরেও মনে ওই ছবিটা ভেসে উঠলে বারবার তিনি সেদিনের সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কি সত্যিই ওই ভাঙাচোরা বাড়িগুলো আর গ্রামটা দেখোনি?'

দিবাস্বপ্ন আর স্বপ্নকে প্রায় একই ভাবতেন স্বপ্নগবেষক গিরীন্দ্রশেখর। তাঁর মনে হয়েছিল, 'অনেক সময় জাগ্রত অবস্থাতেও স্বপ্নের ন্যায় চিন্তাধারা চলিতে থাকে। ইহাকে দিবাস্বপ্ন বা জাগরস্বপ্ন বলে।' ফ্রয়েড ঘুমন্ত চেতনায় স্বপ্ন দেখার অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়ে কল্পনার ছবি আর স্বপ্নের মধ্যে একটা দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন। কল্পনার ছবি দেখা মানুষ জানেন যে তিনি কিছু ভাবছেন, দেখছেন না। ঠিক এর উলটোটা ঘটে স্বপ্নে। কল্পনার ছবি আর যাই হোক কখনও স্বপ্নের মতো অদ্ভুত, উদ্ভট আর বিশৃঙ্খল হয় না। ফ্রয়েড মানসিক চিন্তাভাবনার এই স্তরকে 'ডে ড্রিমিং' বা জেগে স্বপ্ন দেখা বলছেন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের দিবাস্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা এ থেকে পরিষ্কার হয় না। আমি এমন বেশ কিছু মানুষের অভিজ্ঞতার কথা জানি যেখানে একজন মানুষ জেগে জেগে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন এক কল্পনালোকে বিরাজ করতে থাকেন। এঁদের বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পায় ওই সময়টাতে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের আমলের গ্রামের ভেতর দিয়ে যেমন হাঁটতে হাঁটতে বাহ্যজ্ঞান বা বাস্তবের পারিপার্শ্বিকতার চেতনা হারিয়েছিলেন শ্যামলবাবু।

একজন মহিলাকে এরকম দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে অন্য অলীক চরিত্রের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি অনেকবার। এই জায়গায় পৌঁছে, জাগ্রত কল্পনার ছবি আঁকাকে বাস্তবের চিন্তার পরের মানসিক স্তরে বসানো যেতে পারে। আর দিবাস্বপ্নকে রাখা যায় কল্পনার ছবি আর স্বপ্নের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। দিবাস্বপ্ন আর স্বপ্নকে আলাদা করবার কারণটা বলি। স্বপ্নের মতো অদ্ভুত হলেও দিবাস্বপ্নে একটা শৃঙ্খলা থাকে। এরকম স্বপ্নে দেখা দৃশ্যগুলো অনেকটা সিনেমার মতো একটা নির্দিষ্ট ক্রম মেনে চলে। স্বপ্নের ছবির মতো সেগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। দিবাস্বপ্নের ছবির ধারাবাহিকতা স্বপ্নের ছবিতে থাকে না।

স্বপ্নে টুকরো টুকরো ছবি জুড়ে গোটা একটা ছবি তৈরির 'এডিটিং' বা সম্পাদনার কাজটা দুর্বল। সিনেমার মতো উন্নতমানের না হলেও দিবাস্বপ্নের 'এডিটিং'-এর কাজ স্বপ্নের চাইতে অনেক আধুনিক।

জেগে থাকা আর ঘুমিয়ে পড়ার মাঝের জায়গাটা ঠিক কি, এ ব্যাপারে কোনও একটা সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। শুয়ে ঘুম আসবার আগে তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা অবস্থার অভিজ্ঞতা সবারই আছে। এরকম অবস্থায় ঘুমের মতো বাস্তব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না মানুষের মন। আবার জেগে থাকা অবস্থার মতো পুরোপুরি বাস্তবের নিয়ন্ত্রণেও থাকে না। এরকম আচ্ছন্ন অবস্থায় বা তন্দ্রার ঘোরে অনেক সময় নানা ধরনের ছবি ভেসে উঠতে থাকে মনে। এই অবস্থায় দেখা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা অনেকে আমাকে জানিয়েছেন।

লেখক আবুল বাশারের কথা বলি। 'ঘুম আসবার ঠিক আগে' বাশারের চেতনায় ভাসতে থাকে বিচিত্র নানা জায়গার ছবি। কখনও দেখতে পান শৈশবের গুমানি নদীকে। কখনও বা চলে আসে উত্তাল এক সমুদ্র বা দিকচিহ্নহীন মরুভূমি। ঘুমিয়ে পড়বার আগে অর্ধেক জেগে থাকা চেতনায় কোনও একটা ভাবনার এভাবে ছবিতে রূপান্তর প্রায় স্বপ্নের মতো।

অনিতা অগ্নিহোত্রী ব্যতিক্রমী কবি, গদ্যকার। যতটা বাস্তবমুখী ততটাই অনুভূতিপ্রবণ। প্রকৃতির নানা ছবি অনিতাকে মাঝেমধ্যে টেনে নিয়ে যায় কল্পনার দেশে। কল্পনালোকে একটার পর একটা ছবি ভেসে ওঠে মনে। হয়তো আকাশে একপাল সাদা মেঘ। ওদিকে একঝলক তাকিয়েছেন। 'অমনি চলে গেলাম একটা নদীর কাছে— তারপর একটা জলপ্রপাত—অচেনা একটা দেশ'। কল্পনার ছবিগুলো দ্রুত মিলিয়ে যায়। ছবিগুলো দেখতে দেখতে অনিতা কিন্তু বুঝতে পারেন, এগুলো তাঁর কল্পনার ছবি। স্বপ্ন নয়।

দুরন্ত কবি, অধ্যাপক সুবোধ সরকার বাস করেন কল্পনা আর বাস্তব, দুটোরই দুইঞ্চি ওপরে। এক-একটা কবিতার জন্ম দেবার আগে ছটফট করেন সুবোধ। 'রূপমকে একটা চাকরি দিন' কবিতার কথা ধরা যাক। এই কবিতার কল্পনার ছবি দেখতে দেখতে সুবোধ পৌঁছে যান সেইসব নিরালম্ব, অস্থির দিনগুলোর বিপন্নতায়। যখন চাকরি একটা চাই-ই। মেলে না শুধু দেবার মানুষ। কল্পনার এই পর্যায়ে এসে ঢুকে পড়ে বাস্তবের রূপম। যার একটা চাকরি চাই তখনই। নিজেকে বাঁচাতে। বাঁচাতে অন্যদের।

হারবার্ট সিলব্যেরের তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ভাবনার ছবিতে রূপান্তরের এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানলে স্বপ্ন নিয়ে কৌতূহলী মানুষ উৎসাহ পাবেন। যখনই ঘুম পেত বা ঝিমুনি আসত তখনই জটিল কোনও একটা বিষয়ে মন দিতে চেষ্টা করতেন এই মনোবিদ। ওই ভাবনা রূপ নিত ছবিতে। ঘুম ভেঙে দ্রুত ওই ছবিগুলোর কথা লিখে রাখতেন ভদ্রলোক। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চিন্তার বিকল্প হয়ে ওঠা এই ছবিগুলোর দুটোর কথা এখানে বলব। ওরকম অবস্থায় একরাতে সিলব্যেরের ভাবলেন, একটা প্রবন্ধের দুর্বোধ্য (uneven) অংশগুলোকে নতুন করে লিখতে হবে। দেখলেন, একটা অসমান কাঠের টুকরোকে সমান করছেন তিনি। আর একরাতে ঘুমোবার আগে কোনও একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে চিন্তার জাল মাঝপথে ছিঁড়ে গেল। আবার নতুন করে ভাবতে গিয়ে ওই চিন্তার উৎসে কিছুতেই পৌঁছতে পারলেন না সিলব্যেরের। ভাবতে ভাবতে এল ঝিমুনি। দেখলেন, প্রেসের 'কম্পোজ' করা একটা প্রুফের অংশ। যার শেষ লাইনগুলো নেই। এক আর্কিটেক্ট আমাকে এ ব্যাপারে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জানান। নানা ধরনের বাড়ির নকশা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঝিমুনি এসে গেলে এই স্থপতি নতুন ধরনের বাড়ির ছবি দেখতে পান। অনেক সময় দেখেন, ওই রকম একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বাড়িটার একটা 'রাফ স্কেচ' আঁকছেন।

স্বপ্ন আর চলচ্চিত্র

স্বপ্নকে ঘুমন্ত চেতনায় জেগে ওঠা 'চিন্তার চিত্রিত বিবৃতি' বলা যেতে পারে। চলচ্চিত্র বা সিনেমার সঙ্গে এর কিছু মিল রয়েছে। স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শকের ভাবনার চলচ্চিত্রায়ন (Cinematisation) ঘটে। এই চলচ্চিত্র সবাক। সিনেমায় অজস্র টুকরো ছবি দ্রুত ছুটতে থাকে দর্শকের চোখের সামনে দিয়ে। দ্রুত ধাবমান এইসব ছবি দর্শকের মনে কিছু প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। গোটা একটা সিনেমায় এরকম অসংখ্য প্রতিক্রিয়া মিলেমিশে জন্ম দেয় কিছু ভাবনার বা কোনও একটা ধারণার। স্বপ্নেও অসংখ্য ছবি দ্রুত ছুটতে থাকে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের পর্দায়। গোটা একটা স্বপ্নে শুধু ছবি আর কথা নয়, কখনও থাকে স্পর্শ। কখনও বা স্বাদ-গন্ধ। সিনেমার দর্শকের পক্ষে আর যাই হোক চরিত্রদের স্পর্শ, বাগানের ফুলের গন্ধ বা ডাইনিং টেবিলের খাবারের স্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়।

তবু স্বপ্ন দেখবার পর দর্শকের মনে একটা বোধ বা ভাব তৈরি হয়। এদিক থেকে স্বপ্ন অনেকটা সিনেমার মতো। ভয়ের স্বপ্ন আর ভয়ের সিনেমা (হরর ফিল্ম) দুটোই দর্শককে ভীত করে। বাজারি নায়িকার দুঃখ দেখে দুঃখ হয়। অনেকে তো ছবি দেখতে দেখতে কেঁদে ফেলেন। খলনায়কের হার দেখে আনন্দ হয় দর্শকের। কেউ কেউ খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠেন। স্বপ্নে সিনেমার মতো দর্শকের মনে দুঃখ, আনন্দ, করুণা, ঘৃণা, শোক, ভয় এরকম বিচিত্র সব ভাব আসে।

তবু স্বপ্ন স্বপ্নই, সিনেমা নয়। সিনেমার ধারাবাহিকতা বা সামগ্রিকতা স্বপ্নে থাকে না। সিনেমায় ছবিগুলো সাজানো থাকে একটা নির্দিষ্ট ক্রম বা শৃঙ্খলা বজায় রেখে। স্বপ্নের ছবি বেশিরভাগ সময় অগোছালো, বিশৃঙ্খল। সিনেমায় সময়ের গোলমাল নেই। স্বপ্নে সময় হামেশাই এগোয়, পিছিয়ে যায়। আসলে সিনেমায় ছবি জোড়ার ব্যাপারটা (এডিটিং) করা হয় একটা নিয়ম মেনে, সুন্দরভাবে। স্বপ্নে এই 'এডিটিং'-এর ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে, দুর্বল।

সিনেমা চলে নির্দিষ্ট চিত্রনাট্য অনুযায়ী। আর এই 'স্ক্রিপ্ট' বা চিত্রনাট্য একটা শৃঙ্খলা দিয়ে বাঁধা, যুক্তি দিয়ে সাজানো। স্বপ্নের কোনও চিত্রনাট্য নেই তা বলা যাবে না। তবে সেই চিত্রনাট্য 'স্বপ্নকল্পনা'র বিচিত্র উপাদান দিয়ে তৈরি। অদ্ভুত, বিচিত্র, আজগুবি নানা কাণ্ডকারখানা ঘটতে থাকে স্বপ্নে। বাণিজ্যিক হিন্দি ছবিতেও উদ্ভট, আজগুবি নানা কাণ্ডকারখানার ঘনঘটা। দশতলার ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে নায়ক বসে যায় চলন্ত গাড়ির বনেটে। নিরস্ত্র নায়ক একা দশজন সশস্ত্র গুণ্ডাকে ধরাশায়ী করে অবলীলায়। তবু স্বপ্নের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার কাছে হার মানবে এরকম হিন্দি ছবির উদ্ভট ব্যাপারস্যাপার। আর সব সিনেমাই তো আর বাণিজ্যিক ছবি নয়। সত্যজিৎ-মৃণাল-তপন-বুদ্ধদেব-গৌতম-অপর্ণার ছবি, শ্যাম বেনেগাল-গোবিন্দ নিহালনির ছবি, কুরোসোওয়া-আন্তিনিওনি-বার্গম্যানের ছবি—সিনেমার ভাষায় এগুলোই যে সত্যিকারের চলচ্চিত্র।

সিনেমার ছবির মতো স্পষ্ট নয় স্বপ্নের ছবি। আংশিক, ভাসাভাসা। কোনও মানুষ বা বস্তুই পু'রাপুরি ধরা দেয় না স্বপ্নের ছবিতে। সিনেমার সংলাপের মতো স্পষ্ট নয় স্বপ্নের কথা। কেমন যেন জড়ানো জড়ানো, অস্পষ্ট। সিনেমার আবহ তৈরি হয় বাস্তব জগতের নিয়ম মেনে। স্বপ্নের আবহ কল্পনা দিয়ে। স্বপ্নে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া ধ্বনি বা 'মিউসিক' নেই। সিনেমার আবহে সঙ্গীত বা ধ্বনি সিনেমার একটা আবশ্যিক শর্ত। যদি না সেই সিনেমা বহু পুরনো, নির্বাক যুগের হয়।

সিনেমা শক্তিশালী এক শিল্পমাধ্যম। স্বপ্ন ব্যতিক্রমী এক কল্পনালোক। সিনেমার নিজস্ব একটা ভাষা আছে, আছে অর্থ। স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা একটু চর্চা করেন তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন, স্বপ্নের দেশে চালু আছে মৌলিক একটা ভাষা। যে ভাষা স্বপ্নের দেশ ছাড়া আর কোথাও চলে না। আর 'প্রত্যেকটা

স্বপ্নেরই রয়েছে নির্দিষ্ট একটা অর্থ'। তবে স্বপ্নের দেশের ভাষা বেশিরভাগ সময় বড় বেশি বিমূর্ত, জটিল। বিশ্বের বহু বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকারের সিনেমায় বিমূর্ততার বা ভাবের জটিলতার অভাব নেই। তবু তা স্বপ্নের বিমূর্ততার কাছে হার মানতে বাধ্য।

সিনেমায় 'সেন্সার' বা প্রহরী কাজ করে স্বপ্নের মতোই। দেখার অযোগ্য ছবিগুলোকে কেটে দেওয়া সিনেমার সেন্সারের কাজ। অন্তত আমাদের দেশে এই 'সেন্সার-পদ্ধতি' কিভাবে কাজ করে বোঝা মুশকিল! সেন্সারকে ফাঁকি দিয়ে দেখার-অযোগ্য বহু সিনেমা বাজারে চলে আসে হরদম। স্বপ্নের সেন্সার 'সজাগ পাহারাদার'। কখনও এই পাহারাদারী শিথিল হয় না, তা নয়। সেই সুযোগে ছদ্মবেশে 'দেখা উচিত নয়' এমন ছবিও চলে আসে স্বপ্নে। পাহারাদার সজাগ হওয়ামাত্র ভয় পান স্বপ্নের দর্শক। সিনেমাতে কি সেন্সারকে ফাঁকি দিতে 'ছদ্মবেশ'-এর দরকার হয়? কিছুটা হয়তো হয়। বেশি দরকার হয় কৌশল আর বুদ্ধির!

স্বপ্নে ছদ্মবেশ আর প্রতীকের ছড়াছড়ি। স্বপ্নের দর্শক হয়তো দেখছেন কোনও একটা ঘরের ছবি। নারীদেহের প্রতীক হয়ে স্বপ্নে এই ঘরের ছবি আসতে পারে। মোটা, দশাসই, বলশালী কোনও পুরুষ কোনও মহিলার স্বপ্নে আসতে পারেন বাঘের ছদ্মবেশে। স্বপ্নের এই প্রতীকায়ন (Symbolisation)-এর ব্যাপারটা সিনেমাতে ঠিক এভাবে থাকে না। প্রথম সারির আধুনিক পরিচালকদের ছবিতেও প্রতীকী কোনও বস্তু বা দৃশ্য থাকতে পারে। একটা দৃষ্টান্তের কথা বলি।

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' তো দেখেছেন অনেকেই। হরিহরের বহুদিন বাদে বাড়ি ফিরে আসবার দৃশ্যটার কথা ভাবুন। বারান্দার এক কোণে সর্বজয়া ভাত চাপিয়েছেন হাঁড়িতে। দুর্গা যে নেই এই সর্বনাশের কথাটা বুকে চেপে পাথরের মতো বসে আছেন সর্বজয়া। স্বামীকে আসতে দেখে মনের আবেগ বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভাতের হাঁড়ির ঢাকাটাও ভেতরের বাষ্পের চাপে উঠে আসছে ওপরে। এরকম প্রতীকী দৃশ্য বড় পরিচালকের ছবিতে থাকবেই। তবে স্বপ্নের মতো প্রতীকের ছড়াছড়ি সিনেমাতে সম্ভব নয়। সিনেমাতে প্রতীক থাকলেও তা সবসময় স্বপ্নের মতো দুর্বোধ্য নয়। স্বপ্নের ভাষায় রপ্ত দর্শকের কাছেও অনেক সময় স্বপ্নের প্রতীকের অর্থ সহজে ধরা দেয় না।

সিনেমার ছবিগুলোকে একসূত্রে সাজানো নিয়ন্ত্রিত হয় চিত্রনাট্যকার, পরিচালক আর সম্পাদকের ইচ্ছা অনুযায়ী। যে কোনও সিনেমার ভেতরকার উপাদানগুলোর আসল নিয়ন্ত্রক চলচ্চিত্রের পরিচালক। স্বপ্নের ছবি, কথা, ভাব, এক কথায় স্বপ্নের উপাদান (Dream Element) নিয়ন্ত্রিত হয় স্বপ্নের দর্শকের স্বপ্নকল্পনা (Dream Imagination) দিয়ে। স্বপ্নকল্পনা পুরোপুরি নিজস্ব আর মৌলিক পদ্ধতিতে অতীত থেকে বেশ কিছু উপাদান টেনে আনে স্বপ্নের ভেতর। কোনও স্বপ্নকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে না পারলে এই উপাদানগুলোর অস্তিত্ব স্বপ্নের দর্শকের কাছে পরিষ্কার হয় না। সিনেমাতেও অতীত উপাদান থাকে। তবে দর্শকের চোখে এই উপাদানগুলো চলে আসে সহজভাবে, একটা নিয়ম মেনে। স্বপ্নে অতীত উপাদান (Past Element)-এর ছড়াছড়ি।

সিনেমার সঙ্গে স্বপ্নের আর একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। উন্নতমানের সিনেমাতে কথার অর্থ গভীর। ধরা যাক, আপনি হরিদ্বার বেড়াতে যাবেন। সিনেমাতে আপনার ও অন্যদের কথাতে দর্শক আগেই বুঝতে পারবেন যে আপনি হরিদ্বারে যাবেন। তারপর আসবে হরিদ্বার যাবার ট্রেনের একটুকরো দৃশ্য। তারপর হরিদ্বারের ছবি। স্বপ্নে এরকম দেখাতে হলে হুড়মুড় করে আপনি হরিদ্বার চলে যাবেন। হরিদ্বার যাবার ইচ্ছাটা স্বপ্নে সিনেমার মতো সরাসরি আসবে না। বসে থাকবেন নির্জন প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের মধ্যে। কোথাও জায়গার নাম লেখা থাকবে না। তবু আপনার মন বলবে, আপনি হরিদ্বারে রয়েছেন।

ধরুন, সকালে উঠে মনে হল আজ আর অফিস যাবেন না। সিনেমাতে আপনার মুখে সামান্য কিছু কথা বসিয়ে, সিনেমার ভাষায় দর্শককে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। স্বপ্নে এটা অসম্ভব। স্বপ্নে 'হ্যাঁ' আর 'না' আসে একভাবে। অফিস যাবেন না বোঝাতে স্বপ্নে বাসে চেপে অফিস যাচ্ছেন দেখা অসম্ভব নয়। 'স্বপ্নে আমরা কোনও বিষয় অথবা ঠিক তার বিপরীত বিষয়টি, একইরকম দেখি'। সিনেমাতে এরকম হয় না।

হয়তো খুন করে বিচারে ফাঁসির আদেশ হল কোনও অপরাধীর। সিনেমাতে এরকম হলে প্রথমে

খুনের দৃশ্য, তারপর আদালতের সওয়াল-জবাব আর বিচারকের রায় দেখাতে হয়। তারপর আসে ফাঁসির দৃশ্য। স্বপ্নে এরকম হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে স্বপ্নে আগে ফাঁসির দৃশ্য এল। তারপর এল খুনের দৃশ্য। আগে পরিণতি (Effect), তারপর তার কারণ (Cause)। এটা স্বপ্নেই সম্ভব।

সিনেমাতে শোক, দুঃখ, আনন্দ, ভয়, করুণা, ঘৃণা, দয়া এ সব ভাব তৈরি হয় চরিত্রদের অভিনয় আর সংলাপের ভেতর দিয়ে। স্বপ্নে ছবি দেখতে দেখতে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে এ সব বিচিত্র ভাব আসে আপনা থেকেই, তীব্রভাবে। কারণ স্বপ্ন হল ছবিতে রূপ নেওয়া ভাবনা। স্বপ্নের ভাব তাই ছবিনির্ভর বা সংলাপনির্ভর নয়। স্বপ্নে কোনও হাসি বা মজার ঘটনা আসে কার্টুন ছবির মতো। ব্যঙ্গও তাই। কোনও মানুষকে বোকা বোঝাতে স্বপ্নে হয়তো তার মাথায় গোবর মাখানো থাকবে। প্যাঁচানো, জটিল লোক বোঝাতে মাথার চুলে 'জিলিপির প্যাঁচ', দেখা যেতে পারে।

স্বপ্নে একজন মানুষকে অপদস্থ হতে দেখা যেতে পারে নানাভাবে। হয়তো মানুষটা জোড়া সাইকেল আর দুই আরোহীর নীচে চাপা পড়বেন। কারও বড় ধরনের বিপদ বোঝাতে হয়তো দেখা গেল, তিনি ঘেমেনেয়ে হাঁটু মুড়ে দুহাতে অ্যাটলাসের মতো আকাশটাকে আটকে রেখেছেন। যেন ছেড়ে দিলেই মানুষটার মাথায় আকাশ পড়বে ভেঙে! একটা লোক হয়তো বেহায়া, নির্লজ্জ। স্বপ্নে লোকটা এল 'দুকান কাটা' অবস্থায়।

এবার স্বপ্নের কিছু বিশেষত্বের কথা বলব। যেগুলো সিনেমায় সাধারণত থাকে না। কারণ সিনেমার ভাষার সঙ্গে স্বপ্নের এই বিশেষত্বগুলো খাপ খায় না। স্বপ্নের এই বিশেষ দিকগুলো হল:

১. সংক্ষিপ্তকরণ (Condensation)
২. বিচ্যুতি (Displacement)
৩. নাট্যায়ন (Dramatisation)
৪. অতিলক্ষ্য (Overdetermination)
৫. একত্রীকরণ (Unification)
৬. প্রতিনিধিত্ব (Representation)

সংক্ষিপ্তকরণ

স্বপ্নে যতটুকু আমরা দেখতে পাই তা দেখি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে। অজস্র উপাদানের সারসংক্ষেপ দেখা দেয় স্বপ্নে। স্বপ্নের হাজারটা উপাদান (Copious Dream Material) ঘনীভূত (Condensed) হয়ে পরিমিত 'স্বপ্নের দেখা'য় পরিণত হয়। স্বপ্নের উপাদান ধরা যাক এক ড্রাম দুধ। তা ঘন হয়ে স্বপ্নে আসে কিছুটা 'পনীর' হয়ে। আরও ভালো একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। একটা শ্লোগান। 'সপ্তাহেতে প্রতিবারে লক্ষ টাকা জমতে পারে'— কোনও এক রাজ্য লটারির বিজ্ঞাপন। 'সপ্তাহ', 'প্রতিবার', 'লক্ষ টাকা', 'জমতে পারে' সব কটা বিরাট একটা বক্তব্যের সারাংশ। লটারি খেলা হয় সপ্তাহে একদিন। টিকিট কাটলে প্রত্যেক বারই পুরস্কারের টাকা পাবার সম্ভাবনা। বিজ্ঞাপন অন্তত তাই বলতে চায়। লক্ষ টাকা হল ওই লটারির প্রথম পুরস্কার। এত টাকা একসঙ্গে পেয়ে অবশ্যই জমাতে পারেন পুরস্কারপ্রাপক। আর তা থেকে প্রত্যেক মাসে পাওয়া যেতে পারে বেশ কিছু টাকা। আসলে হাত না দিয়ে শুধু সুদ। এত কথা বা বার্তা লুকিয়ে আছে বিজ্ঞাপনের মাত্র ছ'টা শব্দের মধ্যে। সব স্বপ্নেই প্রায় দৃশ্যায়ন আর স্বপ্নের ভাবের পরিমাণগত এই ফারাকটা ঘটে। যদিও তা হয় আরও জটিলভাবে।

সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতির কিছু নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া যাক:

স্বপ্ন ১: দেখলাম বাড়ির বসার ঘরের একটা চেয়ারে যেন বসে আছি—অথচ ঘরে অনেক টেবিল-

চেয়ার—টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত ফাইল—অনেক চেয়ারে লোক বসে আছেন, কেউ চেনা, বেশিরভাগই অচেনা—আমার সামনের টেবিলের উলটোদিকে বড়বাবু দাঁড়িয়ে হাতঘড়ি দেখছেন—কারা যেন চিৎকার করে কিছু বলছেন।

—ধীমান রায়, চাকরিজীবী, দমদম।

ধীমানবাবু কলকাতার কোনও এক সরকারি অফিসের লোয়ার-ডিভিসন ক্লার্ক। তার অফিসে যেখানে তিনি বসেন, সেই ঘরটা আমি দেখেছি। সেখানে অন্তত পঞ্চাশ জন কর্মীর চেয়ার-টেবিল রয়েছে। সব টেবিলের ওপর ডাঁই করা কয়েকশো করে ফাইল। বিরাট হলঘরটায় ঢুকলেই প্রথমে চেয়ার-টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত ওই ফাইলগুলো চোখে পড়ে। ধীমানবাবুর বাড়ির বসার ঘর অফিসের সংক্ষিপ্ত আকার নিয়ে তাঁর স্বপ্নে এসেছে।

স্বপ্নের 'বড়বাবু' ওই অফিসের সেকশান-ইন-চার্জ। ভদ্রলোক নিয়মতান্ত্রিক। এই স্বপ্ন যেদিন ধীমান দেখেন, তার ঠিক দুদিন আগে থেকে অফিসে সময়ে আসা-যাওয়ার 'ওয়ার্ক কালচার' চালু হয়েছে। আগের দিন ধীমান অনেক তাড়াহুড়ো করেও অফিসে এসে পৌঁছেছেন দশটা চল্লিশে। 'দশটা তিরিশের মধ্যে অফিসে আসতে হবে কাল থেকে।' এই ছিল 'বড়বাবু'র নির্দেশ। সেদিন রাতে ধীমান উদ্বিগ্ন ছিলেন। কাল সকালের সব কাজকর্ম সেরে সাড়ে দশটার মধ্যে কী করে অফিসে পৌঁছবেন। অফিসে সময়ে যাওয়া নিয়ে এই টেনশান স্বপ্নে ওর উলটোদিকের টেবিলে বড়বাবুকে হাজির করেছে। বড়বাবু তাঁর হাতঘড়ি দেখছেন। যেন বলতে চাইছেন, 'আজও দেরি হল!'

গত দুদিন সময়ের কড়াকড়ি নিয়ে ধীমানের অফিসে কর্মীদের মধ্যে ফিসফাস কম হয়নি। অনেকেই আগেকার ঢিলেঢালাভাব ফিরে পেতে চান। ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না কেউ। কয়েকবছর আগে একবার এরকম কড়াকড়ি উঠে গিয়েছিল কর্মচারীদের তুমুল বিক্ষোভের পর। এবার ধীমান আশা করতেই পারেন, হইচই একটা হবে। আর 'সময় নিয়ে বাড়াবাড়ি' বন্ধ হবে। স্বপ্নে 'কারা যেন চিৎকার করে কিছু বলছে' আসছে স্বপ্নদ্রষ্টার স্মৃতিতে থাকা পুরনো হইচই আর আগের মতো সাড়ে এগারোটা নাগাদ অফিসে আসার ইচ্ছা থেকে।

পাঠক লক্ষ করলেন কত বিচিত্র স্বপ্ন উপাদান ধীমানের স্বপ্নে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। এই স্বপ্ন পুরোপুরি বিশ্লেষণ করে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আপাতত সেই জটিলতায় যাব না।

স্বপ্ন ২: দেখলাম একজন লোক আমাদের রান্নাঘরের দেওয়ালে ঠেসে ধরে আমার গলা চেপে ধরেছে—মনে হচ্ছে মরে যাব—লোকটার কপালে ডান ভুরুর ওপর একটা কাটা দাগ, চুলগুলো কামানো, গালে একটাও দাড়ি নেই, চিবুকে সামান্য কিছু কালো দাড়ি।

—নীলাদ্রি সান্যাল, স্নাতক, রানিগঞ্জ।

নীলাদ্রির স্বপ্নে 'একজন লোক' দেওয়ালে ঠেসে ধরে গলা টিপে তাঁকে মারতে চাইছে। এ ব্যাপারে নীলাদ্রির সঙ্গে কথা হয় আমার। ওর সঙ্গে নানা কারণে শত্রুতা বা রেষারেষি রয়েছে এমন কিছু মানুষের কথা জানতে পারি। প্রায় তিনদিন ওর সঙ্গে কথা বলে যা মনে হয়েছে তা বলি। যে লোকটা ওকে গলা টিপে মারতে চাইছে সে 'একজন লোক' নয়। মাথা-কামানো এক এলাকার মস্তান। আর ওর এককালের এক বন্ধু। যাঁর গালে একটাও দাড়ি নেই, চিবুকে সামান্য 'ছাগল দাড়ি'। এই দুটো মুখ মিশে গেছে আক্রমণকারীর মুখের আদলে। আর কপালে ডান ভুরুর ওপর কাটা দাগ আসছে ওর ক্লাস সিক্সের অঙ্কের মাস্টার মশাইয়ের স্মৃতি থেকে। ভদ্রলোক রোজ দাড়ি কামাতেন বলে গাল ছিল মসৃণ। ডান ভুরুর ওপর একটা কাটা দাগ ছিল ওই মাস্টার মশাইয়ের।

ক্লাস সিক্সে পড়বার সময় একবার সোজা একটা অঙ্ক ভুল করবার জন্য ওই মাস্টার মশাই বেধড়ক পিটিয়েছিলেন নীলাদ্রিকে। স্বপ্নে আক্রমণকারীর মুখের মসৃণ গালে ওর সেই বন্ধুর দাড়িহীন গাল আর মাস্টার মশাইয়ের দাড়ি কামানো গাল মিশে গেছে। অঙ্কের শিক্ষকের ডান ভুরুর ওপর কাটা দাগটা

হুবহু চলে এসেছে স্বপ্নের গলা টিপে ধরা লোকটার গালে।

নীলাদ্রির স্বপ্নের আক্রমণকারীর মুখের মধ্যে বিশ্লেষণে তিনজন মানুষের মুখের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল। তিনজন মানুষ একসঙ্গে আক্রমণ করছে। স্বপ্নের এরকম ভাবনা একজন আক্রমণকারীর মধ্যে তিনজনকে মিশিয়ে দিয়েছে।

বিচ্যুতি বা প্রতিস্থাপন

মনের পাহারাদারকে ফাঁকি দেবার জন্য স্বপ্নের দর্শক একজনের বদলে হামেশা অন্যকে দেখে। বাস্তবেও এরকম হয় না তা নয়। হয়তো রেগে গেলেন স্ত্রীর ওপর। সেই রাগ গিয়ে পড়ল ছেলের গালে! ছেলেকেই থাপ্পড় মেরে বসলেন। স্বপ্নে এরকম ঘটে যখন তখন। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে বেশিরভাগ সময় ধরে ফেলা যায়, যে মানুষটাকে স্বপ্নদ্রষ্টা দেখছেন তিনি কার প্রতিনিধি। গিরীন্দ্রশেখর বসু স্বপ্নের এই বিশেষত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' বলে। কিছু স্বপ্নের উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

স্বপ্ন ১: 'দেখতাম একটা বাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমার ওপর—ক্ষতবিক্ষত করছে—ভয়ে ঘুম ভেঙে যেত।

—সন্ধ্যা বসু, গৃহবধূ।

স্বপ্ন ২: একজন সাধু, গেরুয়া পোশাক পরা, একমুখ দাড়ি—অনেক লোকের মাঝখানে হঠাৎ আমার দিকে তাকাল—মুখটা লুকোবার চেষ্টা করলেও ঠিক দেখে ফেলল—ছুটে বাড়ি চলে আসছি—সাধুটাও পেছন পেছন আসছে।

—সোমা বণিক, ছাত্রী।

স্বপ্ন ৩: এক জন বন্ধু জানালা দিয়ে আমাকে ডাকছে—দেখে খুব ভয় করতে শুরু করল।

—অদিতিকুমার বসু, শিক্ষক।

স্বপ্ন ৪: আমি একজন গর্ভবতী—একটা বনমানুষ এসে বলছে বাচ্চাটা ওরই—এখনই চাই।

—রুবি চৌধুরী, গায়িকা।

স্বপ্ন ৫: দেখলাম বাংলার মাস্টারমশাই মারা গেছেন—দুঃখে কেঁদে ফেললাম, উনি যে আমার খুব প্রিয়।

—কৃত্তিবাস সেন, ছাত্র।

স্বপ্ন ৬: ১৯৯৬-র মে মাসে নেপালে বেড়াতে গেছি—এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম, একজন বন্ধুর মা মারা গেছেন—সকালে ঘুম ভাঙল কাঁদতে কাঁদতে—ওই মহিলা ক্যান্সারে মারা গেছেন মাস ছয়েক আগে।

—অমৃতা চ্যাটার্জি, সাংবাদিক।

স্বপ্ন ৭: ভয়ঙ্কর চেহারার একটা গরিলা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—পালাতে চেষ্টা করেও বারবার ওটার সামনে পড়ে যাচ্ছি আমি। খুব ভয় লাগছে।

—অঞ্জন রায়, ছাত্র।

প্রথম স্বপ্নের পারিপার্শ্বিক সব তথ্যের সাহায্য নিয়ে স্বপ্নটাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে,

বাঘের ছদ্মবেশে ভদ্রমহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে দশাসই চেহারার, বলবান এক পুরুষ। দ্বিতীয় স্বপ্নের সাধু আর যেই হোন সাধু নন। তিনি এমন একজন মানুষ যাকে সোমা ভয় পান। চতুর্থ স্বপ্নের বনমানুষ আসলে বাস্তবের একজন মানুষ, যাকে স্বপ্নদ্রষ্টা চেনেন।

কৃত্তিবাসের স্বপ্নের (স্বপ্ন ৫) 'বাংলার মাস্টার মশাই' কি সত্যিই তিনি? যাকে 'বাংলার ভাল ছাত্র' ভীষণ ভালোবাসে? এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ বলছে, ছাত্রটির বাবা বাংলার মাস্টার মশাই হয়ে তার স্বপ্নে এসেছেন।

অদিতিকুমার (স্বপ্ন ৩) এই স্বপ্ন দেখেছেন কম বয়সে। সেই সময় দীর্ঘদিন টাইফয়েডে ভুগে স্বপ্নদ্রষ্টা শীর্ণ, দুর্বল। এরকম অবস্থায় বন্ধু জানালা দিয়ে মুখ দেখালে শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত যুবকের ভালো লাগবারই কথা। দীর্ঘদিন অসুখে ভুগতে থাকা অদিতিকুমারের মৃত্যুচিন্তা কাজ করেছে এই স্বপ্নে। বন্ধুর ছদ্মবেশে দেখা দিয়েছিল মৃত্যুর দূত। তাই বন্ধুকে দেখে অসুস্থ, ক্লান্ত যুবক ভয় পেয়েছেন। অঞ্জনের স্বপ্নের 'গরিলা' আদৌ গরিলা নয়, একজন মানুষ।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে এভাবে এক জন মানুষ বা পশুর আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষটাকে খুঁজে পাওয়া যায় কিভাবে? যে পদ্ধতির সাহায্যে এই 'বিচ্যুতি'গুলোকে ধরা যাবে, তা হল 'অবাধ ভাবনুষঙ্গ পদ্ধতি' (Free association method)•

অমৃতার স্বপ্নে প্রিয় বান্ধবীর মৃতা মা আসলে বাড়িতে তাঁর একটানা রোগভোগে বিধ্বস্ত, বাতিল পিসিমা। বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই মহিলা তাঁর ১৮ বছর বয়েস থেকে ভুগে চলেছেন হাজারটা রোগে। বেঁচে আছেন শুধু শারীরিকভাবে। প্রায়ই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। সচেতনভাবে প্রিয় পিসিমাকে এই অবস্থায় দেখতে ভালো না লাগতেই পারে অমৃতার। এই অবস্থা থেকে পিসিমা মুক্তি পান—অবচেতনের এরকম ইচ্ছা এই স্বপ্নের উৎস।

২৮ বছরের শ্রমিক তন্ময়ের স্বপ্নে ওর কর্মস্থলের বর্তমান 'বস' ওর স্কুলের মাস্টার মশাই হয়ে ধরা পড়েন। পাড়ার ক্লাবঘরটা হয়ে যায় একটা আদালত। এরকম বিচ্যুতির ঘটনা ভালোভাবে খেয়াল করলে পাঠক তাঁর নিজের স্বপ্নেও খুঁজে পাবেন।

নাট্যায়ন

স্বপ্নের ভাবনা আর তার চলচ্চিত্রায়নের মধ্যে তফাত অনেক। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' তো অনেকে পড়েছেন। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'-ও বেশিরভাগ পাঠক একবার না একবার দেখেছেন। দুটোর মধ্যে ফারাকটা ভাবুন। বিভূতিবাবুর 'পথের পাঁচালী'র অনেক ঘটনা বাদ গেছে সিনেমা থেকে। সিনেমার প্রয়োজনে সত্যজিৎ যোগ করেছেন বেশ কিছু নতুন ঘটনা। বিভূতিবাবু কাহিনীর প্রয়োজনে অপু-দুর্গা-হরিহর-সর্বজয়াকে যে পরম্পরায় সাজিয়েছেন, সত্যজিতের ছবির ঘটনার পারম্পর্য তা থেকে অনেক জায়গায় আলাদা। ছবির প্রয়োজনে সত্যজিৎকে এটা করতে হয়েছে।

স্বপ্নের ভাবনা আর তার নাট্যরূপ বা চিত্রনাট্যে তফাত অনেকটা এরকম। স্বপ্নের রয়েছে নিজস্ব একটা ভাষা। এই ভাষার নিয়ম মেনে স্বপ্নে ঘটনাগুলো প্রায়ই উলটেপালটে যায়। স্বপ্নদ্রষ্টার স্মৃতি থেকে অনেক আপাত অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয় ঘটনাও চলে আসতে পারে স্বপ্নের ছবিতে। স্বপ্নের ভাবনার এরকম রূপান্তরকে মনোবিদরা নাট্যায়ন (Dramatisation) বলেন। একে চলচ্চিত্রায়ন (Cinematisation)ও বলা যেতে পারে।

অতিলক্ষ্য

অনেক সময় একই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার অচেতন মনে একের বেশি ইচ্ছা পূর্ণতা পেতে চায়। স্বপ্নের এই বিশেষত্বকে ফ্রয়েড 'ওভার ডিটারমিনেশন' বলে উল্লেখ করেছেন। এর বাংলা প্রতিশব্দ 'অতিলক্ষ্য'র অর্থও হতে পারে অনেক দিকে লক্ষ্য। তবু এই শব্দটা থেকে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না পুরোপুরি।

স্বপ্নের এই বিশেষত্বকে স্বপ্নগবেষক গিরীন্দ্রশেখর খুব সহজ একটা উপমা দিয়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কারণের সমবায়ে কোনো একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিলে স্বপ্নে দৃষ্ট সেই ঘটনা সকল কারণেরই পরিচায়ক। যেমন, বাগবাজারে আমার কোনো প্রিয় ব্যক্তি থাকেন, আর বাগবাজারে রসগোল্লাও পাওয়া যায়। স্বপ্নে বাগবাজার দেখার অর্থ, এরূপ ক্ষেত্রে আমার প্রিয় ব্যক্তির নিকট যাওয়াও বটে এবং রসগোল্লা খাওয়াও বটে।'

ফ্রয়েডের মতে, 'একই স্বপ্নের মধ্যে অনেক গোপন ইচ্ছা লুকিয়ে থাকতে পারে। এই ইচ্ছাগুলো একটা আর একটার ওপর চাপা পড়ে থাকে।' সতর্ক স্বপ্ন-বিশ্লেষক অনেক স্বপ্নের মধ্যে একাধিক ইচ্ছা খুঁজে পাবেন। সবচাইতে নীচে চাপা থাকবে শৈশবের কোনও আকাঙ্ক্ষা। তারপর ইচ্ছাগুলো সাজানো থাকে বয়সের ক্রম অনুযায়ী।

স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের কোনও একটা ভাব অনেকসময় নানা ধরনের ভাবকে বোঝায়। স্বপ্ন তৈরির পদ্ধতিতে নানা ধরনের ভাবের সূত্র, যা কোনও একটা নির্দিষ্ট ভাব দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে, চলে আসে ওই ভাব হয়ে। এটাও স্বপ্নে এক ধরনের অতিলক্ষ্য বা Overdetermination। স্বপ্নের একটা মুখের মধ্যে স্বপ্নের দর্শকের স্মৃতিতে থাকা তিনটে মুখের অস্তিত্ব রয়েছে—এই দৃষ্টান্তের কথা আগে বলেছি। স্বপ্নে একের বেশি মানুষকে বোঝাতে একজনের স্বপ্নে চলে আসবার এরকম জটিল ব্যাপার ঘটে প্রায়ই। স্বপ্নপদ্ধতি (Dream Work)-র এটা একটা বিশেষত্ব। স্বপ্নের এই ব্যাপারটা ছায়াছবিতে আসে না। অতিলক্ষ্যকে স্বপ্নের এক বিশেষ চরিত্র বলা যেতে পারে।

একত্রীকরণ

স্বপ্ন দেখবার ঠিক আগের দিনটা থেকে স্বপ্ন তার মূল উপাদানগুলো টেনে নেয়। যে কেউ একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন, স্বপ্ন দেখবার আগের দিন দেখেছেন, শুনেছেন, ভেবেছেন বা বলেছেন এমন একটা বা তারও বেশি উপাদান রাতের স্বপ্নে হাজির হচ্ছে। অন্য উপাদানগুলো আসছে পুরনো স্মৃতি থেকে। যার মধ্যে প্রায়ই ছেলেবেলার স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যাবে।

স্বপ্নের অনেক উপাদানকে মোটামুটি একই কাহিনীতে এনে ফেলা স্বপ্নের একটা বিশেষ ক্ষমতা। স্বপ্নের এই ক্ষমতা আসে স্বপ্নকল্পনা থেকে। প্রত্যেকটা স্বপ্নের বেলায় বিভিন্ন সূত্র বা উপাদানকে এভাবে একসুতোয় গেঁথে ফেলা একান্ত 'প্রয়োজন'। তা নইলে স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকে না। স্বপ্নের নানা উপাদানের এরকম একত্রীকরণ স্বপ্নের একটা আবশ্যিক শর্ত। এখানে কিছু উদাহরণ দেব।

স্বপ্ন ১: 'দেখলাম জ্যোতিবাবু বুম্বাদের বাড়ির খাটে পা ঝুলিয়ে টানটান বসে আছেন।'

স্বপ্নদ্রষ্টা যুবকের স্বপ্নে আগের দিনের তিনটে উপাদান এক হয়ে গেছে:

(ক) জ্যোতিবাবুর পুজোর ছুটি কাটানো নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল কোনও এক বাংলা দৈনিক কাগজে। স্বপ্নদ্রষ্টা সেই কাগজটা দেখেছেন।

(খ) বুম্বা নামে ওর বন্ধুর সঙ্গে বহুদিন পর দেখা হয়েছিল। আড্ডা হয়েছিল কিছু সময়ের জন্য।

(গ) বৌবাজার দিয়ে যেতে যেতে আসবাবপত্রের দোকানের একটা খুব সুন্দর খাটের দিকে চোখ চলে যায়। এক ঝলক দেখে মনে হয়েছিল, এরকম একটা খাট কিনতে হবে।

স্বপ্ন ২: 'আমি সাইকেল চেপে স্কুলে যাচ্ছি। পাশে পাশে হাঁটছেন সত্যজিৎ রায়—তার পেছনে দাড়িওয়ালা রবীন্দ্রনাথ।'

বাচ্চার এই স্বপ্নে যে উপাদানগুলো এক হয়ে গেছে তা হল:

(ক) আগের দিন সাইকেল চেপে এক বন্ধুকে স্কুল যেতে দেখা।

(খ) বাড়িতে মা আর তাঁর এক বন্ধুর সত্যজিৎ আর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার কিছুটা

পড়তে পড়তে কানে আসা।

স্বপ্ন ৩: 'মামাবাড়িতে এক কবি মোড়ায় বসে লক্ষ্মীপুজোর খিচুড়ি আর লাবড়া খাচ্ছেন—আমি মামাবাড়ির চাকর, ঘর মুছছি'।

এই স্বপ্নের কবির সঙ্গে মামাবাড়ির আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই। স্বপ্নদ্রষ্টা মামাবাড়িতে খুব খাতির পান। চাকর হবার বা মামাবাড়ির ঘর মুছবার কোনও কারণ নেই! তবু স্বপ্নটা এসেছে এভাবে। আগের দিনের চারটে উপাদান এখানে এক জায়গায় এসেছে। এগুলো হল:

(ক) শোনা—ওই কবি ফোন করেছিলেন। কোনও একটা ব্যাপারে একটা তথ্য জানবার জন্য।

(খ) বলা—মামাবাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর 'ভোগ' প্রসাদ খাবার বাল্যস্মৃতি নিয়ে রাতে খেতে খেতে বেড়াতে আসা মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

(গ) দেখা—খাবার পর মাসতুতো ভাই একটা বেতের মোড়ার ওপর বসেছিল।

(ঘ) ভাবা—বাড়ির কাজের লোক ছুটিতে যাওয়ায় স্ত্রী ঘর মুছছিলেন। দেখে ভাবছিলেন, 'এত জল ঘাঁটলে ও আবার ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বরে পড়বে।'

সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের নিজস্ব একটা স্বপ্ন দিয়ে এই ব্যাপারটা শেষ করব। এই স্বপ্নের সংক্ষিপ্ত অংশ উল্লেখ করলেই পাঠক স্বপ্ন উপাদানের একত্রীকরণের ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। ফ্রয়েডের যে কোনও লেখার মতোই এই স্বপ্নের বর্ণনা একটুকরো উঁচুমানের সাহিত্য।

'এক গ্রীষ্মের বিকেলে একটা ট্রেনের কামরায় উঠেছি—দেখি আমার পরিচিত দুজন বসে আছেন। তারা অবশ্য একজন অন্যজনকে চেনেন না।—একজন আমার এক নামকরা ডাক্তার সহকর্মী—অন্যজন অভিজাত পরিবারের এক যুবক। ওই পরিবারের সঙ্গে আমি পেশাগত কারণে পরিচিত—দুজনকে আলাপ করিয়ে দিলাম। একবার বন্ধুর সঙ্গে, আর একবার যুবকের সঙ্গে কথা বলছিলাম নানা বিষয় নিয়ে—ডাক্তার বন্ধুকে বললাম, এক কম বয়েসি ডাক্তারের কথা, সে সবেমাত্র প্র্যাক্টিস শুরু করেছে—বন্ধু বললেন, ওই ডাক্তারকে তিনি চেনেন—সে চিকিৎসক হিসেবে যোগ্য, তবে তার সরল গোবেচারা ভাব আর অতি সাধারণ বেশভূষা উচ্চবিত্ত মহলে তার পসার জমানোর পথে আসল বাধা—বললাম, তার জন্যই বেচারার তোমার মতো প্রভাবশালী ডাক্তারের সাহায্য প্রয়োজন—এরপর পাশে বসা যুবকের কাছে তার ঠাকুমার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিলাম।'

রাতে স্বপ্ন দেখলাম—খুব দামি আসবাবপত্রে সাজানো সুন্দর একটা ড্রয়িংরুম—অভিজাত আর উঁচুপদের অনেক মানুষ বসে আছেন। ওঁদের মধ্যে সহজ ভাবে বসে আছে সেই যুবক ডাক্তার, (যাকে 'একটু দেখতে' বলেছিলাম আমার ডাক্তার বন্ধুকে)। তাঁকেও বেশ অভিজাত লাগছে দেখতে—বৃদ্ধা যেন মারা গেছেন—আর ওই যুবক বৃদ্ধার (স্বীকার করা ভালো, ওঁকে আমি পছন্দ করতাম না) শোকসভায় ধীরে ধীরে একটা শোকপ্রস্তাব পাঠ করছেন।'

প্রতিনিধিত্ব

স্বপ্নে অনেকসময় এক বা একের বেশি ভাবনা চলে আসে কিছু ছবির মধ্যে। যা বিশ্লেষণ ছাড়া ধরা যায় না। কখনও বা কোনও ভাবনা স্বপ্নে আসতে পারে কোনও প্রতীক (Symbol)-এর মাধ্যমে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব স্বপ্নপ্রতীক অধ্যায়ে। আবার এরকম হতে পারে যে ঘুমন্ত চেতনার কোনও একটা ভাবনা স্বপ্নে চলে এল কোনও এক বা একাধিক সংখ্যার মধ্য দিয়ে। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যাবে 'স্বপ্নে সংখ্যা' অধ্যায়ে।

এ ছাড়াও মনের নানা ভাব বা ইচ্ছা নানাভাবে চলে আসতে পারে স্বপ্নে। স্বপ্নে বিশেষ কোনও ভাব বা ভাবনা সরাসরি না এসে স্বপ্নের দেশের নিয়ম মেনে জটিলভাবে প্রতীক, সংখ্যা বা ছবির আকারে চলে আসে। এখানে স্বপ্নের ছবি বা কথা আসছে স্বপ্নের মূল ভাবের প্রতিনিধিত্ব করতে। এই ব্যাপারটা স্বপ্ন-গবেষকদের ভাষায় প্রতিনিধিত্ব বা Representation. এ পর্যন্ত বলা স্বপ্নগুলো ও পরবর্তী আরও অনেক স্বপ্নের দৃষ্টান্তে পাঠক স্বপ্নের এই বিশেষ ধর্ম লক্ষ্য করতে পারবেন।

স্বপ্ন দেখেন কেন

মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে তা নিয়ে এত রকম চিন্তাভাবনা বা মত রয়েছে যে স্বপ্ন দেখার কারণ নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। পশ্চিমের দেশগুলোতে গত প্রায় দেড়শো বছরে স্বপ্ন দেখার কারণ নিয়ে কাজকর্ম হয়েছে বিস্তর। একেবারে হাল আমল পর্যন্ত এসব কাজকর্ম বিশ্লেষণ করলে স্বপ্নগবেষকদের চিন্তাভাবনাকে মোটামুটি তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমদল অর্থাৎ শারীরবিদরা মনে করেন, মানুষ স্বপ্ন দেখে শারীরিক বা শারীরবৃত্তীয় কারণে। ধরুন আপনার খুব তেষ্টা পেল। আপনি স্বপ্ন দেখলেন পরপর বেশ কয়েক গ্লাস 'র‍্যালিস' এর বিখ্যাত সুস্বাদু শরবত খাচ্ছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় এক ফোঁটা জল পড়ল আপনার গায়ে। স্বপ্ন দেখলেন, জনমানবহীন এক প্রান্তরে বৃষ্টিতে ভিজছেন আপনি। ঘুমের ভেতর কোনওভাবে বালিশটা উলটে মাথার ওপর উঠে গলায় চাপ পড়ল। স্বপ্নের বিচারকের রায়ে ফাঁসির আদেশ হয়ে গেল আপনার। স্বপ্ন দেখলেন, আপনার ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে। ঘেমেনেয়ে ঘুম গেল ভেঙে।

দ্বিতীয়দলে অর্থাৎ মনোবিদরা মনে করেন, মানুষের স্বপ্ন তৈরি হয় শারীরিক নয়, মানসিক কারণে। মানুষ কি স্বপ্ন দেখবে তা নির্ভর করে তার মানসিকতার ওপর। মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর বসু শারীরবিদ আর মনোবিদদের স্বপ্ন দেখার কারণ সম্পর্কে মতের এই পার্থক্য বোঝাতে খুব সুন্দর একটা উপমা ব্যবহার করেছেন। ধরা যাক ঘুমন্ত মানুষের শরীরে কোনওভাবে জল পড়ল। শারীরবিদ বা বৈজ্ঞানিকদের মতে, 'গায়ে জল পড়ার শারীরিক অনুভূতিই স্বপ্নদর্শনের কারণ'। অন্যদিকে মনোবিদরা স্বপ্ন দেখার এরকম ব্যাখ্যায় আপত্তি তুলবেন। তাঁরা বলবেন, 'জল পড়ার অনুভূতি স্বপ্ন সৃষ্টি করিলেও বৃষ্টির স্বপ্ন দেখিব, কি স্নানের স্বপ্ন দেখিব' তা গায়ে জল পড়ার শারীরিক অনুভূতি ঠিক করে দিতে পারে না। নানা ধরনের স্বপ্ন তৈরি হবার মূল নির্ধারক স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক অবস্থা। বা ঘুমন্ত চেতনার চিন্তাপ্রবাহ।

শীতের দেশে বেড়াতে গিয়ে শীতে কাবু হয়ে বাইরের জামাকাপড় পরেই দুতিন প্রস্থ কম্বলের নীচে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠাণ্ডার ভয়ে জামার কলারের বোতামটা পর্যন্ত খুললেন না। ঘুমের ভেতর হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে গলায় পড়ল চাপ। আর তা থেকে দেখা দিল ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন। এই স্বপ্ন হতে পারে নানা ধরনের। হয়তো দেখলেন দুহাতে আপনার গলা টিপে ধরেছে কোনও এক মাস্তান। বা মধ্যযুগীয় তরবারি দিয়ে গলা কাটা হচ্ছে আপনার। অথবা কোনও অপরাধের জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে আপনাকে। গলায় চাপ পড়বার কষ্ট থেকে মারাত্মক স্বপ্ন তৈরি হলেও এর কোনটা দেখবেন আপনি, তার কারণ খুঁজতে হবে আপনার মনে, শরীরে নয়।

একেবারে হালআমলের একদল স্বপ্নগবেষক মনোবিদ মনে করেন, মানুষ যে স্বপ্ন দেখে তার কারণ খুঁজতে হবে জীববিদ্যা (Biology)-র জ্ঞান দিয়ে। বেশিরভাগ মানুষ কখনও না কখনও ওপর থেকে পড়ে যাবার স্বপ্ন দেখেন। মানুষের পূর্বসূরী বানররা রাতে ঘুমোত গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে। ঘুমন্ত অবস্থায় গাছের ডাল থেকে পড়ে কোনওভাবে নীচের ডাল ধরে বেঁচে যাবার ঘটনা তাদের মনে গভীরভাবে গেঁথে যেত। আর বিবর্তনের নিয়মে এই চিন্তা চলে এসেছে মানুষের মনে। মানুষের পড়ে যাবার স্বপ্ন হতে পারে মানবমনের এরকম ভাবনার প্রতিফলন। স্বপ্ন দেখার এরকম কারণ জীববৈজ্ঞানিক (Biological)। হালের স্বপ্ন-গবেষকদের অনেকে মানুষের সব স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন এভাবে, জীববিদ্যার নিয়ম দিয়ে। একে বলে স্বপ্নসৃষ্টির জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা `Biological Cause of Dream Production.'

আপনার আমার মগজে রয়েছে লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষ বা নিউরোন। এই স্নায়ুকোষগুলির মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন মানুষের মনে বিচিত্র অনুভূতি বা ভাবের জন্ম দেয়। নানাভাবে কতরকম ভাবনাচিন্তাই না আসে জেগে থাকা অবস্থায়। ঘুমিয়ে পড়লে মগজের এই চিন্তাপ্রক্রিয়া পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়ে—এরকম মনে হতে পারে। ঘুমন্ত মানুষের চিন্তাধারা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নানা ধরনের মত রয়েছে। কিছু শারীরবিদ মনে করেন, ঘুমিয়ে পড়লে মানুষের মানসিক প্রক্রিয়া জেগে থাকা অবস্থার মতো একইভাবে চলতে থাকে। তবে এসময়কার ভাবনাচিন্তাগুলো জেগে থাকা অবস্থার বদলে ঘুমের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যায় বলে সুশৃঙ্খল চিন্তার বদলে স্বপ্ন তৈরি করে। স্বপ্নের এরকম তত্ত্বে স্বপ্ন দেখবার কারণ কি, কেনই বা ঘুমন্ত অবস্থার চিন্তা মানুষকে স্বপ্ন দেখায়, তা পরিষ্কার হয় না।

আর একদল বৈজ্ঞানিক মনে করেন, ঘুমের মধ্যে আমাদের মানসিক প্রক্রিয়া অনেকটা শিথিল হয়ে আসে। এঁদের মতে, ঘুমন্ত মানুষের মগজের কোষগুলোর ভেতরকার পারস্পরিক যোগাযোগ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় ভাবনাচিন্তার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে, বিশৃঙ্খল-উদ্ভট নানা চিন্তা মনে আসতে থাকে। এরকম অস্বাভাবিক চিন্তাই হল স্বপ্ন। এই তত্ত্বের সমর্থকরা মনে করেন, পুরোপুরি বেকার মগজের কোষগুলো থেকে উঠে আসা চিন্তাভাবনাই মানুষকে স্বপ্ন দেখায়। এই জেগে ওঠা তো আর এমন নয় যে সব কোষ একেবারে ঘুম ভেঙে 'ধড়মড়' করে জেগে উঠল। এদের ঘুম ভাঙে ধীরে ধীরে। এক-একবারে এক-একটা অংশ জাগতে শুরু করে বিলম্বিত লয়ে।

এই কারণেই নানা ধরনের স্বপ্নে মানসিক ক্ষমতার এত তারতম্য। সামান্য কিছু কোষ জেগে উঠে যে স্বপ্ন তৈরি করে তা উদ্ভট, অর্থহীন। যত বেশি কোষ সক্রিয় হতে থাকে, স্বপ্নও হয়ে ওঠে তত অর্থবহ। প্রায় পুরোপুরি জেগে ওঠা মগজ অনেক সময় বুদ্ধিদীপ্ত নানা স্বপ্ন তৈরি করে। স্বপ্নে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক বা জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় এই সময়টাতেই।

ইতালির বৈজ্ঞানিক বিন্‌ৎস (Binz) ১৮৭৮ সালে স্বপ্ন দেখবার এই তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছিলেন একটু অন্যভাবে। বিন্‌ৎস মনে করতেন, জেগে থাকা অবস্থায় চিন্তাভাবনা করতে করতে মানুষের মগজে নানা বিপাকীয় বস্তু জমা হয়। ঘুমের সময় এগুলো আস্তে আস্তে মগজ থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। আর মগজের কোষগুলোর বিচ্ছিন্ন চিন্তা ঘুমন্ত চেতনার (Clouded Consciousness) মধ্যে নানা বিশৃঙ্খল চিন্তাধারা তৈরি করে। এসব বিশৃঙ্খল আর বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারাই ঘুমন্ত চেতনায় স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। বিন্‌ৎস-এর মনে হয়, মানুষের স্বপ্ন দেখার কারণ শারীরিক (Somatic)। এক সময়ে এই বিজ্ঞানী পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু মানুষের শরীরে কিছু রাসায়নিক (Toxic Substances) প্রবেশ করিয়ে তাঁদের নানা স্বপ্ন দেখাতে পেরেছিলেন। শারীরিক কারণে স্বপ্ন দেখার তত্ত্ব স্বপ্নদ্রষ্টার মন বা মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন। এটা যেন অনেকটা 'পিয়ানো বাদনের প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও নেই এমন একজন মানুষের দশটা আঙুলের পিয়ানোর চাবিগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া।'

স্বপ্ন দেখা নিয়ে সবচাইতে আকর্ষণীয় তত্ত্ব হল, স্বপ্ন দেখা মানুষের মনের এক বিশেষ ক্ষমতা (Specialised activity of mind), যা জেগে থাকা অবস্থায় মানুষের থাকে না। স্বপ্ন হল মানবমনের এমন এক বিশেষ ক্ষমতা যা মানুষের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার জালে আটকে যায় না। যা মানুষের আত্মসচেতনতা বা দৃঢ়সংকল্প দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয়। এমন অবাধে কাজ করতে পারা মানব মগজের এক তুলনাহীন, বিশেষ ক্ষমতা। ১৮৬৯ সালে জার্মান মনোবিদ শ্যেরনার (Scherner) মনের এই বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে ঐতিহাসিক এক বই লেখেন। শ্যেরনার মনে করতেন, স্বপ্নে মনের স্বতস্ফূর্ত বিশেষ ক্ষমতা ভাবনাচিন্তার ক্ষমতায় অপূর্ব পরিবর্তন আনে। আর এই পরিবর্তন মানুষের মনে অনেক অজানা চিন্তাভাবনার জন্ম দেয়। মন চলে যায় বাঁধনহারা এক কল্পনার দেশে, যেখানে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। এই তত্ত্ব ফ্রয়েডকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। শ্যেরনারের এই তত্ত্ব পরে স্বপ্নকল্পনা (Dream Imagination) অধ্যায়ে আরও বিশদে আলোচনা করা যাবে।

স্বপ্নের কাজ

এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা স্বপ্নকে 'উদ্ভট আর আজগুবি' ছাড়া অন্যভাবে ভাবতে পারেন না বা ভাবতে চান না। স্বপ্ন অনেকের কাছেই অর্থহীন। মানুষের মতো বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত মগজ ঘুমন্ত অবস্থায় অকারণে স্বপ্ন দেখে, একুশ শতকের দরজায় দাঁড়িয়ে এরকম একটা ধারণা মেনে নেওয়া কঠিন। দুঃস্বপ্ন দেখে সকালে মনটা অবসাদে ভরে উঠল, এরকম অভিজ্ঞতা কার নেই? আবার 'দারুণ ভালো' কোনও স্বপ্ন দেখে সকালে মনটা চাঙা হয়ে গেল, এরকম অভিজ্ঞতাও প্রায় সব মানুষের রয়েছে। গত দেড়শো বছর বা তারও বেশি সময় ধরে স্বপ্ন নিয়ে কাজ করা মনোবিদরা মানবমনের ওপর স্বপ্নের প্রভাব নিয়ে বেশ কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছেন। সংক্ষেপে এ ব্যাপারে আলোচনা করা যাক।

আজ থেকে একশো ত্রিশ বছর আগে স্বপ্ন-গবেষক রবার্টস মানুষের জীবনে স্বপ্নের প্রয়োজন নিয়ে কিছু বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছিলেন। রবার্টস মনে করতেন, অসম্পূর্ণ নানা ভাবনা, যেগুলো জন্মলগ্নেই শ্বাসরুদ্ধ হয়েছে, স্বপ্নের ভেতর দিয়ে মানুষের মন থেকে বাইরে বেবিয়ে যায়। স্বপ্ন তাই 'অতিভারে জর্জরিত হবার হাত থেকে মনকে বাঁচায়।' স্বপ্নের কাজ অনেকটা প্রেসার কুকারের সেফটি-ভালভ-এর মতো। বাষ্পের চাপ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেলে, ভালভ কিছুটা বাষ্প বাইরে বার করে দিয়ে কুকারকে ফেটে যাবার হাত থেকে বাঁচায়।

জেগে থাকা অবস্থার হাজারটা অসম্পূর্ণ চিন্তা, যেগুলো নিয়ে জেগে থাকা মনের ভাবার ফুরসত মেলে না, স্বপ্নের ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ হয়। স্বপ্ন এই অপূর্ণ চিন্তার অনেকটাই মনের বাইরে বার করে দিয়ে মনের ভার কমায়, মনের স্বাস্থ্য অটুট রাখে। একজন মানুষ স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে, একটা সময় হারিয়ে ফেলবেন তাঁর মানসিক সুস্থতা। কেন না অসম্পূর্ণ চিন্তার ক্রমাগত ভার একটা সময় জেগে থাকা অবস্থার খুব প্রয়োজনীয় চিন্তাগুলোর স্বাভাবিক রাস্তা আগলে দাঁড়াতে পারে।

অনেক স্বপ্ন আমাদের মনকে সান্ত্বনা দেয়, মনের ব্যথা সারায়। হয়তো কোনও কারণে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক গেল ছিন্ন হয়ে। আর তাই নিয়ে মনে তীব্র ব্যথা পেলেন আপনি। বন্ধুর সঙ্গে গল্প করবার বা আড্ডা মারবার স্বপ্ন এসে সাময়িকভাবে আপনার মনের ব্যথাকে সারিয়ে দিতে পারে। তখনকার মতো দুকূল ছাপানো আনন্দে ভরে উঠতে পারে মন। আর আজকের এই জটিল নাগরিক জীবনে এটা হতে পারে একমাত্র স্বপ্নেই। আপনার আমার মনের অতৃপ্ত আশা, না-মেটা কামনা নানাভাবে মিটতে পারে শুধু ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নেই, বাস্তবে নয়। এদিক থেকে বিচার করলে স্বপ্নকে 'মনের স্বাস্থ্যরক্ষক' বা 'হেলথগার্ড অব মাইন্ড' অবশ্যই বলা যায়।

স্বপ্ন যুক্তির শেকল দিয়ে বাঁধা জীবনকে একঘেয়েমি থেকে বাঁচায়। স্বপ্নে মানুষ তাঁর স্বভাবজাত কল্পনার জগতে ঘুরে বেড়াতে পারে অবাধে। উড়তে পারে পাখির মতো। হাজারটা বাস্তবতা অবাধ, লাগামছাড়া কল্পনার জগতটাকে এতটুকু ছুঁতে পারে না স্বপ্নের দেশে। সত্তর বছরের বৃদ্ধ স্বপ্নেই অবলীলায় পৌঁছে যান তার সোনাঝরা শৈশবে, সোনালি কৈশোরে। ছোট্টবেলার সেই মায়াজড়ানো 'বাড়ি'টাকে, যার কথা বয়স্ক মানুষের হয়তো তেমনভাবে মনে নেই, ফিরে পাওয়া যায় যে শুধু স্বপ্নেই। স্বপ্ন মানুষের এক ব্যতিক্রমী বিনোদন। জীবন থেকে মৃত্যুর তীর্থের যাত্রাপথে ঘনিষ্ঠ, উপকারী এক সঙ্গী।

আজ থেকে ঠিক দেড়শো বছর আগে মনের জন্য স্বপ্নের প্রয়োজন বোঝাতে গবেষক পুরকেনজি-র এ সংক্রান্ত কিছু কথা এখানে উল্লেখ করব। স্বপ্নগবেষণার ইতিহাসে পুরকেনজিই সম্ভবত প্রথম

হাজারটা স্বপ্নের ভিতর থেকে 'সৃজনশীল স্বপ্ন' (Productive Dreams)-কে আলাদা করতে পেরেছিলেন। 'স্বপ্নকল্পনার জগতে আনন্দে খেলা করেন স্বপ্নের দর্শক।' বাস্তবের হাজারটা সমস্যা থেকে সাময়িক হলেও সে এক চরম মুক্তি। অনেকের ধারণা, স্বপ্নে সারাদিনের দুশ্চিন্তা আর সমস্যাগুলো অন্যভাবে দেখা দেয়। চিন্তাক্লিষ্ট একজন মানুষের মনের দুঃখযন্ত্রণা তাই স্বপ্নবহুল ঘুমে আরও বাড়ে। এরকম ধারণাকে পুরোপুরি ভুল বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন পুরকেনজি। তাঁর মনে হয়েছিল, 'দিনের উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তাগুলোকে কোনওভাবেই স্বপ্নে টেনে আনতে চায় না মন। বরং চায় স্বপ্ন দেখতে দেখতে এগুলো থেকে খানিক মুক্তি পান স্বপ্নের দর্শক।'

বাস্তবের জগৎ থেকে মানুষকে পুরোপুরি ছিন্ন করে তাকে নিজের জিম্মায় টেনে নেয় স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ব্যথা সারে আনন্দে, ভয় পিছু হটে সাহস আর দূরদৃষ্টির চাপে। পূর্ণ হওয়া কঠিন এমন আশাও পূর্ণ হয় স্বপ্নে, অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব যায় দূর হয়ে। বাস্তবের ঘৃণা স্বপ্নে বন্ধুত্ব আর ভালোবাসার কাছে মাথা নোয়ায়। মনের অনেক পুরনো 'ক্ষত' (wonds) সকালে ঘুম ভাঙা মাত্র জেগে ওঠে কত না মানুষের মনে। ঘুমের সময়টাতে স্বপ্ন এই ক্ষতগুলোকে বারবার জুড়িয়ে দেয় ভালোবাসা দিয়ে। হয়তো স্বপ্নের এই ব্যথা সারাবার ক্ষমতা বাস্তবের হাজারটা কষ্ট যন্ত্রণার হাত থেকে মানুষকে কিছুটা হলেও বাঁচায়। সময়ের ব্যথা জুড়ানোর ক্ষমতা আংশিকভাবে হলেও স্বপ্ননির্ভর।

এই পর্যায়ে, পাঠকের মনে মনের ওপর স্বপ্নের প্রভাব নিয়ে এ পর্যন্ত বলা স্বপ্নগবেষকদের কথাবার্তায় কিছুটা অতিরঞ্জনের অভিযোগ উঠতেই পারে। ঘুমিয়ে আমরা যে শুধু সুখের বা আনন্দের স্বপ্ন দেখি তা তো নয়, অনেক সময় দুঃস্বপ্নও দেখি। যার ভয়ে ঘেমেনেয়ে ঘুম ভেঙে যায় মানুষের। এ সব স্বপ্ন, আর যাই হোক, মনের শুশ্রূষা করতে পারে না। বরং ভেঙে দিতে পারে মনের স্বাস্থ্য। ভয়ে, অবসাদে, হাহাকারে ছেয়ে যেতে পারে মনের আকাশ।

স্বপ্নগবেষক পুরকেনজি মনের ব্যথা সারাবার, সাহস যোগাবার আর ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবার কথাগুলো বলেছেন শুধুমাত্র 'সুখের স্বপ্ন'কে নিয়েই। কোনও গবেষক বা মনোবিদ এমন কথা বলেন নি যে ভয়ের স্বপ্ন, আতঙ্কের স্বপ্ন বা মন খারাপ করে দেওয়া স্বপ্ন মনকে আরাম দেয় বা বিশ্রাম যোগায়। তবে এমন বেশ কিছু স্বপ্ন রয়েছে, যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে উদ্বেগের হলেও, ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলে তা মনকে সান্ত্বনা দেয়। উদ্বেগ থেকে মুক্ত করে। যেমন বহু মানুষের দেখা পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগের স্বপ্ন। বা কিছু মানুষের দেখা ট্রেন বা বাস ধরতে না পারার স্বপ্ন। এগুলোকে দুঃস্বপ্ন মনে হলেও, এগুলো আসলে 'আশ্বাস দেবার স্বপ্ন'।

স্বপ্ন মনের কিছু সমস্যার আগাম বার্তা নিয়ে আসে। এমন অনেক মনোরোগ রয়েছে, যেগুলো জেগে থাকা মনকে বিপর্যস্ত করবার আগেই দেখা দেয় স্বপ্নে। আবার সঠিক চিকিৎসা হলে, কোনও মনোরোগী রোগমুক্ত হবার পরও অনেক সময় স্বপ্নে রোগের প্রতিফলন থেকে যায় আরও বেশ কিছুদিন। এমন একটা সময় ছিল, যখন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা রোগনির্ণয়ে রোগীর স্বপ্নের খোঁজখবর নিতেন। আজকাল বিশেষজ্ঞরা মনোরোগীর স্বপ্নকে আর সেভাবে গুরুত্ব দেন না। এ নিয়ে আলোচনা করব 'স্বপ্ন আর মনের অসুখ' অধ্যায়ে।

শুধু মনোরোগবিশেজ্ঞরা নন, শিক্ষিত মানুষও স্বপ্নকে হেলাফেলা করেন হামেশাই। স্বপ্ন সন্ধানের বছর তিনেকের অভিজ্ঞতায় এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের ধারণা আরও দৃঢ় করেছে। যেটা খুব মজার ব্যাপার সেটা বলি। স্বপ্ন নিয়ে তেমন একটা মাথা না ঘামালেও, স্বপ্নের অর্থ নিয়ে মানুষের কৌতূহলের ঘাটতি নেই এতটুকু। অনেকেই বাজারের চালু নিম্নমানের 'স্বপ্নফল বিচার' বা 'স্বপ্ন অভিধান' পড়ে চটজলদি তাঁর দেখা স্বপ্নের অর্থ খুঁজতে যান। অনেকে আবার তাঁদের দেখা স্বপ্নের কথা জানান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বা সাধু সন্ন্যাসীদের। শাস্ত্রমতে এ সব স্বপ্নের অর্থ জানতে চাওয়া মানুষের কৌতূহল স্বাভাবিক। কেন না এতে কোনও পরিশ্রম নেই। স্বপ্নতত্ত্ব জেনে নিজের স্বপ্ন নিজে বিশ্লেষণ করার পরিশ্রম মেনে নেবেন এমন মানুষ চিরকালই সংখ্যায় কম।

অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা আমাদের মতো দেশের সাধারণ মানুষ শুধু নয় শিক্ষিত মানুষের মনেও রাজত্ব করে অবলীলায়। বিজ্ঞানকে শুধু বইয়ের পাতাতেই বন্দী করে রাখতে ভালোবাসি আমরা।

বিজ্ঞানের আলোয় গড়ে নিতে পারি না মুক্ত চেতনা, মুক্তমন। হয়তো এ সব কারণেই স্বপ্নের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে তার ব্যাখ্যা খুঁজতে চান খুব কম মানুষ। এটা শুধু যে আমাদের মতো দেশের ছবি তা কিন্তু নয়। উন্নত দেশগুলোতেও মানুষের এই প্রবণতা রয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরা স্বপ্নকে ভগবানের সতর্কবাণী হিসেবে ভাবত। 'সায়েন্টিফিক লিটারেচার অন্ ড্রিমস' প্রবন্ধে ফ্রয়েড লিখছেন, 'এটা ভাবা ভুল হবে যে স্বপ্নের অতিমানবিক তত্ত্ব (Superhuman Origin of Dream)-এ বিশ্বাসীরা শুধু আদিযুগেই ছিলেন। আজকের দিনেও এই মতে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়।' ফ্রয়েডের এই প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। ফ্রয়েড রচনাবলী-র চতুর্থ আর পঞ্চম খণ্ডে থাকা স্বপ্ন সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলোকে ফ্রয়েড নিজে বারবার সম্পাদনা করেছেন। বহু অংশ বাদ দিয়েছেন। জুড়েছেন নতুন নতুন অংশ বা পাদটীকা। মৃত্যুর (১৯৩৯) আগে স্বয়ং ফ্রয়েড সম্পাদিত অষ্টম জার্মান সংস্করণ (১৯৩০) আর ১৯৩৮-এ চতুর্থ ইংরেজি সংস্করণ থেকে এই কথাগুলো বাদ যায় নি। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে 'স্বপ্ন দেখান ভগবান'—এরকম ধারণায় বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

স্বপ্ন জেগে থাকা অবস্থায় হাজারটা রুদ্ধ বা অপূর্ণ আবেগকে বাইরে বার করে দিয়ে মনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। স্বপ্ন এক্ষেত্রে 'রেচক'-এর কাজ করে। এরকম 'রেচন' (Exceretory Function of Dreams) ছাড়া স্বপ্ন অনেকসময় সচেতন মনে ইচ্ছাপূরণের আনন্দ দেয়। এই দুটোর বাইরে স্বপ্নের অন্য সরাসরি কোনও ভূমিকায় ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন না। স্বপ্ন-গবেষক আলফ্রেড অ্যাডলার মনে করতেন, এ সব ছাড়া 'এগিয়ে চিন্তা করা' (To Think Ahead) স্বপ্নের আর একটা কাজ। বিশিষ্ট স্বপ্নগবেষক ইয়ুন ভাবতেন, জীবনের প্রথমদিকে স্বপ্ন একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একজন মানুষকে ভবিষ্যতের পথ দেখাতে স্বপ্ন পরোক্ষভাবে সাহায্য করে বলে ইয়ুন বিশ্বাস করতেন।

সবদিক বিচার করে বলা যায়, স্বপ্ন একজন মানুষকে স্বতস্ফূর্ত ভাবনাচিন্তায় সাহায্য করে। মনের গভীরে জমে থাকা আবেগকে বাইরে বার করে দিয়ে মনকে অসুস্থ হবার হাত থেকে বাঁচায়। হয়তো অপূর্ণ আশাআকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে স্বপ্ন পরোক্ষভাবে আমাদের সামনে এগিয়ে চলবার পথে কিছুটা হলেও প্রেরণা যোগায়।

স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন

অনেক সময় স্বপ্নে একটা প্রাথমিক অংশ থাকে, যা স্বপ্নের দর্শকের কাছে স্বপ্ন নাটকের 'ভূমিকা' বলে মনে হয়। ফ্রয়েডের ভাষায় "এটা হল স্বপ্নের 'প্রিল্যুড' বা 'প্রাথমিক প্রস্তাবনা'।" এরপর দর্শক মূল স্বপ্ন দেখতে থাকেন। একে অন্যকে 'স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখা' বলে ভাবেন। কিছু স্বপ্ন দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যাক:

স্বপ্ন ১: ভূমিকা: একটা খেয়াঘাটে নৌকোর অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি—নৌকো নেই।

মূল স্বপ্ন: নৌকো চেপে নদীর ওপারে যাচ্ছি—হঠাৎ নৌকোর মাঝি দাঁড় ফেলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—নৌকো বনবন করে ঘুরছে—আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

—প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৃহবধূ, মালদহ।

স্বপ্ন ২: স্বপ্নে শাহরুখ খান

বাস্তব: মুম্বইতে শাহরুখ খানের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়েছিল, চারপাঁচ ঘণ্টা ধরে—ফ্লোরে শুটিং-এর ফাঁকেফাঁকে ওর সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম।

(ক) স্বপ্নের ভূমিকা: শাহরুখকে নিয়ে (সানন্দায়) আমার লেখার কিছু অংশে ওঁর প্রবল আপত্তি—কোর্টে মানহানির মামলা করেছেন আমার নামে।

(খ) মূল স্বপ্ন: কোর্টে উপস্থিত বলিউডের নামিদামি স্টাররা। অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না, মিঠুন চক্রবর্তী, মাধুরী দীক্ষিত, শ্রীদেবী, জুহি চাওলা—আরও অনেকে। এবং শাহরুখ নিজে। শাহরুখের অ্যাডভোকেট রাম জেঠমালানি, আমার হয়ে লড়ছি আমি নিজেই। আমার সমর্থনে কোর্টে হাজির আমার দফতরের সমস্ত সহকর্মী, এমনকি সম্পাদকও। বহুক্ষণ ধরে চলল সওয়াল জবাব। শেষ পর্যন্ত জয় হল আমারই। আমার সহকর্মীরা আমাকে ঘিরে ধরল। শাহরুখ এসে জয়ের জন্য আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল।—হঠাৎ শাহরুখের জন্য আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

—সুমিত দে, সাংবাদিক

স্বপ্ন ৩: ভূমিকা—কোনও একজন পরিচিত সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছি তার সম্মতি নিয়ে।

স্বপ্ন—বিরাট হইচই হচ্ছে—আমার বাড়ির চারপাশে বহু মহিলা জড়ো হয়ে স্লোগান দিচ্ছে—রাস্তা দিয়ে জালঢাকা কালো একটা পুলিশ ভ্যান আসছে—হঠাৎ একটা বোমা ফাটল—সবাই পালাচ্ছে—বাড়ির চারপাশে একটা লোকও নেই—ভ্যানটাও হাওয়া।

—,—ছাত্র, বাঁকুড়া

স্বপ্ন ৪: (ক) স্বপ্নের ভূমিকা: রাস্তার দুপাশের সব দোকান সরকার পুলিশ দিয়ে ভেঙে দিয়েছে—সাধারণ মানুষ আর হকাররা এই নিয়ে খুব ক্ষুব্ধ।

(খ) মূল স্বপ্ন: পুলিশ এসে দোকানগুলোকে ভাঙছে—দোকানদার আর প্রশাসনের গণ্ডগোল খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হয়েছে—অবস্থা আয়ত্বে আনতে না পেরে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে—বেশ কিছু মানুষ গুলি খেয়ে ধরাশায়ী—আমি প্রাণের ভয়ে একটা জায়গায় লুকিয়ে আছি—হঠাৎ একজন

পুলিশ আমাকে দেখে ফেলল—গুলি চালাল আমাকে তাক করে—গুলি খেয়ে আমি আর্ত চিৎকার করে পড়ে গেলাম।

—সুধাংশু দত্ত, ফুটপাথের দোকানদার, কাশিমবাজার

স্বপ্ন ৫: স্বপ্ন দেখতে দেখতে গল্পের একটা মুড বা প্লট তৈরি হল—এবার সেই প্লটটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু হল—একটার পর ঘটনা ঘটছে—এ তো স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নই।

—বাণী বসু

এরকম আরও অনেক স্বপ্নের দৃষ্টান্ত আমার ঝুলিতে আছে। সব তো আর লেখা সম্ভব নয়। বাণী বসু যেভাবে স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন অন্যরা তা নয়। একটু অন্যরকম। স্বপ্নের প্রথম অংশ যেন খেয়াল গানের 'আলাপ'। বাকিটা 'বিস্তার'। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের মতো। 'আরণ্যক'-এর ভূমিকা আর মূল অংশের সঙ্গে কিছু স্বপ্নের এই দুটো অংশকে তুলনা করা যায়। যে কোনও পাঠক নিজের স্বপ্ন কিছুদিন ঘুম ভেঙে উঠেই তাড়াতাড়ি লিখে রাখবার অভ্যাস করলে বুঝতে পারবেন, এরকম ঘটনা তাঁর কিছু স্বপ্নেও আসছে।

স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নের সবচেয়ে সুন্দর দৃষ্টান্ত আমার কাছে এসেছে বিদেশ থেকে। পশ্চিম আফ্রিকার গ্যাবন থেকে এই স্বপ্ন লিখে পাঠিয়েছেন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ভট্টাচার্য।

স্বপ্ন ৬: (ক) চলেছি পিচবাধানো রাস্তা ধরে, পাশে রেলিং ঘেরা ছোট ছোট ফুলগাছ—ফুলগাছ পেরোলে সবুজ মাঠ, তারপর এক বিশাল দীঘি—রাস্তার অন্য ধারে উঁচু রেললাইন—নীচে ক্যামেরা কাঁধে স্ট্র-হ্যাট পরা এক ট্যুরিস্ট। স্থানীয় একজন খেটোধুতি পরা লোককে জিজ্ঞাসা কবলাম ঝরনা দেখতে যাব কিভাবে—লোকটি বলল ঝরনা দেখতে হলে 'ডোংরি' যেতে হবে, দূরত্ব ষাট কিলোমিটার—সিঁড়ি বেয়ে স্টেশনে উঠে দেখি একজন স্কার্টফ্রক পরা মেয়ে—তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঝরনাটায় যাব কিভাবে—মেয়েটি বলল, ওটা বর্ডারের কাছাকাছি। সব চাইতে ভালো হয় নিজের গাড়ি প্লেনে করে নিয়ে গিয়ে জায়গাটা ঘুরে দেখলে—ওখানে একটা ছোট্ট এয়ারপোর্ট আছে—তারপর দেখলাম কলকাতার বাড়ির বারান্দার মায়ের সঙ্গে গল্প করছি—মাকে বললাম, আমরা ঐ জায়গায় বেড়াতে যাব—সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটা প্লেন কিনে ফেলি—

(খ) এরপর দেখলাম, সুন্দর এক উপত্যকা, ঘন সবুজ জঙ্গল—পাহাড়ের চূড়ায় সমতলে একটা জায়গা এয়ারপোর্ট—ওপরে ঝলমলে সোনালি আকাশ—একটা দারুণ সুন্দর ঝরনা।

স্বপ্ন জোড়া লাগা

সব সময় নয় মাঝেমধ্যে, সবাই নয় কেউ কেউ, একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে গেল, একটুবাদে আবার ঘুমিয়ে স্বপ্নের পরের অংশটা আবার দেখতে পারেন। কোনও স্বপ্ন এভাবে জোড়া লাগলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ঘুমন্ত অবস্থায় যে ভাবনা থেকে কোনও একটা স্বপ্ন দেখছেন, ঘুম ভেঙে একটু বাদে আবার একই ভাবনার পরের অংশটা আসতে পারে ঘুমন্ত চেতনায়। এরকম হলে স্বপ্ন জোড়া লাগে। বেশিরভাগ সময় জেগে ওঠার পর চিন্তাপ্রবাহ যায় ভেঙে। তাই স্বপ্ন আর জোড়া লাগে না।

মাঝেমধ্যে এরকম স্বপ্ন জোড়া লাগে স্বপ্নসন্ধানের এক বিশেষ সমীক্ষার কুড়ি শতাংশ মানুষের। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এরকম অভিজ্ঞতা হয় মাঝেমাঝে। ওঁর কথায় 'স্বপ্ন দেখতে দেখতে হয়তো ঘুমটা ভেঙে গেল—আবার ঘুমিয়ে একই স্বপ্ন দেখলাম। ক-দিন আগে একটা খুব সুন্দর জায়গা দেখছিলাম—জেগে আবার ঘুমিয়ে গেলাম। ঐ জায়গাটা আবার স্বপ্নে চলে এল।' লেখিকা বাণী বসুও এ ধরনের স্বপ্ন দেখেন। 'স্বপ্নে লেখার এক প্লট তৈরি হল—প্লটটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছি—হঠাৎ ঘুমটা গেল ভেঙে—আবার ঘুমিয়ে একই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।' এরকম স্বপ্ন জোড়া লাগার কথা জানিয়েছেন আরও অনেক মানুষ।

সব মানুষের নয়, কিছু মানুষের স্বপ্ন জোড়া লাগে। কেন এমন হয়? স্বপ্ন জোড়া লাগে যাঁদের অন্যদের চাইতে তাঁরা কোথায় আলাদা? আমার স্বপ্ন নিয়ে কাজকর্মের যা অভিজ্ঞতা তা বলি।

স্বপ্ন জোড়া লাগা নির্ভর করে কতগুলো বিশেষ কারণের ওপর। স্বপ্ন ঘুমন্ত চেতনার ছবিতে রূপান্তর। একজন মানুষের স্বপ্নের জগতে রয়েছে সাধারণ (Common) কতগুলো নিয়ম। যা সব স্বপ্নের দর্শকের স্বপ্নকেই নিয়ন্ত্রণ করে। আর রয়েছে বিশেষ (Specific) ব্যক্তিনির্ভর কিছু নিয়ম। এই নিয়মগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় স্বপ্নদ্রষ্টার মনোজগত (Psyche) এর গঠন আর ঐ বিশেষত্বগুলো দিয়ে। সব মানুষের কিছু স্বপ্ন তাই এক ধরনের। যেমন পরীক্ষার স্বপ্ন। বা প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন। আর কিছু স্বপ্ন আসে স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিকতা বা মনের গঠন অনুযায়ী। যা আবার নির্ভর করে পেশা, বয়েস, লিঙ্গ, অর্থনীতি, শ্রেণী, ভালোলাগা-মন্দলাগা, পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও আরও অনেক ব্যাপারের ওপর।

সৃষ্টিশীল, অনুভূতিপ্রবণ মানুষের স্বপ্ন জোড়া লাগে বেশি। অনুভূতিপ্রবণ অথচ সক্রিয়ভাবে সৃষ্টিশীল নন, এমন মানুষের স্বপ্নও জোড়া লাগে প্রায় একইরকম। 'পুরুষদের চেয়ে, আমার ধারণা, মেয়েরা বেশি অনুভূতিপ্রবণ'। কবি শঙ্খ ঘোষ গভীর দৃঢ়তার সঙ্গে এক দুপুরে কথাগুলো বলেন এই লেখককে। মেয়েরা বেশি অনুভূতিপ্রবণ হলে, তাঁদের স্বপ্ন জোড়া লাগবে পুরুষদের চাইতে বেশি। আমার স্বপ্নসন্ধানের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। স্বপ্ন জোড়া লাগে যাঁদের, তাঁদের ষাট শতাংশ মেয়ে।

যাঁরা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে আর জেগে তা নিয়ে ভাবতে ভালোবাসেন, তাঁদের স্বপ্ন অন্যদের চাইতে বেশি জোড়া লাগে। এরকম বেশ কিছু মানুষের খোঁজ আমি পেয়েছি। রাতে সামান্য সময়ের জন্য ঘুম ভেঙে আবার ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্ন জোড়া লাগার সম্ভাবনা বেশি। টয়লেটে যাবার প্রয়োজন হলে, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যাপারটা সেরে আবার ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্ন জোড়া লাগে বেশি। হইচই বা চিৎকার চেঁচামেচি শুনে অথবা ভয় পেয়ে হয়তো ঘুম ভাঙল আপনার। এরকম হলে, স্বপ্ন জোড়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে।

সুন্দর স্বপ্ন, ভালোলাগার স্বপ্ন বেশি জোড়া লাগে। এটা কিছু নির্ভর করে আপনি আগের স্বপ্নটা

আবার দেখতে চাইছেন কিনা তার ওপরও। সুখের স্বপ্ন তাই জোড়া লাগে বেশি। দুঃখের, হতাশার বা ভয়ের স্বপ্ন কম। হতাশায় ভুগছেন এমন দুজন মানুষের স্বপ্ন এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। এক জনের মারদাঙ্গা, খুনখারাপির স্বপ্নও জোড়া লাগে। অন্য জনের নানাধরনের হতাশার স্বপ্ন না চাইলেও জুড়ে যায়। এরকম মানুষ হয়তো ব্যতিক্রম। এদের মানসিক সমস্যার সঙ্গে খারাপ স্বপ্ন (Negative Dreams) জোড়া লাগার সম্পর্ক রয়েছে বলে আমার মনে হয়।

জোড়া লাগা স্বপ্নে পরের অংশে কি কোনও গুণগত পরিবর্তন আসে? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন, 'দেখি বটে, কিন্তু ঠিক আগের মতো আর হয় না, একটু অন্য রকম।' বাণী বসুর মনে হয়, জোড়া লাগবার পর স্বপ্ন তাঁর আগের মতোই থাকে। আমার নিজের একরাতে দেখা দারুণ রোম্যান্টিক একটা স্বপ্ন চারবার জোড়া লেগেছিল। সেই স্বপ্নে প্রিয়তম কবির সঙ্গে আমি হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম আউটরাম ঘাটে গঙ্গার পারের রাস্তা ধরে। আর কবি আমাকে সেই রাতে শুনিয়েছিলেন তাঁর সবচাইতে প্রিয় কবিতাগুলো। একের পর এক। একজন গৃহবধূ জানিয়েছেন, ঘুম ভেঙে আবার ঘুমিয়ে পড়লে তাঁর বেশিরভাগ স্বপ্নই জোড়া লাগে। এরকম অভিজ্ঞতা হয়তো আরও অনেকের রয়েছে।

স্বপ্ন ভুলে যাওয়া

বেশির ভাগ মানুষই স্বপ্ন দেখে তা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যান। যে সব স্বপ্ন সকালে উঠেই স্বপ্নদ্রষ্টা মনে করতে পারেন, অনেক সময় মনে হয় সেই স্বপ্নেরও পুরোটা মনে পড়ছে না। যা মনে করতে পারছেন, তার চাইতে যেন বেশি 'আরও কিছু' দেখেছেন। এই মনে না পড়া অংশগুলো বেশিরভাগ সময়েই অনেক চেষ্টা করেও মনে করা যায় না। সকালে উঠেই শুয়ে শুয়ে বা স্থির হয়ে বসে ভাবতে না পারলে অনেক স্বপ্ন বেলা বাড়লে স্মৃতির অতলে চলে যায়। অনেক ভেবেও আর মনে পড়ে না। 'বেশিব ভাগ স্বপ্ন সকালে উঠে মনে থাকে, এর একটা বড় অংশ পরে আস্তে আস্তে ধূপের গন্ধের মতো মিলিয়ে যায়।' ফ্রয়েড লিখছেন, 'স্বপ্ন সাধারণত সকালে গলে অদৃশ্য হয়ে যায়, এরকম চালু প্রবাদ ষোলো আনা ঠিক।'

কিছু মানুষ স্বপ্ন বেশি দেখেন, কিছু মানুষ কম। এটা খুব আশ্চর্যের যে কিছু স্বপ্ন বহুদিন মনে থেকে যায়। সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে দেখা তাঁর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা সংক্রান্ত একটা স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। পঁচাত্তর বছরের একজন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী তার দশ-এগারো বছর বয়সে দেখা স্বপ্নের কথা এই বই লেখার কাজ চলবার সময় আমাকে বলেন। আমার নিজের ঠিক বাইশ বছর আগে দেখা একটা স্বপ্নের কথা আজও আমার ছবির মতো মনে পড়ে। আমার স্বপ্নসন্ধানে কুড়ি থেকে আটান্ন বছর আগে দেখা স্বপ্নের বিবরণ আমাকে জানিয়েছেন কয়েকশো মানুষ। বারবার একই স্বপ্নর কথা জানতে চেয়ে, আমি নিশ্চিত যে এঁরা কেউ একবিন্দুও বানিয়ে বলেন নি।

স্বপ্নসংগ্রহের অভিজ্ঞতায় এমন কিছু মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে যাঁরা শুধু যে স্বপ্ন খুব বেশি দেখেন তাই নয়, এঁদের স্বপ্ন মনেও থাকে অন্যদের চাইতে বেশি। এঁদের মধ্যে সাতাশি বছরের কবি অরুণ মিত্র-র স্বপ্ন মনে রাখবার আশ্চর্য ক্ষমতা মুগ্ধ হবার মতো। এ ব্যাপারে আর এক বিরল ব্যতিক্রম চৌষট্টি বছরের যুবক কবি, সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতায় বা শান্তিনিকেতনে এই কবির বাড়িতে নতুন স্বপ্ন চাইতে গিয়ে কোনও দিন খালি হাতে ফিরতে হয়নি। আমার কাজের অভিজ্ঞতা বলে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা অরুণ মিত্রর মতো সৃজনশীল মানুষেরা যে স্বপ্ন বেশি মনে রাখতে পারেন তার নানা কারণ রয়েছে। স্বপ্ন দেখতে আর মনে রাখতে, অন্যভাবে বলতে গেলে স্বপ্ন নিয়ে চর্চা করতে ভালোবাসেন এমন একজন মানুষ স্বপ্ন অন্যদের চাইতে বেশি মনে রাখতে পারবেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সুনীল স্বপ্ন নিয়ে বেশি ভাবেন বা নিজের দেখা স্বপ্নকে সৃজনশীল কাজে লাগান হামেশাই। স্বপ্ন বেশি মনে থাকবার এটাও হয়তো একটা কারণ। তাছাড়া একই স্বপ্ন বারবার মনে করলে স্মৃতিকোষে তা গেঁথে যায় গভীরভাবে। আর অটুট স্মৃতিশক্তি তো অবশ্যই স্বপ্ন বেশি মনে থাকবার একটা বড় কারণ।

বেশিরভাগ মানুষ যে বেশিরভাগ স্বপ্ন ভুলে যান তার কারণ স্বপ্নকে এঁরা তেমন একটা গুরুত্ব দেন না। স্বপ্ন এঁদের কাছে 'উদ্ভট, আজগুবি, অর্থহীন একটা ব্যাপার।' স্বপ্ন নিয়ে ভাবা বা আলোচনা করার রেওয়াজ বিশ্বের কোনওদেশের মানুষের মধ্যেই তেমনভাবে নেই। অনেক মানুষই স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা তো দূরের কথা, এ নিয়ে কথা বলাকেও 'সময় নষ্ট করা' বলে ভাবেন। প্রায় আড়াই হাজার মানুষের স্বপ্ন সংগ্রহ করতে গিয়ে সমান সংখ্যক মানুষের তাচ্ছিল্যের হাসি বা এড়িয়ে যাওয়া কথাবার্তা আমার স্বপ্নসংক্রান্ত অভিজ্ঞতায় নতুন একটা মাত্রা যোগ করেছে।

স্বপ্ন যে মানুষ খুব বেশি ভুলে যায় তার আরও কারণ রয়েছে। সকালে উঠে স্বপ্নের যে স্মৃতি তা মনে করা হয় সাধারণত একবার। দিনের বেলায় জেগে থাকা অবস্থায় হাজার হাজার তথ্য স্মৃতিকোষে গভীরভাবে থেকে যাওয়া নির্ভর করে সেই তথ্যের উদ্দীপনা কতটা তীব্র তার ওপর। দিনের বেলায় অজস্র ছোটখাটো ঘটনা আর তথ্য, সংকেত বা উদ্দীপনা মৃদু বলে আমরা অবিরত ভুলে যাই। স্বপ্ন মনে রাখতে হয় দিনের বেলায়, জেগে থাকা অবস্থায়, ঘুমের মধ্যে নয়।

দিনের আলোয় শতসহস্র তথ্যের ভিড়ে জেগে থাকা অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় আর ছোটখাটো ব্যাপারের মতো বেশিরভাগ সময় স্বপ্নও সেভাবে 'আমল' পায় না মগজের কাছে। অন্য আরও তথ্যের মতো বেশিরভাগ স্বপ্নই তাই মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যান। স্মৃতিকোষে স্বপ্নের উদ্দীপনা বড়ই মৃদু। তাই দিনের বেলা প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোর প্রচণ্ড ব্যস্ততার ভিড়ে 'বেকার' স্বপ্ন বেশিরভাগই যায় হারিয়ে। ফ্রয়েডের কথায়, 'স্বপ্নগুলো যেন অন্ধকার রাতের নক্ষত্র আর তারাদের মতো। এদের আলোর কদর শুধু রাতেই। সকালে সূর্য উঠে গেলে তীব্র রোদে তারা আর নক্ষত্রদের আলোর কথা আর মনে রাখে ক-জন। দিনের ব্যস্ততায় বেশিরভাগ স্বপ্ন তাই হারিয়ে যায় মন থেকে।'

এটা খুব আশ্চর্যের যে মগজের স্মৃতিকোষের স্বপ্ন ভুলে যাবার অসাধারণ দক্ষতা এড়িয়ে কিছু স্বপ্ন বহুকাল, এমনকী আমৃত্যু থেকে যায় একজন মানুষের মনে। বাহাত্তর বছরের এক বৃদ্ধ তার চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে দেখা তিনটি স্বপ্ন আর তার পারিপার্শ্বিক প্রতিটি তথ্যের কথা আমাকে জানান। এতে অবাক হবারই কথা। স্বপ্নগবেষক স্ট্রুমপেলের এরকম বহু স্বপ্নের দৃষ্টান্ত জানা ছিল। কেন কিছু স্বপ্ন এত বেশি মনে থাকে, এই স্বপ্নগুলো অন্য স্বপ্নের চাইতে আলাদা কোথায়, এ নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পাশ্চাত্যের বহু মনোবিদ দীর্ঘ পরিশ্রম করেছেন। তবু এ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। একই স্বপ্ন বারবার দেখলে বহুদিন মনে থাকা স্বাভাবিক। সকালে ভুলে যাওয়া স্বপ্ন অনেক সময় হঠাৎ করে কোনও আকস্মিক অনুভব (Chance Perception) এর জন্য মনে পড়ে যায়। তবু কিছু স্বপ্নের মগজে বহু বছর বেঁচে থাকবার সম্ভাব্য কারণ আজও অজানা।

স্ট্রুমপেল স্বপ্ন ভুলে যাবার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, 'কোনও বাক্য মগজ তখনই বেশি মনে রাখতে পারে যখন তার শব্দগুলো ঠিকভাবে একটা নিয়মে সাজানো থাকে। কোনও ঘটনার বেলাতেও এটা সত্যি। নির্দিষ্ট একটা ঘটনার অংশগুলো সঠিক ক্রমে পরপর জোড়া থাকলে স্মৃতিতে তা গভীর ছাপ রেখে যায়। ঘটনাটাও বহুদিন মনে থাকে।' স্বপ্নের ঘটনাগুলো বড় আগোছালো, নিয়মছাড়া আর বিশৃঙ্খলভাবে সাজানো। তাই মগজ তা সহজেই ভুলে যায়। ঠিক এই কারণেই পাঁচ বছর আগেকার একটা দিনের পরপর ঘটনাগুলো হয়তো একজন মানুষ পরপর মনে করতে পারেন। অথচ একই মানুষ পুরোপুরি ভুলে যান পাঁচ দিন আগে দেখা স্বপ্নের কথা। বহুদিন আগে দেখা কোনও সিনেমার দৃশ্যগুলো আমাদের মনে থাকে। অথচ কয়েকদিন আগে দেখা কোনও অ্যালবামের একশোটা ছবির বেশিরভাগটাই যাই ভুলে।

স্বপ্ন ভুলে যাবার পেছনে মনের এক মানসিক প্রক্রিয়া (Psychical Process) বিশেষভাবে কাজ করে। স্বপ্নের গভীরে প্রবেশ করতে করতে একটা সময় আমরা বুঝতে পারব, স্বপ্নের মধ্যে বেশিরভাগ সময় অচেতন মনের নানা গোপন ইচ্ছা চলে আসে। স্বপ্ন দেখামাত্রই একজন মানুষের অচেতন মনের অবদমিত নানা ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে তৃপ্ত হয়। স্বপ্নের কাজ এটুকুই। তারপর ওই স্বপ্নকে ধরে রাখবার আর কোনও প্রয়োজন মনের নেই। আরও একটা ব্যাপার রয়েছে। স্বপ্ন তৈরি হবার সময় অনৈতিক কোনও ইচ্ছা যাতে স্বপ্নে চলে আসতে না পারে, তার জন্য আমাদের মনে এক পাহারাদার (Censor of Mind) ঘুমের মধ্যেও কাজ করে। আগে যে মানসিক প্রক্রিয়ার কথা বলেছি, মনের পাহারাদার হল ওই প্রক্রিয়া। এই পাহারাদারকে ফাঁকি দিতে নানা অনৈতিক ইচ্ছা বিভিন্ন প্রতীক বা রূপকের ছদ্মবেশে স্বপ্নে চলে আসে। মনের প্রহরী এটা জানে বলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বপ্নটাকে মন থেকে বার করে দিতে চায়। যাতে জেগে উঠে স্বপ্নের প্রভাবে মনে কোনও পাপবোধ বা অশান্তি না আসে।

পাঠক লক্ষ করবেন, কিছু স্বপ্ন সকালে উঠে টুকরো টুকরো মনে পড়ে। কিছু স্বপ্নের কথা মনে করতে চাইলেও তা কিছুতেই মনে পড়তে চায় না। যে স্বপ্ন যত বেশি গোপন ইচ্ছা থেকে আসে, তা একজন মানুষ তত তাড়াতাড়ি ভুলে যান। মনের পাহারাদার এক্ষেত্রে জেগে উঠে স্বপ্নটাকে মনে করতে বাধা

দেয়। যাতে নিজের মনে ওই গোপন ইচ্ছার অস্তিত্বের কথা স্বপ্নের দর্শক এতটুকুও জানতে না পারেন। ফ্রয়েড তার নিজের কিছু স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনের ভিতর থেকে এক ধরনের বাধা (Internal Resistance) আসছে বলে লক্ষ করেন। পরে ওই স্বপ্নের বিশ্লেষণে অচেতন মনের এমন ইচ্ছার অস্তিত্ব ধরা পড়ে যা সচেতন মনের কাছে অসামাজিক, নিন্দনীয়। স্বপ্ন ভুলে যাবার বা স্বপ্ন বিশ্লেষণে বাধা দেবার ক্ষেত্রে মনের পাহারাদারের ভূমিকা অনেকটাই। স্বপ্নকে যে উদ্ভট, আজগুবি বলে মনে হয় তার জন্য কিছুমাত্রায় দায়ী এই পাহারাদার বা সেন্সারের ভূমিকা—যাতে স্বপ্নদ্রষ্টা তার স্বপ্ন নিয়ে এতটুকু মাথা না ঘামান। আর মনের গোপন ইচ্ছার কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারেন।

স্বপ্নের স্থায়িত্বর মতো জেগে থাকা মানুষের মনে স্বপ্নের স্মৃতির স্থায়িত্ব খুব অল্প। স্বপ্ন সবচাইতে ভালো মনে থাকে স্বপ্ন দেখার পর খুব কম সময়ের মধ্যে তা মনে করতে পারলে। মাঝরাতে কোনও কারণে ঘুম ভেঙে গেলে প্রথম রাতে দেখা স্বপ্ন সবচাইতে ভালো মনে থাকে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে সকালে উঠে মনে করলে ওই স্বপ্নরই অনেক কিছু আর ভালোভাবে মনে পড়ে না। পরে মনে করা স্বপ্নের মনে পড়া অংশগুলো বেশিরভাগ সময় স্বপ্নদ্রষ্টা নিজের অজান্তে নিজস্ব কল্পনাশক্তি দিয়ে জুড়ে দেন। ফরাসি স্বপ্নগবেষক এগার এই নিয়ে সূক্ষ্ম রসিকতা করেছেন তাঁর লেখায়। এগার লিখছেন, 'পরে মনে পড়া স্বপ্নের অংশগুলো জুড়ে দেবার সময় প্রত্যেক মানুষই নিজের অজান্তে এককেজন সৃষ্টিশীল শিল্পী হয়ে ওঠেন!' আর কিছুটা মনে পড়া স্বপ্নের বাকি অংশ অচেতনভাবে এভাবে জুড়ে বারবার তা মনে করতে থাকলে, একসময় গোটা স্বপ্নে নিজের তৈরি অংশগুলো পর্যন্ত স্বপ্নের দর্শকের নিজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

স্বপ্নগবেষকরা সকলেই তাই স্বপ্ন নিয়ে উৎসাহী মানুষকে ঘুমোতে পরামর্শ দেন মাথার নীচে কাগজকলম নিয়ে। ঘুম ভাঙলেই স্বপ্নের অভিজ্ঞতা একটুও বাদ না দিয়ে লিখে রাখতে হবে। স্বপ্নসন্ধানের কাজে আমি এরকম বহু মানুষের খোঁজ পেয়েছি, যাঁরা এই পদ্ধতিতে এককালে তাঁদের স্বপ্ন লিখে রাখতেন। লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আমাকে জানান, এভাবে লিখে রাখা কয়েকশো স্বপ্নের বিবরণ তাঁর সংগ্রহে রয়েছে। সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, লেখিকা বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, কবি শঙ্খ ঘোষ—এঁরা সকলেই স্বপ্ন দেখার পরপরই স্বপ্নের বিবরণ একটা সময়ে লিখে রাখতেন। শুধু এঁরা নন, কবি, সাংবাদিক, সহ-সম্পাদক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী, ফটোগ্রাফার, চাকুরিজীবী—নানা পেশার বহু মানুষ এভাবে স্বপ্ন লিখে রাখেন। এরকম লিখে রাখা বেশ কিছু স্বপ্ন সংগ্রহ করার বা দেখার দুর্লভ সুযোগ আমার হয়েছে।

অনেককেই বলতে শোনা যায় তিনি আজকাল আর একদম স্বপ্ন দেখেন না। অনেক সময় সকালে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে কিছু একটা স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু স্বপ্নটাকে মনে করতে পারা যায় না একেবারেই। এরকম হতেই পারে যে রাতে স্বপ্ন দেখে সকালে তার কথা একেবারেই মনে পড়ল না। কয়েকজন সাংবাদিক ও অন্য পেশার মানুষ আমাকে জানান, তাঁদের এত গভীর ঘুম হয় যে তাঁরা একেবারেই স্বপ্ন দেখেন না। এ ব্যাপারে স্বপ্নগবেষক মনোবিদরা কি বলেন জানার কৌতূহল জাগতেই পারে। এঁদের মতে, ঘুম খুব গভীর হলেও ঘুমের একটা স্তরে (REM Sleep) কোনও না কোনও স্বপ্ন মানুষ দেখবেই। সম্ভবত সকালে উঠে এসব স্বপ্নের কথা কিছু মানুষ মনে রাখতে পারেন না। সারাদিন খুব বেশি পরিশ্রম করা মানুষ বলতেই পারেন, 'বিছানায় পড়ি আর মড়ার মতো ক-ঘণ্টা ঘুমোই। আমার স্বপ্ন দেখার সময় কোথায়?'

মনোবিজ্ঞানের আলোয় বিচার করলে, এই শ্রেণীর মানুষও রাতে স্বপ্ন দেখেন। যাঁদের ঘুম এই পর্যায়ে পড়ে, তাঁরা লক্ষ করবেন, এক একদিন এক একরকম অনুভূতি নিয়ে তাঁদের ঘুম ভাঙছে। রাতে ভালো স্বপ্ন দেখলে ঘুম ভেঙে বেশ একটা ফুর্তির আমেজ থাকে। সব কিছুকেই ভালো লাগে। আর ভয়ের, শোকের বা হতাশার স্বপ্ন মানুষ ভুলে গেলেও সকালে ঘুম ভাঙে মন খারাপ নিয়ে। বাহাত্তরটা বসন্ত পার করে দেওয়া বর্ষীয়ান সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর এ সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। 'এখন আমি স্বপ্ন দেখি না বলব না, তবে হয়তো ঘুমের ভেতরই ভুলে যাই। সকালে উঠে কখনও স্বপ্ন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমার ধারণাই হয়ে গেছে যে আমি আর স্বপ্ন দেখি না। ধারণাটা হয়তো ঠিক নয়।'

অনিদ্রা, মানসিক রোগ বা উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে এমন মানুষকে নানা ধরনের চিন্তানাশক, নিদ্রাকর্ষক বা মানসিক রোগের ওষুধ খেতে হয় নিয়মিত। এসব ওষুধের (Hypnotics, Tranquilisers, Sedative Drugs) প্রভাবে ঘুমের স্বপ্ন দেখা স্তর স্বাভাবিকের চাইতে সময়ে কমে যায়। এঁরা স্বপ্ন কম দেখেন। ওষুধের প্রভাবে স্বপ্ন ভুলেও যান অন্যদের চাইতে বেশি। ডাক্তারের পরামর্শে নিদ্রাকর্ষক ওষুধ নিয়মিত খেতে হয় এমন এক লেখিকার খেদোক্তি, 'রাতের ওই ওষুধটা আমার অনেক স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে।'

নানা পেশা আর অর্থনীতির, নানা বয়সের যেসব মানুষ তাঁদের স্বপ্নের বিবরণ আমাকে মুখোমুখি জানিয়েছেন বা লিখে পাঠিয়েছেন তাঁরা অবশ্যই স্বপ্ন দেখতে আর মনে রাখতে চান। অনেকে জানতে চেয়েছেন স্বপ্ন মনে রাখার সঠিক উপায় কি? মনোবিদরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বপ্নের বিবরণ লিখে রাখবার যে পরামর্শ দেন তা তো আগেই বলেছি। ফ্রয়েডের এ ব্যাপারে একটা মূল্যবান সিদ্ধান্তের কথা বলি। 'যে কেউ যদি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর দেখা স্বপ্নকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে থাকেন, তবে তাঁর স্বপ্ন দেখা বাড়বে, এটা হলফ করে বলা যায়।' আসলে তিনি ভুলবেন অনেক কম, তাই মনে পড়া স্বপ্নের সংখ্যাও অনেক বাড়বে। জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে নিজের আর তার রোগীদের স্বপ্ন বিশ্লেষণের মতো ঐতিহাসিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা এই জার্মান মনোচিকিৎসক নিজেই তাঁর এই সিদ্ধান্তর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মৃত্যুর ষাট বছর পরও সিগমুন্ড ফ্রয়েড স্বপ্নতত্ত্বের জগতে এক কিংবদন্তী। অথবা ইতিহাস।

স্বপ্নকল্পনা

স্বপ্নের দেশ চালায় স্বপ্নকল্পনা। 'ড্রিম ইমাজিনেশন'। জেগে থাকা মানুষের কল্পনা নিয়ন্ত্রণ করে যুক্তিবোধ, শৃঙ্খলা, প্রয়োজন। স্বপ্নের কল্পনা নিজেই নিজের রাজা। যুক্তির নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়ে ঘুমন্ত মানুষের ভাবনার জগতে কল্পনা হয়ে যায় উদ্দাম, শেকলভাঙা। স্বপ্নের দেশে রয়েছে স্বতস্ফূর্ত এক শক্তি। যে শক্তির জোরে স্বপ্নকল্পনা নরম, বহুমুখী আর বৈচিত্র্যে ভরা। স্বপ্নকল্পনা যেন উদাস, ভাবুক, নিয়মভাঙা এক কবির কলম। যে কলম থেকে বেরিয়ে আসে বিশৃঙ্খল অথচ শক্তিশালী পদ্য। অথবা দক্ষ চিত্রকরের হাতের তুলি। যে তুলি যে কোনও ভাবনাকে বিমূর্ততার ঢঙে আর কল্পনার রঙে এঁকে দেয় স্বপ্নের ক্যানভাসে। অকল্পনীয় ক্ষিপ্রতায় আঁকা সেই ছবির প্রদর্শনী স্বপ্নের দর্শক দেখতে পান তাঁর ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নে।

জেগে জেগে অনুভূতিপ্রবণ, সৃষ্টিশীল একজন মানুষের যে কল্পনা তা স্বপ্নকল্পনার কাছে হার মানে অবলীলায়। জেগে থাকা মানুষের কল্পনা যেন রবীন্দ্রনাথের লেখা বাচ্চাদের ছড়া। আর স্বপ্নকল্পনা সুকুমার রায়ের ননসেন্স কবিতা। 'আবোল তাবোল'। স্বপ্নকল্পনা যেন 'ক্ষ্যাপার গান'। যে গানের 'নাইকো মানে, নাইকো সুর'। থাকবেই বা কেন! স্বপ্নের দেশের কল্পনা জাগ্রত চেতনার চোখে 'আজগুবিতাল, বেঠিকবেতাল'। সুকুমার রায়ের প্রতিটা ননসেন্স কবিতা যেন একেকটা উদ্ভট স্বপ্ন। যে স্বপ্ন তৈবিব পিছনে কাজ করে ঘুমিয়ে থাকা মানুষের 'ক্ষ্যাপামন'। বাস্তবের কল্পনা যেন সব বাঁধন ঘুচিয়ে ফেলে উদ্দাম স্বপ্নকল্পনায় রূপ নেয় স্বপ্নের দেশে। 'সৃষ্টিছাড়া' সেই কল্পনার ভাষা লেখা হয় 'অসম্ভবের ছন্দেতে'।

কিছুই অসম্ভব নয় স্বপ্নের দেশে। স্বপ্নের দেশে অবিরত ঘটে চলা উদ্ভট,আজগুবি কাণ্ডকারখানা স্বপ্নকল্পনার এক এক টুকরো সৃষ্টি। আর কি বিচিত্র সেই দেশটা। বাস্তবের যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে নয়, স্বপ্নকল্পনা স্বপ্নেব জগৎটাকে চালায় তার নিজস্ব নিয়মকানুন দিয়ে। একবার সেই ভাষায় রপ্ত হয়ে গেলে ওই দেশের ঘটনাগুলো বোঝা যায় সহজেই। স্বপ্নকল্পনার জোরে গরু শুধু গাছেই ওঠে না, আকাশেও ওড়ে।

টেলিফোন অপারেটার মার্গারেট রায়ের দুটো স্বপ্নের কথা বলি। একবার মার্গারেট দিদির সঙ্গে একটা জাহাজে বেড়াতে গিয়ে দেখেন জাহাজের ওপর ওঁর চেনা একটা গির্জা। আর একবার ওঁর স্বপ্নে আসে 'একটা বড় মাছ। তার গায়ে পকেট। পকেটে একটা কাগজে বাবার ঠিকানা লেখা।' ঠিকানাটা পড়তে পারেননি মার্গারেট।

কিছু বিচিত্র স্বপ্নের কথা বলি। 'স্বপ্নকল্পনা'র ভাষা বুঝতে কিছুটা সুবিধা হবে:

১) হোয়াইট হাউসে অতিথি হয়ে গিয়েছি, বিল ক্লিন্টনের বেডরুম—বিছানার ওপর বসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে দু জনে মেজাজে আড্ডা হচ্ছে বাংলায়—খুব মজা লাগছে।

—ডা. অনুপম গোস্বামী, অ্যানাসথেটিস্ট।

২) মারা যাবার দশ বছর বাদে বন্ধু ওদের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে—ওর চেহারাটা পুরো মাইকেল জ্যাকসনের মতো হয়ে গেছে।

—বাপি ভট্টাচার্য, ব্যবসায়ী।

৩) স্পেসশিপ আসবে আমি জানি। সবাই ভয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছে—আমি একা ছাদের ওপর প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করছি—আমাদের ছাদটা মস্ত একটা রানওয়ে হয়ে গেছে—একটা তারা আস্তে-আস্তে বড় হয়ে উঠছে।

—বলাকা ভট্টাচার্য, স্নাতকোত্তর ছাত্রী।

৪) অফিসে বসে হাউমাউ করে কাঁদছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—আমি তাঁকে খুব সান্ত্বনা দিচ্ছি। কাঁচের ঘরের বাইরে অনেক লোক জমে গেছে—ওরা কী সব বলাবলি করছে।

—প্রমোদ বসু, সাংবাদিক, 'আনন্দবাজার'।

৫) পাড়ার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত প্রবীণ মানুষ ধুতি মালকোচা মেরে লম্বা একটা গাছে ওঠার চেষ্টা করছেন।

—পান্নালাল ঘোষ, সাংবাদিক, 'বর্তমান'।

৬) অলিম্পিক অ্যাথলেটিক্স মিটে সাতটা ইভেন্টে 'সোনা' জিতেছি—ওগুলো বেচে সাতটা বিশাল খেলার মাঠ তৈরি করেছি।

—দিলীপ বাগুই, শিক্ষক।

৭) স্কুল আর কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছি—বন্ধুরা সবাই মাথায় ঘোমটা দিয়ে আছে—বারবার বললেও কেউ ঘোমটা নামাচ্ছে না—জোর করে একজনের ঘোমটা তুলতেই দেখি মুখটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের!

—সুদর্শনা মুখোপাধ্যায়, ছাত্রী।

৮) বোনের বিয়ে হচ্ছে—ওকে সাজিয়ে দিচ্ছে ওর জামাইবাবু— খুব আনন্দ সারা বাড়িতে—মা, কাকিমারা সবাই জামাপ্যান্ট পরেছে, ওঁদের সবার মুখে গোঁফদাড়ি—সবাই কান দিয়ে রসগোল্লা খাচ্ছে।

—রীতা চৌধুরী, গৃহবধূ।

৯) নিউইয়র্কের ১৬০ তলা উঁচু একটা বাড়ির ছাদে উঠেছি সিঁড়ি টপকে টপকে—অথচ একটুও ক্লান্ত হইনি।

—সুদেষ্ণা বসু, সাংবাদিক, 'আনন্দবাজার'।

১০) স্বর্গে গিয়ে দেখি ব্রহ্মা খুব বিপদে পড়েছে। হাওড়া ব্রিজকে কে যেন ব্লেড দিয়ে চিরে দিয়েছে—ব্রহ্মা বলছে, 'কি করা যায়?' আমি বললাম, 'এ আবার কি শক্ত ব্যাপার! এক টিউব ফেভিকল দিন, আমি জুড়ে দিচ্ছি।'

—বিকাশ দাস, ছাত্র।

১১) দুটো বাচ্চা প্লাস্টিকের একটা কালোসাপ নিয়ে খেলছিল—ওরা সাপটা ফেলে চলে গেল—আমি সাপের লেজে আগুন দিলাম—কুঁইকুঁই আওয়াজ—মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর কালো সাপ বেরিয়ে এল—আমি লুকোলাম একটা গাছের আড়ালে।

—রত্নেশ্বর সরকার, শিক্ষক।

১২) স্পেসশিপের ভেতর যেমন ভাসে, তেমনি ভাসতে ভাসতে নভোচর রাকেশ শর্মা আমার ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকছেন—আমি বললাম, 'ওভাবে ঢুকছেন কেন! দরজা দিয়ে আসুন!'—বলে

দরজা খুলে দিতে গেলাম।

—অনুভা কর, সাংবাদিক, 'বর্তমান'।

১৩) শচীন তেণ্ডুলকার আমার খাটের ওপর বসে আমার সঙ্গে গল্প করছে, একদিন হঠাৎ দেখি আমার ঘরের সব দেয়াল শচীন ওর অটোগ্রাফ দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছে—আমি বললাম, এভাবে সব দেয়াল নোংরা করলে কেন?'

—তপতী দে, স্নাতক, আগরতলা।

১৪) একটা লোক ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে—লোকটার মাথা নেই।

—তাপস মৈত্র, ছাত্র, বালুরঘাট

১৫) একটা ১০/১২ তলা বাড়ির ওপরকার কার্নিস থেকে নীচের দিকে ঝুলে রাস্তার লোকজন দেখছি।

—মনিলাল নাগ, সেতার শিল্পী।

১৬) কিছুদিন আগে এক রাতে দেখলাম, গঙ্গার ঘাটে নাট্যকার গিরিশ ঘোষ বাংলা মদের বোতলে গঙ্গাজল ভরে নিচ্ছেন।

—শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক, 'সানন্দা'।

১৭) হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আমাদের দোতলা বাড়ির কার্নিসে ঠ্যাং দুলিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছেন—।

—ডা. অমিতাভ ভট্টাচার্য, চিকিৎসক।

স্বপ্নের দেশে এরকম অদ্ভুত, উদ্ভট কাণ্ডকারখানা ঘটে যখন তখন। বাস্তবের দেশে যা উদ্ভট, স্বপ্নকল্পনায় তাই স্বাভাবিক। স্বপ্নের দর্শকের কল্পনা অবাধ, স্বাধীন। 'সারাদিন যুক্তিবুদ্ধির চাপে কল্পনার স্প্রিংগুলোতে যেন চাপ দেওয়া থাকে ('So many springs under tension')। রাতে ঘুমের দেশে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তির চাপটা যায় খুলে—আর কল্পনার স্প্রিংগুলো নাচতে শুরু করে নিজের খেয়ালে'। একশো বছর আগে বিশিষ্ট এক মনোবিদ এই সুন্দর উপমা ব্যবহার করেছিলেন স্বপ্নের কল্পনার অবাধ, উদ্দাম গতিকে বোঝাতে।

স্বপ্নের ছবি স্বপ্নকল্পনার জোরে প্রায়ই ঘটায় 'বেঠিক, বেতাল' নানা ঘটনা। সব কিছুই সম্ভব সেই 'উদ্ভট' কল্পনায়। 'ওরাং ওটাং' এর রঙ হতে পারে 'হলুদ-সবুজ'। একটা সিংহ উড়ে উড়ে আসতে পারে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দিকে। আর সেই সিংহের রঙ হলুদ নয়, ধূসর নয়, হতে পারে একেবারে নীল। স্বপ্নের পার্কে ময়ূরদের মধ্যে কথাবার্তা হয় বাংলাভাষায়। আর তা শুনতে পান স্বপ্নের দর্শক অনিতা অগ্নিহোত্রী। সৌম্য চৌধুরী দেখা পেতে পারেন সালভাদার দালির। চিত্রকর যোগেন চৌধুরীর সৃষ্টিশীল পুত্র সৌম্য স্বপ্নে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পান সালভাদর দালিকে। একটা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে দক্ষ পর্বতারোহীর মতো দালি উঠছেন শিখরের দিকে।

সৃষ্টিশীল মানুষেরা অন্যদের চাইতে একটু বেশি অনুভূতিপ্রবণ হবেন, এটা স্বাভাবিক। এঁদের কল্পনা জেগে থাকা অবস্থাতেই এগোয় ঘোড়ায় চেপে। আর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবার সময় কবি, লেখক, চিত্রকর, ভাস্করদের স্বপ্নকল্পনা আকাশে ওড়ে সাতঘোড়ার রথে চড়ে। কিছু এরকম মানুষের স্বপ্নের কথা বলি। শুরু করা যাক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে—

(১) (ক) স্বপ্নের সূর্যালোকে ঝড়!

কাল রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। সূর্যালোকে ঝড় উঠেছে। সে অবর্ণনীয়। দাউ দাউ করে

চারদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা—গেলুম গেলুম রব। একটা যেন প্রলয় কাণ্ড, সব পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

—রবীন্দ্রনাথ।

[১৯৩৯ সালে মংপুবাসের সময়ে জুনের ৪ তারিখ রাতে রবীন্দ্রনাথ এই স্বপ্ন দেখেন।]

(খ) বেদমন্ত্রে মৃত্যুর বৈরাগ্য।

আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে সেইটে কাকে বুঝিয়ে বলছি। আশ্চর্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্তস্বরের মতো, অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি, আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র চামুণ্ডার মতো ফেনার জিভ মেলে অট্টহাস্যে নৃত্য করছে।—মেঘগুলো মরিয়া হয়ে উঠেছে, যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই—বলছে, যা থাকে কপালে।—মাল্লারা ছোট ছোট লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে চলাফেরা করছে, কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সংকেত—ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বাইরে জল, বাতাসের গর্জন আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণমন্ত্র ক্রমাগত বাজতে লাগল।—ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ওই ঝড় এবং ঢেউয়ের মতোই এলোমেলো মাতামাতি করতে থাকল।

—রবীন্দ্রনাথ

[১৯১৬ সালে জাপানের পথে জাহাজে এক রাতে রবীন্দ্রনাথের দেখা স্বপ্নের অভিজ্ঞতা]

(গ) লম্বা করে দেবার শয়তানের দল।

কাল রাত্তিরে ভারী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে—বাড়ি ঘর, সমস্তই একটা অন্ধকার কালো কুয়াশার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে—এবং তার ভিতর তুমুল কি একটা কাণ্ড চলছে। আমি একটা ভাড়াটে গাড়ি করে পার্ক স্ট্রিটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি—যেতে যেতে দেখলুম সেন্ট জেভিয়ার কলেজটা দেখতে দেখতে হু হু করে বেড়ে উঠেছে—জানতে পারলুম একদল অদ্ভুত লোক এসেছে, তারা টাকা পেলে কী এক কৌশলে এইরকম অপূর্ব ব্যাপার করতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি এসে দেখি সেখানেও তারা এসেছে—বদ দেখতে, কতকটা মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারা—সরু গোঁফ, গোটা দশ বারো দাড়ি মুখের এদিকে ওদিকে—তারা মানুষকেও বড় করে দিতে পারে—আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্য উমেদার হয়েছেন—তারা এঁদের মাথায় কী একটা গুঁড়ো দিচ্ছে আর এঁরা হুশ করে লম্বা হয়ে উঠছেন। আমি কেবলই বলছি, কি আশ্চর্য, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। —কে একজন প্রস্তাব করলে আমাদের বাড়িটা উঁচু করে দিতে। তাঁরা রাজি হয়ে কয়েকটা ইট ভাঙতে আরম্ভ করলে। খানিকটা ভেঙেচুরে বললে, এইবার এত টাকা চাই, নইলে বাড়িতে হাত দেব না। কুঞ্জ সরকার বললে, সে কি হয়, কাজ না হলে কি করে টাকা দেওয়া যায়! বলতেই তারা চটে উঠল—বাড়িটা সমস্তই একরকম বেঁকেচুরে বিশ্রী হয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে দেখা গেল, আধখানা মানুষ দেয়ালের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, আধখানা বেরিয়ে। সমস্ত দেখেশুনে মনে হল এ সব শয়তানী কাণ্ড—দালানে গিয়ে খুব একাগ্রমনে উপাসনা করা গেল। বেরিয়ে এসে মনে করলুম ঈশ্বরের নাম করে তাদের ভর্ৎসনা করব—কিন্তু বুক ফেটে যেতে লাগল, তবু গলা দিয়ে কথা বেরোল না।—ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন!

—রবীন্দ্রনাথ।

[এই অদ্ভুত স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেন ১৮৯১ সালে, সাজাদপুরে। স্বপ্নের বিবরণ ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃত]

(২) নিরীশ্বরবাদীর স্বপ্নে জীবন্ত কালীপ্রতিমা।

একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছি—কলোনি এলাকা (তখন বিজয়গড়ে থাকতাম)—কিছুটা গিয়ে বাঁদিকে

একটা পরিত্যক্ত বাড়ি—সামনের দিকটা বন্ধ—পেছনে একটা গ্যারাজ—তার দরজাটা খুলতেই অপূর্ব স্যান্ডস্টোনের একটা কালীপ্রতিমা। কেউ যেন বলছে, আমি এতদিন অপূজিতা রইলাম—আমাকে পূজা করো—আমি তর্ক করছি, আমি তো তোমাকে বিশ্বাস করি না, আমি তোমাকে পুজো করতে পারব না—বলে আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

—মহাশ্বেতা দেবীর স্বপ্ন

(৩) প্রাগৈতিহাসিক যুগে।

যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ—একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে সেই যুগের একজন লোক, তার গায়ে তেমন কিছু নেই—পাতার পোশাক পরা। লোকটা একেকটা করে ভেড়ার বাচ্চাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে এপার থেকে ওপারে—একটা বাচ্চাকে পারল না—ওই ভেড়ার বাচ্চাটা নদীতে ভেসে চলে যাচ্ছে—লোকটা নদীতে নামতে পারছে না, কারণ নদীতে খুব স্রোত।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্ন

(৪) স্বপ্নে প্রাচীন শহর, বিপদ।

একটা প্রাচীন শহরে গেছি একজনের সঙ্গে দেখা করতে—ওপরের দিদির সঙ্গে। একটা মার্বেল প্যালেস, অথচ ছাতটা নেই—দিদি বসে আছেন। রানির মতো—অথচ ঠিক দিদি তিনি নন—হিন্দি সিনেমার হিরোইনের মতো, কাছা দিয়ে কাপড় পরা—রাজ্যের দেওয়ানের সঙ্গে হিসেবনিকেশের কথা বলছেন—তারপর আমাকে নিয়ে ফিরছেন—অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে ১৮-১৯ বছরের আমি ফিরছি দিদির সঙ্গে—আমাদের গন্তব্য একটা যৌথ পরিবারের বাড়ি—কারা যেন আমাদের পিছু নিয়েছে—তাড়া করছে—ছুটতে ছুটতে বলছি—'তুমি এখানকার রানি, তোমার এই অবস্থা!'—একটা বাড়ির সামনে পৌঁছেছি, দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল—একটা ফণাতোলা সাপ আর একটা বাঘ, দুটোই তেড়ে এল আমাদের দিকে—এগুলো বাড়ির মালিকের পোষা, ভদ্রলোক আসতেই সাপ আর বাঘ দুটো ঠাণ্ডা হয়ে গেল—ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা যে এখানে পৌঁছে গেছেন, এটাই ভরসা। আর ভয় নেই।' কীসের ভয়, কি ব্যাপার—আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—অথচ ভদ্রলোক যেন গোটা ব্যাপারটাই জানেন।

—বাণী বসুর স্বপ্ন।

(৫) রত্নখচিত রথের স্বপ্ন

রত্নখচিত বিশাল একটা রথ—আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে—আকাশটা স্লেট পাথরের মতো কালো—বছর তিরিশ আগে এই স্বপ্নটা বার তিনেক দেখেছি। খুব স্পষ্ট মনে আছে।

—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন

(৬) বাঘের সবজি খাওয়ার স্বপ্ন।

একটা সময় এটা দেখতাম। আমরা বল খেলতে যেতাম—পথে এক জনের বাগান পড়ত—আলু, পেঁয়াজ, বেগুন, রসুন এসবের চাষ হত ওই বাগানে। স্বপ্নে দেখছি, একটা বাঘ এসেছে বাগানে—মন দিয়ে আলু পেঁয়াজ খাচ্ছে—আমার ভয় করছে না, আশ্চর্য একটা অনুভূতি হচ্ছে—বাঘের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—বাঘ চোখতুলে একবার আমাকে দেখে আবার খাওয়ায় মন দিল—যেন ছাগলে সবজি খাচ্ছে।

—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্ন।

(৭) শান্তিনিকেতনের নীচে আর একটা শান্তিনিকেতন।

আজই ভোরের বেলায় রাতে দেখা একটা স্বপ্নের অংশ মনে পড়ছিল। সেটা ছিল এরকম যে শান্তিনিকেতনের মাটি খুঁড়ে তার তলায় আর একটা শান্তিনিকেতন বানাবার পথ তৈরি হচ্ছে।

—শঙ্খ ঘোষের স্বপ্ন

(৮) জীবন্ত দুর্গাপ্রতিমা।

ছোটবেলায় যে বাড়িতে আমরা থাকতাম—ডাচ আমলের বিশাল বাড়ি—এখন গঙ্গাগর্ভে—তাতে দু তিনটে সিঁড়ি ছিল—ছাতে ওঠার সিঁড়িটায় ছিল কিছুটা উঠে একটা বাঁক—তারপর বাঁদিকে, বাঁকের পাশে ঘুঁটে, কয়লা এ সব থাকত—স্বপ্নে সে সব পেরিয়ে আমি উঠলাম—সিঁড়ির শেষে দরজাটা বন্ধ—তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মা দুর্গা—আয়ত চোখ—সুন্দর সাজগোজ—আমি তাকাতেই আমার দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করলেন,

'সর্বমঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে, ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে।'

—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্ন।

(৯) প্রকৃতির ক্যানভাসে তুলির আচড়।

একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি; গভীর, গহন অরণ্য—আমি হাঁটছি—একটুবাদে পৌঁছলাম একটা খোলা জায়গায়—ওপরে নীল আকাশের চাঁদোয়া—আর সামনে মস্ত একটা জলপ্রপাত, হঠাৎ করে জলপ্রপাতটা যেন একটা ছবির মস্ত ক্যানভাস হয়ে গেল, অথচ জল পড়ার উতলা আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে, আমি রঙ আর তুলি নিয়ে সেই ছবিতে নানা রঙের আঁচড় দিতে শুরু করলাম—নানা রঙ দিয়ে আমার হাতের তুলি জীবন্ত ক্যানভাসে ছবি এঁকে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। কমবয়সে যখন ছবি আঁকতাম, তখন এই স্বপ্নটা বেশ কয়েকবার দেখেছি।

—নবনীতা দেবসেনের স্বপ্ন।

(১০) স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরচত্বরে এক জন হোঁৎকা চেহারার লোক—শ্রীরামকৃষ্ণর ধুতি ধরে টানছে—লোকটার বিশালবপু। সঙ্গীরা ঠাকুরের দর্শনার্থীদের আটকে রেখেছে—ধুতিটা ক্রমাগত লম্বা হচ্ছে—লম্বা হতে হতে সাদা ধুতিতে মন্দিরচত্বর ভরে গেছে—ঠাকুর চিৎকার করে কান্না করছেন 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

—শঙ্করলাল ভট্টাচার্যর স্বপ্ন।

(১১) স্বপ্নে সুনীল গাভাসকার।

(ছোটবেলায় খুব খেলতে ইচ্ছে হত, শরীরের জন্য খেলতে পারতাম না। ক্রিকেট ভাল লাগত খুব, মাঠে বসে বা জানালা দিয়ে খেলা দেখতাম। মা খেলাধূলার ওপর অনেক বই কিনে দিতেন। খেলাধূলার ওপর অনেক বই পড়েছি ছেলেবেলা থেকে। সুনীল গাভাসকারের খেলা, মানুষ গাভাসকার আমার খুব প্রিয়। এই স্বপ্নটা গাভাসকার খেলা থেকে সরে দাঁড়াবার অনেক পরে দেখা।)

রাস্তাটা রানাঘাটের, আমাকে সাইকেলের রডে বসিয়ে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সুনীল গাভাসকার—এতটুকু বিস্ময় নেই আমার মধ্যে—যেন এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার—আমি ওকে বললাম, তুমি এত তাড়াতাড়ি খেলা ছেড়ে দিচ্ছ কেন, খেলা ছেড়ো না। আরও কিছুদিন খেলো—গাভাসকার বলছেন, কেন উনি সরে দাঁড়াচ্ছেন।

—জয় গোস্বামীর স্বপ্ন

(১২) অদ্ভুত স্বপ্নের বাড়ি।

একটা জায়গায় গিয়েছি—সমুদ্র নয়, পাহাড়ও নয়,—একটা অদ্ভুত জায়গায় আমার বাড়ি—আমার বাড়ির উলটোদিকে একটা কুঁড়েঘরের মতো বাড়ি। সেখানে এক দম্পতি থাকে, কোরিয়ান বা ভিয়েতনামি,—লোকটা জিনসের প্যান্ট পড়া, চওড়া বেল্ট, মোঙ্গোলিয়ান মুখ—মেয়েটার মুখও এরকম, স্কার্ট পরা—ওরা দু জনে সাইকেল চড়ে কাজে বেরিয়ে যায়—ওদের ছেলেমেয়েরা হাঁসমুরগীর ছানার মতো আমার বাড়ির উঠোনে খেলে বেড়ায়—লোকটা রাত্রে ড্রিঙ্ক করে বউকে বেদম পেটায়।

—সুচিত্রা ভট্টাচার্যের স্বপ্ন।

(১৩) স্বপ্নে সাদা রোমাঞ্চ!

একটা মঞ্চ—তার ওপর সাদা একটা কিছু। অদ্ভুত রূপময়, লাবণ্যময়। কখনও মনে হচ্ছে একটা সাদা পাহাড়ী ফুল—কখনও সাদা পেখমতোলা পায়রা—আবার এক একবার সাদা ঝালর দেওয়া পোশাকপরা একটা মেয়ে—খুব ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে, আমি অনেক দেরি করে ফেলেছি আসতে—পেছনে দাঁড়িয়ে আছি—আমি সামনে দু হাত বাড়িয়ে দিলাম—সাদা ব্যাপারটা—প্রচণ্ড হৃদ্যময় কিছু—আমার বুকে চলে এল—(এই স্বপ্নটা ছাত্রাবস্থার শেষে বারবার দেখেছি)

—অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর স্বপ্ন

আমার ফাইলে থাকা সৃষ্টিশীল, অনুভূতিপ্রবণ কিছু মানুষের প্রায় একশোটা স্বপ্নের ভেতর থেকে বিশেষভাবে নির্বাচিত এই তেরোটা স্বপ্ন এখানে উল্লেখ করলাম। স্বপ্নকল্পনার ধরন, নরমনরম ভাব আর বৈচিত্র্য বুঝতে এই স্বপ্নগুলোর বিবরণ পাঠককে সাহায্য করবে। প্রতিটা স্বপ্নের বিবরণ হুবহু তুলে দেওয়া। শুধু স্বপ্ন হিসেবে নয়, এই স্বপ্নগুলোর সাহিত্যমূল্যও অনেক। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা 'গপ্পো খোঁজার স্বপ্ন, (Plot Seeking Dream) রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করব পরে। এই পর্যায়ে পৌঁছে, ঝুলি থেকে স্বপ্নকল্পনার আরও কিছু দৃষ্টান্ত পাঠকদের সামনে রাখব। তীব্র অনুভূতিশীল কিছু মানুষের এই স্বপ্নগুলো স্বপ্নকল্পনার আরও নানা দিকে আলো ফেলছে।

(১) তালিবানদের ভারত আক্রমণ!

স্বপ্নেই খবর পেলাম, সম্ভবত ফোনে, তালিবানরা ভারতে এসে গেছে।—দেশের উত্তর পশ্চিম দিক থেকে একটা প্যাসেজ তৈরি করে দ্রুত চলে আসছে—দেশের নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ে—ভীষণ ভয় করছে—এরকম একটা অবস্থা এদেশে হয় কি করে, এত ভাল 'সাউন্ড' একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকতে! অবাকও লাগছে—এখন কি করি—দুশ্চিন্তা হচ্ছে—তালিবানরা এলে এদেশে নারীবাদীদের কি হবে—নিজের জন্য চিন্তা হচ্ছে না, অথচ নারীবাদীদের জন্য ভীষণ করুণা হচ্ছে!

—অনিতা অগ্নিহোত্রী

(২) কুড়ি ফুট লম্বা অর্ধেক সাহেব!

কুড়ি ফুট লম্বা একটা মানুষ নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টের চেক-আউটে দাঁড়িয়ে আছে—একটা হাত সাদা, একটা হাত কালো—মানুষটা বিশাল লম্বা সাদা হাতটা বাড়িয়ে বলছে, 'দেখি, তোমার কাগজপত্রগুলো দেখি!'

—সুবোধ সরকার, অধ্যাপক কবি

(৩) স্বপ্নের কলকাতায় হিমযুগ!

হঠাৎ চমকে উঠে দেখি কলকাতায় হিমযুগ শুরু হয়ে গেছে—লেকের পাশ দিয়ে হাঁটছি—লেকের জলের ওপরটা নীলচে সাদা বরফ হয়ে জমে আছে—সেই জমা বরফের নীচে জলে লাল, নীল মাছেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—অনীক রুদ্র, শিক্ষক কবি

(৪) ছিপ ফেলে ইঁদুর ধরা!

একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে রয়েছি—যেখানে রয়েছি তার আশেপাশে অনেক ফ্ল্যাটবাড়ি—ফ্ল্যাটগুলোর ব্যলকনি থেকে অনেক মানুষ নীচে ছিপ ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখ হওয়ায় ভাসতে থাকা ফাতনায়—জায়গাটায় যেন আবর্জনার চাষ হচ্ছে—ফাতনায় টান পড়ায় একজন ছিপ তুলল, বড়শিতে ইঁদুরজাতীয় একটু অদ্ভুত প্রাণী উঠে এল।

—স্বপ্নময় চক্রবর্তী, গল্পকার

(৫) মাও সে তুং এর সঙ্গে হেলিকপ্টারে!

দেখছি মাও সে তুং এর সঙ্গে হেলিকপ্টারে চড়ে চীনের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে যাচ্ছি—অনেক নীচ দিয়ে যাচ্ছে আমাদের হেলিকপ্টার—উনি নানা কথা বলছেন আমাকে—'দেখ, এভাবে আমরা চাষ করি—এটা এভাবে হয়।'

—অনিরুদ্ধ ধর, সাংবাদিক

(৬) আত্মার কলকাতায় ফেরা!

ঘাটশিলা গেছি—ফুলডুংরি পাহাড়ে উঠছি—সন্ধে হয়ে আসছে—দলছুট হয়ে গেছি। কয়েকজন দুষ্কৃতী এল—আমাকে খুন করল। আত্মা হয়ে দেখছি, আমার মৃতদেহ পড়ে আছে—আত্মা উড়ে এল কলকাতায়—নিজের বাড়ি—বাড়ির সবাই আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে—যত বোঝাই, আমি কোনও ক্ষতি করব না, তত ভয় পায়—মা এসে বোঝাচ্ছে, 'দ্যাখ, আমি ভয় না পেলেও ওরা তোকে দেখে ভয় পাচ্ছে। তা ছাড়া তুই মরে গেছিস! পৃথিবীতে থাকবি কি করে!' কাঁদতে কাঁদতে আমার আত্মা সাদার্ন অ্যাভিনিউর রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে—চোখের জলের ভেতর দিয়ে নীচের লাল কৃষ্ণচূড়া, হলুদ রাধাচূড়ার ছবি চোখে ভাসছে।

—মৈত্রেয়ী গুহ, সাংবাদিক

(৭) 'গোধূমচূর্ণ' মানে কি?

এক বন্ধুর সঙ্গে অপরিচ্ছন্ন একটা রেস্টুরেন্টে মোগলাই পরোটার অর্ডার দিয়েছি—অনেকক্ষণ বাদে, বিরক্ত লাগছে—পরোটা এল—মুখে দিয়ে বুঝলাম কাঁচা—আমাদের গজগজানি টের পেয়ে ক্যাশে বসে থাকা বুদ্ধিদীপ্ত, সৌম্য বৃদ্ধ, সম্ভবত মালিক, বলে উঠলেন, 'খেতে খারাপ লাগছে বুঝি?' আমরা রেগে 'হ্যাঁ: বলায় বললেন, 'সেকি, তা কি করে হবে? এ যে খাঁটি গোধূমচূর্ণ দিয়ে তৈরি—গোধূম মানে জানো তো খোকা?'—রেগে ঘুরিয়ে বললাম, 'গোধূম মানে জানব না কেন? গোধূম মানে একপাল গরু—গরুর ধূম যাকে বলে!'

—যুধাজিৎ দাশগুপ্ত, সাংবাদিক

(৮) ডেনিস লিলির সঙ্গে।

ম্যাচ চলছে—লিলি বল করছে—আমি লেগ আম্পায়ার—ওভার শেষ হতে লিলি স্কোয়ার লেগে ফিল্ডিং করতে এল—টোয়ের ওপর ভর দিয়ে বসে আমাকে বলল, তুমি কোন দেশের লোক? দু-চার কথার পর সন্ধেবেলা ডিনারে নেমন্তন্ন করল—সন্ধে হয়ে গেছে—আমি ওয়ার্ডরোভ ঘেঁটে একটাও ইভনিং-ড্রেস পেলাম না—ডিনারে যাওয়া হল না!

—অনুভা কর, সাংবাদিক

(৯) আলোর গোলোকে প্রবল বিস্ফোরণ!

প্রেয়ারহলের দরজা দিয়ে একটা বিশাল আলোর গোলক ভেতরে ঢুকল দুলতে দুলতে—গোলোকটা যেন তরল আগুন (লিকুইড ফায়ার) দিয়ে তৈরি—ওটা কোনও রিজিড বডি নয়—ওর গা থেকে মাঝেমধ্যে হাত পা বেরিয়ে আসছে অ্যামিবার মতো—একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল—অথচ কোনও আওয়াজ নেই, কোনও উত্তাপ নেই—আলোটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

—অভীক ভট্টাচার্য, সাংবাদিক

(১০) বাঁধ, দৈত্য আর কৃষ্ণচূড়া!

একটা অদ্ভুত জায়গা, সামনেই সমুদ্র, প্রচুর ঢেউ—ওপারে যেতে হবে—কোনও সাঁকো নেই—আমরা অনেকে মিলে বালির বস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে বাঁধ দিচ্ছি। একটুখানি বাঁধ তৈরি হতেই কালো

দৈত্যাকৃতি রোমশ, জান্তব চেহারার কিছু জীব সমুদ্র থেকে উঠে এল, ওরা জোর করে বাঁধ ভেঙে দিল—আমরা আবার নতুন করে বাঁধ তুলছি—ওরা ভাঙছে—এভাবে চলছে—আমরা ক্লান্ত, বিভ্রান্ত। কিছুতেই একটা বাঁধ গড়ে তুলতে পারছি না—সমুদ্রের মধ্যে সবাই দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছি পাশাপাশি—আস্তে আস্তে নিথর হয়ে আমরা এক এক জন এক একটা গাছ হয়ে গেলাম—এক একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ—দৈত্যরা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

—ডা. স্মরজিৎ জানা, এপিডেমিওলজিস্ট, কলকাতা।

এবার বিখ্যাত নন এমন কিছু মানুষের স্বপ্নকল্পনার জগতে চলে যাওয়া যাক। 'সাধারণত মেয়েরা পুরুষদের চাইতে একটু বেশি সংবেদনশীল'। অনেকে হয়তো এটা মেনে নেবেন না। তবে মেয়েদের অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা নিয়ে এমন ধারণার সঙ্গে অনেক কবি, চিত্রকর, গদ্যকার একমত। আমারও অভিজ্ঞতাও তাই। বিতর্কে না গিয়ে বরং সরাসরি চলে যাই কিছু স্বপ্নকল্পনার বর্ণনায়।

'দেখলাম হাঁটতে হাঁটতে আমি পৌঁছে গেছি এক অজানা অচেনা দেশে—সবাই একটা গাড়ির ওপর বসেছে, যেটা উড়তে উড়তে উঠে যাচ্ছে। আমি একটা গাড়ির ওপর চেপে বসতেই বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে শূন্যে উঠে গেলাম—সাদা-কালো রঙের পুঞ্জীভূত মেঘের ভিতর থেকে সবুজ রঙের একটা দৈত্য বেরিয়ে এল—আমাকে দেখে বিশাল হাঁ করে হাত দুটো বাড়িয়ে তেড়ে এল—আমি প্রাণপণে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই আমাকে বজ্রআঁটুনিতে কবজা করে নিল—হঠাৎ আমি ওই দৈত্যটার মতো বিরাট আকৃতির হয়ে গেলাম, নিমেষে—যুদ্ধ শুরু হল—দৈত্যটা লুকিয়ে পড়ল মেঘের আড়ালে'।

'আনন্দবাজারে'র টেলিফোন অপারেটার সুব্রত মহাপাত্রের স্বপ্ন। মানবপুত্র সুব্রত নিমেষে দৈত্যের আকার ধারণ করে বিশাল দৈত্যকে বাধ্য করেন মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করতে। বাস্তবে হাজারটা দৈত্যের সঙ্গে দিন-রাত অবিরাম অসম লড়াই চলে আজকের পৃথিবীর সাধারণ একজন মানুষের। একমাত্র স্বপ্নেই স্বপ্নকল্পনার জোরে জোরদার লড়াই করা যায় দৈত্যের সঙ্গে। হারিয়ে দেওয়া যায় দৈত্যকেও। মারাদোনার মতো বিশ্ববিখ্যাত ফুটবলার স্বপ্নেই আত্মজীবনী লিখতে বলতে পারেন কলকাতার সাংবাদিক শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে। পেলের সঙ্গে স্বপ্নের ফুটবল খেলতে পারেন পূর্ণেন্দু রায়। শুধু খেলা নয়, পেলের মতো খেলোয়াড়কে কাটিয়ে অবলীলায় দিয়ে দিতে পারেন স্বপ্নের গোল। শুভঙ্করের বা পূর্ণেন্দুর স্বপ্ন বাস্তবের চোখ দিয়ে দেখলে উদ্ভট। স্বপ্নকল্পনার অভিধানে যে উদ্ভট আর অসম্ভব বলে কোনও শব্দ নেই!

ব্যাপারটা হয়েছিল এরকম। মারাদোনা এসেছেন কলকাতায়। বাংলায় আত্মজীবনী লেখার জন্য ধরেছেন সাহিত্যিক মতি নন্দীকে। বয়েস আর ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে মতি নন্দী রাজি হলেন না। বললেন, 'ওটা বরং শুভঙ্কর লিখুক'। শুভঙ্করের এক ক্রীড়া সাংবাদিক বন্ধু আবার হঠাৎ করে শচীন তেণ্ডুলকারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ওঁকে। আশ্চর্য ব্যাপার, শচীনও আত্মজীবনী লেখার অনুরোধ জানালেন শুভঙ্করকেই। মারাদোনা না শচীন! দোটানায় পড়ে স্বপ্নকল্পনার জাল ছিঁড়ে যায় শুভঙ্করের।

বাবা, মা, ভাইয়ের সঙ্গে একটা প্লেনে চড়ে চলেছেন মহুয়া। আইনের ছাত্রী মহুয়া মজুমদার। প্লেনটা মাটি থেকে একটু ওপরে। প্লেনের নীচে, মাঠে খেলা করছে অনেক অনেক ছেলেমেয়ে। ওরা চিৎকার করছে, নেমে যাবার জন্য। বাচ্চাদের আবদার মেনে স্বপ্নের প্লেন থেকে সবাই নেমে আসেন মাটিতে। প্লেন থেকে নেমে মহুয়া মা বাবা ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে বসল প্লেনের ডানার ওপর। এত সুন্দর প্লেন থেকে মাটিতে পা রাখতে কারই বা ইচ্ছে করে!

বাস্তবের ট্রেন ছোটে রেললাইন ধরে। স্বপ্নের ট্রেন এত নিয়ম মানতে যাবে কেন? একুশ বছরের ছাত্রী মনীষা কর্মকারের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল স্বপ্নকল্পনার ট্রেনে চড়ে। রেললাইন ধরে না গিয়ে ট্রেন চলেছে প্ল্যাটফর্মের মাঝখান দিয়ে। ট্র্যাক ছেড়ে ছুটছে প্রচণ্ড গতিতে। আশপাশের লোকজন পাগলের মতো চিৎকার করছে। ছুটছে প্রাণ বাঁচাতে। ভ্রুক্ষেপ নেই ট্রেনচালকের। ট্রেন ছুটছে দুটো লাইনের মাঝখান দিয়ে। এঁকেবেঁকে। অনেকটা একধরনের অভিজ্ঞতা শিক্ষক রনজিত বিশ্বাসের। ওঁর

স্বপ্নের ট্রেন ছুটেছিল মাটির ওপর দিয়ে। সামনে মস্ত উঁচু এক ছাইগাদা। তাতে কি! স্বপ্নের ট্রেন চলে স্বপ্নের নিয়ম মেনে। রেললাইন ছেড়ে ছুটলেও লাইনচ্যুত হয় না স্বপ্নের ট্রেন। বাস্তবের এরকম ঘটনাই বরং স্বপ্নের চোখে উদ্ভট।

মৃত্যুচেতনা কাজ করে বড় হয়ে যাওয়া প্রত্যেকটা মানুষের ভেতর। 'পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের পর যে মানুষের মৃত্যুচেতনা থাকে না, সে অতি মূর্খ'। ডব্লু. এস. ইলিয়টের বিখ্যাত কথা। দুরন্ত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো ক-জন আর টানটান দাঁড়াতে পারেন মৃত্যুর উপত্যকার কিনারে। বলতে পারেন, 'যেতে পারি, যে কোনও দিকেই আমি চলে যেতে পারি'। তীব্র জীবনবোধ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কলমকে দিয়ে তারপর বলাতে পারে, 'কিন্তু কেন যাব?'। নিজের মৃত্যুটা ঠিক কিরকম, কত অদ্ভুত হতে পারে, তা বুঝে ওঠবার উপায় নেই বাস্তবের কোনও মানুষের। স্বপ্নের দেশে কল্পনার বুদ্বুদে মৃত্যুও হয়ে উঠতে পারে আশ্চর্যরকম রোমান্টিক।

গৃহবধূ মিঠু ভট্টাচার্যের অভিজ্ঞতার কথা বলি। বিশাল সমুদ্রের পাশে বিস্তীর্ণ বালুচরে বিষাক্ত একটা সাপ কামড়ায় মিঠুকে। অবশ্যই স্বপ্নে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন। বাবাকে জানান ঘটনাটা। বাবা জানিয়ে দেন, 'নিশ্চিত মৃত্যু, কিছু করবার নেই!' বাবার নিরুত্তাপ উত্তরে অবাক লাগে মিঠুর। ছোটেন মায়ের কাছে। মায়ের প্রতিক্রিয়া আরও মজার। বলেন, 'তাড়াতাড়ি দুটো ঘি-ভাত খেয়ে নে। বড় অসময়ে চলে যাচ্ছিস মা!' বড় আশ্চর্য লাগে মিঠুর। প্রিয়জনেরা কেমন অবলীলায় মেনে নিলেন তাঁর আসন্ন মৃত্যুকে! কি আর করেন। 'সাগ্রহে' মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে স্বপ্ন যায় ভেঙে।

ফরাসি স্বপ্নগবেষক ভাসহিদ্ (Vaschide N) স্বপ্নকল্পনার 'ননসেন্স' ভাব নিয়ে কিছু মূল্যবান কথাবার্তা বলেন প্যারিস থেকে প্রকাশিত (১৯১২) এক গবেষণাপত্রে। 'স্বপ্নকে প্রথমে উদ্ভট বলে মনে হতে পারে। স্বপ্নের ব্যাখ্যায় আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে উদ্ভট স্বপ্নের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ধারণা(Idea)-গুলোকে। এটা ঠিকভাবে করতে পারলে স্বপ্নের সব অসঙ্গতি, আর উলটো-পালটা ব্যাপার পুরোপুরি যুক্তিনির্ভর আর সঙ্গত একটা ধারণার বলে ভীষণভাবে অর্থবহ হয়ে দাঁড়ায়।'

প্রখ্যাত লেখক হ্যাভলক এলিস ১৮৯৯ সালে লেখেন স্বপ্নের ওপর বিখ্যাত এক বই। 'দ্য ওয়ার্লড অব ড্রিমস'। স্বপ্নকল্পনার জটিলতাকে এলিস সহজবোধ্য ধারণার বিমূর্ত রূপান্তর ভাবতেন। এলিসের এ সংক্রান্ত মন্তব্য পাঠককে গভীরভাবে ভাবায়। 'স্বপ্ন হল শতসহস্র আবেগ আর বেঠিক চিন্তার প্লাবন। এই ভাবনাচিন্তাগুলোকে গভীরভাবে লক্ষ করলে আমাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। আমরা খুঁজে পাই মানবমনের আদিমযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিবর্তনের সবকটা ধাপ।' ফ্রয়েড এই ব্যাপারটাকেই দেখতেন একটু অন্যভাবে। 'স্বপ্নবিশ্লেষণের কাজটা পুরোদস্তুর পুরাতাত্ত্বিকের কাজের মতো। মনকে খুঁড়তে খুঁড়তে লুকিয়ে থাকা অজানা তথ্যগুলোকে বার করে আনা'।

কোনও ধনীদেশের ছোড়া পরমাণুবোমার ঘায়ে ভারত প্রায় নিশ্চিহ্ন! বর্ধমান জেলার কুসুমগ্রামের মুদির দোকানি অক্ষয় সরকারের স্বপ্ন। সব মানুষ ছিন্নভিন্ন। বোমার দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, গাছপালা। শুকিয়ে যাচ্ছে নদী-খাল-বিল। স্বপ্নকল্পনা অতদূর না পৌঁছলেও মাঝেমাঝে ভারত আর পাকিস্তানের যুদ্ধ লাগিয়ে দেয় রেলকর্মী সুকুমার নায়েকের ঘুমন্ত চেতনায়। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ফাইটার প্লেন। অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ। অন্ধকার ধোঁয়াতে ঢেকে যায় স্বপ্নের আবহ। ধোঁয়ার আড়ালে লোকজনের ছোটাছুটি। দিশেহারা মানুষের আশ্রয়ের খোঁজে এলোপাথাড়ি দৌড়।

স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয় অনেকের। এরকম স্বপ্নের কথা বলব 'স্বপ্নে বিখ্যাত চরিত্র' অধ্যায়ে। অধ্যাপিকা মুনমুন চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্নে চলে আসেন রবীন্দ্রনাথ নন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। দুটো হাত বাড়িয়ে মুনমুনকে বলেন, 'আলো নেবে? আলো?' রাতে স্বয়ং উত্তমকুমার এসে হাজির হন তাপস ভট্টাচার্যর স্বপ্নে।

বক্তৃতা করছেন উত্তমকুমার। ক্ষোভপ্রকাশ করছেন তাঁকে যথাযথ আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে।

তীব্র ক্ষোভে বক্তৃতা শেষে অস্বীকার করলেন সামনের সারির আসেন বসতে। বসলেন পেছনের সারিতে ডাক্তারবাবুর পাশে। মেজাজ হয়ে গেল খোস। অনেকক্ষণ ধরে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে চলল হাসিঠাট্টা, গল্পতামাশা। এখানেই শেষ নয়। হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলেন অভিনেত্রী মাধবী চক্রবর্তী। যুবতী বয়সের মাধবী। পরনে জিনস আর গেঞ্জি, মাথায় রিবন! মিউজিক এর তালে তাল রেখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে বলরুম থেকে অদৃশ্য হলেন দ্রুতলয়ে। মাধবী চক্রবর্তী পরছেন জিনস আর গেঞ্জি! আর এদিকে শাড়ি পড়ে মার্কেটিং এ বেরোন নাট্যকর্মী ফটিক পুরকাইত। বারমুডার ওপর পাঞ্জাবি চাপিয়ে ট্রেনে চড়ে, তীর্থদর্শনে যান ছেষট্টি বছরের বৃদ্ধা মায়াবতী পালচৌধুরী! 'উলটপুরান' আর কাকে বলে!

বিজ্ঞান নির্ভর স্বপ্নকল্পনার এক ব্যতিক্রমী বিবরণ আমাকে জানান উত্তরপাড়ার এক গৃহবধূ। শর্বরী ঘোষাল। এই স্বপ্নের বিবরণ যে কোনও কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীর চাইতে কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়। শর্বরীর স্বপ্ন হুবহু তুলে দিচ্ছি—

'আমি একজন পুরুষ সায়েন্টিস্ট। দেশ থেকে কোনও একটা আন্তর্জাতিক সেমিনারে গেছি। নানা দেশের বাঘাবাঘা বৈজ্ঞানিকরা সেখানে হাজির। একটা নামি রেস্তোরাঁয় বসে সবাই খাচ্ছি। ছোটছোট টেবিলে চার জন, ছ-জন বসে। খাবার আর ড্রিঙ্কস সার্ভ করা হচ্ছে। ওই তরলে এমন কিছু মেশানো যা খেলে মানুষ অদৃশ্য (ইনভিসিবল) হয়ে যায়—আমরা, বৈজ্ঞানিকরা অদৃশ্য হয়ে গেলাম। বুঝলাম, এটা কোনও আন্তর্জাতিক মাফিয়াচক্রের কারসাজি, সেমিনারটার আয়োজন করেছে ওরাই। সারা পৃথিবীর তাবড় তাবড় সায়েন্টিস্টকে এই কায়দায় কিডন্যাপ করে, তাঁদের দিয়ে ধ্বংসাত্মক নানা কাজ করিয়ে নেবে।'

'আমার মনে হল একজন এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন, আমার নোবেলজয়ী এক বন্ধু। কীভাবে খুঁজব ওকে? খেয়াল হল, আমার হাতের তালু যতটা চওড়া তিনি ততটাই চওড়া! যে লোক চওড়ায় আমার হাতের তালুর মাপের হবেন তিনিই সেই বৈজ্ঞানিক। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলাম, কেউ দেখতেই পেল না আমাকে। একটা বাচ্চাদের স্কুল—টিফিন শেষ হওয়ায় সবাই হুড়োহুড়ি করে ক্লাসে যাচ্ছে। আমি ওঁদের এড়িয়ে হাঁটবার চেষ্টা করলেও বারবার ধাক্কা খাচ্ছি। ওরা যে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না—গায়ের ওপর চলে আসছে...'

কল্পনার ডানায় ভর করে আপনার আমার জীবনে গড়ে ওঠে কত রোম্যান্টিক মুহূর্ত। স্বপ্নের রোম্যান্টিকতা যেন স্বপ্নকল্পনার দক্ষ আর দ্রুত হাতে উলবোনা। উলুবেড়িয়ার দেবব্রত চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্র। তখন কিশোর বয়স। একরাতে ঘোড়ায় চড়ে দেবব্রত চলে যায় এক অচিন গাঁয়ে। একটা বিশাল সরোবরে জলকেলি করছে একদল রাজহাঁস। একসময় এলেন এক সাধু। কি একটা মন্ত্র পড়লেন। আর রাজহাঁসগুলো হয়ে উঠল সুন্দরী পঞ্চদশী। উঠে এল ডাঙায়। কিশোরের ঘোড়াটা যেন কোথায় চলে গেছে। অপেক্ষা করে বসে আছে কিশোর। এমন সময় সেই সুন্দরী কিশোরীদের নেত্রী এল। কিশোরের হাত ধরে আহ্বান জানাল ওদের সঙ্গে যাবার জন্য।

এরকম আরও অনেক স্বপ্ন আছে আমার ঝুলিতে। কিছু স্বপ্ন হার মানায় রূপকথার কাহিনীকেও। ফ্রয়েডের কথা "স্বপ্ন" শুধুমাত্র বিবৃতি নয়, কল্পনার সৃজনশীল ক্ষমতা (Productive Dreams) ও মাঝেমধ্যে ধরা পড়ে যায় "স্বপ্নে"। দেবব্রতর স্বপ্ন যেমন। স্বপ্নকল্পনার জাদুতে তৈরি এক রূপকথা।

আঠারো বছরের এক যুবক একবার স্বপ্নে অনেকক্ষণ ধরে প্রেমালাপ করেন এক যুবতীর সঙ্গে। বাস্তবের মাঠে নয়, নদীর ঘাটে নয়, নয় কোনও নির্জন বাগানের নিভৃতকোণে। বাস্তবের প্রেমের রোমান্টিকতা ছাপিয়ে যুবক যুবতীর স্বপ্নের প্রেমালাপ চলে জলে ভাসতে থাকা একটা পদ্মপাতার ওপর বসে!

দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ২৮ বছরের স্বপ্না আচার্য তাঁর একটা বিচিত্র স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। এই স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শকের স্বপ্নকল্পনার গতি সত্যিই 'আজগুবি তাল বেঠিক বেতাল'। স্বপ্নে স্বপ্না চলে গেছেন আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে। সেখানে তিনি বন্য উপজাতিদের রানি। পরনে তার সবুজ পাতার তৈরি পোশাক। মাথায় পাতা, ফুল আর পাখির পালকের তৈরি মুকুট। গলায় কানে, হাতে, রঙিন

ফুলের গয়না। জংলি উপজাতির লোকেরা নতজানু হয়ে বসে আছে তাঁর কাছে। ওরা ঘাসের তৈরি কুঁড়েঘর তৈরি করে দিয়েছে রানির জন্য। নানা ধরনের হাজারটা ফল এনে রেখেছে তাঁর খাবার জন্য। সারাদিন রানি প্রজাদের অভাব অভিযোগ শোনেন। শাসন করেন। স্নান করেন বিখ্যাত আমাজন নদে। উপজাতি যোদ্ধাদের মধ্যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা হয়। পাশেই নদির জলে হাঁ করে থাকে রক্তলোলুপ নানা জলজ প্রাণী। হেরে যাওয়া যোদ্ধাদের স্থান হয় ওদের পেটে। রাতে মশালের আলোয় বসে নাচের আসর। বিশাল কাঠের ঢাক বাজতে থাকে। আর বাজনার তালে তালে উদ্দাম নৃত্যে মেতে ওঠে আদিবাসী নারীপুরুষ।

বত্রিশের যুবক প্রবাল বিশ্বাসের নেশা ওর দুচাকার মোটরবাইক। একরাতে স্বপ্ন দেখলেন, বাইকটা পরিষ্কার করছেন। যেমন প্রত্যেক রবিবার সকালে করেন। হঠাৎ ঘটে গেল তাজ্জব একটা ঘটনা। বাইকটা এক পলকে হয়ে গেল ঘোড়া। বাইকের পেছন থেকে বেরিয়ে এল ঘোড়ার লেজ। ঘোড়াটা খুব আদর করল প্রবালকে। ঘোড়ার দৌড়বার ক্ষমতা আর প্রচণ্ডবেগে বাইক চালাতে অভ্যস্ত স্বপ্নদ্রষ্টার কথা মাথায় রাখলে এই স্বপ্নের মধ্যে পাঠক ইচ্ছাপূরণের অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন সহজেই।

স্বপ্নের কল্পনা দুরন্ত, চঞ্চল, বেহিসেবি। বাস্তব জগৎ থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে নেয় স্বপ্নের পৃথিবী। সেই উপাদান, ধরা যাক, ইট, বালি, সিমেন্ট, পাথর। এসব উপাদান দিয়ে স্বপ্নে তৈরি হয় বিচিত্র ধরনের, উদ্ভট আকৃতির ঘরবাড়ি, অট্টালিকা। বাস্তব পৃথিবীর কোনও দক্ষ স্থপতির কল্পনার নকশায় এরকম বাড়ি তৈরি অসম্ভব। কেন না, একজন স্থপতিকে বাড়ি তৈরি করবার সময় মাথায় রাখতে হয় হাজারটা ব্যাপার। বাড়ির নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, স্তম্ভের ভার বইবার ক্ষমতা, আলো বাতাস—আরও কত কি। স্বপ্নে ওই একই মালমশলা দিয়ে তৈরি হয় স্বপ্নের ঘরবাড়ি। যে নির্মাণ কোনও নিয়মের, কোনও যুক্তির ধার ধারে না। স্বপ্নের বাড়ির একশো ষাট তলায় এক মুহূর্তে আপনি উঠে যেতে পারেন এতটুকু কষ্ট না করে। লিফটে নয়, সিঁড়ি দিয়ে নয়। গ্লাইড করে বা নীচ থেকে লাফিয়ে। ব্যলকনি থেকে বা ছাদ থেকে এক লাফে চলে যেতে পারেন নীচের রাস্তায়।

শুধু কি তাই! স্বপ্নকল্পনায় সময় আর দূরত্ব যোগযোগের পথে সমস্যা তৈরি করতে পারে না এতটুকু। বেড়াতে গিয়ে হয়তো দিল্লির কোনও হোটেলে উঠেছেন। দু পা হাঁটলেই আপনার কলকাতার বাড়ি। বীরভূমের জনুবাজার থেকে একটা মজার স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন শিক্ষক শুভ্রাংশু রায়। শুভ্রাংশুর দাদা থাকেন শান্তিনিকেতনে। আর মা ১৮ মাইল দূরে জনুবাজারে। এক রাতে ওঁর দাদা মাকে ডাকলেন। আঠারো মাইল দূর থেকে মায়ের জবাব 'দাঁড়া! একটু অপেক্ষা কর। ডালটা হয়ে এসেছে। ভাত চাপিয়ে যাচ্ছি।' কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শুভ্রাংশুর মা চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। জনুবাজার থেকে শুভ্রাংশুও। ফেরার পথে আর এক কাণ্ড! বাসস্ট্যান্ডে অনেকক্ষণ বাস নেই। ওঁর দাদা একটা সাইকেলকে টেনে দুটুকরো করে দিলেন। একটা চাকায় শুভ্রাংশু চললেন জনুবাজার। অন্য চাকায় ওর দাদা ফিরলেন বাড়ি।

স্বপ্নের যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটাই উন্নত। আধুনিকতম টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাও এর কাছে হার মানবে। স্বপ্নের সমস্যা বাস্তবের মতোই। বাস্তবে সমস্যা মেটানো বড় ঝঞ্ঝাটের, কষ্টের। স্বপ্নের সমস্যা মুহূর্তে মিটে যায় কল্পনার জোরে। কৃষ্ণনগরের বিধান বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা শুনুন। রাস্তার বাঁকের কাছে একটা ল্যাম্পপোস্ট। একদিন ওই জায়গায় কেউ একটা তাড়া করল বিধানকে। বেদম দৌড়েও ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে পারছেন না। বাস্তবে এরকম হলে অনুসরণকারীর হাতে ধরা পড়ে যেতেন ভদ্রলোক। স্বপ্নে এরকম মানুষের হাত থেকে পার পাওয়া যায় সহজেই। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেলেন বিধান। অনুসরণকারী নীচে, বিধান অনেক ওপরে। অনেকটা একভাবে একবার বেঁচে যান ছত্রিশ বছরের প্রসূন মুখার্জি। তাড়া করে আসা একদল লোকের হাত থেকে বাঁচতে প্রসূন শুরু করে দিলেন উড়তে। লোকগুলো ওপরদিকে তাকিয়ে তাড়া করছে প্রসূনকে। ধরতে পারছে না।

স্বপ্নের কল্পনার গতি বড় বিচিত্র। বাড়িতে ওর ঘরে শুয়ে ছিল যুবক আকবারুল হাসান। ঘরে 'ভূতের মতো কিছু একটা' এসে ঢুকল। ওকে বলল উঠে দাঁড়াতে। তারপর উড়তে। ঘরে চড়াইপাখির মতো

উড়তে শুরু করল আকবারুল। এক সময় ওর মাথাটা লেগে গেল ছাতে। আর উঠবে কি করে? স্বপ্নের সমাধান চটজলদি। ছাদশুদ্ধ গোটা বাড়িটাই উড়তে শুরু করল ওপরের দিকে। উড়তে উড়তে আরও ওপরে। এটা সমাধানের স্বপ্ন। অনেকটা এরকম অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানান পুরুলিয়ার এক গ্রামের যুবক।

বাস্তবের হুবহু অনুকরণে বিশ্বাসী নয় স্বপ্নের কল্পনা। এ পর্যন্ত আলোচনায় তা পরিষ্কার হয়েছে আশা করি। পনেরো বছরের স্কুলছাত্র অভিজিৎ দে-র দুটো সৃজনশীল স্বপ্নের নমুনা শোনাই। অভিজিৎ একরাতে স্বপ্ন দেখেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওকে পড়াচ্ছেন। পড়ানো শেষ হল। এবার ঈশ্বরচন্দ্র অভিজিৎকে শেখালেন, কি করে 'পাইপ' টানতে হয়! আর একরাতে ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল হেলিকপ্টারে চড়ে। চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দেখে, নীচের প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছে প্রকাণ্ড সাইজের ডাইনোসরেরা।

স্বপ্নকল্পনার অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানাকে ফরাসি স্বপ্নগবেষক জে. আর. এল. ডেলবিফ ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দরভাবে। 'স্বপ্নে বুদ্ধি, স্মৃতি, কল্পনা—সবই জেগে থাকা অবস্থার মতো সজাগ। তফাৎটা হল, মনের এসব বিশেষ ক্ষমতা জুড়ে যায় পুরোপুরি কাল্পনিক আর ক্ষণভঙ্গুর কিছু বস্তুর সঙ্গে।' ডেলবিফ লিখছেন, 'প্রত্যেক স্বপ্নদ্রষ্টা আসলে একজন অভিনেতা। যিনি স্বেচ্ছায় কখনও সাজেন পাগল, কখনও দার্শনিক। অভিনয় করেন ঘাতক বা শিকারি, দৈত্য বা বামন, শয়তান বা দেবদূতের ভূমিকায়'। আর এক ফরাসি মনোবিদ এল. এফ. এ. ম্যরি (Maury) স্বপ্নকল্পনার উদ্ভট গঠনকে দেখেছেন অন্য চোখে। 'জেগে থাকা মানুষের মননশীল চিন্তাভাবনায় যে ভারসাম্য, স্বপ্নে তা যায় হারিয়ে। অনেক স্বপ্নই তাই আপাতচোখে আজগুবি'।

এই অধ্যায় শেষ করব রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকল্পনার এক আশ্চর্য বিবরণ দিয়ে। এই স্বপ্নকল্পনা চলে আসে 'সহজ-পাঠ' এর দ্বিতীয় খণ্ডের বিখ্যাত এক স্বপ্নকবিতায়। স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

'চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি বরগা কড়িতে
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে'

শহরের ইটেগড়া বাড়িগুলো যেন গণ্ডার হয়ে এগোচ্চে। দুদ্দাড় করে এগিয়ে চলেছে বাড়ির দরজা জানালাগুলো।

'রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ্ ধাপ্
দোকান বাজার সব উঠে আর নামে
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে।'

মস্ত বিছের আকার নিয়ে এগোচ্ছে হাওড়া ব্রিজ। পেছন পেছন চলছে হ্যারিসন রোড।

'মনুমেন্টের দোল যেন ক্ষ্যাপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি
আমাদের ইস্কুল ছোটে হনহন;
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।'

দেয়ালে ছটফট করছে স্কুলের ম্যাপগুলো। একটানা ঢঙ ঢঙ করে বেজে চলেছে স্কুলের ঘণ্টা। লক্ষ লক্ষ শহরবাসী চিৎকার করছে। বলছে 'থামো থামো, কোথা হতে কোথা যাবে একি পাগলামো।' নৃত্যের নেশায়, চলার খেয়ালে কলকাতা কান দেয় না শহরবাসীর কথায়। কবি ভাবছেন, এতে চিন্তার কি আছে! না হয় কলকাতা সোজা চলে যাবে বোম্বাই!

'দিল্লী লাহোরে যাক, যাক না আগ্রা
মাথায় পাগড়ি দেব, পায়েতে নাগরা'

না হয় কলকাতা চলে যাবে ইংল্যান্ড। বুট হ্যাট কোটে ইংরেজ সাজবে। এ সব ভাবতে কীসের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের। অপার বিস্ময়ে দেখেন, 'কলকাতা আছে কলকাতাতেই।'

স্বপ্নের উদ্দীপনা আর উৎস

স্বপ্নের উদ্দীপনা আসে কোথা থেকে? এ নিয়ে সাধারণের মধ্যে নানারকম কথা চালু আছে। রাত্রে উদ্ভট স্বপ্ন দেখলে আর স্বপ্নদ্রষ্টা তা বাড়ির বয়স্ক মানুষকে বললে একটা চটজলদি সমাধান বয়স্করা প্রায়ই করে দেন। বলেন, 'পেটগরম হয়েছিল, তাই ওরকম স্বপ্ন দেখেছ! এ নিয়ে ভাবতে হবে না।' অনেকে বলেন, উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় বুকে চাপ পড়ায় মানুষ ভয়ের স্বপ্ন দেখে। ঘুমের ভেতর পা দুটো একটু সরে গেলে পড়ে যাবার স্বপ্ন আসতে পারে—এটাও খুব জনপ্রিয় ধারণা। তার চাইতে জনপ্রিয় ধারণা হল, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে মানুষের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে।

এ সব জনপ্রিয় ধারণাগুলো ঠিক বা ভুল যাই হোক, এর ভেতর একটা সত্যি লুকিয়ে আছে। তা হল, নানা ধরনের শারীরিক উদ্দীপনা ঘটলে ঘুমের মধ্যে মানুষ স্বপ্ন দেখতে পারে। আমরা যখন ঘুমোই, তখন আমাদের চেতনার সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। 'ঘুমের মধ্যেও মানুষের আত্মা বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত থাকে।' চোখে জোরালো আলো পড়লে বা কানে তীব্র আওয়াজ ঢুকলে অনেকসময় ঘুম ভেঙে যায়। একই ব্যাপার ঘটে বেশি গরম পড়লে বা ঘুমন্ত অবস্থায় শরীরে কোনও ব্যথা পেলে। খাট থেকে পড়ে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেছে এরকম অভিজ্ঞতা তো অনেকেরই আছে!

এ সব তথ্য থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার। তা হল, ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের চোখ, নাক, কান, ত্বক বা শরীরের বাইরের আর ভিতরের উদ্দীপনাগুলোর সঙ্গে ঘুমন্ত চেতনার কিছুমাত্রায় হলেও যোগাযোগ থেকে যায়। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। আর এর ওপর ভিত্তি করে শরীরে আসা বাইরের কোনও উদ্দীপনা থেকেই স্বপ্ন তৈরি হয়, এরকম ধারণা প্রথম তৈরি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে। পরবর্তীকালে বহু শারীরবিদ ও গবেষক নানা ধরনের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে স্বপ্নের উৎস পুরোপুরি শারীরবৃত্তীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রয়েড স্বপ্ন নিয়ে তার দীর্ঘকালের মৌলিক গবেষণার শেষে স্বপ্নের উৎস নিয়ে চালু এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তাঁর মনে হয়, স্বপ্নের উৎস বা উদ্দীপনা পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই মানসিক।

১৭৫৮ সালে জি. এফ. মিয়্যার তাঁর দেখা একটা স্বপ্নের কথা তাঁর প্রবন্ধে লেখেন। এক রাতে মিয়্যার একটা দুঃস্বপ্ন দেখেন। কিছু লোক যেন তাঁকে মাটিতে চিত করে শুইয়ে চেপে ধরে আছে। আর এক জন তাঁর একটা পায়ের বুড়ো আঙুল আর পরের আঙুলের ফাঁকে মাটিতে মস্ত একটা গজাল পুঁতছে। ভয়ে জেগে উঠে মিয়্যার দেখেন, তাঁর পায়ের ওই দুটো আঙুলের ফাঁকে একটুকরো খড় আটকে আছে। বহুবছর বাদে (১৭৮৪) গবেষক জে. সি. হেনিংস, মিয়্যারের দেখা এরকম আর একটা স্বপ্নের কথা লেখেন। গলায় শার্টের কলারের চাপ পড়ায় মিয়্যার স্বপ্ন দেখেন, তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। হ্যফব্যুয়র (১৭৯৬) এক রাতে অনেক উঁচু একটা দেয়াল থেকে পড়ে যাবার স্বপ্ন দেখে ভয়ে জেগে যান। দেখেন, তিনি সতিসত্যিই মাটিতে পড়ে আছেন। এই ধরনের স্বপ্নের কথা আমাকে জানান প্রায় কুড়ি জন স্বপ্নের দর্শক। ওপর থেকে পড়ে যাবার স্বপ্নে এঁদের মধ্যে বেশির ভাগ নিজেদের আবিষ্কার করছেন মেঝেতে। কেউ বা বিছানার চাদর আঁকড়ে ধরে শরীরের অর্ধেক বা তারও বেশি খাটের বাইরে ঝুলছে—এই অবস্থায় জেগে গেছেন।

ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় চোখ, নাক, কান বা ত্বকে নানা ধরনের উদ্দীপনা কীভাবে স্বপ্ন তৈরি করে তা নিয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ চালান ফ্রয়েডের আগেকার বেশ কয়েকজন স্বপ্নগবেষক। জার্মান গবেষক পি. জ্যেসেন স্বপ্নের ওপর ঘুমন্ত চেতনায় বাইরের উদ্দীপনার প্রভাব লক্ষ করেন বহু বছর ধরে। তাঁর

পর্যবেক্ষণ আর সিদ্ধান্ত কী ছিল বলি। ঘুমন্ত অবস্থায় যে কোনওরকম শব্দ মানুষের মনে স্বপ্নর জন্ম দেয়। হঠাৎ বাজের শব্দে এক জন স্বপ্ন দেখতে পারেন, তিনি যেন যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন। আর বোমাবর্ষণ হচ্ছে। মুরগির ডাক শুনে আসতে পারে আতঙ্কের স্বপ্ন। যেখানে স্বপ্নদ্রষ্টার গলা দিয়ে ভয় পেয়ে কান্নার অস্ফুট আওয়াজ আসতে থাকে। দরজা খোলা বা বন্ধের আওয়াজে এক জন মানুষ দেখতে পারেন সিঁধেল চোরের চুরির স্বপ্ন।

জ্যেসেন ও সমসাময়িক আরও কয়েকজন গবেষকের স্বপ্নের উৎস নিয়ে আরও কিছু সিদ্ধান্তের কথা বলা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। এঁরা বলতেন, কোনও ঘুমন্ত মানুষ শীতের রাতে ঘুমের মধ্যে গায়ের চাদর সরে গেলে দেখতে পারেন বিবস্ত্র হয়ে বা কম জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন। ঘুমন্ত মানুষের পা খাটের একেবারে কিনারে চলে গেলে, তিনি হয়তো স্বপ্নে নিজেকে দেখতে পাবেন ভয়ঙ্কর এক খাদের কিনারায় খাড়া পাহাড়ের এক বিপজ্জনকে কোণায়। ঘুমোতে ঘুমোতে বালিশ মাথার ওপরে চলে গেলে আসতে পারে বিশাল পাথরের নীচে চাপা পড়ে যাবার ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। কেউ স্বপ্ন দেখতে পারেন আহত হবার বা বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকবার, যদি তাঁর শরীরে কোথাও বেশি ব্যথা থাকে। বীর্য জমে যাবার জন্য দেখা দিতে পারে যৌনস্বপ্ন (Lascivious Dreams)।

আজ থেকে একশো বছর আগে ফরাসি মনোবিদ এল. এফ. এ. ম্যরি স্বপ্নের উৎস নিয়ে নিজের ওপর কিছু মজার পরীক্ষা চালান। ঘুমন্ত অবস্থায় শরীরে নানা ধরনের উদ্দীপনার ব্যবস্থা করে ম্যরি ঘুমিয়ে কী স্বপ্ন দেখলেন তা ঘুম ভেঙে দ্রুত লিখে ফেলতেন। নাকে আর ঠোঁটে একটা পালকের আলতো ছোঁয়া দিতে থাকায় ম্যরি দেখলেন বীভৎস এক অত্যাচারের স্বপ্ন। তার মুখে পিচমাখানো মুখোশ পরিয়ে তা তুলে নেওয়ায় মুখের সব চামড়া উঠে আসছে। নাকে ও'ডি কোলোনের গন্ধ দেওয়ায় স্বপ্নদ্রষ্টা দেখলেন তিনি মিশরের কায়রো শহরের বিখ্যাত এক সুগন্ধির দোকানে রয়েছেন। কপালে একফোঁটা জল ফেলায় ম্যরি দেখলেন, তিনি ইতালিতে। প্রচণ্ড গরমে ঘামতে ঘামতে বিশেষ একধরনের ঠাণ্ডা 'ওয়াইন' খাচ্ছেন। একটা গরম ইস্ত্রি গালের কাছে রাখায় স্বপ্নে ম্যরি ফরাসি বিপ্লবের সময়কার ফ্রান্সে ফিরে যান। একদল ডাকাত (ফরাসি বিপ্লবের সময় 'শ্যেফারস' নামে পরিচিত এই দলের নৃশংস অত্যাচার ওদেশে কুখ্যাত হয়ে আছে) বাড়িতে ঢুকে তাঁর পা জ্বলন্ত কয়লার ওপর চেপে ধরে সব কিছু নিয়ে যাচ্ছে।

অসুস্থ অবস্থায় ম্যরির দেখা আর একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্নের বিবরণ ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনাবলীতে। ম্যরি দেখছেন, তিনি রয়েছেন দেশের সন্ত্রাসের দিনগুলোতে। একের পর এক হত্যাকাণ্ড দেখতে দেখতে বিধ্বস্ত ম্যরিকে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হল ফরাসি ট্রাইবুনালে। বিচারে মৃত্যুদণ্ড হল তাঁর। দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল বধ্যভূমির দিকে। সেখানে হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছে ম্যরির শাস্তি দেখবার জন্য। সিঁড়ি দিয়ে ঘাতক তাঁকে তুলে নিয়ে যায় মৃত্যুদণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে। গিলোটিনের ব্লেড নেমে গেল ম্যরির গলায়। শরীর থেকে মাথা আলাদা অবস্থায় প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙে যায় স্বপ্নদ্রষ্টার। দেখেন, বিছানা থেকে তার ঘাড় বাইরে ঝুলছে। গিলোটিনের ব্লেড নেমে আসবার পর শরীর থেকে যেভাবে ঝোলে গলা।

বিছানা থেকে ঘাড় বাইরে ঝুলে যাওয়ার উদ্দীপনা থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। এরকম ঘটনা ঘটা থেকে স্বপ্নদ্রষ্টার ঘুম ভাঙার মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব কম হওয়া স্বাভাবিক। এত অল্প সময়ে স্বপ্নে কীভাবে এত দীর্ঘ স্বপ্নদৃশ্য তৈরি হয় তা শুধু তখনকার স্বপ্নগবেষকদের নয়, স্বয়ং ফ্রয়েডকেও বিস্মিত করেছিল। স্বপ্নের ঘটনাগুলো ঘটে যায় সিনেমার চাইতে অনেক বেশি দ্রুতলয়ে। এ ব্যাপারে আমি ঘড়ির অ্যালার্ম সংক্রান্ত আমার একটা স্বপ্নের কথা বলব।

একদিন সকালে ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে আমি ঘড়ির মাথার ওপরকার বাটন টিপি আওয়াজটা বন্ধ করবার জন্য। বোতাম টেপার পরও ঘড়ির বিপ বিপ আওয়াজ বাজতে থাকে একটানা। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে ঘড়িটাকে খুলে সব কলকবজা বার করে ফেলি। একটা ধাতব প্লেট থেকে তখনও আওয়াজ বার হচ্ছে। আওয়াজ বন্ধ করার চেষ্টা করেও কোনও কাজ হয় না। তখন ওই প্লেটটাকে নিয়ে ছুটলাম ইলেকট্রনিক্সের কাজ জানা এক মিস্ত্রির কাছে। সে তখন একটা প্রাইভেট বাসে কনডাকটারি করছে। বাসের মধ্যেই তাকে বারবার অনুরোধ করলাম ওটা ঠিক করে দিতে। সে বাসের ট্রিপ শেষ

করে ওটা করবে বলায় অগত্যা বাস থেকে নেমে বাড়ি চলে আসি। এবার আমার খুদে বৈজ্ঞানিক পুত্র ওই প্লেটটার ওপর তার কেরামতি চালাতে থাকে। তাতেও অ্যালার্মের আওয়াজ বন্ধ না হওয়ায় আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি বুঝতে পারলাম, ঘড়ির বোতাম আমি টিপেছি স্বপ্নে। আর অ্যালার্ম বাজতে শুরু করা আর আমার ঘুম ভাঙবার মধ্যে মাত্র মিনিট দুয়েক সময় কেটেছে। এত অল্প সময়ে কত কাণ্ডই না ঘটে গেছে স্বপ্নে।

কোচবিহার থেকে শিক্ষিকা সুচিস্মিতা সান্যাল তাঁর একটা স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। একরাতে স্বপ্নে মহিলা দেখেন, চোর এসে ঘরের জানলার রডে লাঠি দিয়ে ট্যাং-ট্যাং আওয়াজ করছে। তারপর জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশের টর্চটা তুলে নিতেই সুচিস্মিতা ভয়ে চিৎকার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। প্রথমদিকে গলায় আওয়াজ বার না হলেও পরে নিজেরই 'চোরচোর' আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় স্বপ্নদ্রষ্টার। ঘুম ভেঙে শুনতে পান, রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে পাহারাদার লাঠি দিয়ে ট্যাং-ট্যাং আওজার করছে। আর ওই আওয়াজই তার স্বপ্নে চলে এসেছে চোরের রড পেটানোর আওয়াজ হয়ে।

আলোচনার এই পর্যায়ে বাইরের কোনও উদ্দীপনা (Stimulus) কেন স্বপ্নে জেগে থাকা অবস্থার মতো সঠিক অর্থ না বুঝতে পেরে একধরনের বিভ্রম তৈরি করে, এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। জেগে থাকা মানুষের মগজ যে কোনও বাইরের উদ্দীপনাকে ঠিকঠিক চিনতে পারে তার পদ্ধতিটা জানা যাক। বাইরের কোনো উদ্দীপনা মাথায় গিয়ে স্মৃতিতে থাকা হাজারটা উদ্দীপনার ভেতর থেকে নির্দিষ্ট এই উদ্দীপনার অর্থটাকে খুঁজে বার করে এখনকার উদ্দীপনাকে বুঝে নেয়। এর জন্য উদ্দীপক যথেষ্ট জোরালো হওয়া দরকার। দরকার স্মৃতি হাতড়ে তার অর্থ বার করবার সময়। ঘুমন্ত চেতনার কাছে বাইরের উদ্দীপনা সবসময় ততটা জোরালো হয় না। বা ঠিক মানে বুঝবার মতো যথেষ্ট সময় পায় না। তাই বাইরের উদ্দীপনা ঘুমন্ত অবস্থায় নানা বিভ্রম তৈরি করে। আর এগুলো স্বপ্নে চলে আসে।

এই বিভ্রমের সঙ্গে বাস্তবের ফারাক বোঝাতে ফ্রয়েড সুন্দর একটা উপমা ব্যবহার করতেন। 'কোনও এক দূরদেশে' ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দূরে কোনও একটা বস্তুর আভাস দেখতে পেলেন একজন। মনে হল যেন অনেক দূরে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু এগোলে মনে হল আসলে ওটা ঘোড়া নয়, একটা গরু বসে আছে। একেবারে সামনে গেলে বোঝা গেল, গরু বা ঘোড়া কোনওটাই নয়, আসলে এক দল মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এই উপমার গরু আর ঘোড়া হল স্বপ্নের বিভ্রম। আর দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো বাস্তব।

ঘুম আসবার ঠিক আগে অদ্ভুত এক ধরনের বদলাতে থাকা ছবি দ্রুত মনে ভাসতে থাকতে থাকে কিছু মানুষের। আপনি হয়তো খুব খুদে অক্ষরে ছাপা পুজোসংখ্যা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেলেন। দেখলেন, অনেক দূরে একটা কাগজে অস্পষ্ট কিছু শব্দের ছবি। ১৮৯২ সালে মনোবিদ জি. স্টুমবেল ল্যাড্ এ ব্যাপারটা নিয়ে কিছু পরীক্ষা চালান। এসব পরীক্ষায় ঘুমন্ত চেতনায় চোখের ভেতরকার রেটিনার উত্তেজনা কীভাবে ছবি হয়ে স্বপ্নে চলে আসতে পারে সে সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে ল্যাড্ দেখলেন অদ্ভুত একটা ছবি। 'বইয়ের পরিষ্কার অক্ষরগুলো আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে এল। তারপর দেখলাম যেন একটা ডিম্বাকৃতি ছিদ্রের ভেতর দিয়ে অনেক দূরে একটা কাগজের কিছু লেখা আমি অনেক কষ্টে দেখতে পাচ্ছি। চেষ্টা করেও অস্পষ্ট অক্ষরগুলো ঠিক ধরা যাচ্ছে না।'

আধোঘুমন্ত চেতনায় চোখের ভেতরকার রেটিনায় উত্তেজনা এরকম যে অবিরত বদলে যাওয়া ছবিগুলোকে স্বপ্নের ভেতর নিয়ে আসে তা কিছু সৃজনশীল মানুষকে তাঁদের সৃজনশীলতায় সাহায্য করতে পারে। গবেষক জোহানস্ ম্যুলার ঘুমের ঠিক আগে এই ছবি দেখার ব্যাপারটাকে 'কল্পনার চিত্রায়ন' (Imaginative Visual Phenomenon) বলতেন। ঘুমের সময় চোখ বন্ধ থাকায় দৃষ্টির ক্ষেত্র (Feild of Vision) অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই অন্ধকার জায়গায় 'দৃশ্যমান ধূলিকণা' (Luminous Dusts) যে উত্তেজনা তৈরি করে তা স্বপ্নে নির্দিষ্ট অবয়ব নিয়ে কয়েকশো বা হাজার একই বস্তুতে রূপ নিয়ে পারে। হয়তো আপনি দেখলেন কয়েকশো টিয়া পাখি উঠে যাচ্ছে। অথবা গাঁদা ফুলের বাগানে হাজার হাজার ফুটে থাকা ফুলের ওপর উড়ে যাচ্ছে কয়েকশো এক ধরনের প্রজাপতি।

স্বপ্নে অনেক সময় যে আমরা অনেকগুলো একই বস্তু দেখতে পাই, তা হয় এই দৃশ্যমান কণাগুলো দিয়ে রেটিনার ভেতরকার উত্তেজনার জন্য। পাঠক খেয়াল করবেন, স্বপ্নে প্রায়ই অনেক মানুষের ভিড়, অনেক প্রজাপতি, অনেক পাখি দেখা যায়। আর এই 'অনেক' বস্তুর বা ব্যক্তির মধ্যে একটা মোটামুটি মিল থাকে। স্বপ্নে রেটিনার উত্তেজনার এই ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বপ্নের বেশিরভাগই যে ছবি।

এবার আসা যাক শরীরের ভেতরকার উদ্দীপনাগুলো কীভাবে স্বপ্নের উৎস হয়ে উঠতে পারে সেই আলোচনায়। জেগে থাকা অবস্থায় হাজারটা বাইরের উদ্দীপনার প্রভাবে ভেতরকার উদ্দীপনাগুলো তেমন একটা গুরুত্ব পায় না আপনার মনে। ঘুমিয়ে পড়লে শরীরের ভেতরকার কোনও কষ্টকর উত্তেজনা ঘুমন্ত চেতনায় দাগ কাটতে পারে গভীরভাবে। ঠিক যেভাবে দিনে হাজারটা শব্দের ভিড়ে না শুনতে পাওয়া সামান্য আওয়াজও গভীর রাতে স্পষ্ট শোনা যায়। আর এই উত্তেজনা নানা ধরনের ছবি হয়ে চলে আসতে পারে এক জন মানুষের স্বপ্নে। শরীরের কোনও অসুখ বাইরে আসবার আগেই চলে আসতে পারে স্বপ্নে, একটু অন্যভাবে। একজন বয়স্ক মানুষ হয়তো ঘন ঘন দুঃস্বপ্নের শিকার হচ্ছেন ঘুমের মধ্যে। কিছু দিন বাদে দেখা গেল, তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন।

শরীরের ভেতরকার অসুবিধা বুঝে ওঠবার আগেই স্বপ্নে চলে আসবার এই ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন ফ্রয়েডের আগেকার কিছু মনোবিদ আর স্বপ্ন-গবেষক। এঁদের অনেকে স্বপ্নকে ভাবতেন 'রোগের আগামবার্তা' (Premonitors of Illness) হিসেবে। এমন কী অ্যারিস্টটলের মতো প্রাচীন দার্শনিকের লেখাতেও এরকম ধারণার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যাবে। অ্যারিস্টটল মনে করতেন, কোনও রোগ বাইরে প্রকাশ পাবার আগে রোগের কষ্ট বা অসুবিধা বহুগুণ হয়ে চলে আসতে পারে স্বপ্নে। ফরাসি মনোবিদ পি. তিসি-র এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা ছিল মৌলিক। তিসি ভাবতেন, শরীরের ভেতরকার নির্দিষ্ট অংশের অসুখ বা অসুবিধা নির্দিষ্ট ধরনের স্বপ্ন তৈরি করে। হৃদরোগে ভোগা মানুষ দেখে প্রচণ্ড আতঙ্কের স্বপ্ন, যা অবশ্যই কষ্টকর কোনও মৃত্যু দিয়ে শেষ হয়।

ফুসফুসের রোগে (যেমন হাঁপানি) ভোগা মানুষ হয়তো স্বপ্নে দেখবেন, প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পাকস্থলির সমস্যা বা হজমের সমস্যা রয়েছে এমন একজন হয়তো দেখলেন প্রচুর খাবারের স্বপ্ন। বা খাবার দেখে গা গোলাতে থাকার স্বপ্ন। খেতে ইচ্ছে না করার স্বপ্ন। এখানে একটা প্রশ্ন আসবেই। তা হল মানুষ শুধু অসুস্থ হলেই কি এরকম স্বপ্ন দেখে? সুস্থ অবস্থায় দেখে না? যে কোনও সুস্থ মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে প্রত্যেক রাতে কত ধরনের স্বপ্নই না দেখেন। একজন হতদরিদ্র পেট ভরে খেতে না পাওয়া মানুষ তো স্বপ্নে দেখতেই পারেন, তিনি নানা লোভনীয় খাবার খাচ্ছেন গোগ্রাসে। এরকম স্বপ্ন দেখতে হলে তার হজমের গোলমাল থাকতেই হবে, তার কোনও মানে নেই। একজন সুস্থ মানুষও দেখতে পারেন ভিড়ের মধ্যে দম আটকে আসার স্বপ্ন বা আতঙ্কের মৃত্যুর স্বপ্ন। এরকম স্বপ্ন শুধু ফুসফুসের রোগ বা হৃদরোগ থাকলেই আসবে তা তো নয়।

পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোয় একটা ব্যাপার পরিষ্কার। তা হল, ফ্রয়েড পূর্ববর্তী অনেক মনোবিদের শরীরের ভেতরকার অস্বাভাবিক উত্তেজনা থেকে স্বপ্ন তৈরির ধারণা পুরোপুরি নির্ভুল ছিল না। পাকস্থলির, হৃদযন্ত্রের, ফুসফুসের বা শরীরের ভেতরকার অন্য জায়গা থেকে আসা স্বাভাবিক উদ্দীপনা থেকেও নানা ধরনের স্বপ্ন তৈরি হতে পারে। রোগাক্রান্ত পাকস্থলির বা ফুসফুসের উদ্দীপনা স্বপ্নে আসতে পারে না তা নয়। তবে সুস্থ পাকস্থলি বা ফুসফুস থেকেও স্বপ্নের উদ্দীপনা তৈরি হয় যখন তখন। ফ্রয়েডের আগেকার কিছু মনোবিদ স্বপ্নের উৎস হিসেবে শরীরের ভেতরকার অস্বাভাবিক উদ্দীপনাকে বড় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

স্বপ্নের শারীরিক উৎসগুলোকে (Somatic Sources of Dreams) মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এ. ক্রাউস্ ভাগ করেছিলেন শরীরের বিভিন্ন তন্ত্র (Symtem) অনুযায়ী। স্বপ্নের এরকম উৎস হতে পারে (১) শরীরের যে কোনও মাংসপেশী (২) ফুসফুস (৩) হৃদযন্ত্র (৪) জননতন্ত্র (যৌন ইচ্ছা) (৫) শরীরের প্রান্তিক নানা অনুভূতি (Peripheral Sensations).

ঘুমের ভেতর পা একটু সরে গেলে পড়ে যাবার স্বপ্ন দেখতে পারেন একজন মানুষ, ফ্রয়েডের আগেকার মনোবিদদের এরকম ধারণার কথা আগে বলেছি। স্বপ্নে যে মানুষ উড়ে বেড়ায় তার জন্যও,

এঁরা মনে করতেন, স্বপ্নদ্রষ্টার শারীরিক উৎস দায়ী। ঘুমন্ত অবস্থায় বুকের খাঁচার ওঠানামা থেকে এরকম স্বপ্ন তৈরি হয় বলে এঁরা বিশ্বাস করতেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের যে উৎসগুলো আলোচনা করলাম তাতে একটা সাধারণ সূত্র রয়েছে। তা হল, স্বপ্নের উৎস শারীরবৃত্তীয়। একই শারীরিক উৎস নানা ধরনের স্বপ্ন তৈরি করতে পারে। ধরা যাক, ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শরীরে কোনওভাবে এক ফোঁটা জল পড়ল। এতে আপনি দেখতে পারেন বৃষ্টিতে ভেজার স্বপ্ন। বা স্নান করার স্বপ্ন। বা গরমে ঘেমেনেয়ে গ্লাস গ্লাস সরবত খাওয়ার স্বপ্ন। প্রশ্ন হল, এর কোন স্বপ্নটা আপনি দেখবেন, তা ঠিক হবে কীভাবে? ফ্রয়েডের আগেকার স্বপ্নগবেষক মনোবিদ বা শারীরবিদরা এ ব্যাপারে মাথা ঘামাননি। ফ্রয়েডই প্রথম এ নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আর যুক্তিনির্ভর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছন। স্বপ্নের উৎস শারীরিক হলেও এক্ষেত্রে স্বপ্নের চরিত্র ঠিক করে দেয় স্বপ্নদ্রষ্টার মন। এটা ছিল ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত।

একটা সময় কিছু মনোবিদ আর শারীরবিদ মনে করতেন, স্বপ্ন হল পুরোপুরি এক বিভ্রম (Hallucinaiton)। স্বপ্নের শক্তিশালী কল্পনাশক্তিকে, যা কোনও যুক্তি বা বাধা মেনে চলে না, পাশ কাটাবার এটা ছিল সহজতম পথ। তিসির মতো মনোবিদ স্বপ্নে মনের ভেতর থেকে কোনও মানসিক শক্তি কাজ করে না বলে রায় দিয়ে বসেছিলেন। 'পুরোপুরি মানসিক উৎস থেকে মানুষ কোনও স্বপ্ন দেখে না। স্বপ্নে মানসিক কল্পনা যা কিছু তৈরি হয় সবই আসে বাইরে থেকে, ভেতর থেকে নয়।' এঁদের কারও মতই মেনে নেওয়া যায় না। কারণ আমাদের মগজ প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নের ওপর মগজের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

স্বপ্নের ওপর মনের প্রভাব নিয়েও কম বিতর্ক হয়নি। একদল শারীরিক ভাবতেন, আমরা যা ভাবি, দেখি, শুনি বা বলি তাই স্বপ্নে চলে আসে। সত্যিই কি তাই হয়? আমাদের সারাদিনের কাজকর্ম বা ভাবনাচিন্তা অবশ্যই কোনও না কোনওভাবে স্বপ্নে চলে আসতে পারে (২০ পাতায় 'একত্রীকরণ' দেখুন)। তবু তা কখনই অবিকৃতভাবে আসে না। আসে স্বপ্নকল্পনার জোরে অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়ে। আবার অনেক গবেষক বলতেন, দিনের বেলা যা আমাদের বেশি আকর্ষণ করে তাই স্বপ্নে বেশি আসে। আপনি হয়তো ক্রিকেটপাগল। নিয়মিত সারারাত আপনি কি স্বপ্নে ক্রিকেট খেলেন বা ক্রিকেট নায়কদের স্বপ্ন দেখেন? আদৌ নয়।

স্বপ্নের উৎস নিয়ে এই জটিল অবস্থা থেকে বার হয়ে আসতে সাহায্য করে স্বপ্ন নিয়ে ফ্রয়েডের যুগান্তকারী একটা সিদ্ধান্ত। 'প্রত্যেকটা স্বপ্নের রয়েছে নির্দিষ্ট একটা অর্থ।' ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব মেনে নিলে স্বপ্নের মানসিক উৎস বুঝতে অসুবিধে হবার আর কোনও কারণ থাকে না। স্বপ্ন দেখা মানুষের (কিছু মানবেতর প্রাণীরও) মনের একটা বিশেষ ক্ষমতা। এটা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। স্বপ্নকল্পনা (Dream Imagination)-র পরিচালক যদি মানুষের মন হয় তবে স্বপ্নের মানসিক উৎসকেও স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত ছিল, 'স্বপ্নের প্রাথমিক উদ্দীপনা আসে মন থেকে। হয়তো ভবিষ্যতের গবেষকদের গবেষণা থেকে স্বপ্নের মানসিক উৎসর পিছনে শারীরবৃত্তীয় সূত্র ঠিক কীভাবে কাজ করে তা জানাতে পারবে।'

ফ্রয়েড পরবর্তী গবেষকদের কাজকর্মে ফ্রয়েডের মনের ইচ্ছা কতটা পূর্ণ হয়েছে বলা কঠিন। ইয়ুন (Jung) বা অ্যাডলারের (Adler) মতো গবেষকরা স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বপ্নের উৎসকে পুরোপুরি মানসিক বলে রায় দিয়েছেন। আর একেবারে হালআমলে সমস্ত স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হচ্ছে জীববৈজ্ঞানিক সূত্র ধরে। যদি এই মত কোনওদিন আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে স্বপ্নের উৎসকে পুরোপুরি শারীরবৃত্তীয় (Physiological) বলে ধরে নিতে হবে।

স্বপ্নের উৎস নিয়ে এই কি শেষ কথা? হয়তো নয়। ফ্রয়েড পরবর্তী হাতে গোনা কয়েকজন মনোবিদ স্বপ্নের মানসিক উৎসের সঙ্গে শারীরিক উৎসকে মেলাতে চেয়েছেন নানাভাবে। স্বপ্নের প্রাথমিক উৎস পুরোপুরি মানসিক হলেও এর পেছনে কিছু শারীরবৃত্তীয় কারণ অনেক সময়ে কাজ করে। আমার তাই মনে হয়। তা নইলে মানুষ যৌন স্বপ্ন দেখে কেন? কেন ঘুমন্ত চেতনায় মলমূত্রের বেগ নানা ধরনের স্বপ্নের জন্ম দেয়? প্রত্যেকটা স্বপ্নের মূল উৎস মানসিক হলেও তার সঙ্গে অনেক সময় যুক্ত থাকে কোনও শারীরবৃত্তীয় কারণ। কীভাবে? তা বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন আলোচনা করতে করতে পরিষ্কার হবে।

স্বপ্নের অনুঘটক

ঘুম প্রত্যেক মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন। ঘুম আসবার পর দুই বিপরীতমুখী প্রয়োজনের টানাপোড়েনে জন্ম নেয় কিছু স্বপ্ন। একদিকে ঘুমের প্রয়োজন। অন্যদিকে কিছু শারীরবৃত্তীয় চাহিদার প্রয়োজন। খিদে, তেষ্টা, যৌন ইচ্ছা বা মলমূত্র ত্যাগের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাগুলো ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে যে কোনও মানুষের। আর এগুলো কাল্পনিকভাবে মিটতে পারে যে কোনও মানুষের স্বপ্নে। অথবা ইচ্ছার প্রভাবে ঘুম যেতে পারে ভেঙে। এই সব ইচ্ছাগুলো অনেক সময় ইচ্ছাপূরণের নানা স্বপ্ন হয়ে শরীরের চাহিদাকে পূর্ণ করে। যাতে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখবার পর গভীরভাবে ঘুমিয়ে যেতে পারেন।

রাত্রে ভালো করে খাওয়া হয়নি বা খাবার জোটেনি এই অবস্থায় হয়তো ঘুমিয়ে গেলেন একজন মানুষ। ঘুমের ভেতর খিদের বোধ মানুষটাকে স্বপ্ন দেখাল, তিনি পেট পুরে খাচ্ছেন। স্বপ্নের খাওয়াদাওয়া সেরে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন মানুষটা। এক্ষেত্রে খাওয়ার ইচ্ছা স্বপ্নের অনুঘটক হিসেবে কাজ করল। এরকম বেশ কিছু স্বপ্ন আমি স্বপ্নসংগ্রহের কাজ করতে করতে পেয়েছি।

পুরুলিয়ার হতদরিদ্র আদিবাসী রামচাঁদ মুর্মু। প্রায় রাতেই খাবার জোটে না রামচাঁদের। এরকম রাতে অনেক দিন রামচাঁদ স্বপ্ন দেখে পেট ভরে মাংসভাত খাওয়ার। হাওড়া উড়ালপুলের নীচে এক ছ-ফুট বাই ছ-ফুটের ঝুপড়িতে রাত কাটায় ভিখারি শিউচরণ। এক রাতে একটা মাত্র রুটি খেয়ে পেট পুরে জল খেয়ে শিউচরণ ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখে এক বিয়েবাড়িতে ভোজ খাচ্ছে। প্রচুর লুচি, মাংস আর রসগোল্লা। এক 'বাবু' (সম্ভবত কর্তা) এসে বলেছেন, 'এত কম খাচ্ছ কেন? আরও একটু মাংস আর কয়েকটা রসগোল্লা খাও!' স্বপ্নের ভোজ খেয়ে সেই রাতে খুব ভালো ঘুম হয়েছিল শিউচরণের।

এক অভিযাত্রীদলের সদস্য এক জন যুবক আমাকে তাঁর এরকম একটা স্বপ্নের কথা জানায়। পিণ্ডারী গ্লেসিয়ার ট্রেক করতে গিয়ে একটা সময় ওঁদের রসদে টান পড়ে। সে দিন রাতে দলের সদস্যরা ডিনার সেরেছেন কফি আর বিস্কুট দিয়ে। ঘুমিয়ে পড়ে যুবক স্বপ্ন দেখেন, তিনি একটা বড় রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন রাঁধুনি ওঁর হাতে একটা প্লেটে মস্ত একটা মুরগীর ঠ্যাং তুলে দেয়। যুবক প্লেটটা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায় খাবার ঘরে। অনেক অচেনা মানুষ সেখানে বসে নানা ধরনের খাবার খাচ্ছেন। একটা ফাঁকা টেবিলে বসতেই বেয়ারা ওঁর প্লেটে স্যালাড আর বেশ কিছু তন্দুরি রুটি দিয়ে যায়। খিদের পেটে তন্দুরি রুটি আর মাংসের সেই 'স্বপ্নের ভোজ' গোগ্রাসে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন স্বপ্নের দর্শক।

খিদের এরকম স্বপ্নে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। তা হল, এরকম স্বপ্নে এক জন মানুষ সেই সব খাবারের স্বপ্ন বেশি দেখেন যেগুলো তাঁর খুব পছন্দের। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের উনিশ মাসের মেয়ে আনা সারাদিন শুধু তরল খাবার খেয়ে রাতে দেখেছিল তার সব চাইতে প্রিয় অমলেট, স্ট্রবেরি আর পুডিং এর স্বপ্ন। সৌমিত চট্টোপাধ্যায় নামের এর স্নাতকোত্তর ছাত্র হস্টেলে একবার রাতের খাবার না খেয়ে ঘুমিয়ে দেখেন সিরাজে বিরিয়ানি খাওয়ার স্বপ্ন। সৌমিতের প্রিয়তম খাদ্যবস্তু বিরিয়ানি। বিশেষ করে সিরাজ রেস্তোরাঁর। রামচাঁদ মুর্মু খিদের পেটে স্বপ্ন দেখেন মাংসভাত খাওয়ার। কারণ মাসংভাত হল ওঁর সবচাইতে পছন্দের। এক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর রাতের বরাদ্দ খাবারে পেট ভরে না। ভোজনরসিক এই মানুষটা মাঝেমাঝে খাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। মাছ, মাংস, ভাত, রুটি বা রসগোল্লা নয়। তাঁর স্বপ্নে আসে ওঁর প্রিয় মিষ্টি গাঙ্গুরামের সন্দেশ।

একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দিয়ে খিদের উদ্দীপনার প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। ষাট বছরের এক ব্যক্তি এক দিন ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হন। সারাদিন শিরার ভেতর দিয়ে নানা ধরনের ফ্লুইড

('স্যালাইন') দেওয়া হয় ওঁকে। রাতে স্বপ্ন দেখেন, মা (মৃতা) এসে বিছানার পাশে একটা টুলে বসে ভাত খাওয়াচ্ছেন। গরাস বানিয়ে বানিয়ে। ছেলেবেলায় ওঁর মা ঠিক এইভাবে ভাত খাওয়াতেন ভাইবোনদের এক সঙ্গে বসিয়ে। খিদের এই স্বপ্নে আশ্চর্যভাবে চলে এসেছে শৈশবস্মৃতি। যে কোনও বড় হয়ে যাওয়া মানুষের স্বপ্নে তাঁর শৈশবের স্মৃতি একটা প্রধান উপাদান। এ নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

ঘুমের মধ্যে তেষ্টা নানা ধরনের স্বপ্নের অনুঘটকের কাজ করতে পারে। মনোবিদ দ্যু প্রের লেখায় এ সংক্রান্ত অসাধারণ একটা স্বপ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। আফ্রিকার মরুভূমির ভেতর দিয়ে দীর্ঘ যাত্রাপথে মুংগো পার্ক নামের এক জন মানুষ তেষ্টার চোটে প্রায় মরতে বসেছিলনে। অর্ধচেতন অবস্থায় পার্ক একনাগাড়ে দেখে চলেন তাঁর দেশের একের পর এক উপত্যকার স্বপ্ন। যে উপত্যকার এখানে ওখানে রয়েছে মিষ্টিজলের পুকুর।

ঘুমের মধ্যে তেষ্টা পেয়ে স্বপ্নে জল বা সরবত খান অনেক মানুষ। এক পাঁড়মাতাল একরাতে স্বপ্ন দেখে, সে চুমুক দিয়ে একটা ড্রাম থেকে আকণ্ঠ বাংলা মদ পান করছে। রাতে শোবার আগে প্রচুর মদ্যপান করেছিল সে। বেশি মদ্যপানের কারণে মাঝরাতে তেষ্টা থেকে এরকম স্বপ্নের জন্ম। ন-বছরের বাচ্চা শুভম রায়চৌধুরীর সবচাইতে প্রিয় 'সেভেন-আপ' পানীয়। শুভম আমাকে ওঁর একটা স্বপ্নের কথা জানায়। স্বপ্নে বোতল বোতল 'সেভেন-আপ' খেয়েছে সে একরাতে। বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন ক্রিকেট খেলে বাড়ি ফিরে কোনওরকমে খাবার খেয়ে প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ঘুম এসে যায় ওর। সারাদিন জল খাওয়া কম হওয়ায় ঘুমের মধ্যে প্রচণ্ড পিপাসা ঘুমন্ত শুভমকে একের পর এক বোতলজাত পানীয় পান করবার স্বপ্ন দেখিয়েছে।

ঘুমের মধ্যে যৌন ইচ্ছা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় অনেক সময়। আর এরকম হলে এই ইচ্ছা অনুঘটক হয়ে ঘুমন্ত মানুষকে নানা ধরনের যৌনস্বপ্ন দেখায়। বয়েস অনুযায়ী ছেলেদের কামাবেগের তারতম্যের কারণে এরকম স্বপ্নও কম বেশি হয়। তারতম্য ঘটে স্বপ্নের চরিত্রে। বয়ঃসন্ধি অতিক্রম করা কিশোর আর অবিবাহিত যুবকরা এরকম স্বপ্ন দেখেন সবচাইতে বেশি। নিয়মিত স্বাভাবিক যৌনমিলনে অভ্যস্ত পুরুষেরা এরকম স্বপ্ন দেখলেও তুলনায় তা অনেক কম। আবার একটু বেশি বয়সে এরকম যৌন স্বপ্ন বেশি দেখেন কিছু মানুষ। এটা নির্ভর করে ওই মানুষের যৌনতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনবোধ আর মানসিকতার ওপর।

ঘুমের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে যে কোনও মানুষের। একদিকে এরকম প্রয়োজন আর একদিকে একটানা আরও ঘুমোবার ইচ্ছা (বা বাথরুমে যাবার অনিচ্ছা) এই দুই বিপরীত ইচ্ছার টানাপোড়েন থেকে অনেক স্বপ্ন জন্ম নেয়। অনেক ছোট বাচ্চা মূত্রত্যাগের বেগ এলে স্বপ্ন দেখে, সে বাথরুমে গিয়ে ব্যাপারটা সারছে। ছোট বাচ্চাদের রাতে, 'বিছানা ভেজানো'-র (Bed Wetting) জন্য বেশিরভাগ সময় দায়ী স্বপ্ন । অনেক পাঠক হয়তো তাঁদের ছোটবেলায় দেখা এরকম স্বপ্নের কথা মনে করতে পারবেন।

এরকম শারীরিক প্রয়োজন থেকে এক জন মানুষ নানা ধরনের স্বপ্ন দেখতে পারেন। এই ধরনের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের নানা জায়গায়। কিছু মনোবিদ বড়দের দেখা এরকম সব স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টার যৌনতাবোধ কাজ করে বলে মনে করেন। আমি এ নিয়ে কোনও বিতর্কে যাবার বা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করি না।

স্বপ্নে জন্মকল্পনার স্মৃতি

পাঠক শুনলে আশ্চর্য হবেন, জন্মের সময়কার, এমনকী মায়ের পেটে থাকবার সময়কে নিয়ে আজগুবি কল্পনার (Birth Fantasy) ছবি খুঁজে পাওয়া যায় বেশ কিছু বড় হয়ে যাওয়া মানুষের স্বপ্নে। আমি কীভাবে হলাম, কোথা থেকে এলাম, এ নিয়ে কৌতূহল থাকে যে কোনও শিশুমনে। একটু বড় হয়ে যাওয়া বাচ্চার মনে এ নিয়ে নানা উদ্ভট কল্পনার জন্ম নেওয়া অস্বাভাবিক নয়। বড় হয়ে যাওয়া মানুষের কল্পনায় এরকম ছবি থাকে না। ছবিগুলো অনেকসময় থেকে যায় অচেতনে, শৈশবস্মৃতিতে। স্বপ্নে এরকম ছবি চলে আসা একেবারে অসম্ভব নয়। বেশ কিছু জনের স্বপ্নে, সরু গলি বা পথ ধরে হাঁটবার স্বপ্নে জন্মের সময়কার বা মায়ের পেটে থাকবার সময় নিয়ে ছেলেমানুষের 'আজগুবি কল্পনার ছবি' খুঁজে পেয়েছেন ফ্রয়েডের সমসাময়িক ও পরবর্তী বেশ কয়েক জন স্বপ্নগবেষক।

ফ্রয়েডের এক যুবতী রোগিণীর স্বপ্নে জন্মের সময়কার এই স্মৃতি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। যুবতীর স্বপ্নটা ছিল এরকম:

গ্রীষ্মের অবকাশ কাটাবার এক রিসর্ট—লেকের কালচে জলে 'ডাইভ' দিচ্ছেন স্বপ্নদ্রষ্টা—ফ্যাকাশে চাঁদের ছবিটা জলের যে অংশে পড়েছে, সেখানে—।

স্বপ্নে জলে ঝাঁপ দেওয়া বা জলে নেমে যাওয়া আর জল থেকে উঠে আসার ছবি হুবহু এক। ঘটনাপ্রবাহের উলটোদিকে (Reversion Phenomenon) বা বিপরীত মুখে হাঁটা স্বপ্নের একটা বিশেষত্ব। স্বপ্নে জলে নামার অর্থ তাই হতে পারে জল থেকে উঠে আসা। বা 'বার হয়ে আসা'। মায়ের পেটে গর্ভজলে বহুদিন কাটাবার পর জন্মের সময় আমরা 'জল থেকে উঠে আসি'। ফ্রয়েড মনে করতেন, স্বপ্নদ্রষ্টা যুবতীর এই স্বপ্নে তার জন্মের কল্পনার স্মৃতি চলে এসেছে এভাবে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠবে। জলের যে জায়গাটায় ফ্যাকাশে চাঁদ সেখানেই স্বপ্নদ্রষ্টা ঝাঁপ দিচ্ছেন। এটা কেন স্বপ্নে আসছে? কারণ, যে গর্ভপথ (Birth Passage) ধরে শিশু জন্ম নেয় তার আকৃতি অনেকটা চাঁদের মতো। জন্মাবার সময় বাচ্চা দ্রুত এই পথটা সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেয়, এরকম উদ্ভট ধারণা অনেকের অবচেতনে বা অচেতনে রয়েছে।

নানাদেশের পৌরাণিক কাহিনী আর উপকথায় মাতৃগর্ভের ভ্রূণের স্মৃতি ভবিষ্যতে মনে পড়ে যাবার প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। এ ব্যাপারে মনোবিদ ওটো র‍্যাঙ্ক (১৯০৯)-এর গবেষণাপত্রকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন ফ্রয়েড। আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনীতেও এরকম ঘটনার দৃষ্টান্ত অনেক। মহাভারতের কথা ধরা যাক। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় অভিমন্যু নাকি চক্রব্যূহে ঢোকার কৌশল জানতে পেরেছেন মাকে বলা মায়ের বাবার গল্প থেকে। ওর দাদু যখন ওই ব্যূহ থেকে বার হবার কৌশলের কথা বলছেন, গল্প শুনতে শুনতে মা পড়েছেন ঘুমিয়ে। ভ্রূণ অভিমন্যু তাই জানতে পারেনি চক্রব্যূহ থেকে বার হবার কৌশল। মাতৃগর্ভের এই স্মৃতি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাকে সপ্তরথীর চক্রব্যূহে ঢোকার কৌশল শিখিয়ে দেয়। ব্যূহ থেকে বার হবার কৌশল না জানা থাকায় সাত রথীর যৌথ উদ্যোগে মারা পড়তে হয় অভিমন্যুকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এরকম কাহিনী আজগুবি বা উদ্ভট। তবু জন্ম নেবার বা তার আগের জীবনটা নিয়ে শিশুমনের এরকম অদ্ভুত কল্পনা স্বপ্নে চলে আসতে পারে ছবি হয়ে।

আমার ঝুলিতে থাকা সুনীল গঙ্গোপাধায়ের একটা স্বপ্নের কথা বলি। স্বপ্নটা এরকম:

'আমি একটা নদীতে নামছি একটু একটু করে। প্রথমে হাঁটুজল, তারপর কোমর পর্যন্ত, তারপর বুক।

আমি কিছুই পরে নেই, একেবারে নগ্ন। দিনেরবেলা নয় রাত্তিরবেলা। আকাশে চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। তারপর দেখলাম দূরে বড় বড় পাহাড়। রাত্তিরবেলাও জ্যোৎস্নায় চকচক করছে শিখরের তুষার। সাঁতার কাটার বদলে আমি আস্তে আস্তে ডুবে গেলাম সেই নদীর গভীরে। তারপরই দূরে কামানের গোলার মতো কীসের যেন শব্দ হল।'

সুনীলের স্বপ্নে তাঁর গায়ে কিছু নেই। নদীর জলে প্রথমে পা, পরে হাঁটু, কোমর হয়ে পুরোপুরি জলে ডুবে যাচ্ছেন স্বপ্নদ্রষ্টা। ছবির 'উলটোদিকে চলা'র হিসেবে, নগ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার ধীরে ধীরে নদীতে ডুবে যাওয়া বাস্তবে জল থেকে বার হয়ে আসা। প্রথমে মাথা, তারপর কোমর—এভাবে। ঠিক যেভাবে মায়ের পেট থেকে বার হয়ে পৃথিবীর 'প্রথম আলো' দেখে শিশু। উলটে দেখলে গর্ভপথের আবছা অন্ধকার সুনীলের স্বপ্নে 'দিনেরবেলা নয়, রাত্তিরবেলা—জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে'। যেটা আশ্চর্যের তা হল, আগে বলা ফ্রয়েডের রোগিণী আর সুনীল—প্রায় একশো বছরের ব্যবধানে দুই স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নে চাঁদ চলে এসেছে। দুজনের স্বপ্নেই চাঁদের অর্থ হুবহু এক।

পাঠক বলবেন, এটা যদি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মের সময়কার কল্পনার স্মৃতির স্বপ্ন হবে, তবে স্বপ্নে 'বড় বড় পাহাড়, জ্যোৎস্নায় চকচক করা শিখরের তুষার—এ সব এল কোথা থেকে? একটা স্বপ্নে নানা সময়ের নানা ধরনের উপাদান চলে আসে বেশিরভাগ সময়। জ্যোৎস্না, পাহাড়, চকচক করতে থাকা শিখরের তুষার—এসব হয়তো আসছে স্বপ্নদ্রষ্টার শৈশব বা পরবর্তী জীবনের অন্য কোনও স্মৃতি থেকে। সুনীলের স্মৃতিতে থাকা অন্য কোনও একটা ছবি এখানে ঢুকে পড়ে স্বপ্নটাকে জটিল করে দিয়েছে। স্বপ্নের শেষে 'কামানের গোলার মতো আওয়াজ'—এর ব্যাখ্যা কি? এই শব্দ একটা প্রতীক হতে পারে। বিশিষ্ট কোনও মানুষকে সামরিক কায়দায় স্বাগত জানানো হয় কামানের তোপ দেগে। স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নে এই আওয়াজ কামানের গোলার মতো না হয়ে শাঁখ বাজবার মতো হতে পারত। এই আওয়াজ হবার কথা স্বপ্নের শুরুতে—স্বপ্নে তা উলটে চলে এসেছে প্রথমে। স্বপ্নের শেষ অংশের এই 'আওয়াজ' শুনে আর সন্দেহ থাকে না যে, এ হল জন্ম নিয়ে কল্পনার স্বপ্নায়ন।

কেউ যদি এই স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যা না মানতে চান, মানবেন না। তবে ফ্রয়েডীয় মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এরকম।

কৃষ্ণনগরের গৃহবধূ সুমিত্রা তরফদারের একটা স্বপ্ন এই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে তাতেও এরকম কল্পনার স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায়। স্বপ্নটা বলি:

'বিকেল বেলা—একটা মাঠে শুয়ে আছি—একটু বাদে দেখি একটা সরু গলি ধরে হাঁটছি, কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না এত অন্ধকার—গলিটা এত সরু যে একটু বাদেবাদে দুপাশের বাড়িগুলো গায়ে লাগছে—খুব অস্বস্তি হচ্ছে, ভয় করছে। গলির মুখে পৌঁছে দেখি—সামনে অনেক জল—আবছা অন্ধকার একটা লেক বলে মনে হচ্ছে জলটাকে—'

এক মহিলা চিকিৎসক প্রায় একই ধরনের স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। ইনি একই স্বপ্ন দেখেছেন অন্তত তিনবার।

'একটা বড় বাড়ির অনেক ওপরতলা থেকে যেন নীচে নামতে হবে আমাকে—সামনে ঘোরানো সিঁড়ি—পাশে একটা লিফট—সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি গেটের সামনে একটা পুকুর—খুব অবাক লাগছে—তাহলে আমি এই বাড়িতে এলাম কি করে—আমি সাঁতার জানি—তবু মনে হচ্ছে আমাকে জলে নামতেই হবে—জলে ঝাঁপ দিলাম—ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল।'

এই দুটো স্বপ্ন অনেকটা একরকম। স্বপ্নের ছবিগুলোকে উলটে দিলে 'জল থেকে বার হয়ে আসা'র সম্ভাব্য কল্পনার স্মৃতি খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। এই স্বপ্নদুটোকে আমার 'ড্রিম অব্ বার্থ ফ্যানটাসি' বলে মনে হয়। প্রথম স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মাঠে শুয়ে থাকা সম্ভবত বাস্তবে জন্মের পর 'বেবি-ট্রে'তে শুয়ে থাকা। (পঁচিশের এই গৃহবধূর বাচ্চার জন্ম হয়েছিল কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে।) জন্মাবার পর ওঁর বাচ্চাকে শোয়ানোর বেবি-ট্রে স্বপ্নকল্পনায় মাঠ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় স্বপ্নে ঘোরানো সিঁড়ি এসেছে জটিল গর্ভপথের প্রতীক হয়ে। আর স্বপ্নের লিফটটা একটা হাসপাতালের কোনও একটা ব্লকের লিফট। মহিলা ওই হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত।

সুবল ঘড়াই নামের কলকাতার এক জন ট্রাফিক কনস্টেবলের একটা স্বপ্নে সম্ভবত তাঁর মাতৃগর্ভের কল্পনার স্মৃতি রয়েছে। ইনি একদিন স্বপ্ন দেখেন, 'জলে ডুবে যাচ্ছি—হঠাৎ পায়ের নীচে কি একটা লাগে—এক ধাক্কায় মাথা তুলে ফেলি জলের ওপর—আবার ডুবে যাই—আবার কীভাবে যেন মাথা উঠে আসে—এরকম বেশ কয়েকবার হবার পর ভয়ে চিৎকার করে ঘুম ভেঙে যায়—দেখি বিছানা পর্যন্ত ঘামে ভেজা।'

মায়ের পেটে থাকা অবস্থাকে নিয়ে কিছু বাচ্চার মনে উদ্ভট কল্পনা থাকে। এরকম এক আজগুবি কল্পনা হল পেটে জলের ভেতর 'ডুবতে ডুবতে ভাসা'। হয়তো সুবলের স্বপ্নে ছেলেবেলার স্মৃতিতে থাকা এরকম কোনও ছবি চলে এসেছে। ফ্রয়েড পরবর্তী এক জন স্বপ্নগবেষকের লেখায় এরকম তিনটে স্বপ্নের উল্লেখ রয়েছে। অনেকসময় খুব ছোটবেলায় জলে ডুবতে ডুবতে কোনওরকমে বেঁচে যাবার ভয়ঙ্কর স্মৃতি থেকেও প্রায় একইরকম ছবি স্বপ্নে চলে আসতে পারে। বছর পঁয়তাল্লিশের এক জন আদিবাসীর স্বপ্নে এরকম স্মৃতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে চলে এসেছে। সুখিয়া সরেন নামের বর্ধমান জেলার এক গ্রামের এই আদিবাসী পুরুষটি বছর পাঁচেক বয়সে একবার এক পুকুরে ডুবে মরতে বসেছিল। স্বপ্নে বেশ কয়েকবার ওই ভয়ঙ্কর ছবিটা চলে আসে। বারবার ডোবা আর ভাসার সময় একটা কুমির সুখিয়াকে হাঁ করে গিলে খেতে আসে। জীবনে কোনওদিন নিজের চোখে কুমির দেখেনি সুখিয়া। কখনও দেখা কুমিরের কোনও ছবি থেকে কুমিরটা এসে ঢুকে পড়েছে সুখিয়ার স্বপ্নে।

এখানে একটা ব্যাপার নজর দেবার মতো। মায়ের পেটে থাকার বা জন্মের সময়কার উদ্ভট কল্পনায় বেশিরভাগ সময় একধরনের ভয় বা উদ্বেগ থাকে। এখানে ফ্রয়েডের কিছু প্রাসঙ্গিক কথা উল্লেখ করব। ফ্রয়েড লিখছেন, 'স্বপ্নে জন্মের আগের বা জন্মের কল্পনার স্মৃতি প্রায়ই ভয়ের আবহ এনে দেয়। এরকম কল্পনালোকের ভীতির সঙ্গে বড় হয়ে যাওয়া মানুষের কিছু সাধারণ ভয়ের যোগাযোগ আছে বলে আমার বিশ্বাস। যেমন কেউ জ্যান্ত কবর দিয়ে দেবে 'এরকম ভয়'। নির্জন কোনও জায়গায়, বিশেষ করে রাতে, একা যেতে হলে এরকম ভয় দেখা দেয় বেশিরভাগ মানুষের মনে। আমাকে ওখানে 'পুঁতে রাখলেও কেউ জানতে পারবে না'—এরকম কথা ওই প্রসঙ্গে অনেককে বলতে শোনা যায়। মানুষের মনের এরকম ভয়ের সঙ্গে আর একটা ভয়ের মিল আছে। তা হল ভূতের ভয়। এরকম ভয় হয়তো মানুষের অচেতন মনের গভীরতম স্তরে ঢুকে থাকা মৃত্যু-ওপারের জীবনে বিশ্বাসের একটা কারণ। কল্পনায় থাকা জন্মের আগেকার ভয়ঙ্কর ভুতুড়ে জীবনটাকে যে মানুষ মনের গভীরে মৃত্যুর পর আর একবার কল্পনা করে নেয়।

জানা আর অজানা ইচ্ছা

স্বপ্নের সঙ্গে ইচ্ছার সম্পর্ক অনেকটা মাটির সঙ্গে গাছের মতো। গাছকে স্বপ্ন বললে ইচ্ছাকে বলব মাটি। মাটি ছাড়া গাছ বাঁচে না। ইচ্ছা ছাড়া তৈরি হয় না স্বপ্ন। জীবনে ইচ্ছা না থাকলে আমাদের ঘুম হত স্বপ্নহীন। অনেকেই এটা মানতে চাইবেন না। বলবেন, ইচ্ছার সঙ্গে স্বপ্নের এই সম্পর্কের ধারণা ভুল। ইচ্ছা বিচিত্র ধরনের হয়। কিছু ইচ্ছার গতি কি বিচিত্র, তা মনোবিজ্ঞানের আলোয় মনকে পরীক্ষা না করলে বোঝা যায় না। এই ইচ্ছাগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। কেননা, নানা ধরনের ইচ্ছার চরিত্র না জানলে স্বপ্নবিশ্লেষণ ও স্বপ্নতত্ত্বের জটিলতা বুঝতে অসুবিধা হয়।

ফ্রয়েড মনের স্তর অনুযায়ী ইচ্ছাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। ইচ্ছার এই ভাগগুলো হল:

(ক) সচেতন বা Conscious.

(খ) অবচেতন বা Preconscious. অনেকে একে Subconscious বলেন।

(গ) অচেতন বা Unconscious.

সচেতন ইচ্ছার কথা আমরা জানি। কারণ তা আমাদের চেতনায় থাকে। খাওয়ার ইচ্ছা, ঘুমোনোর ইচ্ছা, অন্যের উপকারে লাগবার ইচ্ছা, আড্ডা মারার ইচ্ছা, পড়ার ইচ্ছা—এরকম ইচ্ছাগুলোর কথা আমরা সচেতনে জানি। মনের এরকম ইচ্ছাগুলো তাই সচেতন ইচ্ছা।

অবচেতনের ইচ্ছার কথা আমরা না জানলেও, চেষ্টা করলে মনে যে একরম ইচ্ছা ছিল তা বুঝতে পারা যায়। ধরা যাক, আজ রবিরার। বাজারে গিয়ে আপনি অনেক মাছ-মাংস-সবজি-মিষ্টি কিনে বাড়ি ফিরলেন। এত বাজার দেখে আপনার স্ত্রী জানতে চাইলেন, 'আজ কি তোমার বন্ধুর আসবার কথা?' স্ত্রীর কথা শুনে হয়তো বুঝতে পারলেন, বন্ধু আসুক এরকম ইচ্ছা মনে নিশ্চয়ই ছিল। তা নইলে বাজার করবেন কেন? প্রত্যেক রবিবার তো এত বাজার করেন না। অনেক বাজার করার পিছনে এখানে অবচেতনের একটা নির্দিষ্ট ইচ্ছা কাজ করল।

অচেতন বা অবচেতনের ইচ্ছার কথা আমরা সহজে জানতে পারি না। ধরুন, আপনার যুদ্ধ যাওয়ার ইচ্ছা। যদি বলি আপনার এই ইচ্ছার পিছনে কাজ করছে আপনার মৃত্যু-ইচ্ছা, আপনি তা কিছুতেই মেনে নেবেন না। 'পুরোপুরি বাজে কথা' বলে উড়িয়ে দেবেন। হয়তো স্বপ্ন দেখলেন আপনার কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মারা গেছেন। বলা হল, এর জন্য দায়ী আপনার মনের ওই বন্ধু মারা যাক এরকম ইচ্ছা। শুনে আপনি রেগে যাবেন। এরকম ইচ্ছাগুলো মনের অচেতনে থাকে বলে চেতনায় এগুলোর অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি না। এগুলো তাই অচেতন ইচ্ছা।

সচেতন, অবচেতন আর অচেতন ইচ্ছার শ্রেণীবিভাগ কাল্পনিক। সচেতন থেকে শুরু করে অচেতন পর্যন্ত অসংখ্য কাল্পনিকভাগে ইচ্ছাকে ভাগ করা যায়। ভারতীয় স্বপ্নগবেষক মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর বসু খুব সুন্দরভাবে ইচ্ছাকে ছয়ভাগে ভাগ করেছেন। নানা ধরের ইচ্ছাগুলোর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় থাকা দরকার। তাহলে স্বপ্নে নানা ধরনের ইচ্ছার উপস্থিতি বুঝতে সুবিধা হবে।

(১) যেসব ইচ্ছা প্রকাশ্য, সেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে এক জন মানুষের মনে কোনও সন্দেহ থাকে না। ধরুন, আজ বুধবার, অফিস যাবেন কি যাবেন না এই নিয়ে সকালে উঠে দোটানায় পড়লেন। শেষে ঠিক করলেন, আজ আর অফিস যাবেন না। এক্ষেত্রে অফিসে না যাবার ইচ্ছা মনে প্রকাশ্যে চলে আসায় এই ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝতে অসুবিধা হল না। বা হয়তো পুজোর ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাবেন ঠিক

করতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড়ের জঙ্গলে যাবেন। মধ্যপ্রদেশ যাবার ইচ্ছা মনে প্রকাশ্যে উঠে আসায় এই ইচ্ছার কথা সহজেই বুঝতে পারলেন। এরকম ইচ্ছার অবস্থান চেতনার কেন্দ্রে।

(২) কিছু ইচ্ছা মনে এত স্পষ্টভাবে না থাকলেও এগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের মনে তেমন সন্দেহ থাকে না। সকালে উঠে প্রতিদিনের অভ্যাসমতো বাজারে ছুটলেন বা দাঁত ব্রাশ করে মুখ ধুলেন। এখানে ইচ্ছা হয়েছিল বলে বাজারে গিয়েছেন বা দাঁত মেজেছেন, দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্যে পড়ায় তা মনে থাকে না। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন দাঁত মাজলেন বা বাজার গেলেন, আপনি বুঝতে পারবেন এর পেছনে দাঁত মাজার বা বাজার যাবার ইচ্ছা কাজ করেছে। এই পর্যায়ের ইচ্ছাগুলোর অবস্থান চেতনার একপ্রান্তে।

(৩) এই পর্যায়ের ইচ্ছা আপনার জ্ঞানের একেবারে বাইরে না থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের মতো সহজে এগুলোর অস্তিত্ব বোঝা যায় না। নিজের মনকে নিজে কিছুটা বিশ্লেষণ করলে এরকম ইচ্ছার অস্তিত্ব ধরা যায়। এক জন মানুষের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে করতে হঠাৎ তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। এরকম ঘটনার জন্য আপনার মনে ওই মানুষটাকে চড় মারার ইচ্ছা দায়ী, এটা প্রথমে বোঝা যাবে না। খানিকটা গভীভাবে নিজেকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, এক্ষেত্রে মারার ইচ্ছাই আপনাকে চড় মারতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

(৪) কিছু ইচ্ছার অস্তিত্ব নিজের মন বিশ্লেষণ করেও বোঝা যায় না। কাজ দেখে বা আগে মনে এরকম ইচ্ছা হয়েছিল ভেবে এরকম ইচ্ছার অস্তিত্ব কিছুটা অনুমান করা যায় মাত্র। একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন আপনি ধূমপান করেন। 'আর সিগারেট ছোঁব না'—প্রতিজ্ঞা করে গত সাত দিন একটাও সিগারেট খাননি। এমন সময় বাড়িতে বন্ধু এল। দুজনে গল্প করছেন। বন্ধু সিগারেট ধরিয়ে দু-একটা টান দিয়ে সিগারেটটা ছাইদানে রেখেছেন। গল্প করতে করতে কখন যে ছাইদান থেকে বন্ধুর সিগারেটটা তুলে টানতে শুরু করেছেন তা নিজেই জানেন না। স্ত্রী চা দিতে এসে সহাস্যে আপনার প্রতিজ্ঞার কথা বন্ধুকে মনে করিয়ে দেওয়ায় বুঝতে পারলেন, আপনি প্রতিজ্ঞা ভেঙে সিগারেট খাচ্ছেন। এই ঘটনায় ছাইদান থেকে সিগারেট তুলে তাতে টান দেওয়ার জন্য দায়ী বন্ধুকে সিগারেট খেতে দেখে আপনার মনে জেগে ওঠে সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা। কখন যে এরকম ইচ্ছা হয়েছিল, তা জানতেও পারেননি। তবে স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে যাবার পর আপনার বুঝতে আর বাকি রইল না যে, এরকম ইচ্ছা মনে জেগেছিল।

এরকম ইচ্ছা সম্পর্কে গিরীন্দ্রশেখরের দুটো মূল্যবান পর্যবেক্ষণের কথা বলি।

(ক) এরকম ইচ্ছা অনুমানসাপেক্ষ হলেও কাজ দেখে এরকম ইচ্ছা সম্পর্কে এক জন মানুষের মনে ইচ্ছার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকে না।

(খ) এরকম গোপন ইচ্ছা মনের প্রকাশ্য ইচ্ছাকেও হারিয়ে দিতে পারে। 'সিগারেট খাব না'—আপনার মনের এরকম প্রকাশ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি আবার সিগারেট খেলেন গোপন ইচ্ছার বশে।

(৫) এই পর্যায়ের ইচ্ছাও অনুমানসাপেক্ষ। তবে বিশ্লেষণ ছাড়া এরকম ইচ্ছার অস্তিত্ব ধরা অসম্ভব। কেউ যদি আপনার কাজ বিশ্লেষণ করে এই ইচ্ছার কথা ধরিয়ে দেয়, আপনি কিছুতেই তা মানতে পারবেন না। কেননা এরকম ইচ্ছা নৈতিকতাবিরোধী। ধরা যাক, হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজনে এক বন্ধুর কাছ থেকে দ-হাজার টাকা ধার নিলেন। বললেন, পরের মাসের এক তারিখে মাইনে পেয়েই তাঁর বাড়িতে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসবেন। মাইনে হবার পর বন্ধুকে টাকা ফেরত দেবার কথা ভুলে গেলেন বেমালুম। স্ত্রী মনে করিয়ে দেওয়ায় এক রবিবার ওই বন্ধুর বাড়ি গেলেন। যাবার সময় সঙ্গে করে টাকাটা নিতে ভুলে গেলেন। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে পড়লেন লজ্জায়। বন্ধু বললেন, 'তাতে কি হয়েছে। আমি

পরের রবিবার বিকালে তোমার বাড়ি যাব।' কথাটা স্ত্রীকে বলতে ভুলে গেলেন। রবিবার দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে কোথায় যাচ্ছেন বাড়িতে না জানিয়েই চলে গেলেন এক তাসের আড্ডায়। রাতে বাড়ি ফিরে শুনলেন, বন্ধু এসে টাকা না নিয়ে ফিরে গেছে।

স্ত্রী আপনাকে রাতে বলতেই পারেন, পরপর আপনার এতগুলো ভুল পুরোপুরি ইচ্ছাকৃত। আপনি আসলে বন্ধুকে টাকাটা ফেরত দিতে চাইছেন না। সব ভুলের উৎপত্তি ওই টাকা শোধ না করবার ইচ্ছা থেকে বা বন্ধুকে ঠকাবার ইচ্ছা থেকে। আপনি স্ত্রীর ওপর রাগ করবেন। এরকম ইচ্ছার কথা মেনে নিতে চাইবেন না। বোঝাতে চেষ্টা করবেন, সবকটা ভুলই হয়েছে নিতান্ত অনিচ্ছায়। কাজের ঝঞ্ঝাটে। আপনার স্ত্রী মনে করিয়ে দেবেন, নিজের পাওনা তুলতে তো ভুল হয়নি। এক তারিখে মাইনে ছাড়াও কালই যে 'বকেয়া পাওনা' অনেকগুলো টাকা অফিস থেকে তুলে এনেছেন। তবু আপনি স্ত্রীর যুক্তি মানবেন না, পালটা যুক্তি সাজাবেন। 'মানুষেরই ভুল হয়। এরকম অনৈতিক ইচ্ছা আমার মতো সৎ লোকের হয় না। অফিসের নানা টেনশানে আছি বলেই বারবার ভুল হচ্ছে' ইত্যাদি। বারবার একই ভুল হলে এরকম ইচ্ছা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। গিরীন্দ্রশেখরের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ, 'এই সকল ভুল বা অন্যমনস্কতা একটা নিয়মের অধীন, আকস্মিক নহে।'

(৬) এই পর্যায়ের ইচ্ছাগুলো নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। কারণ মনের এই অচেতন ইচ্ছাগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সাধারণত অন্ধকারে থাকি। কোনও কাজ বিশ্লেষণ করে এরকম ইচ্ছার অস্তিত্ব ধরিয়ে দিলেও কিছুতেই তা মেনে নেওয়া যাবে না। বরং এরকম ইচ্ছাকে 'অদ্ভুত ও অসম্ভব' বলে মনে হবে। আগের পর্যায়ের ইচ্ছার থেকে এরকম ইচ্ছা পুরোপুরি আলাদা। 'লোককে ঠকাবার ইচ্ছা' এমন কোনও অলীক ব্যাপার নয় যে, তা পুরোপুরি অবিশ্বাস্য লাগবে। অন্যকে ঠকিয়ে বড়লোক হবার বহু দৃষ্টান্ত আমাদের চারপাশে রয়েছে। তাই 'লোক ঠকাবার ইচ্ছাকে' 'অসম্ভব' বলা যায় না। পাশাপাশি যদি বলি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মৃত্যুর ইচ্ছা রয়েছে, তবে হঠাৎ করে কোনও পাঠক তা মেনে নেবেন না। অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেবেন।

মনোবিজ্ঞান বলে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই মরার ইচ্ছা কিছুমাত্রায় হলেও থাকে। এক জন বয়স্ক মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। বা এক জন সৎ বলে পরিচিত কমবয়েসি পুলিশ অফিসার ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে ঘুষ নেবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জুতোর ফিতে দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা গেলেন। পরীক্ষায় পাশ না করতে পেরে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে ষোলো বছরের এক যুবক আত্মঘাতী হল। তেরো বছরের এক জন কিশোরী মায়ের বকা খেয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা গেল। এরকম দৃষ্টান্ত আমাদের চারপাশে ঝুড়িঝুড়ি। এ সব ঘটনাগুলো থেকে বলা যায়, শুধু বেশি বয়সে নয়, যে কোনও বয়সেই এক জন মানুষের মনে মৃত্যুর ইচ্ছা অবশ্যই থাকে। দুঃখকষ্টের জ্বালাযন্ত্রণায় যা প্রকাশ্যে চলে এসে যে কোনও বয়সের যে কোনও মানুষকে আত্মহননে প্রবৃত্ত করে।

পাঠক জানতে চাইবেন, আমাদের প্রত্যেকের মনে মৃত্যুর ইচ্ছা যদি থাকে, সব সময় তা প্রকাশ পায় না কেন? কারণ অচেতন মৃত্যুর ইচ্ছা পুরোপুরি বিপরীত বাঁচার ইচ্ছার আড়ালে চাপা পড়ে থাকে। ব্যতিক্রমী মুহূর্তগুলো বাদ দিলে, আমরা সবসময় বেঁচে থাকতে, এই পৃথিবীর রূপরসগন্ধকে প্রাণভরে অনুভব করতে বড় ভালবাসি। কবিগুরু যখন বলেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' তখন কবির কথার সঙ্গে আমরা একাত্মতা অনুভব করি। কারণ, আমরা বাঁচতে ভালবাসি। হঠাৎ করে কোনও বিপদে আপদে, তীব্র মানসিক আঘাতে বা শোকে এই বাঁচার ইচ্ছার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এর বিপরীত মৃত্যুর ইচ্ছা। সেই মুহূর্তে মৃত্যুইচ্ছা খুব তীব্র হলে তার প্রভাবে এক জন মানুষ আত্মহত্যা করে বসতে পারেন।

সব সময় মৃত্যুর ইচ্ছা এত তীব্রভাবে মনে ভেসে ওঠে না। তখন এক জন মানুষ এমন কিছু করতে পারেন, যা বিশ্লেষণ করলে, তার মধ্যে মানুষটার মারা যাবার পরোক্ষ ইচ্ছা খুঁজে পাওয়া যাবে। ধরা

যাক, কোনও এক বহুতল বাড়িতে আগুন লেগেছে। আগুন এতটা ছড়িয়েছে যে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। অনেকসময় দেখা যায়, এমন অবস্থাতেও দু এক জন মানুষ ঘরে আটকে পড়া মানুষকে বাঁচাতে ওই বাড়িতে ঢুকে পড়েন আর মারা যান। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এভাবে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে এক ধরনের পরোক্ষ মৃত্যুইচ্ছা বা আত্মহননের প্রবণতা কাজ করে। যে যুদ্ধে মৃত্যুর সম্ভাবনা খুব বেশি, এক জন মানুষ যখন স্বেচ্ছায় ওই যুদ্ধে যান—তাঁর ওই কাজ মৃত্যুইচ্ছার নামান্তর মাত্র। ট্রেন, ট্রাম বা বাসে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝুলতে ঝুলতে যাতায়াতের মধ্যেও কিছুমাত্রায় মৃত্যুইচ্ছা অবশ্যই থাকে। আমাদের প্রতিদিনের নানা ধরনের ঝুঁকিযুক্ত কাজের পিছনে মারা যাবার ইচ্ছে নানাভাবে, নানামাত্রায় কাজ করে।

মানুষের মনের মৃত্যুইচ্ছা এরকম নানাভাবে প্রকাশ পায়। হয়তো অনেকে এ ব্যাপারটা মেনে নিতে পারবেন না। একটা উপমার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। মানুষের মনের মৃত্যুইচ্ছা যেন আমাদের পেটের বাঁদিকের ওপরে থাকা প্লীহা (Spleen)। সব মানুষেরই প্লীহা আছে। তবু স্বাভাবিক অবস্থায় এর অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি না। শুধু তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান থেকে এক জন ডাক্তার বুঝতে পারেন যে তাঁর রোগীর পেটে প্লীহা আছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও অন্য কিছু রোগে প্লীহা বড় হয়। রোগীও তখন তা বুঝতে পারেন। এই উপমা থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন ম্যালেরিয়ার মতো রোগে যেমন প্লীহার অস্তিত্ব বোঝা যায়, সঙ্কটে বা দুঃখদুর্দশায় তেমনি বোঝা যায় মৃত্যুচিন্তার উপস্থিতি। অন্যসময় প্লীহার মতো মৃত্যুইচ্ছাও আড়ালে থাকে। এটা যে আছে তা বোঝাই যায় না। যদি না শরীরে প্লীহার বা মনে মৃত্যুইচ্ছার উপস্থিতি সম্পর্কে এক জন মানুষ তত্ত্বগতভাবে অবহিত থাকেন।

মৃত্যুইচ্ছা প্রকাশ্যে চলে আসবার নানারকম মাত্রাভেদ আছে। অপমানের জ্বালায় যে অফিসার গলায় জুতোর ফিতে দিয়ে ফাঁস লাগান বা অবসাদগ্রস্ত যে শিল্পী মেট্রোরেলের বিদ্যুৎবাহী লাইনে ঝাঁপ দেন, তাঁদের ক্ষেত্রে মৃত্যুইচ্ছাও আত্মহত্যা করবার আগে মনে চলে আসে তীব্রভাবে। এরকম ক্ষেত্রে মৃত্যুইচ্ছা স্থান নেয় সংশ্লিষ্ট মানুষের চেতনার কেন্দ্রে। আবার ঝড় উঠলে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নৌকাডুবি নিশ্চিত জেনে কবি শেলী (Percy Bussy Shelly) যখন নেহাত আনাড়ি লোকের সঙ্গে সমুদ্রে নৌকা ভাসান—তখন তাঁর মনে এই মৃত্যুইচ্ছা ততটা প্রকট থাকে না। এর অবস্থান চেতনার কেন্দ্রে নয়, একপাশে। দাউদাউ করে একটা বাড়ি জ্বলছে দেখে যে মানুষ কাউকে বাঁচাতে আগুনে ঝাঁপ দেয় তার সেই মুহূর্তের মৃত্যুইচ্ছার তীব্রতা একইরকম। যুদ্ধে যাওয়ার মধ্যে যে মৃত্যুইচ্ছা তার তীব্রতা আরও কম। ভিড় ট্রেনবাসে ঝুলতে ঝুলতে যাতায়াতের মধ্যে যে মৃত্যুইচ্ছা তা আরও পরোক্ষ, মৃদু।

এই পর্যায়ের ইচ্ছাগুলোর ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যে মানুষ জায়গা থাকতেও ট্রেন বা বাসের ভিতরে না গিয়ে দরজায় ঝোলেন, তাঁর এই কাজের পেছনে পরোক্ষভাবে হলেও মৃত্যুইচ্ছা দায়ী। অথচ বাস্তবে দেখা যাবে, মৃত্যুতে তাঁর চরম ভয়। অচেতনের এরকম ইচ্ছা, বেশির ভাগ সময়ে সচেতনে ঠিক বিপরীত ভাবের জন্ম দেয়। একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় নানা ধরনের স্বপ্নে। যদি বলি এক জন পুরুষের অচেতন মনে তাঁর জীবিত বাবার মৃত্যুর ইচ্ছা বা মৃত্যুকামনা থাকে, তবে অনেকেই ঘোরতর আপত্তি করবেন। কারণ চেতনায় রয়েছে ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ 'বাবা যেন আরও বহুদিন বাঁচেন' এরকম ইচ্ছা। স্বপ্নে কখনও বাবার মৃত্যু দেখলে, সচেতন মনের প্রভাবে চরম কষ্টযন্ত্রণা তৈরি হয়। এরকম হয় বিশেষ করে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে ওঠার পর। এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন' (১০১ পাতায়) অধ্যায়ে।

এতক্ষণ যে সব ইচ্ছার কথা বলা হল, তার যে কোনও শ্রেণীর ইচ্ছাই স্বপ্নে চলে আসতে পারে। তবে স্বপ্নে সাধারণত অচেতন ইচ্ছাই আসে বেশি। স্বপ্নকে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ না করলে এরকম ইচ্ছার অস্তিত্ব বোঝা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সহজসরল চেতন বা অবচেতনের ইচ্ছা বাচ্চাদের স্বপ্নে আসে বেশি, বড়দের কম। এ ধরনের বহু স্বপ্নের দৃষ্টান্ত পাঠক পাবেন 'স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণ' 'বাচ্চাদের স্বপ্ন' আর 'মুশকিল আসানের স্বপ্ন' অধ্যায়ে।

এখন দেখা যাক, কাজের সঙ্গে ইচ্ছার সম্পর্ক কি? মনোবিজ্ঞান বলে, যে কোনও কাজের পিছনে মনে কোনও না কোনও ইচ্ছা অবশ্যই থাকে। ধরা যাক, আপনি নতুন মোটর সাইকেল কিনেছেন। সাইকেল আপনি চালাতে জানেন না। মোটর সাইকেল চালাতে জানেন এমন এক বন্ধু আপনাকে

মোটর সাইকেল চালাতে শেখার তালিম দিচ্ছেন আপনার পিছনে বসে। প্রথমদিকে এক কাজে বাধা প্রবল। মোটর সাইকেল চালাতে চালাতে প্রতি পদে পদে এই কাজে আপনাকে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। একবার রপ্ত হয়ে গেলে, দু-চাকার এই বাহন চালাতে চালাতে আপনি আর 'চালাবার ইচ্ছা' সজ্ঞানে অনুভব করবেন না। পাঠক লক্ষ করবেন, এক্ষেত্রে কাজে বাধা আসবার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাও মনের অগোচরে চলে গেল। প্রসঙ্গত বলি, সাইকেল চালাতে জানেন না এমন মানুষ প্রায়ই সাইকেল চালাবার স্বপ্ন দেখেন। শান্ত মানুষ দেখেন রাগী হয়ে ওঠার বা মেজাজ হারাবার স্বপ্ন। এই বইতে নানা জায়গায় এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এর বিপরীত দিকটা একবার ভাবুন। আপনি হয়তো রোগা পাতলা মানুষ। ধরা যাক, প্রচণ্ড বলশালী এক জন মানুষের ওপর কোনও কারণে আপনার মনে খুব রাগ। তাকে মারা শারীরিক কারণে আপনার পক্ষে অসম্ভব। এটা জানেন বলে তাকে মারার ইচ্ছা কখনও সচেতনে থাকবে না। এরকম ইচ্ছা আদৌ তৈরি হলে তা চলে যাবে অচেতনে। এখন যদি আপনি স্বপ্ন দেখেন যে ওই মানুষটাকে আপনি সম্মুখসমরে ধরাশয়ী করছেন, তবে বুঝতে হবে ওই মানুষটাকে মারার ইচ্ছা থেকে ওই স্বপ্নের জন্ম। সচেতনে আপনি তা মেনে নিতে পারবেন না। কারণ অচেতন মনে একরম ইচ্ছার অস্তিত্ব আপনার জ্ঞানের বাইরে। পাঠক বুঝতে পারলেন, কাজে বাধা শুধু কম নয় সাধ্যের বাইরে চলে গেলেও, ওই কাজের পিছনে ইচ্ছার অস্তিত্ব আর চেতনায় থাকে না।

আমাদের অচেতন মনে নানা ধরনের হাজারটা ইচ্ছা থাকে। এই ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ আমরা করতে পারি না সমাজ, শিক্ষা, সহবত—এ সবের প্রভাবে তৈরি হওয়া তীব্র বাধার ফলে। চেতনায় থাকা ইচ্ছা বাধা পেলে তা নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশ পেতে চায়। অফিসে বড়বাবুর ওপর রাগ হল। বড়বাবুর ওপর রাগ দেখানো অসম্ভব। তাতে চাকরিতে ক্ষতির সম্ভাবনা। বাড়িতে সেই রাগ গিয়ে পড়ল স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের ওপর। একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে নিজের সচেতন ইচ্ছার এরকম রূপান্তরের দৃষ্টান্ত আপনি নিজের আচরণের মধ্যে অবশ্যই খুঁজে পাবেন।

সচেতন ইচ্ছার মতো চাপা পড়া ইচ্ছাও নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে নানারকম কাজের মধ্যে প্রকাশ পেতে চায়। এরকম প্রকাশের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। স্বপ্নে অবদমিত ইচ্ছা কতরকম ভাবে চলে আসতে পারে তা নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা থাকলে স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারা যায় সহজে।

আমি এখানে গিরীন্দ্রশেখর বসুর দেওয়া একটা উপমা যতটা সম্ভব সহজে পাঠকের সামনে রাখার চেষ্টা করব।

মনে করুন, রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল, আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়েছে। অর্থাৎ আপনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। ডাক্তার আপনাকে চিনি ও অন্য মিষ্টি খেতে নিষেধ করেলন। আপনি এই নির্দেশ মেনে চললেন। কেন না চিনি, মিষ্টি খাওয়া বন্ধ না করলে অকালে মৃত্যুর ভয় আছে। আপনার ভেতরকার বেঁচে থাকার ইচ্ছা এখানে চিনি বা মিষ্টি খাবার স্বাভাবিক ইচ্ছাকে নষ্ট করে দিল। আপনি মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করলেন ডাক্তারের নিষেধের সঙ্গে আপনার বেঁচে থাকবার ইচ্ছার মিল খুঁজে পেয়ে। গিরীন্দ্রশেখর মনে করতেন, বাইরের কোনও বাধা আমাদের মনের কোনও ইচ্ছাকে নষ্ট করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন হয় মনে বিপরীত ইচ্ছার (এক্ষেত্রে বেঁচে থাকবার) প্রকাশ্যে চলে আসা। এরকম ক্ষেত্রে আপনার আচরণ হতে পারে নানারকম—

(১) ডাক্তারের নিষেধ না মেনে মিষ্টি খাবেন। এখানে মিষ্টি খাবার ইচ্ছার কাছে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা হার মেনেছে।

(২) *মিষ্টি দেখলে খেতে ইচ্ছে হতে পারে, তাই বাড়িতে সবাইকে বলে দিলেন,* 'সাবধান! বাড়িতে *যেন মিষ্টি না ঢোকে!' মনে যা চাইছেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছার প্রভাবে ঠিক তার বিপরীত কাজ করলেন।*

(৩) মিষ্টি খাবার খুব ইচ্ছা হল, অথচ খেতে পারলেন না। অকারণে স্ত্রী, ছেলেমেয়েকে অন্য প্রসঙ্গে বকাবকি শুরু করলেন।

(৪) বন্ধুর বাড়ি গেলেন। একপ্লেট মিষ্টি এল আপনার জন্য। বললেন, 'আমি মিষ্টি খাই না'। অথচ অন্যমনস্কভাবে গল্প করতে করতে মিষ্টি খেয়ে নিলেন।

(৫) মিষ্টি খাবার ইচ্ছা হল। মনকে বোঝালেন। স্ত্রীকে বললেন, 'তেলেভাজা আনাও। তেলেভাজা খাব।'

(৬) মিষ্টির বদলে খুব বেশি ফল খেতে শুরু করলেন।

এভাবে বাস্তবে মিষ্টি খাবার ইচ্ছা মিটল অন্য কাজে। কল্পনায় এই ইচ্ছা কতভাবে মিটতে পারে তা বলি—

(১) কল্পনায় মিষ্টি খেলেন। স্বপ্নে এই ব্যাপারটা আসতে পারে সরাসরি।

(২) মুড়ি বা চিঁড়ে খেয়ে মিষ্টি খাবার ইচ্ছা মেটালেন।

(৩) বাড়িতে অতিথি বা আত্মীয়স্বজন এলে সামনে বসে তাঁদের প্রচুর মিষ্টি খাওয়ালেন। তাঁদের আনন্দে নিজে আনন্দিত হলেন তাঁদের সঙ্গে মানসিকভাবে একাত্মতা অনুভব করে। মনোবিজ্ঞানে এরকম একাত্মতার নাম **'আইডেন্টিফিকেশান'**।

(৪) মিষ্টি খাবার বিরুদ্ধে মনে মনে নানারকম যুক্তি দাঁড় করালেন। যেমন, মিষ্টি খেলে ওজন বাড়ে বা মিষ্টি খেলে দাঁত খারাপ হয়। এটা যেন সেই শিয়ালের 'আঙুরফল টক' ভাবার মতো ব্যাপার।

(৫) মিষ্টি খাবার নানা কাল্পনিক বাধা মনে তৈরি করে তা দিয়ে মিষ্টি খাবার ইচ্ছাকে দমন করলেন। যেমন, 'এই অঞ্চলে মিষ্টির দাম বড় বেশি', 'এখানে ভলো মিষ্টি পাওয়া যায় না', বা 'এখানকার সব মিষ্টিতে ভেজাল।'

(৬) 'মিষ্টি খুব ক্ষতিকর। রামবাবু প্রচুর মিষ্টি খান। এর ফল তিনি কয়েকবছরের মধ্যেই বুঝতে পারবেন। অকালে মারা যাবেন'—এখানে নিজের মিষ্টি খাবার ইচ্ছা চাপালেন রামবাবুর ঘাড়ে। মনোবিজ্ঞানে নিজের ইচ্ছা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে তাকে দোষ দেবার চেষ্টা করার প্রবণতার নাম **'প্রোজেকশান'** বা অভিক্ষেপ।

রুদ্ধ ইচ্ছা কতরকমভাবে বাস্তবে চলে আসতে চায়, পাঠক তা বুঝতে পারলেন। স্বপ্নে এরকম নানাভাবে অচেতনের চাপা পড়া ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে তৃপ্ত হতে চায়। নানাভাবে বিকৃত হয়ে আসে বলে স্বপ্নে অচেতন ইচ্ছার অস্তিত্ব সহজে বোঝা যায় না।

অজানা ইচ্ছার নানা ধরন নিয়ে এত সবিস্তার আলোচনা করবার কারণ আছে। এ সম্পর্কে সাধারণভাবে আমরা তেমনভাবে সচেতন নই। স্বপ্ন কি কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণ? এই প্রশ্নের জবাবে অনেক শিক্ষিত মানুষও আমাকে জানিয়েছেন, আদৌ তা নয়। আসলে ইচ্ছা বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি, বাস্তবে ইচ্ছার ব্যাপ্তি তার চাইতে অনেক অনেক বেশি। ইচ্ছার এই শ্রেণীবিভাগ আর নানা ধরনের ইচ্ছার নানা চরিত্র ভলোভাবে না বুঝলে স্বপ্নে নানা ধরনের ইচ্ছার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। স্বপ্নের দেশে ঘুরতে বেড়িয়ে ইচ্ছা নিয়ে এত কথাবার্তা কোনও পাঠকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। স্বপ্ন নিয়ে আলোচনার গভীরে যেতে যেতে এই অধ্যায়ের ভাবনাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন

অধ্যাপক সুবোধ সরকার থাকেন কলকাতার লেক গার্ডেনসে। কৃষ্ণনগরের ছেলে সুবোধ। ওখানকার বাড়িতে কেটেছে অনেকগুলো বছর। এখন মা আছেন কৃষ্ণনগরে। নানা কাজের চাপে বেশি যেতে পারেন না মায়ের কাছে। মায়ের কাছে থাকা—সন্তানের, বিশেষ করে ছেলেদের এক চিরন্তন ইচ্ছা। বড় হয়ে যাওয়া সুবোধের মধ্যেও এবকম ইচ্ছা গভীরভাবে বেঁচে থাকে চেতনায়, অবচেতনে। ইচ্ছা মেটে স্বপ্নে। স্বপ্নে প্রায়ই মায়ের কাছে চলে যান সুবোধ। বসে থাকেন মায়ের পাশে। আসন্ন সন্ধ্যা, একটা দুটো পাখি ডাকে। মনোরম সন্ধ্যায় মায়ের পাশে চুপটি করে বসে থাকতে বড় ভলো লাগে সুবোধের।

কাবেরী গোস্বামীর প্রিয় ভালোলাগা হল শিশু। বাচ্চাদের সঙ্গ ভীষণ ভলোবাসেন। গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অনাথ শিশুদের আশ্রয় দেবার, বড় করবার তীব্র ইচ্ছা কাবেরীর মনে। বারবার দেখেন একটা স্বপ্ন। বিবাট বড় একটা বাড়ি। রাস্তায় পড়ে থাকা বাচ্চাদের তুলে আনা হয়েছে সেই বাড়িটায়। কয়েকশো বাচ্চা হেসেখেলে বেড়াচ্ছে ঘরে ঘরে। রাতদিন কাবেরী রয়েছেন ওদের সঙ্গে। এ স্বপ্নও তো ইচ্ছাপূরণের। বাস্তবে নয়, কল্পনায়।

এই পর্যায়ে এসে স্বপ্নের অর্থ খোঁজার দিকে এগোনোর চেষ্টা করা যাক। সুবোধ আর কাবেরীর স্বপ্নের মতো সহজ সরল স্বপ্ন আর মানুষ কটা দেখেন। বেশিরভাগ স্বপ্নই আসে উদ্ভট, আজগুবি হয়ে। এ সব স্বপ্নের অর্থ বুঝতে যাওয়া যেন অন্ধকার এক জঙ্গলে কোনও একটা বিশেষ গাছকে খুঁজে বেড়ান। অথচ, 'প্রত্যেকটা স্বপ্নের রয়েছে নির্দিষ্ট একটা মনোগত গঠন (Psychical Structure), আর রয়েছে নির্দিষ্ট একটা অর্থ।' স্বপ্নের দর্শকের জেগে থাকা অবস্থার চিন্তাধারায় তার দেখা স্বপ্নের একটা অর্থবহ জায়গা রয়েছে। তবে বেশিরভাগ স্বপ্নই কেন এত অদ্ভুত? এগুলোর অর্থই বা বোঝা যাবে কীভাবে?

এই অন্ধকার অনেকটা ফিকে হয়ে আসে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের আলোয়। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ফ্রয়েডের স্বপ্ন-ব্যাখ্যার মৌলিক পদ্ধতি নিয়ে মনস্তত্ত্বের জগতে শুরু হয়েছিল এক নতুন অধ্যায়। হাজার হাজার সাধারণ মানুষ আর মনোরোগীর স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে সেদিন ফ্রয়েড পৌঁছেছিলেন আলোড়ন তোলা এক সিদ্ধান্তে। 'স্বপ্ন মাত্রই মনের মধ্যে চাপা পড়ে থাকা অপূর্ণ কোনও ইচ্ছার কাল্পনিক পূরণ'। ফুলফিলমেন্ট অফ সাপ্রেসড অর রিপ্রেসড উইশ। যে কোনও স্বপ্নের প্রাথমিক ব্যাখ্যা মনে চাপা পড়ে থাকা কোনও ইচ্ছার পূর্ণতালাভ, এটা ধরে নিলে যে কোনও স্বপ্নের মানে খুঁজে বেড়ানোর ব্যাপারটা সহজতর হয়ে আসে। যদিও স্বপ্নের এই প্রাথমিক ব্যাখ্যা কিছুটা অতিসরলীকরণ। বেশির ভাগ স্বপ্নকে সঠিক পদ্ধতিতে খুঁড়তে পারলে স্বপ্নের গভীর একটা অর্থ অবশ্যই পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতি জটিল, এ ব্যাপারে আমরা ভাবনাচিন্তা করব পরে।

স্বপ্ন মাত্রই ইচ্ছাপূরণ—এই তত্ত্বকে মেনে নিতে গেলে একের পর এক প্রশ্ন উঠে আসতে থাকে মনে। যদি তাই হবে তবে স্বপ্ন সময় বিশেষে এত জটিল বা উদ্ভট হয় কেন? এর উত্তর খুব কঠিন নয়। স্বপ্নের দেশের নিয়মকানুন আর স্বপ্নকল্পনার গতি প্রকৃতিতে রপ্ত হয়ে গেলে বুঝতে সুবিধা হবে, কেন স্বপ্ন সময় বিশেষে এত জটিল, অদ্ভুত। পাঠক প্রশ্ন করবেন, ভয়ের স্বপ্নে, আতঙ্কের স্বপ্নে কী করে ইচ্ছাপূরণ হয়? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাবে ভয়ের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনার সময়। হয়তো কাল দেখা, ভাবা বা শোনা কোনও কথা চলে এসেছে আপনার গতকাল রাতের স্বপ্নে। এও কি ইচ্ছাপূরণ? এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের বক্তব্য প্রাঞ্জল। প্রত্যেকটা স্বপ্নের আপাত অর্থ (Manifest Content) আর তা খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁজে পাওয়া গভীর অর্থে (Latent Content) ব্যাপারটায় রপ্ত হলে প্রত্যেকটা স্বপ্নের পেছনে

অপূর্ণ, অতৃপ্ত কোনও না কোনও বাসনা, কামনা বা ইচ্ছার অস্তিত্ব পাওয়া যাবেই।

স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় এই ব্যাখ্যার সঙ্গে এক মত হতে পারেননি ফ্রয়েডের সময়কার ও ফ্রয়েড পরবর্তী বহু গবেষক মনোবিদ। মনোবিদ পাভলভ একটা সময় ফ্রয়েডের অন্ধ সমর্থক ছিলেন। পরে পাভলভ অস্বীকার করেন ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে। পাভলভের কিছু কথা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। 'একটা পাহাড় খুঁড়ে তার নীচে রেল লাইন বসাবার কাজ শুরু করেছিলাম আমরা। আমরা ঠিক জায়গাটা খুঁজে বসিয়ে দিলাম লাইন। আর ও (ফ্রয়েড) আরও বেশি খুঁড়তে গিয়ে আসল কাজটাই করে উঠতে পারল না।'

ফ্রয়েড পরবর্তী বিশিষ্ট মনোবিদ অ্যাডলার ও ইয়ুন ফ্রয়েডের স্বপ্ন ব্যাখ্যার তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন কিছু জায়গাতে। এক কালের ফ্রয়েডীয় মনোবিদ সি.জি. ইয়ুন তিরিশের দশকের প্রথমদিকে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে স্বপ্নসংক্রান্ত ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকে সরাসরি আক্রমণ করে বসেন তীব্র ভাষায়। তার আগে থেকেই ইয়ুনের স্বপ্নতত্ত্বের জগতে মনোবিজ্ঞানের চাইতে প্রাধান্য পেতে শুরু করে দর্শন। আর ঘুমের নানা স্তরের সঙ্গে স্বপ্ন দেখার সম্পর্ক নিয়ে হালের স্বপ্ন-গবেষকদের কাজকর্মের যে ধারা, তা পুরোপুরি শারীরতত্ত্ব দিয়ে চালিত। মনের ব্যাপারটা সেখানে গৌণ। হালের স্বপ্নবিদদের অনেকে বলতে চাইছেন, সব স্বপ্নের পিছনেই রয়েছে জীববৈজ্ঞানিক কারণ। 'বায়োলজিক্যাল কজ অফ ড্রিমস।' যদি তাই হয়, তবে হয়তো একদিন স্বপ্নের সবটুকু স্বপ্নত্বই যাবে চলে।

সব স্বপ্ন কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণ না হলেও অনেক স্বপ্নে যে মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে মেটে, এ ব্যাপারে বহু মনোবিদ এক মত। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাঙালি স্বপ্নগবেষক মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর বসুর নাম। আপাতত স্বপ্ন মাত্রই ইচ্ছাপূরণ কিনা এই বিতর্ক থাক। আমরা বরং নানা পেশার আর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মানুষের স্বপ্নে কত বিচিত্র ইচ্ছাপূরণ ঘটে তা খোঁজার চেষ্টা করি।

যে মানুষের মনের জগৎ যত সরল, সেই মানুষের স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণ ঘটে তত সরাসরি। এর সবচাইতে ভালো দৃষ্টান্ত বাচ্চাদের স্বপ্ন। বাচ্চাদের স্বপ্নের বেশিরভাগ সহজসরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন। অনেকের ধারণা, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের স্বপ্নও ছিল আজকের শিশুদের মতো। বড় হয়ে যাওয়া মানুষের মানসিকতা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। অনেক বড় হয়ে যাওয়া মানুষের স্বপ্নে গোপন ইচ্ছার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় বিস্তর খাটাখাটনির পর। মনোবিজ্ঞান, স্বপ্নের দর্শকের স্মৃতি আর পারিপার্শ্বিক নানা তথ্যের ভিত্তিতে স্বপ্নটাকে কাটাছেঁড়া (Dissection) করে।

ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। কবির জীবন ছিল স্বপ্নময়। কমবয়েস থেকে তাঁর দেখা বিচিত্র নানা স্বপ্নের কথা ধরা থাকত কবির স্মৃতিতে। বড় হয়ে স্বপ্ন দেখবার পরদিন আগের রাতে দেখা স্বপ্নের কথা লিখে রাখতেন ডায়েরিতে। বা স্বপ্নের বিবরণ শোনাতেন ঘনিষ্ঠ কাউকে। হয়তো স্ত্রী, পুত্র বা ঘনিষ্ঠজনকে লেখা চিঠিতে চলে এসেছে সেই স্বপ্নের কথা। রবীন্দ্রনাথের দেখা স্বপ্নগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। নিতান্ত বালক বয়সে মাতৃহীন কবি একরাতে স্বপ্নে মা সারদাদেবীর দেখা পান শান্তিনিকেতনে। কবির বয়স তখন সাতচল্লিশ (১৯০৮)। এই স্বপ্নের বিবরণ উল্লেখ করেছি পাঁচ পাতায়। গীতাঞ্জলির একটা কবিতায় ওই স্বপ্নের প্রভাব রয়েছে। কবিতায় সুর দিয়ে পরে তা পরিণত হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতে। এই গান অনেকেই শুনেছেন।

'জননী তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি ও অরুণকিরণ রূপে।
জননী তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপেচুপে।'

১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণে যান জাহাজে চেপে। স্ত্রী আর দুই পুত্রকন্যার সঙ্গে দীর্ঘদিন দেখা না হবার বেদনায় ওই সময় কবির হৃদয় ছিল ভারাতুর। 'জাহাজ চলেছে উত্তাল সমুদ্রের ওপর দিয়ে—এদিকে কবির মন পড়ে রয়েছে কলকাতায়, জোড়াসাঁকো গৃহের আপন নিভৃত

কক্ষটিতে।' সেটাই স্বাভাবিক, কেন না মেয়ে বেলা তখন চার বছরের আর ছেলের বয়েস দুই। জাহাজে যেতে যেতে কবির নিশ্চয়ই ইচ্ছে হত স্ত্রীপুত্রকন্যাকে দেখতে। বাস্তবে অসম্ভব এই মিলন ঘটল এক রাতে স্বপ্নে। কবি দেখলেন, কবির আত্মা যেন শরীর ছেড়ে বেরিয়ে জোড়াসাঁকো পৌঁছে গেছে। স্ত্রীকে লিখছেন—

'একটা বড়ো খাটে একধারে তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে বেলি খোকা শুয়ে। আমি তোমাকে একটুআধটু আদর করলুম—তারপর বেলি খোকাকে হাম দিয়ে ফিরে এলুম।'

এই স্বপ্ন দেখবার ঠিক চারদিন পরে কবি তাঁর ভলোবাসার কন্যাকে আবার পেয়ে যান স্বপ্নে। লিখছেন,

'কাল রাত্তিরে বেলিটাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম—সে যেন ষ্টীমারে এসেছে—তাকে এমনি চমৎকার ভলো দেখাচ্ছে সে আর কি বলব।'

বড় মেয়ে বেলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের টান ছিল বরাবরই বেশি। তাঁর বহু কবিতায়, গানে, চিঠিপত্রে এর প্রমাণ রয়েছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বপ্নে মেয়েকেই বারবার দেখতে পাবার মধ্যে তাই আশ্চর্যের কিছু নেই।

১৯১২ সালের পৌষমাসে কবি ছিলেন মার্কিনদেশে। ৬ পৌষ আমেরিকায় বসে অবশ্যই শান্তিনিকেতনে পবের দিনের শুভ অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে পারার তীব্র বেদনা কবির মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। শান্তিনিকেতনে ৭ পৌষের অনুষ্ঠান হচ্ছে, অথচ রবীন্দ্রনাথ সেখানে অনুপস্থিত! তা কি করে সম্ভব? সমস্যা মেটে রাতের স্বপ্নে। ৬ পৌষ রাতে দেখা এই স্বপ্নের বিবরণ পাওয়া যায় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা কবির চিঠি থেকে:

"স্বপ্ন দেখলুম, তোমাদের সকাল বেলাকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে—আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছি—কিন্তু কেউ জানে না। তুমি যখন গান গাচ্ছ, 'জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী', আমি মন্দিরের উত্তরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ছায়ার মতো যাচ্ছি—তোমাদের পিছনে গিয়ে বসব—তোমবা কেউ কেউ টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে উঠেছ। এমনতর সুস্পষ্ট স্বপ্ন আমি অনেক দিন দেখিনি। জেগে উঠে ওই গানটা আমার মনে বাজতে লাগল।"

এবার স্বপ্নসন্ধানের অভিজ্ঞতার কথা বলি। বিচিত্র হাজাবটা ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন রয়েছে আমার ফাইলে। কবি, লেখক দিব্যেন্দু পালিতের একটা ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন শোনাই। দিব্যেন্দুর ছেলেবেলা, কৈশোর, যৌবন কেটেছে ভাগলপুরে। ওই সময় একটা স্বপ্ন দেখেছেন বারবার। চিত্রাভিনেত্রী পরমাসুন্দরী মধুবালার সঙ্গে ভাগলপুরের রাস্তায় সাইকেল রিকশায় চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিশোর বয়সে রোম্যান্টিক নায়িকা মধুবালাকে খুব পছন্দ করতেন। মধুবালা অভিনীত 'মহল' ছবি দেখেছেন কম করে দশবার! মধুবালার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো তাই সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন।

একটা ছোট বাচ্চা। বাবা তার স্কুলের মাস্টার। তাই বাবার পকেটে থাকত ছোটছোট চক। পৃথিবীর সব চককে নিজের পকেটে ভরার তীব্র ইচ্ছা থাকত সেকালের বাচ্চাদের। ইচ্ছা পূর্ণ হত স্বপ্নে। শিশু স্বপ্ন দেখত, পেল্লাই সাইজের বিশাল একটা চক। যেন একটা থাম। দুহাতে আঁকড়ে ধরে আছে স্বপ্নের দর্শক শিশু। সেই বাচ্চা আজ বড় হয়ে গেছে অনেক। তিনি আজ লেখক, বিজ্ঞানকর্মী। স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর নাম।

সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলেবেলা কেটেছে বাংলাদেশের খুলনা শহরে। ১৯৪৭ সালে ওঁর সাড়ে ছ-বছরের বড় দাদা মারা যান অপঘাতে। ওঁরা তখন নতুন এসেছেন কলকাতায়। প্রিয় দাদা নেই। তার সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ নেই বাস্তবে। তাই প্রায়ই দাদা এসে হাজির হতেন স্বপ্নে।

"দেখতাম, খুলনা শহরে স্কুলের মাঠে ম্যাচ হচ্ছে। দাদা সাইকেল নিয়ে মাঠের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিগো তুমি মরে যাওনি?' দাদা বললেন, 'না তো!' আনন্দে আমি জোরে জোরে পা ফেলে বাড়ির দিকে হাঁটছি। তাড়াতাড়ি বাড়িতে খবরটা দিতে হবে।"

চিত্র পরিচালক তপন সিংহ তাঁর নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে এক সকালে আমাকে তাঁর এই বয়সে দেখা একটা ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নের কথা জানান। তপনবাবুর স্ত্রী অরুন্ধতী দেবী মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর।

তপনবাবুর স্মৃতিতে, চেতনায় অরুন্ধতী দেবীর স্মৃতি আর রবীন্দ্রনাথের গান রয়েছে মিলেমিশে। মাঝেমধ্যে স্বপ্নে চলে আসেন অরুন্ধতী দেবী।' হয়তো একটা খুব চেনা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন। যে গানটা আগে প্রায়ই গাইতেন।' বা দুজনে একসঙ্গে বসে কোনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছেন। এরকম স্বপ্ন দেখলে 'বড় ভালো লাগে' সত্তর পার করে দেওয়া 'সাগিনা মাহাতো'র পরিচালকের।

দুই বিখ্যাত শিল্পী তাঁদের একই ধরনের স্বপ্নের কথা আমাকে বলেন। চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্য বাবাকে হারিয়েছেন মাত্র সাড়ে চার বছর বয়সে। ওঁর কাছে আজও দুর্মূল্য স্মৃতি হয়ে বেঁচে আছে খুব ছোটবেলায় বাবার হাতের ওপর বসে ট্রামে করে কোথাও একটা যাবার কয়েকটা মুহূর্ত। বাস্তবে বাবাকে হারিয়েছেন সেই কবে। তবু বাবা আজও তীব্রভাবে বেঁচে আছেন বিকাশের চেতনায়, অবচেতনে। বাবার অভাব মেটে স্বপ্নে। প্রায়ই বাবা আসেন বিকাশের স্বপ্নে। কথা বলেন, পরামর্শ দেন। একটা সময় গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের চাকরি ছাড়া নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল বিকাশের মনে। 'কেউ বলছেন, ছেড়ে দাও। কেউ বলছেন, এত ভালো সরকারি চাকরি কেউ ছাড়ে!' এরকম একটা টালমাটাল সময়ে ছেলেদের সবচাইতে বেশি প্রয়োজন হয় বাবার মতামত। বাস্তবে বাবা নেই। তবু বাবার পরামর্শ পেয়ে যান এরকম একরাতের স্বপ্নে। বাবা বলেন, 'চিন্তা করিস না, চাকরিটা ছেড়ে দে।' পরদিন সকালে উঠেই চাকরি ছেড়ে দেন বিকাশ। আর কোনওদিন তাকাননি পিছন ফিরে।

ভাস্কর সোমনাথ হোরের বাবা যখন মারা যান, তখন সোমনাথের বয়স তেইশ। 'একটা পুরো যৌথ পরিবার নির্ভরশীল ছিল ওই এক বাবার ওপর।' বাবার অভাব ভীষণভাবে বুকে বাজত যুবক সোমনাথের। আজও বাজে। বাবার অভাব মেটে স্বপ্নে। সেই সময় থেকে শুরু করে ৫০-৬০ বছর বয়স পর্যন্ত সোমনাথের স্বপ্নে বহুবার এসেছেন তাঁর বাবা। দেখতেন, 'বাবা এসেছেন বাড়িতে। খুব হইচই হচ্ছে। বাবা বাড়িতে আসা মানেই আনন্দ, ফুর্তি।' সোমনাথের স্বপ্নে বারবার ফিরে এসেছেন হারিয়ে যাওয়া বাবা, সোমনাথকে দিয়েছেন আশ্রয়ের ছায়া, নির্ভরতার আশ্বাস। বাবাকে ফিরে পাবার তীব্র ইচ্ছা বাস্তবে মেটা সম্ভব নয় বলেই সোমনাথ বহুবার বাবাকে পেয়ে গেছেন স্বপ্নে। আর স্বপ্নে হারিয়ে যাওয়া বাবাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে ভেসে গেছেন প্রতিবার। আজ এই ৭৬ বছর বয়সেও বিখ্যাত ভাস্কর সোমনাথ হোর মাঝেমধ্যে বাবাকে ধরে ফেলেন স্বপ্নে।

স্বপ্নে প্রিয় ভাইদের সঙ্গে দেখা হওয়া, গল্পগুজব—এটা অবশ্যই ইচ্ছাপূরণ। মহাশ্বেতা দেবীর ভাই তিনজন। তিনজনই মৃত। একরাতের স্বপ্নে মহাশ্বেতা পৌঁছে যান এক শীতের সন্ধ্যাবেলা। তখনও আলো জ্বালা হয়নি। মহাশ্বেতা একটা দরজা খুলতেই দেখেন, ভাই ফল্গু দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে বললেন, 'ফল্গু, তুমি!'—পাশ থেকে অবু বলে উঠল, 'আমাকে বুঝি দেখতে পাচ্ছ না?' দুজনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন দিদি মহাশ্বেতা। 'দিদি আমিও আছি!'—অনীশ দাড়ি কামাচ্ছিল, জড়ানো গলায় বলে উঠল কথাগুলো। এবার এই তিনজনকে ধরে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে মহাশ্বেতাকে। কিভাবে যাবেন, কে ট্যাক্সি ডেকে দেবে, ভাবতে ভাবতে মিলিয়ে যায় স্বপ্নটা।

স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে থাকেন আমেরিকায়। অনেকদিন দেখেননি ছেলেকে। ছেলেকে কাছে পাবার জন্য উতলা হয় মায়ের মন। এক একরাতে ছেলেকে পেয়ে যান স্বপ্নে। দেখেন, ছেলে রয়েছে বাড়িতেই। অবাক হয়ে স্বপ্নেই জানতে চান, 'কিরে, তুই যাসনি?' কখনও বা স্বপ্নে ছেলে ফিরে আসে বিদেশ থেকে। অনেকদিনের জন্য। এরকম স্বপ্ন দেখে সকালে উঠে স্বপ্নের ইচ্ছাপূরণের আনন্দের রেশটা থেকে যায় স্বাতীর মনে।

আনন্দবাজার পত্রিকা-র কার্যনির্বাহী সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায়ের একটা স্বপ্নের কথা বলি। সুমনের মা মারা গেছেন। স্বপ্নে মায়ের দেখা পান মাঝে মাঝে। মায়ের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেছেন। বা মা কিছু কিনে দিচ্ছেন। স্বপ্নে বাস্তবের হারিয়ে যাওয়া মাকে ফিরে পেয়ে বড় আনন্দ হয় স্বপ্নের দর্শক সুমনের। কলকাতার এক বাংলা দৈনিক পত্রিকায় এক ৩৮ বছরের মহিলা সাংবাদিক একইভাবে স্বপ্নে পেয়ে যান মারা যাওয়া মাকে। এক রাতে স্বপ্নে এসে মা ওঁকে বললেন, 'আম কেটে দে, খাব। দেখিস যেন আঁশ না থাকে। গলায় আটকাবে।' খুব আম খেতে ভালোবাসতেন মহিলা।

চল্লিশ বছরের এক মহিলার ইচ্ছাপূরণের এক রোমান্টিক স্বপ্ন। মহিলা বিবাহবিচ্ছিন্না। বর্তমানে এক জন 'কাছের মানুষ' রয়েছেন ওঁর। ভদ্রলোকের ডিভোর্স না হওয়ায় বিয়ে করতে পারছেন না দুজন।

এক রবিবার পুরুষবন্ধুটি এলেন। দুজন গল্প করলেন অনেকক্ষণ। রাতে মহিলা স্বপ্ন দেখলেন, কোনও একটা অচেনা জায়গায় বেড়াতে গেছেন। একটা দারুণ সুন্দর রাস্তা ধরে হাঁটছেন দুজনে। উঠেছেন পুরোপুরি কাঁচের তৈরি একটা হোটেলে।

রেলের একজন লজেন্স বিক্রেতা একবার স্বপ্নে দেখা পান স্বপ্নের নায়কের। বাবলু নামের এই তিরিশের যুবক একদিন স্বপ্নে চলে যান ওঁর দিদির বাড়ির পাশের একটা মাঠে। মাঠে সিনেমার শুটিং হচ্ছে। নায়ক তাপস পাল নামলেন গাড়ি থেকে। বাবলু এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলেন, 'কি তাপসদা। ভালো আছেন তো!' যেন কতদিনের পরিচয়! তাপস পাল হ্যান্ডশেক করলেন বাবলুর সঙ্গে। বাবলু বললেন, 'খুব ভালো অভিনয় হচ্ছে আপনার। চালিয়ে যান!' স্বপ্নের নায়ক স্বপ্নে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বাবলুকে।

উত্তরপাড়া থেকে ২৮ বছরের সঞ্জিত চক্রবর্তী তাঁর একটা বিচিত্র স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন। বারবার দেখা এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন ফাঁকা একটা মাঠে। ওঁর পাশ দিয়ে আরোহীবিহীন একদল ঘোড়া দৌড়ে চলেছে কোনও একদিকে। ঘোড়ার সংখ্যা যখন কমে আসছে তখন একটা ঘোড়ার পিঠে কোনওরকমে চেপে বসেন সঞ্জিত। আর ঘোড়াটা ওকে নিয়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে এগোয়। এই স্বপ্নে ছোটবেলায় রূপকথার গল্পে পড়া পক্ষীরাজ ঘোড়ার শৈশবস্মৃতি চলে এসেছে। ওই গল্প শুনতে শুনতে আশ্চর্য ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে শূন্যে ভাসতে চায় বাচ্চার কল্পনাপ্রবণ মন। স্বপ্নের দর্শকের শৈশবের ওই ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হয়েছে বড় হয়ে তাঁর দেখা এই স্বপ্নে।

বর্ধমান জেলার পানাগড়ের ক্লাস টেনের ছাত্র অভীক ভট্টাচার্য এক রাতে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখে। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন দুই আন্তর্জাতিক ফুটবল নক্ষত্র। মারাদোনা আর পেলে! অভীক দৌড়চ্ছে বল নিয়ে গোলের দিকে। মারাদোনা দৌড়ে বল কেড়ে নিতে এলেন। তাজ্জব ব্যাপার! অভীকের পায়ে লাগতেই মুখ থুবড়ে পড়লেন মারাদোনা! আর অভীক অবলীলায় দিয়ে দিলেন একটা গোল। হাজার হাজার দর্শক ছুটে এল। দর্শকরা কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করল অভীককে নিয়ে। একবার মারাদোনা আর শচীন দুজনেই আত্মজীবনী লেখার অনুরোধ করেছিলেন কলকাতার এক সাংবাদিককে। এই স্বপ্নের কথা আগে বলেছি।

স্বপ্নের নায়কনায়িকার সঙ্গে দেখা হওয়া, আড্ডা দেওয়া—একরকম সুপ্ত বাসনা থাকে কত মানুষের মনে। কারও কারও এই বাসনা মেটে স্বপ্নে। স্বপ্নে প্রায়ই শচীন তেন্ডুলকার চলে আসেন আগরতলার তপতী দে-র স্বপ্নে। শুধু আসেন না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শচীন তার খাটে বসে আড্ডা মারেন তপতীর সঙ্গে। তপতীর হবি শুনবেন? শচীনের ছবি কেটে কেটে অ্যালবাম বানানো। গত আট বছর ধরে এরকম ছবি সংগ্রহ করে চলেছেন। একরাতে এককালের দুনিয়া কাঁপানো ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি স্বপ্নের ডিনারে নেমন্তন্ন করেছিলেন স্বপ্নের ম্যাচের আম্পায়ার সাংবাদিক অনুভা করকে। উত্তমকুমার আজও এক যুবকের স্বপ্নের নায়ক। একবার উত্তর চব্বিশ পরগনার এই যুবকের বাড়িতে একটা বড় ঝামেলা বাধল। আর স্বপ্নে ঝামেলা মেটাতে হাজির হলেন স্বয়ং উত্তমকুমার!

বাঙালি যুবকদের প্রেমে পড়া যৌবনের 'স্ট্যাটাস সিম্বল'! একটাও প্রেমে না পড়া যুবকেরা বন্ধুবান্ধবদের কাছে অপদস্থ হয় যাচ্ছেতাইভাবে। বর্ধমান জেলার গুসকরা থেকে ছাব্বিশের এক যুবক স্বপ্নে প্রেমে পড়ার কাহিনী আমাকে জানান। ওঁদের এলাকায় এক ছোট পরিবার ভাড়া এসেছে। আর কোনওভাবে যুবক ওই পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছেন। গোটাটাই স্বপ্নে। ওই বাড়ির এক অষ্টাদশী প্রেমে পড়েছে যুবকের। মেয়েটির বাবা বলেছেন, 'তুমি আসবে। তুমি এলে মেয়েটা খুব ভালো থাকে।' তারপর দুজনে শুধু প্রেম আর প্রেম! এক সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, 'সিনেমার নায়ক নায়িকার কায়দায় ডান হাত ওর বাঁ হাতের কনুইয়ের মধ্য দিয়ে' হাঁটা! প্রেমের 'তীব্র স্বাদ' স্বপ্নে পাওয়া সরল ইচ্ছাপূরণ, যা পেয়েছিলেন এই স্বপ্নের দর্শক।

উত্তর চব্বিশ পরগনার সান্দিপনী গ্রামের ২৮ বছরের চাকরিজীবী যুবক সুকুমার সাহা। একরাতে স্বপ্নে অফিস যেতে যেতে চলে গেলেন মুম্বই। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে। লতা সুকুমারের গায়ে হাত রাখলেন ভ্রাতৃস্নেহে। বললেন, 'কেমন আছিস? অনেক দিন তোদের কোনও খবরাখবর পাই না! তোর মা বাবা কেমন আছেন? এখন কি করছিস? গানের লাইনটা ছাড়লি

কেন?' ইচ্ছাপূরণের মাত্রাটা একবার বুঝুন! একটা দুটো নয়, আমার ঝুলিতে স্বপ্নের নায়ক নায়িকাকে নিয়ে এ ধরনের স্বপ্ন আছে ঝুড়িঝুড়ি।

ত্রিপুরার আগরতলার গৃহবধূ চিত্রলেখা রায় খেলাপাগল। এক রাতে, 'স্বপ্নে দেখলাম আমি আর সুনীল গাভাসকার একটা বিশাল উঁচু বাড়ি থেকে সিঁড়ি দিয়ে গল্প করতে করতে নীচে নেমে আসছি।' দার্জিলিং এর ক্রিকেট পাগল তপেন রায় এক রাতে অচেনা একটা মাঠে নেট প্র্যাকটিস করেছেন কপিলদেবের সঙ্গে। সিঙ্গুরের দেবাশিস মুখার্জি স্বপ্নে দীর্ঘ আড্ডা মেরেছেন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার অর্জুনা রণতুঙ্গার সঙ্গে। এরকম স্বপ্নের বিবরণ পড়ে কারও কাছে তা অবিশ্বাস্য মনে হলেও আমার কাছে এগুলো ষোলো আনা খাঁটি। উল্লেখ করা হয়েছে এমন স্বপ্নগুলো অনেক ক্ষেত্রে একই স্বপ্নের বিবরণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বারবার নেওয়া আর পরীক্ষা করা।

কিছুটা জটিল, উদ্ভট একটা ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দিয়ে আপাতত স্বপ্নের নায়কনায়িকাদের প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। এই স্বপ্নের দর্শক কলকাতার এক সংবাদপত্রের ৩৮'বছরের একজন মহিলা সাংবাদিক। গুলাম আলি ওর প্রিয় গায়ক। গত কয়েকবছর ধরে স্বপ্নে গুলাম আলির দেখা পেয়েছেন বেশ কয়েকবার। একরাতে দেখেন এই আজগুবি স্বপ্নটা। গুলাম আলি প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে শুয়ে আছেন একটা খাটে। আর খাটের মাথার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছেন স্বপ্নের দর্শক। গুলাম আলিকে শেখাচ্ছেন 'মায়াবন বিহারিণী হরিণী'। মহিলা তেমন একটা গান জানেন না। ভালোবাসেন রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্য নানা ধরনের গান শুনতে। এরকম স্বপ্নের ভেতর একাধিক ইচ্ছাপূরণের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে কষ্ট করতে হয় না।

অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বপ্ন সংগ্রহ করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। 'ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার' চালু প্রবাদ খানিকটা হলেও সত্যি। ছেঁড়া কাঁথায় শোয়া হতদরিদ্র মানুষ একরম স্বপ্ন না দেখলে এই প্রবাদ চালু হল কোথা থেকে? বাস্তবে এরকম মানুষের মূল অনটন খাদ্যের, টাকাপয়সার, জামাকাপড়ের আর বাসস্থানের। সমস্যাগুলো বাস্তবে মেটে না, বরং দিন দিন আরও তীব্রতর হয়। সমস্যার চটজলদি সমাধান হয় স্বপ্নে। সবার নয়, কারও কারও। কোন্নগরের দরিদ্র বিড়িশ্রমিক অনিল বসাক একবার স্বপ্নে বালিশের নীচে অনেক টাকা পেয়ে যান। শিয়ালদা প্ল্যাটফর্মের ভিখিরি রাখু রুইদাস এক রাতে স্বপ্ন দেখে ওর মাথার কাছে একটা বস্তাভর্তি টাকা পড়ে আছে। ঘুম ভেঙে এরকম স্বপ্নকে মর্মান্তিক মনে হয়। তবু স্বপ্নে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য 'বড়লোক' তো হওয়া যায়!

বাংলায় একটা চালু প্রবাদের কথা অনেকে জানেন। 'স্বপ্নেই যখন বিরিয়ানি রাঁধছ, তখন আর ঘি ঢালতে কার্পণ্য কেন?' স্বপ্নের প্রাপ্তি যে বেশিরভাগ সময় প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যায়, তা কিছুটা বোঝা যায় এরকম প্রবচন থেকে। স্বপ্নে টাকা পাওয়ার যে কটা স্বপ্নের কথা আমার জানা আছে, তাতে স্বপ্নের দর্শক অল্পস্বল্প নয়, পেয়ে যায় হাজার হাজার বা লাখ লাখ টাকা। মুর্শিদাবাদের লালগোলার চায়ের দোকানদার সিরাজুল আলির কথাই ধরা যাক। সিরাজের সংসার চলে অভাবে অনটনে। এক রাতে ও স্বপ্নে লটারিতে পেয়ে যায় দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার। দিনে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা যার রোজগার, তাঁর স্বপ্নের লটারিতে প্রাপ্তি দু-এক লাখ নয় একেবারে দশ লাখ টাকা! 'এমন একটা কথা স্বপ্নেও ভাবিনি', অনেককেই এরকম কথা বলতে শোনা যায়। কথাটার অর্থ কিছুটা বোঝা যায় সিরাজুলের স্বপ্ন থেকে।

লটারির টিকিট বিক্রেতা সত্য পাল তার এরকম একটা স্বপ্নের কথা আমাকে বলেন। বহু বছর লটারির টিকিট বিক্রি করেও আজ পর্যন্ত খুব বেশি টাকার প্রাইজ ওঠেনি ভদ্রলোকের টিকিট থেকে। যা দু-চারটে উঠেছে সবই পঞ্চাশ, একশো কি পাঁচশো টাকার। একরাতে বৃদ্ধ স্বপ্ন দেখেন, ওঁর বিক্রি করা টিকিট থেকে উঠেছে একটা রাজ্য লটারির প্রথম পুরস্কার। আর সেই সুবাদে মোটা অঙ্কের কমিশন মিলেছে ওঁর। বোলপুরের কাছে তালতোড় গ্রামের নিতাই দাস রিকশা চালায় বোলপুরে। দিনে রোজগার করে চল্লিশ থেকে আশি টাকা। প্রায়ই ভাবে আরও বেশি রোজগারের কথা। বাস্তবে রোজগার বাড়ে না তেমন একটা। স্বপ্নে এক একদিন দিনের শেষে রোজগার হয়ে যায় ২০০, ২৫০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত!

মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের শেখ আজিজুল হক থাকে বরানগরে। কাজ করে রাজমিস্ত্রির। এক বড় কন্ট্রাকটারের কাছে। আজিজুলের দৈনিক রোজগার বাঁধা পঞ্চাশ টাকা। একরাতে স্বপ্ন দেখে, ও যেন বড় এক জন কন্ট্রাকটর। ওর কাছে কাজ করে প্রায় শ'দুয়েক মিস্ত্রি-মজুর। আর ওর দিনের রোজগার সাত আটশো টাকা। দীনু হাজরা নামের মুর্শিদাবাদ জেলার এক সব হারানো যুবক কাজ করেন রাজমিস্ত্রির 'যোগাড়ি'র। শ্রীরামপুরে। ওঁর এক দিনের রোজগার ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। দীনুর মনের গোপন ইচ্ছা ও খুব বড় রাজমিস্ত্রি হবে। এক দিন রাতে স্বপ্ন দেখে, একটা বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে একা-একা। কারও সাহার্য ছাড়াই। আর ওর কাজ দেখে খুব খুশি হয়ে পিঠ চাপড়ে দিচ্ছেন 'আর্টিস্টবাবু' (আর্কিটেক্ট)। এরকম স্বপ্নে মনের আশা কি সহজেই না মিটে যায়!

স্বপ্নে যে মানুষ মাত্রা ছাড়ানো প্রত্যাশার কথা ভাবে তা লুকিয়ে আছে 'স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি' কথাগুলোর মধ্যে। এক তরুণ কবি কবিতা লিখছেন মাত্র কয়েক বছর। এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর কবিতার ফরাসি অনুবাদ হয়ে বই বেরিয়েছে ফ্রান্স থেকে। আর ফরাসি সরকার ওই বইটার জন্য তাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। কবিকে চিঠি দিয়েছে প্যারিসে সাত দিনের জন্য রাষ্ট্রীয়-অতিথি হয়ে পুরস্কার নিতে যাবার জন্য। কবির নামটা ইচ্ছে করেই লিখছি না। ক্লাস টেনের স্কুল ছাত্র অভিজিৎ দে পড়াশোনায় ভালো। পরীক্ষায় নম্বর পায় ষাট শতাংশের মতো। তাই বলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে, এটা অভিজিৎ কখনও ভাবে না। এক রাতে 'মা সরস্বতী' এলেন ওর কাছে। বর দিলেন। সেই বরে অভিজিৎ স্বপ্নের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পেয়ে গেল সবচাইতে বেশি নম্বর!

ইচ্ছাপূরণের তীব্রতম স্বপ্নটার কথা আমাকে জানিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. টেক. এর ছাত্র পীযূষকান্তি রায়। এক রাতে পীযূষ চলে যান ক্যালিফোর্নিয়া। উদ্দেশ্য গবেষণা। গবেষণায় সফল হলেন পীযূষকান্তি। সোরগোল পড়ে গলে সারা বিশ্ব জুড়ে। আর নোবেল কমিটি বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যতিক্রমী সাফল্যের জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী পীযূষকান্তি রায়কে!

বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত এক এলাকায় বহু আদিবাসী নারীপুরুষের স্বপ্ন সংগ্রহ করার সুযোগ হয়েছে এই লেখকের। এঁদের স্বপ্নে শিশুদের স্বপ্নের মতো সহজ সরল ইচ্ছাপূরণ আসে বারবার। দুবেলা ভালোভাবে ভাত জোটে না যাদের, তারাও স্বপ্নে আপেল আঙুর খায়। খায় বিরাট ভোজ। নবগ্রামের শমীকা হেমব্রমের বিয়ে হয়েছে বর্ধমান জেলাতেই। বদ্যিপুর গ্রামে। বিয়ের মাসখানেক বাদে শমীকা স্বপ্ন দেখে, নিজের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে খুব আদর করছে। বাচ্চাটা ফুলের মতো সুন্দর, ফুটফুটে।

রঘু মাণ্ডি ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী। দিন কাটে অভাবে, অনটনে। মাসে একদিন মাছ পেলে সেই ওর কাছে 'মহাভোজ'। অভাব মেটে স্বপ্নে। প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখেন রঘু। পেট পুরে মাংস ভাত খাবার। একই স্বপ্ন দেখেন যুবক বৈদ্যনাথ বাস্কে। মুমুণ্ডা গ্রামের ক্ষেতমজুর বুধো মুর্মু স্বপ্নে মাঝেমাঝে রাশিরাশি আপেল, আঙুর খায়। নবগ্রাম বাঁধপারের ক্ষেতমজুর ২৪ বছরের ছবি সরেন খায় আম আর কলা। ২১ বছরের হতদরিদ্র সুন্দরী সরেন মাঝেমধ্যে নেমন্তন্ন খায় কোনও উৎসবের বাড়িতে। মাংস-পোলাও, লুচি সন্দেশ, আরও কত কি! আর এরকম ভোজে খুব আনন্দ হয় সুন্দরীর। পুরুলিয়ার আদিবাসী বৃদ্ধ রামচাঁদ মুর্মু প্রায়ই স্বপ্ন দেখে ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাতের। স্বপ্নে গোগ্রাসে গরম গরম ভাত খায় রামচাঁদ।

গরম ভাত বা মাছমাংস যে-গরিব সহায়সম্বলহীন মানুষের কাছে কতটা অমূল্য তা অনেকের পক্ষে হয়তো কল্পনা করা কঠিন। আপেল, আঙুর বা কলার মতো সামান্য ফল জীবনে মাত্র এক আধবার খেয়েছে বা কখনও খায়নি এমন বহু আদিবাসী মানুষকে আমি জানি। আপেল-আঙুর, আম-কলা এঁদের অনেকের কাছে 'স্বপ্নের ফল'। 'স্বপ্নের ভোজ' মাছ বা মাংস দিয়ে পেট পুরে গরম ভাত খাওয়া। এঁদের জীবনের সামান্য এটুকু চাহিদাও যে মেটাতে হয় স্বপ্নে!

চিকিৎসক হিসেবে আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি। এক দম্পতি বিয়ের সাত বছর বাদেও নিঃসন্তান। অনেক চিকিৎসাতেও মহিলা মা হতে পারেননি। মহিলা একদিন আগের রাতে তাঁর দেখা একটা স্বপ্নের কথা বলেন। তাঁর এক সঙ্গে পাঁচটা বাচ্চা হয়েছে। সম্ভবত একটা মেয়ে। বাকি সবকটা ছেলে। মহিলাকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জানা যায় 'কোডাক'এর বিখ্যাত ছবির পোস্টার, যাতে অনেকগুলো ফুটফুটে বাচ্চা রয়েছে পরপর, তিনি দেখেছেন আগের দিন সকালে, স্টুডিওতে একটা ছবি তুলতে

গিয়ে। আর এক নিঃসন্তান গ্রামীণ দম্পতি অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছিলেন কোনও বাচ্চাকে দত্তক নেবার। দত্তক নেবার আবেদন করে সরকারি নিয়মকানুনের ফাঁসে ব্যাপারটা আটকে ছিল প্রায় একবছর। সমস্যার চটদলদি সমাধান হয় মহিলার এক রাতের স্বপ্নে। দেখেন, একটা সদ্যোজাত বাচ্চাকে কারা যেন ফেলে রেখে গেছে নির্জন একটা বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে বাচ্চাটাকে তুলে এনে ওঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন একজন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী। এই স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করেন ওই এলাকায়। স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে মাসে একবার আসেন ওঁদের চাপাডাঙার বাড়িতে।

এক মহিলা এলেন সময় পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঋতুস্রাব না হবার সমস্যা নিয়ে। মহিলার একটাই ছেলে। বছর পাঁচেকের। বাচ্চার দৌরাত্ম্যে তিনি অস্থির। তা ছাড়া সামনেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ফাইনাল পরীক্ষা। পর দিন এসে জানালেন, আগের রাতে দেখা স্বপ্নের কথা। স্বপ্নে আপনা থেকেই বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় মহিলার। অবাঞ্ছিত সন্তানের মা হবার হাত থেকে রেহাই দেয় স্বপ্নের গর্ভপাত। এই স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণ হয়েছে অঙ্কের নিয়মে, সহজভাবে।

সব সময় ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন এত সহজভাবে আসে না। আসে খানিকটা ঘুর পথে। বিয়ের এক মাসের মাথায় এক নবদম্পতি এলেন। এই মহিলার সমস্যা আগের মহিলার মতোই। ওঁরা বাচ্চা চান না অন্তত বছর দুয়েক। অথচ সেই মাসে ঋতুস্রাবের তারিখ পেরিয়েই গেছে দিন সাতেক। মহিলাকে পরীক্ষা করে সাত দিন বাদে আসতে বলি। পরের সপ্তাহে এলে জানতে চাই, তাঁর এই ক-দিনে দেখা স্বপ্নের কথা। একটা স্বপ্ন মনে করতে পারলেন খুব ভালোভাবে। ওঁর দিদি ভর্তি হয়ে আছেন নার্সিংহোমে। ওর একটা ছোট অপারেশান হয়েছে। এই অপারেশান সম্ভবত অ্যাবরশান করাবার। মনের প্রহরী সজাগ থাকায় নিজে নিজের অ্যাবরশান না দেখে মহিলা স্বপ্নে দিদির জায়গায় নিজেকে প্রতিস্থাপন করে ফেলেন। দিদির অ্যাবরশানের স্বপ্ন তাই নিজের না চাওয়া মাতৃত্বের হাত থেকে মুক্তি। মুক্তি বিয়ের পর প্রথম ক-বছরের স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকে।

এক মাসখানেকের বাচ্চার মা তাঁর একটা স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। কৃষ্ণাদেবীর সমস্যা ছিল তাঁর বাচ্চা বুকের দুধ পাচ্ছে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুটা কৌটোর দুধ খাওয়াতে হচ্ছিল বাচ্চাকে। কৃষ্ণাদেবীর স্বপ্নটা ছিল এরকম। তাঁর স্তন থেকে দুধ বার হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে। আর তিনি বেবিফুডের কৌটোতে সেই দুধ ধরে রাখছেন। নিজের সন্তানকে চাহিদা মতো দুধ না দিতে পারার অপূর্ণ বাসনা থেকে এই স্বপ্নের উৎপত্তি। বাস্তবের অপূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে স্বপ্নে। নিজের দুধ তিনি ধরে রাখছেন খালি বেবিফুডের কৌটোতে। যাতে বেবিফুডের বদলে দরকার পড়লেই ধরে রাখা বুকের দুধ বাচ্চাকে খাওয়ানো যায়।

বেশ কিছু বাচ্চাদের স্বপ্নে মজার মজার ইচ্ছাপূরণের দৃষ্টান্ত পেয়েছি। ক্লাস ফাইভের এক ছাত্র। নাম তার ঋত্বিক পাল। ও জন্মাবার আগেই ওর দাদু মারা যান। ওদের শোবার ঘরে রয়েছে দাদুর পাজামা-পাঞ্জাবি পরা বাঁধানো এক ছবি। একদিন রাতে ঋত্বিক দেখে, পাজামা পরা দাদু এসে ওর সঙ্গে বসে গল্প করছেন। একটুও ভয় লাগেনি, বরং দাদুর সঙ্গে গল্প করতে খুব মজা লেগেছিল ঋত্বিকের। গড়িয়াহাটের টুপুর ঋত্বিকেরই বয়সী। পড়ে লা মার্টিনিয়ার স্কুলে। যেদিন ও স্বপ্নটা দেখেছে তার পর দিন থেকে স্কুলে ক্লাসের শেষে সুইমিং কোর্স শুরু হবার কথা। টুপুর দেখল ক্লাস হয়ে গেছে। ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছেলেদের সেকশানে। ওখানে সাঁতার শেখানো হচ্ছে। আর মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে টুপুর। ইচ্ছা পূরণের এই স্বপ্ন এক দিক থেকে 'ধৈর্য ধরে রাখতে না পারার স্বপ্ন'। ফ্রয়েডের ভাষায় 'ড্রিম অফ ইমপেসেন্স'। এরকম বেশ কিছু স্বপ্নের কথা পরে বলেছি।

আমার ঝুলিতে আছে এক বছর আট মাসের প্রতীকের স্বপ্ন। বিস্ময়কর এই স্বপ্ন সংগ্রহ করে দিয়েছেন ওর বাবা প্রদীপ দাশগুপ্ত। জন্মাবার পর থেকেই প্রতীকের সবচাইতে প্রিয় বন্ধু ছিল ওর পিসি। কিছুদিন আগে বিয়ে হয়ে পিসি চলে যায় শ্বশুরবাড়ি। শিশু প্রতীক পিসির অভাব বোধ করে তীব্রভাবে। দু-তিনদিন রাতে ঘুমের ভেতর ভাঙা ভাঙা কথায় চিৎকার করে ওঠে, 'পিতি...ই, পি...ই...তি এতে...তে। পি...ই...তি এতে...তে।'

ফ্রয়েড তাঁর বইতে তাঁর সবচেয়ে ছোটমেয়ে আনার [Anna Freud, ফ্রয়েডের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা, এখন মৃত। মনোবিজ্ঞানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের লেখিকা।] একটা মজার স্বপ্নের কথা লিখেছেন।

১৯ মাসের আনা একদিন বেশ কয়েকবার বমি করে। তখনকার চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী সেদিন জল ছাড়া আর কিছুই খেতে পায়নি আনা। রাতে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে, 'আন্না ফয়েদ, স্তবেইজ, অমবলেত্, পুদ্দেন'। সেই সময় কোন জিনিস তার নিজের এটা বোঝাতে শিশু আনা জিনিসটার আগে নিজের নাম উচ্চারণ করত। সে স্বপ্ন দেখে ওমলেট, স্ট্রবেরি আর পুডিং খাবার। সারাদিন না খেতে পাওয়া শিশু আনার ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নে ওর মেনুতে ছিল ওর সবচাইতে প্রিয় খাবারগুলো।

সাত বছরের সৃষ্টির বাড়ির একটা ঘরে একটা কালো পেতলের ঘোড়া আছে। একরাতে সৃষ্টি স্বপ্ন দেখে ঘোড়াটা ডানা মেলে পাশের জানালা দিয়ে উড়ে বাইরে চলে গেল। সৃষ্টি ওকে ধরে কি করে? স্বপ্নের সমাধান সহজ। ঘোড়াটাকে ধরতে ওর পেছন পেছন উড়তে শুরু করে সৃষ্টি। এই স্বপ্ন ইচ্ছাপূরণের। পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়াবার ইচ্ছা কোন বাচ্চার না থাকে! অন্যভাবে দেখলে, এটা একটা সমাধানের স্বপ্ন। সল্যুশান ড্রিম।

সিকিম বেড়াতে গিয়ে রোজ কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথাটা দেখতে পেত ছ-বছরের দেবলীনা। বাবার কাছে জানতে চাইত, পেলিং ছেড়ে ওই পাহাড়ের মাথায় কবে যাবে। একরাতে ইচ্ছাপূরণ হল স্বপ্নে। অনেকটা সময় ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় বরফের ওপর স্কেটিং করে বেড়ায় দেবলীনা। পাঁচ বছরের বিনির সবচাইতে প্রিয় নেশা পুতুল খেলা। পুতুলটার একটা পা ভেঙে যায় একদিন। খুব চিন্তায় পড়ে বিনি। কিভাবে পুতুলটার ভাঙা পা জোড়া লাগবে। নিজে অনেক চেষ্টা করেও জোড়া লাগাতে পারল না পা-টা। একরাতে স্বপ্নে পুতুলের পা জোড়া লাগাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ওদের হাউস ফিজিসিয়ান ডাক্তারবাবু বাড়িতে এসে পা-টা ঠিক জায়গায় লাগিয়ে প্লাস্টার করে দিচ্ছেন। ঠিক যেভাবে ওর দাদুর পায়ের ভাঙা হাড় জুড়ে দিয়েছিলেন 'ডক্টর আঙ্কল'।

যৌবন আসবার আর ফুরিয়ে যাবার বছরগুলোতে দেখা বেশ কিছু স্বপ্নের কথা জানার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। গোপা রায় নামের একটি মেয়ের কথা বলি। পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত ঋতুমতী না হবার জন্য ওঁকে ওর মা নিয়ে আসেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের চেম্বারে। পরীক্ষা করে দেখা যায়, কোনও সমস্যা নেই গোপার। ওঁকে জানানো হয়, ভয়ের কোনও কারণ নেই। এর পর এক মাসের মধ্যে দুদিন দুধরনের স্বপ্ন দেখে গোপা। প্রথম স্বপ্নে ও দেখতে পায় ওর বিয়ে হচ্ছে এক অচেনা পুরুষের সঙ্গে। বিয়ে আর পূর্ণযৌবন মোটামুটি সমার্থক। বিশেষ করে শহরে। দ্বিতীয় স্বপ্নে গোপা দেখে ও একটা পুকুরে স্নান করছে। আর জলের রঙটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। গোপার প্রথম স্বপ্ন পরোক্ষভাবে ইচ্ছাপূরণ। আর দ্বিতীয় স্বপ্নে সরাসরি ইচ্ছাপূরণের লক্ষণ বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

দুর্গাপুরের সুস্মিতা রায় নামের কুড়ি বছরের এক যুবতীর সমস্যা ওঁর ওজন। ওই বয়সে সত্তর কেজি ওজন ওঁকে বিব্রত করত দিনরাত। কলেজের বন্ধুরা রাগাত, বিয়ে হবে না বলে। প্রচুর ব্যায়াম, মেপেমেপে খাওয়া, ডাক্তার দেখানো কিছুতেই কোনও কাজ হল না। একদিন স্বপ্ন দেখলেন ওঁর এক বান্ধবীর বিয়েতে গেছেন মেরুন রঙের বেনারসি পরে। আর বিয়েবাড়িতে সবাই ওর সুন্দর চেহারা দেখছে আশ্চর্য হয়ে! এই স্বপ্নের মধ্যে তন্বী হবার সুপ্ত বাসনা পূর্ণ হবার ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায় সহজেই।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে বত্রিশ বছরের বেবি ইসলাম আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন তাঁর এক বিষাদমাখানো স্বপ্নের কথা। ছাত্রজীবনে বেবি ভালোবাসতেন নুরুল নামের এক সহপাঠীকে। কোনও কারণে ওঁদের বিয়ে হয়নি। নুরুল এখন দুবাইতে। স্ত্রী, পুত্রকন্যা নিয়ে জমজমাট সংসার। প্রথম প্রেম ভেঙে যাবার আঘাত তীব্র হয়ে বেজেছিল বেবির জীবনে। ঠিক করেন, বিয়ে করবেন না। আজও বিয়ে করেননি। চট্টগ্রাম শহরের এক স্কুলে পড়ান। বেবি যে স্বপ্নটার কথা আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন তা এরকম। রাতে ঘুমিয়ে আছেন নিজের ঘরে। হঠাৎ দরজায় টোকা। দরজা খুলতেই দেখেন নুরুল এসেছে। বলছে, 'আমাদের ডিভোর্স (স্ত্রীর সঙ্গে নুরুলের) হয়ে গেছে'। এই স্বপ্ন ইচ্ছাপূরণের। তবু বাস্তবের কঠিন জমিতে স্বপ্ন দেখার পর দিন সকালে কতটা ধাক্কা খেয়েছেন বেবি ভাবতেও খারাপ লাগে।

কোচবিহার থেকে ২৭ বছরের এক শিক্ষিকা তাঁর একটা অদ্ভুত স্বপ্নের কথা আমাকে জানিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর নাম গোপন রাখছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়বার সময়ে একজন

মুসলমান সহপাঠীকে ভালোবেসে ফেলেন ওই যুবতী। নিজেকে সরিয়ে নেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে। শিক্ষিকার স্বপ্ন, 'আমি একটা খাটে শুয়ে আছি—আমার প্রেমিক আমার কাছে আসছে। হঠাৎ দেখলাম ওর লিঙ্গটা নেই—পাশে খুলে রেখে এসেছে।'

প্রেমিক কাছে আসছে, এটা অবশ্যই মনের গোপন বাসনার কাল্পনিক পরিপূরণ। তবে সে লিঙ্গটা খুলে রেখে আসতে যাবে কেন? কারণ 'ওই সময় খুব ব্যথা লাগে মেয়েদের, এরকম আতঙ্ক আগেও ছিল এখনও আছে' ওই মহিলার। ইচ্ছাপূরণের বাধা দূর করতে স্বপ্নের প্রেমিককে মিলিত হবার আগে খুলে রেখে আসতে হয়েছে তাঁর পুরুষাঙ্গ। অবিবাহিতা ওই মহিলার গর্ভবতী হয়ে পড়বার আশঙ্কা দূর করতে এই ব্যাপারটা স্বপ্নে এসেছে, এমনও হতে পারে।

জরায়ুর টিউমারে ভুগছিলেন সন্ধ্যা মিত্র। ৪২ বছরের নিঃসন্তান মহিলা। অপারেশান করে জরায়ু বাদ দেওয়া হল। পর দিন সকালে ঘুম ভেঙে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন 'কোথায় গেল?' তখন বোঝা যায়নি ব্যাপারটা। পরে সুস্থ হয়ে ওঠার পর জানতে পারি, অপারেশানের রাতে স্বপ্ন দেখেছেন, সিজার করে ফুটফুটে একটা বাচ্চা হয়েছে ওঁর। সকালে উঠে পেটের তীব্র যন্ত্রণা আর আবছা স্মৃতি এই দুইয়ের দোটানায় পড়ে যান সন্ধ্যাদেবী। ঘুমের ওষুধের ঘোরে ভালো করে বুঝে উঠতে পারেন না, কী, অপারেশান হয়েছে তাঁর। জরায়ু বাদ দেবার না পেট কেটে বাচ্চা হবার! মনে হয়, বাচ্চা হলেও হতে পারে! রাতে স্বপ্নে দেখে সিসটারের কাছে তিনি জানতে চান, কোথায় গেল তাঁর বাচ্চাটা?

যৌবন চলে যাবার দিনগুলোয়, পড়ন্ত বেলায় পূর্ণ যৌবনের দিনগুলোকে ফিরে পাবার বাসনা বেঁচে থাকে বেশিরভাগ মহিলার অবচেতনে। এরকম বাসনা মেটার বেশ কিছু স্বপ্ন আমার ফাইলে রয়েছে। এর থেকে বাছাই করা কয়েকটা বলি। আটচল্লিশের গৃহবধূ মালতী বন্দ্যোপাধ্যায় একরাতে স্বপ্ন দেখেন, তাঁর বিয়ে হচ্ছে। আর বিয়ে হচ্ছে 'সেই সুন্দর চেহারার লোকটার সঙ্গে', যাঁর সঙ্গে একদিন বিয়ে হয়েছিল মালতীদেবীর। আটচল্লিশ বছরের এক অধ্যাপিকার স্বপ্ন। তিনি যেন একটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছেন। অথবা অন্য কোনও সমবয়সী মহিলা। বাচ্চাটা বেশ বড়সড়, 'ম্যাচিওর'। মায়ের দিকে তাকায়, হাসে, কথাও বলে! একদিন দেখলেন কলেজের ওঁর চাইতে ছোট এক সহকর্মীকে। তিনি যেন একটা বাচ্চার জন্ম দিচ্ছেন। ঘুম ভেঙে বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের আমেজ ধাক্কা খায়। মনে হয়, বাচ্চাটা কোথায় গেল?

এই অধ্যাপিকার প্রথম সন্তান জন্মের সময় মাথায় চোট লেগে পরে মৃগীতে আক্রান্ত হয়। বহু চিকিৎসা করেও তেমন একটা কাজ হয়নি। বরং দেখা দেয় পোস্ট এপিলেপটিক সাইকোসিস। কিছুমাত্রায় হলেও আঠাশ বছরের এই যুবক মানসিকভাবে একজন প্রতিবন্ধী।

'ওই ধরনের স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময় একটা টেনশান কাজ করে। বাচ্চাটা স্টিলবর্ণ, প্রিম্যাচিওর বা ডিফর্মড হবে না তো?' মহিলার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা আর একটা সুস্থ সন্তানের গোপন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় এরকম স্বপ্নে। ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন কখনও বা জটিল হয় স্বপ্নের 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' করে দেবার ক্ষমতার প্রভাবে। নিজের বদলে কোনও সহকর্মী বা অন্য চেনা মহিলাকে মা হতে দেখেন অধ্যাপিকা।

ইচ্ছাপূরণের আর একটা স্বপ্নের কথা বলি। হুগলি জেলার মধুসূদনপুর গ্রামের এক যুবকের স্বপ্ন। 'সাপের স্বপ্ন দেখলে সন্তানলাভ হয়'—এই বহুল প্রচলিত প্রবাদের কথা কে না জানেন! আর জানেন বলেই অনেক সময় সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে কেউ কেউ সাপের স্বপ্ন দেখেন। তার মানে এই নয় যে, সাপের যে কোনও স্বপ্নই আসে সন্তানলাভের বাসনা থেকে। সাপের সঙ্গে সন্তানলাভের চালু প্রবাদের ব্যাপারটা জানা নেই, এমন কেউ মা কিংবা বাবা হবার বাসনা থেকে সাপের স্বপ্ন দেখবেন না। পেশায় হকার ওই যুবক এই চালু প্রবাদের কথা জানেন। বিয়ে করেছেন প্রায় বত্রিশ বছর বয়সে। বিয়ের ক-দিন বাদে দেখেন এই স্বপ্নটা। একটা ঢ্যামনা আর একটা গোখরো সাপ বাড়ির দুয়ারে ওর পায়ের পাশের মাটিতে। যেন খেলা করছে। একটুও ভয় লাগছে না, বরং খুব মজা লাগছে। যুবকের বাবা হবার ইচ্ছা এই স্বপ্নে কল্পনায় মিটছে কিছুটা জটিলভাবে।

দূরদর্শনের সংবাদপাঠিকা ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য ৩৯ বছর বয়সে জীবনে একবারই একটা সাপের স্বপ্ন

দেখেন। একটা বিরাট সাপ এঁকেবেঁকে যাচ্ছে। বাস্তবে সাপকে এড়িয়ে চলেন ইন্দ্রাণী। চিড়িয়াখানায় গেলেও কোনওদিন সাপের খাঁচার দিকে যান না। অথচ স্বপ্নে সাপ দেখে একটুও খারাপ লাগেনি। এই স্বপ্নের অর্থ আর একটা বাচ্চার মা হবার ইচ্ছা। কেন না সাপের স্বপ্ন দেখলে সন্তানলাভ হয়—এই প্রবাদের কথা আরও অনেকের মতো ইন্দ্রাণীও জানেন। ইন্দ্রাণী নিজে এই স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। তিনি জানান, হ্যাঁ আর একটা বাচ্চা তিনি অবশ্যই চান। বয়েস আর ব্যস্ততার কারণে তা সম্ভব নয়। বাস্তবের অসম্ভব ইচ্ছা ইন্দ্রাণীর স্বপ্নের কল্পনায় পূর্ণ হয়েছে রূপকের মাধ্যমে।

এতক্ষণ যে স্বপ্নগুলোর কথা বললাম, তার প্রায় সবই সহজ ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন। উৎসাহী পাঠক নিজের স্বপ্নগুলোর বিবরণ স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভাঙতেই নিয়মিত লিখে রাখতে শুরু করলে, এমন অনেক স্বপ্ন পাবেন যেগুলোতে ইচ্ছাপূরণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। ভয়ের স্বপ্ন বা উদ্বেগের স্বপ্নের মধ্যে 'ইচ্ছাপূরণ' রয়েছে বললে অনেকেই তার তীব্র বিরোধিতা করবেন। যে কোনও বড় হয়ে যাওয়া মানুষ সহজসরল স্বপ্ন দেখেন কম। জটিল স্বপ্ন আসে সেই তুলনায় অনেক বেশি। এরকম জটিল স্বপ্নের কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছি 'স্বপ্নকল্পনা' অধ্যায়ে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা প্রসঙ্গে আরও অনেক জটিল স্বপ্নের বিবরণ আসবে।

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, এরকম জটিল স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণের অস্তিত্ব কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে। এককথায় এর উত্তর, স্বপ্নবিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে। যাতে স্বপ্নের দর্শকের কাছ থেকে পাওয়া নানা আনুষঙ্গিক তথ্যের আলোয় স্বপ্নটাকে খুঁড়তে খুঁড়তে তার গভীরে ঢুকে যাওয়া যায়। জটিল স্বপ্নের সঠিক বিশ্লেষণ একদিক থেকে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অচেতন মনের কোনও একটা জায়গাকে আবিষ্কার করে ফেলা। স্বপ্নবিশ্লেষণের কাজকে একজন পুরাতাত্ত্বিকের কাজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পুরাতাত্ত্বিক তার জ্ঞানের ভিত্তিতে কোনও একটা জায়গায় খননকার্য চালাতে থাকেন। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বার করে আনেন মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা প্রাচীন কোনও এক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। এক জন স্বপ্ন-বিশ্লেষকের কাজও তাই। স্বপ্নকে সঠিক পদ্ধতিতে খুঁড়তে খুঁড়তে তিনি বার করে আনেন আপাতবিবরণের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নের গভীর অর্থ। অনেকে হয়তো জানেন, পুরাতত্ত্ব আর ইতিহাস ছিল সিগমুন্ড ফ্রয়েডের প্রিয়তম দুটো বিষয়।

প্রাথমিকভাবে ফ্রয়েড মনে করতেন, যে কোনও স্বপ্ন মাত্রই কোনও একটা ইচ্ছার কাল্পনিক পূরণ। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে ফ্রয়েড তাঁর এই মতের কিছুটা পরিবর্তন আনেন। মানসিক আঘাত থেকে নানা মানসিক রোগে (Traumatic Neurosis) ভুগছেন এমন কিছু মানুষের স্বপ্নে কোনও ইচ্ছাপূরণ নেই বলে এরকম মানসিক রোগীদের স্বপ্নকে ফ্রয়েড ব্যতিক্রমী বলে উল্লেখ করছেন। ভারতীয় স্বপ্ন-গবেষক গিরীন্দ্রশেখর বসু ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে এক মত হতে পারেননি। গিরীন্দ্রশেখর মনে করতেন, স্বপ্নমাত্রই এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ। তাঁর মতে, শেষদিকে ফ্রয়েডের এরকম মত পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন ছিল না।

ইচ্ছাপূরণের ধরন অনুযায়ী স্বপ্নকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে রাখা যায় সেই সব স্বপ্নকে যেখানে মনের কোনও একটা ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে হলেও মিলে যায় সহজ সরল ভাবে। যাতে স্বপ্নের দর্শক আনন্দ পান। বাচ্চাদের বেশিরভাগ আর বড়দের কিছু স্বপ্ন এই পর্যায়ের। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকছে সেই সব জটিল স্বপ্ন যার মধ্যে ইচ্ছাপূরণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। বড়দের বেশিরভাগ স্বপ্ন, উদ্বেগের স্বপ্ন আর ভয়ের স্বপ্ন এই পর্যায়ের। উদ্বেগের স্বপ্নে বা ভয়ের স্বপ্নে কীভাবে ইচ্ছাপূরণ হয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে রূপকথার এক কাহিনী থেকে।

এক দরিদ্র কাঠুরে স্ত্রীর তাড়নায় কাঠ কাটতে গেছে বনে। দুর্বল শরীরে কুঠার চালাতে গিয়ে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে সে কাঁদতে শুরু করে গাছের তলায় বসে। এমন সময় এক পরী নেমে আসে কাঠুরের সামনে। তাঁর দুঃখকষ্ট লাঘব করতে পরী তাকে মজার একটা 'বর' দেয়। কাঠুরে প্রথম তিনবার যা চাইবে সেই তিনটে ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। আনন্দে ভাসতে ভাসতে কাঠুরে বাড়ি ফেরে। বউকে জানায় সব কথা। বলে, 'এতদিনে আমাদের ভাগ্য ফিরল। তুমি চা করে আনো, আমি তক্ষণে কি চাওয়া যায়

ভাবি!' বউ চা নিয়ে ফিরতে না ফিরতেই কাঠুরের নাকে পাশের ময়রার দোকান থেকে জিলিপি ভাজার জিভে-জল-আনা গন্ধ এসে পৌঁছয়। সাতপাঁচ না ভেবেই কাঠুরে বলে বসে, 'কিছু জিলিপি হলে চায়ের সঙ্গে জমতো বেশ!' বলামাত্র একপাত্র জিলিপি এসে হাজির হয় দুজনের সামনে।

সামান্য জিলিপির জন্য একটা ইচ্ছাপূরণের বর খরচ করে ফেলায় কাঠুরের গিন্নি তো রেগে আগুন! কাঠুরে মনের আনন্দে একের পর এক জিলিপি খাচ্ছে। আর বউ তাকে বেজায় গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে। 'মূর্খ! পেটুক! লোভী! সামান্য জিলিপির জন্য একটা বর খরচ করলে! অভাবের শেষ নেই সংসারে! আর লোভীর মতো উনি জিলিপি চেয়ে বসলেন!' একটানা ব্যাকবাণ আর চেঁচামেচির তাড়নায় কাঠুরে যায় রেগে। বলে, 'একটা জিলিপি তোমার নাকে আটকে যাক।' অমনি একটা জিলিপি প্লেট থেকে উঠে নাচতে নাচতে নাকছাবির মতো আটকে যায় কাঠুরের বউয়ের নাকে। নাকে আটকানো জিলিপি ধরে বহু টানাটানি করলেও তা নাক থেকে খোলে না। কাঠুরের বউ এবার কাঁদতে শুরু করে। বলে, 'তোমার দুটো পায়ে পড়ি। আরও একটা বর তোমার পাওনা আছে। তৃতীয় বরে তুমি আমার নাক থেকে জিলিপিটা খুলে দাও।'

কাঠুরে পড়ে মরা ফাঁপরে। দুটো বর খরচ হয়ে গেছে আজেবাজে ইচ্ছা মেটাতে। আর মাত্র একটা বর বাকি। অথচ বউয়ের নাক থেকে জিলিপিটাও খোলা দরকার। বিশাল বাড়ি, চাষের জমি, টাকাপয়সা— সব ইচ্ছা একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে লুকিয়ে সে বলে ওঠে, 'ওর নাক থেকে জিলিপিটা খুলে যাক'। অমনি কাঠুরে বউয়ের নাক থেকে খসে পড়ে জিলিপি। সে আনন্দে নাচতে শুরু করে। মনের দুঃখে কাঠুরে কপাল চাপড়াতে থাকে। তিনটে বরই খরচা হয়ে গেল। অথচ তার অবস্থা রয়ে গেল যে কে সেই!

রূপকথার এই কাহিনী থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন, একজনের কাছে যে ইচ্ছা আনন্দের, মজার অন্যের কাছে তা যন্ত্রণার, উদ্বেগের। এই স্বামী স্ত্রী দুজনকে আমাদের মনের অচেতন আর সচেতন অংশের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অচেতনের ইচ্ছাপূরণের আনন্দ সচেতনে সব সময় দেখা দেয় না। অচেতনের কোনও একটা ইচ্ছা স্বপ্নে পূর্ণ হলে, তার প্রভাবে অচেতন মনে আনন্দ দেখা দিলেও সচেতনে তার বদলে দেখা দিতে পারে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া। ভয়ের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নকে ইচ্ছাপূরণ বললে ইচ্ছাপূরণ ঘটে অচেতন মনে। সচেতনের উলটো অনুভূতি থেকে যা বুঝে ওঠা দুরূহ। মনের এই দুটো অংশ যেন একজন মানুষের দুটো সত্তা। এক সত্তার আনন্দে অন্য সত্তা যন্ত্রণা পায় হরদম।

'জানা আর অজানা ইচ্ছা' অধ্যায়ে নানা ধরনের আপাত ইচ্ছা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পাশাপাশি ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের অবচেতন মনের সম্পর্ক নিয়ে পাঠককে ভাবতে হবে। হাজারটা অনৈতিক আর অসামাজিক ইচ্ছা চাপা পড়ে আছে আমাদের মনের অন্ধকার অচেতনের দেশে। এই ইচ্ছাগুলোর ওপর খবরদারি চালায় অবচেতন মন। বাস্তব ন্যায়নীতির বাইরে কোনও ইচ্ছাকেই অবচেতন মন বাইরে বা সচেতনে আসতে দেয় না। জোর করে তাকে ঠেলে দেয় অচেতনের অন্ধকারে। বড়দের জটিল স্বপ্নে অচেতনের নানা ধরনের ইচ্ছাই পূর্ণ হয় বেশি। মনের পাহারাদারের চোখ খুব কড়া। তাকে ফাঁকি দিয়ে কোনও অন্যায় বা অনৈতিক ইচ্ছা স্বপ্নে চলে আসে স্বপ্নপদ্ধতি (Dream Work)-র সাহায্যে জটিলভাবে বদলে গিয়ে। যাতে ছদ্মবেশে আসা ইচ্ছার অস্তিত্ব সহজে ধরা যায় না। প্রয়োজন হয় স্বপ্নবিশ্লেষণ পদ্ধতির।

'ইচ্ছাপূরণ' অধ্যায়ের অন্তিম অংশে কিছু সিদ্ধান্তে পাঠক অবশ্যই পৌঁছতে পারবেন। সহজ সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণের আনন্দের ভাগিদার হয় ঘুমন্ত চেতনা। এরকম স্বপ্ন আমাদের মতো বড় হয়ে যাওয়া মানুষ আর কটা দেখেন! আমাদের বেশিরভাগ স্বপ্নই তো 'উদ্ভট, আজগুবি, জটিল।' এই সব স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছাপূরণের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন ফ্রয়েডীয় মনোবিদরা। এঁরা বলেন, ভয়ের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নও তাই। অচেতন মনের নানা ধরনের ইচ্ছা চলে আসে এই সব জটিল বা ভয়ঙ্কর স্বপ্নে। ইচ্ছা মেটার আনন্দ পায় মনের অন্ধকার অবচেতন বা অচেতন। সচেতন মনের আলোর সঙ্গে যে অন্ধকারের সম্পর্ক অনেক সময়েই আদায়-কাঁচকলায়। অন্ধকারের আনন্দ আলোয় আসে যন্ত্রণা হয়ে, কষ্ট হয়ে। স্বপ্নের কথা বাদ দিলে এই কথাগুলো হয়তো আজকের উত্তর আধুনিক নাগরিক জীবনের নানা ইচ্ছা প্রসঙ্গে একইরকম প্রাসঙ্গিক।

স্বপ্নে শৈশবের স্মৃতি

টুকরো টুকরো ছেলেবেলা বারবার এসে হানা দেয় ঘুমন্ত চেতনায়, স্বপ্নে। স্বপ্নের দর্শকের শৈশবের স্মৃতি নানাভাবে চলে আসে স্বপ্নে। সরাসরি অথবা প্রতীকের মধ্য দিয়ে। 'এটা স্বপ্নের একটা বিশেষ দিক। খুব ছোট্টবেলার কোনও ঘটনা, মানুষ বা ছবি বহু বছর বাদে স্বপ্নের দর্শকের ঘুমন্ত চেতনায় এসে যেতে পারে। এসব ছবি অনেক সময় অবিকল, কখনও বা কিছুটা জটিলভাবে তৈরি করে পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বপ্নের একটা উপাদান। অনেক সময় জেগে থাকা অবস্থায় মনে পড়ে না, এমন স্মৃতির ছবিও চলে আসতে পারে আপনার স্বপ্নে। কারও স্বপ্নে ছেলেবেলা আসে কম। কারও বেশি।

আমার সংগ্রহে থাকা বহু স্বপ্নের মধ্যে খুব ছোট্টবেলার স্মৃতি খুঁজে পাওয়া যায় বারবার। বত্রিশের এক গৃহবধূর স্বপ্নের কথাই ধরা যাক। ওঁর নানাধরনের স্বপ্নে একটা বাড়ি আসে বারবার। 'একটা বাড়ি। সামনে কয়েকজন লালটুপি পরা পুলিশ। তার সামনে একটা রাস্তা পেরিয়ে একটা মাঠ। মাঠে একটা বাচ্চাদের স্লিপ'। ভদ্রমহিলার স্মৃতিতে এমন কোনও জায়গার অস্তিত্ব নেই। মহিলার মায়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, ওই জায়গাটা হল কালনার একটা থানা। মহিলার দাদু এক সময় ওই থানার অফিসার ইনচার্জ ছিলেন। মায়ের সঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টা ওখানে দুবার গিয়েছেন খুব ছোটবেলায়। শেষবার গিয়েছেন ওর মাত্র দুবছর বয়েসে। দুবছরেব কোনও অভিজ্ঞতা জেগে থাকা অবস্থায় স্মৃতি (Waking Memory)-তে থাকে না। স্বপ্নের স্মৃতি (Dream Memory)-তে একেবারে ছোট বয়সের অনেক টুকরো অভিজ্ঞতাও জমা থাকে। যা জেগে থাকা অবস্থায় একজন মানুষ মনে করতে পারেন না। ফ্রয়েড ও আরও অনেক পরবর্তী স্বপ্নগবেষক বহু স্বপ্নে এরকম স্মৃতির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।

জন্মের পর যে বাড়িটাতে পার কবেছেন জীবনের কয়েকটা বছর, সেই বাড়িটা প্রায়ই কড়া নাড়ে অনেক মানুষের স্বপ্নে। হয়তো পরে অনেকবার বদলে গেছে বাড়ি। তবু নানা সূত্রে, নানা অনুষঙ্গে ওই বাড়িটাই আসে। সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য স্বপ্নে আজও তাঁদের বহু পুরনো তিলজলার বাড়িটাকে খুঁজে পান। ছেলেবেলা থেকে বাবার রেলের চাকরির কর্মসূত্রে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। 'মাঝেমাঝে স্বপ্নে চলে আসে ছোটবেলার ওই জায়গাগুলো।' মৈমনসিংহ বা কাটিহার। দেশের বাড়িতে চলে যান। খেলেন ছোট্টবেলার সাথীদের সঙ্গে। 'জায়গাগুলো, মুখগুলো একেবারে অবিকৃত'।

ছেচল্লিশ বছর বয়সে লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য স্বপ্নে প্রায়ই দেখেন তাঁর ছোটবেলাকার স্কুলটার ছবি। কখনও শুনতে পান বাস এসে হর্ন বাজাচ্ছে। সুচিত্রা দেখতে পান সেই বয়সের ফ্রক পরা মেয়েটাকে। মেয়েটা ছোট অথচ তার মনটা যেন এখনকার। কিশোরী বয়েসটাকে স্বপ্নে ফিরে পেয়ে খুব আনন্দ হয় আজকের বড় হয়ে যাওয়া সুচিত্রার। একত্রিশ বছরের কাবেরী গোস্বামীর স্বপ্নে বারবার চলে আসেন ওঁর বাবা। বাবা যখন মারা যান কাবেরীর বয়স তখন মাত্র আট। গল্পকার রবিশঙ্কর বলের স্বপ্নে একবার চলে এসেছিল অচেনা একটা রানওয়ে। পরে বুঝতে পারেন, ওটা ওঁর খুব ছোটবেলায় হিমাচল প্রদেশ বেড়াতে গিয়ে দেখা মানালির রানওয়ে। এক নাট্যকর্মীর বেশ কয়েকবার স্বপ্নে দেখা হয় একগাল দাড়ি রোগা এক জন অচেনা মানুষের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বাবার সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায় ইনি নাট্যকর্মীর কাকা। এই কাকার কোলেকাঁখে চেপে অনেক ঘুরেছেন বর্তমান নাট্যকর্মী অতিশৈশবে। কাকা যখন মারা যান তখন ওর বয়েস দুবছরের কিছু বেশি। জেগে থাকা স্মৃতিতে স্বপ্নের কাকা তাই অচেনা।

ছেলেবেলা বানের জলের মতো ঢুকে পড়ে লেখক আবুল বাশারের স্বপ্নে। ছোটবেলার নদী, ধানক্ষেত, খাল আর নদীসঙ্গম আসে বারবার। 'ঠিক পরের বোনটার সঙ্গে মাছ ধরতে যাচ্ছি'; একদিন

রাতে স্বপ্ন দেখেন বাশার। এই দৃশ্য তাঁর ছেলেবেলার একই ছবির 'সেকেন্ড প্রিন্ট' যেন। এক চিকিৎসক-বন্ধুর একটা আশ্চর্য স্বপ্নের কথা বলি। ওঁর স্বপ্নে বারবার আসে একটা সবুজ দোলনা। আর দোলনার ওপর ঝুঁকে পড়া অচেনা একটা মুখ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এই ছবিটার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। ওঁর দাদুর সূত্রে জানা যায়, জন্মের কিছুদিন পর থেকে সবুজ রঙের একটা দোলনায় দোলানো হত ওকে। বছরখানেক বয়স পর্যন্ত। এই কাজটার জন্য রাখা হয়েছিল এক নেপালি কিশোরীকে। মেয়েটা কাজ ছেড়ে চলে যাবার পর বাচ্চাকে দোলনায় নয়, শোয়ানো হত বিছানা পেতে। সবুজ দোলনা আর তার ওপর ঝুঁকে পড়া মুখের সূত্র অতিশৈশবের ওই স্মৃতি।

বাণী বসু একবার স্বপ্ন দেখেন, একটা মাটির বাড়ির দাওয়ায় শুয়ে আছেন। পাশে তাঁর বাবা। সামনে চওড়া একটা মাটির রাস্তা। ওঁর বাবা মারা যান আজ থেকে ঠিক একচল্লিশ বছর আগে। বড় দাদা, দিদিকে বাণী বলেন স্বপ্নের ওই মাটির বাড়ি, দাওয়া আর রাস্তার কথা। জানা যায়, বাড়িটা ছিল ভাগলপুরে। ওই পরিবার যখন ভাগলপুরে থাকতেন তখন ছোট্ট মেয়েটার বয়েস মাত্র বছর দেড়েক। স্বপ্নের স্মৃতি বাস্তবের স্মৃতিকে এরকম ডিঙিয়ে চলে যায় হামেশাই। তাই স্বপ্নের বাড়ি, রাস্তা বা স্বপ্নের মুখকে অনেক সময় শৈশবের দৃশ্য বলে চিনতে পারে না স্বপ্নের দর্শকের জেগে থাকা স্মৃতি। স্বপ্নের স্মৃতি যে কিছুই ভোলে না। কত অচেনা ছেলেবেলার দৃশ্য অবলীলায় ধরা দেয় ঘুমন্ত চেতনার ইচ্ছার কাছে, প্রয়োজনের কাছে।

একটা মজার ঘটনা বলি। এক ভদ্রলোক তাঁর দেশের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছেন কুড়ি বছরেরও বেশি সময় পরে। রাতে স্বপ্ন দেখলেন, পুরোপুরি অচেনা একটা জায়গায় চলে গেছেন। কথা বলছেন অপরিচিত একজন মানুষের সঙ্গে। পর দিন দেশের বাড়িতে পৌঁছে ভদ্রলোক তো অবাক। এই তো আগের রাতের সেই অচেনা জায়গাটা। স্বপ্নে যেমন দেখেছেন হুবহু একরকম। একটু বাদে একজন পড়শি এলেন দেখা করতে। অবাক কাণ্ড! ইনি যে আগের রাতের স্বপ্নে দেখা 'অপরিচিত' ভদ্রলোক! এই স্বপ্ন আমার সংগ্রহ থেকে নেওয়া নয়। এল. এফ.এ.ম্যরি নামের ফরাসি স্বপ্নগবেষকের সংগ্রহ থেকে এই স্বপ্নের কথা তাঁর রচনাসংগ্রহে উল্লেখ করছেন স্বয়ং সিগমুন্ড ফ্রয়েড। এরকম স্বপ্ন ফ্রয়েডের ভাষায় 'ধৈর্য ধরে রাখতে না পারার স্বপ্ন' (Dream of Impatience)। পরদিন বাড়ি গিয়ে ছেলেবেলাকে ফিরে পাবার তীব্র ইচ্ছা অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি একটা রাতও। স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা চলে গেছেন শৈশবের দেশে।

কবি জয় গোস্বামীর ছেলেবেলা কেটেছে রানাঘাটে। 'রানাঘাটের বাড়ি, উঠোন, বাড়ির ভাঙা পাচিল পেরিয়ে জঙ্গল, তারপর জঙ্গল পেরিয়ে একটা ডোবা'—এসব শৈশবের স্মৃতি বারবার চলে আসে জয়ের স্বপ্নে। একেবারে অবিকৃত নয়, একটু বদলে। শৈশবস্মৃতি চল্লিশ ছুঁতে চলা এই কবির স্বপ্নে কি তীব্রতা নিয়ে ঢুকে পড়ে তা বোঝা যায় জয়ের দেখা একটা স্বপ্নের কথা শুনলে—

স্বপ্ন: মাঝেমধ্যে স্বপ্ন দেখি, এখনকার এই টাক পড়া চেহারা। হাতে ছাতা, কাঁধে ঝোলা, পাজামা পাঞ্জাবি পরা। বাস ধরব বলে দাঁড়িয়ে আছি—দেশ এর অফিসে যাব—জায়গাটার চারধারে বড়বড় ঝোপ, অনেকটা রানাঘাটের আইশতলার মতো। একটা ফ্রকপরা, গোলমুখ মেয়ে পাশে এসে দাঁড়াল।—রাস্তাটা ঢালু, একটা ব্রিজ থেকে নেমে এসেছে। আমি বলছি 'তুই কোথায় যাবি?' ও বলছে, 'তুই কোথায় যাবি?' এই স্বপ্নটা দেখবার পরদিন কেমন যেন একটা অনুভূতি হয়। হয়তো ভালোই লাগে। একটা মাদকতা। একটা আশ্চর্যভাব।

এই স্বপ্নের প্রেক্ষাপট এরকম। মেয়েটা তখন ন-দশ বছরের। জয়ের বয়েস এগারো অথবা বারো। জয়দের পাশের বাড়িতে ছুটিতে এসেছিল কিশোরী। 'এক দিন ওর সঙ্গে শারীরিক কিছু ব্যাপার ঘটেছিল। ওই বয়সে, কিছুই জানি না, ওই অবস্থায় যা হয় আর কি।' দু বছর পর মেয়েটা আবার এসেছে। বাড়িতে অনেকে। একটা সময় সবাই চলে গেছে। বাড়ির একটা ঘরে ওই মেয়েটার সঙ্গে ক্যারাম খেলছে জয়। 'আমাদের বাড়িতে একটা দোলনা ছিল। হঠাৎ ওকে বললাম, দোলনায় চড়বি?' মেয়েটা রাজি হয়ে গেল। 'দোলনায় উঠতে যেতেই কি প্রচণ্ড আবেগ আর তীব্রতা নিয়ে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল' জয়ের ওপর। দুজনের কোনও যোগাযোগই ছিল না মাঝের সময়টায়। তবু কি উদ্বেল আবেগ আর রোমাঞ্চ ওই কিশোরী বয়ে বেড়িয়েছে টানা দুবছর ধরে। সেই বয়সের জয়ের কাছে 'সেই

মুহূর্তগুলোতে কোনও যৌন উন্মাদনার ব্যাপার ছিল না, ছিল অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চ।'

আঠাশ বছর পরেও এই হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি বারবার হানা দেয় জয়ের এইধরনের স্বপ্নে। আজ বড় হয়ে যাওয়া মেয়েটাকে দেখলে চিনতেও পারবে না বড় হয়ে যাওয়া জয়। ওই কিশোরীর নাম, ডাকনাম, পদবি—সব হারিয়ে গেছে জয়ের স্মৃতি থেকে। স্বপ্নের সাঁকো থেকে নেমে আসা বা সাঁকোয় উঠে যাওয়া ঢালু রাস্তায় আঠাশ বছর আগেকার ওই কিশোরী তবু বারবার চলে আসে জয়ের স্বপ্নে। এত বছর বাদে 'ওই স্মৃতি ফিরে আসে, ভাবলে বড় বিস্ময় লাগে' কবি জয় গোস্বামীর।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্নে ছেলেবেলার বাড়ির বাইরের পুকুরপারের তালগাছ দুটো ফিরে আসে। বর্ষীয়ান এই লেখকের এই সংক্রান্ত স্বপ্ন উল্লেখ করেছি 'ওড়ার স্বপ্ন' বিভাগে। কবি অনিতা অগ্নিহোত্রীর স্বপ্নে মাঝেমধ্যে চলে আসে অস্পষ্ট একটা হাটের ছবি। অনিতার মনে হয়, সাঁঝবেলার ওই হাট আসে ছেলেবেলায় যতীন্দ্রনাথ বাগচীর 'হাট' কবিতা পড়তে পড়তে শিশুমনের কল্পনার ছবির স্মৃতি থেকে। প্রশাসক, সঙ্গীতশিল্পী দীপক রুদ্র-র বয়েস এখন সাতান্ন। এই বয়সেও স্বপ্নে ছোটবেলাটা ধরা পড়ে যায় বারবার। মা হয়তো স্কুল যাবার আগে খেতে দিচ্ছেন। বা জামাকাপড় বার করে দিচ্ছেন। এরকম টুকরো টুকরো এক একটা ছবি চলে আসে স্বপ্নে। হঠাৎ করে কখনও বা চলে আসে ছোটবেলার ঢাকার বাড়িটাও।

বড় হয়ে যাওয়া মানুষের স্বপ্নে ছেলেবেলার একটা নির্দিষ্ট ছবি কেন ঢুকে পড়ে, অন্যটা ঢোকে না? এর কারণটা বার করে ফেলা যায় স্বপ্নটাকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে। শৈশব, বড় হয়ে যাওয়া মানুষের নানা স্বপ্নে ঢুকে পড়ে নানা প্রয়োজনে। এই ব্যাপারটাকে ভাগ করা যায় দুভাবে। (১) যেখানে স্বপ্নের আবহ বা গঠনের প্রয়োজনে স্বপ্নে ছেলেবেলা ফিরে আসে। (২) যেখানে অচেতন মনে শৈশবে ফিরে যাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে নানারকম দৃশ্যের মধ্য দিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা তার শৈশবকে ফিরে পান। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্নের মধ্যে সরাসরি কোনও শৈশবের ছবি নাও থাকতে পারে। স্বপ্নবিশ্লেষণ করলে স্বপ্নের মধ্যে দর্শকের ছেলেবেলাকে খুঁজে পাওয়া যায়। এরকম স্বপ্ন হতে পারে নানা ধরনের:

(ক) উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন—যেখানে শৈশবের অসঙ্কোচ নগ্নতায় ফিরে যান স্বপ্নের দর্শক। এরকম স্বপ্ন দেখেন অনেক মানুষ (১০৯ পাতায় দেখুন)।

(খ) বাবা, মা, ভাই, বোন বা অন্য প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন—খুব ছোটবেলায় প্রিয়জনের প্রতি বিদ্বেষ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় অচেতনে। এরকম মৃত্যুর স্বপ্নে ফিরে আসে শৈশব চেতনার অনুভূতি। (১০১ পাতায় দেখুন)।

(গ) ওড়া, শূন্যে ভাসা, বন বন করে ঘোরা বা সাঁতার কাটার স্বপ্ন: এসব স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ছেলেবেলার আনন্দঘন স্মৃতি ফিরে পান স্বপ্নের দর্শক (৯৮ পাতায় দেখুন)।

(ঘ) জলে ডোবা আর জলে ডুবে যাওয়া থেকে কাউকে বাঁচাবার স্বপ্ন: অনেক মনোবিদ এরকম কিছু স্বপ্নে মাতৃগর্ভে থাকা আর জন্মরহস্য নিয়ে শৈশবের উদ্ভট কল্পনার (Birth Fantasy) স্মৃতির পুনরাবৃত্তি খুঁজে পেয়েছেন। (১০৭ পাতায় দেখুন)

(ঙ) মুদ্রা বা টাকা কুড়ানোর স্বপ্ন—স্বপ্নদ্রষ্টা এরকম স্বপ্নে মনের আনন্দে মাটিতে বা অন্য কোথাও পড়ে থাকা মুদ্রা বা টাকা কুড়োতে থাকেন। এরকম স্বপ্নে শৈশবের একটা প্রবৃত্তি (instinct যা পরে অচেতনে চাপা পড়ে যায়), কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হয়। (২১৪ পাতা দেখুন)।

(চ) চোরডাকাতের তাড়ার স্বপ্ন: এরকম স্বপ্নের মধ্যেও স্বপ্নের দর্শকের ছেলেবেলা বা কম বয়সের কিছু স্মৃতি বা ধারণা লুকিয়ে থাকতে পারে।

অনেক সময় কোনও একটা স্বপ্নে আপাতভাবে দেখা সব দৃশ্যগুলো আসে স্বপ্ন দেখবার আগের দিনের (ফ্রয়েডের ভাষায় 'ড্রিম ডে') দেখা, শোনা, ভাবা বা বলা কোনও উপাদান থেকে। যা কাছের অতীতের কোনও উপাদানকে স্বপ্নে টেনে আনে। তবু, শৈশবের কিছু ছবি বা কিছু উপাদান লুকিয়ে থাকে স্বপ্নটার মধ্যে। যা খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ না করলে সহজে ধরা পড়ে না।

লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর একটা স্বপ্নের বিবরণ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। ছেলেবেলায় দেখা মানুষের মুখ কীভাবে পঁয়ত্রিশ বছর পরেও স্বপ্নে এসে ঢুকে পড়ে তা বোঝা যায় স্বপ্নময়ের দেখা এই স্বপ্নের বিবরণ থেকে—

স্বপ্ন: ভূপেদা বলে একজন মানুষকে মাঝেমধ্যে স্বপ্নে দেখি—একদিন দেখলাম বুড়ো হয়ে গেছে ভূপেদা, কিন্তু গোঁফদাড়ি আছে। মনোহর আইচের মতো মাসল দেখাচ্ছে—ভূপেদা চলে যাচ্ছে—ভূপেদাকে 'ভূপেপাগলা! ভূপেপাগলা!' বলে খেপাচ্ছি—হঠাৎ ভূপেদার মুখ কেমন বদলে গেল—অন্য একটা চেনাচেনা মুখ, ও কিছু বলার চেষ্টা করছে—পারছে না।

ছেলেবেলা আর সেই সময়কার নানা ঘটনা চল্লিশ পার করে দেওয়া স্বপ্নময়ের এই স্বপ্নে ঢুকে পড়েছে। এই স্বপ্নের অর্থ কিন্তু অন্য। প্রথমে এই স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শকের শৈশবের উপাদানগুলো খোঁজা যাক। 'ভূপেদা' স্বপ্নময়ের ছোটবেলার পাড়ার মাস্তান ভূপীদা। সবাই ভয় করত এই মাস্তানকে। দুষ্টুমি করলে বাচ্চাদের মায়েরা 'ভূপীদাকে ডাকছি' বলে ভয় দেখাতেন। স্বপ্নে 'ভূপেদা'র মুখটা 'কেমন বদলে যায়' চেনাচেনা অন্য একটা মুখে। এই চেনাচেনা মুখটা স্বপ্নময়ের শৈশবের আর একটা পরিচিত ছবি। 'কাঁচিপাগলা'। সবাই তাকে এই নামেই ডাকত, খেপাত। 'তার কাপড়ের পেছনদিকটা সবসময় হলুদ থাকত, দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যেত না'। বাচ্চারা দূর থেকে তাকে দেখলেই চিৎকার করে খেপাত 'কাঁচিপাগল।' বলে।

স্বপ্নের 'ভূপেদা'র মুখ বদলে যায় 'কাঁচিপাগলা'র মুখে। আর যাই হোক, পাড়ার মাস্তানকে খেপাবার দুঃসাহস কোনও বাচ্চার হবার কথা নয়। আসলে 'কাঁচিপাগলা'কে দেখে যেভাবে খেপাত স্বপ্নময় আর ওর ছোট্ট বন্ধুরা, স্বপ্নে ও ভূপেদাকে খেপায় সেই এক ভাষায়, এক ভঙ্গিতে। এটা বোধহয় ছোটবেলার হাড়-হিম-করা মাস্তানের ওপর বড় হয়ে যাওয়া স্বপ্নময়ের স্বপ্নের প্রতিশোধ! খেপালে বাস্তবের কাঁচিপাগলা পেছন ফিরে বাচ্চাদের 'যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল দিত'-ছোটবেলায়। স্বপ্নে ভূপেদাকে খেপালেও ভূপেদার প্রতিক্রিয়া একজন অসহায় মানুষের মতো। ও যেন কিছু বলার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। শৈশবের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মাস্তানের স্বপ্নের প্রতিক্রিয়াহীন অসহায় অবস্থা! এও তো স্বপ্নের দর্শকের এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ!

এক খিলিপানের দোকানদার লালু আমাকে তাঁর স্বপ্নে বারবার আসা একটা অচেনা মুখের কথা জানায়। 'বেঁটে, খুব কালো, মাথার সামনে একটা আব। একটা ঠেলাগাড়ি।' আমি খোঁজখবর করি ওই শহরের পুরনো লোকদের কাছ থেকে। কিছুদিন বাদে এক ভিখিরি-বুড়িমার কাছে খোঁজ পাওয়া যায় ওই অচেনা লোকটার। ও হল ক্ষুদিরাম। বহুদিন আগে ওই মফঃস্বল শহরে একটা ঠেলাগাড়িতে করে লোকের বাড়িতে বাড়িতে কয়লার বস্তা পৌঁছে দিত ক্ষুদিরাম। ওর মাথায় ছিল টাক, কপালে একটা 'ডারময়েড সিস্ট' (টিউমার, কালুর ভাষায় 'আব')। বাচ্চারা ওকে খেপাত 'খুদিআলু' বলে। আর বাচ্চারা সমস্বরে এই নামে ডাকতে শুরু করলেই ক্ষুদিরাম ঠেলা থামিয়ে এক টুকরো কয়লা ছুঁড়ে মারত বাচ্চাদের দিকে। ক্ষুদিরাম যখন মারা যায় তখন লালু খুব ছোট। ক্ষুদিরামের মুখ ওর মনে থাকবার কথা নয়। তবু খুব ছোটবেলার ঠেলাওয়ালা ক্ষুদিরাম বারবার চলে আসে লালুর স্বপ্নে।

স্বপ্নের ভ্রমণ

ভ্রমণপিপাসু আর কল্পনাপ্রবণ অনেক মানুষই স্বপ্নে বেড়ান। অদেখাকে দেখা আর অচেনাকে চেনার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে স্বপ্নের দর্শকের স্বপ্নে চলে আসে বেড়ানোর ছবি। বাঙালির জীবনে থেকে অনেক কিছু হারিয়ে গেলেও হারায়নি ভ্রমণ। ফুরিয়ে যায়নি দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন। কাজের চাপ, শরীরের অক্ষমতা আর টাকা পয়সার অভাব—এসব কারণে হাজার ইচ্ছে থাকলেও দুম করে বেরিয়ে পড়তে পারেন না অনেকে। চেতনায় আর অবচেতনে বেড়াবার ইচ্ছেটা তো আর মিলিয়ে যায় না। ভ্রমণকাহিনী আর ভ্রমণসাহিত্য পড়ে এই ইচ্ছার কিছুটা হয়তো মেটে। তবু এরকম মানসভ্রমণে পাহাড়-জঙ্গল-অরণ্যের ত্রিমাত্রিক প্রভাবটা যেন ঠিক আসে না।

স্বপ্নে অবচেতনের অতল থেকে ঘুমন্ত চেতনায় উঠে আসতে পারে বেড়ানোর চলমান ছবি। চলমান ছবি স্বপ্নের মূল উপাদান। স্বপ্নের ভ্রমণে থাকে চলমান বিচিত্র রঙিন ছবি। একেবারে জীবন্ত। শুধু মানুষ নয়, স্বপ্নের ভ্রমণে গাছপালা, পশুপাখি কথা বলে যখন তখন। পাওয়া যায় তাদের স্পর্শ। স্বপ্নে কেউ বেড়ান পাহাড়ে, কেউ বা জঙ্গলে। কেউ বা চলে যান প্রিয় সমুদ্রের নির্জন কোনও তটে। স্বপ্নের ভ্রমণ স্বপ্নের দর্শকের ইচ্ছাপূরণ। বাস্তবের অতৃপ্তি মেটে স্বপ্নের বেড়ানোয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সব চাইতে প্রিয় বেড়াবার জায়গাটার নাম শুনলে অনেকে চমকে উঠবেন। বেশ কয়েকবার ঘুরে এসেছেন। জায়গাটার নাম স্বর্গ! এরকম সফর তো আর বাস্তবে সম্ভব নয়। অগত্যা সুনীলকে স্বর্গভ্রমণে যেতে হয় স্বপ্নে। মাঝেমধ্যে স্বপ্নেই চলে যান স্বর্গের দেশ দেখতে। ওঁর কথায়, 'মাঝেমধ্যে স্বপ্নে একটা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। কিছুক্ষণ বাদে বুঝতে পারি, আরে! আবার স্বর্গে চলে এসেছি!' ভ্রমণপ্রিয় এই লেখক সারাজীবন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশবিদেশের চেনা অচেনা হাজারটা সুন্দর স্পটে। সমুদ্রে, নদীতে, জঙ্গলে, পাহাড়ে। বিখ্যাত সব শহরে। তবু স্বপ্নে স্বর্গ বলে যে জায়গাটায় বেড়াতে যান সুনীল তার স্বপ্নিল সৌন্দর্য অপার, অসীম। মনোরম সেই সফরে দারুণ রোম্যান্টিক একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ান। রাস্তা চলতে চলতে দেখা পান একের পর এক পেল্লায় সাইজের গাছেদের। আর কী তাদের রঙের বাহার! সবুজ, হলুদ, কালচে সবুজ। একবাব এমনই এক স্বর্গভ্রমণে আশ্চর্য মেরুন রঙের একটা গাছের দেখা পেলেন। আনন্দে, বিস্ময়ে হতবাক তিনি। আশপাশে খুঁজে বেড়ালেন, কোথায় এই মেরুন রঙের গাছটার একটা চারা পাওয়া যায়। 'মনে হল, এই গাছের একটা চারা মায়ের জন্য নিয়ে যেতে হবে। মায়ের যে খুব গাছের শখ।'

মানস সরোবর যাবার পথের কষ্টের কথা তো সবাই জানেন। বাণী বসু কিন্তু একবার মানস ঘুরে এসেছেন একটুও কষ্ট না করে। বাস্তবে নয় স্বপ্নে। ওঁর অভিজ্ঞতা, 'একটা বিশাল নীল জলের সরোবর। বুঝতে পারছি মানসে চলে এসেছি। ভীষণ শান্ত, কোলাহলহীন, অপূর্ব চারপাশের পরিবেশ। সেই অপার্থিব শান্তি মনে থাকবে সারাজীবন।'

ভারতবর্ষে এমন জঙ্গল খুঁজে পাওয়া মুশকিল যে জঙ্গলের নাড়িনক্ষত্র চেনেন না লেখক বুদ্ধদেব গুহ। ভ্রমণ পাগল এই সাহিত্যিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই যৌবনের দিনগুলো থেকে। সময় সুযোগ পেলেই হুটপাট বেরিয়ে পড়েন এই বয়সেও। ছেলেবেলা থেকেই আমাজন আর কঙ্গো এই দুই নদী বুদ্ধদেবের মনে অদ্ভুত এক মোহ তৈরি করে রেখেছে। বিদেশ গেছেন বহুবার। গেছেন পূর্ব-আফ্রিকায়। তবু সুযোগ হয়নি পশ্চিম আফ্রিকার কঙ্গো নদী আর দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর বুকে ভেসে বেড়াবার।

ইচ্ছাপূরণ হয়েছে স্বপ্নে। স্বপ্নে বেশ কয়েকবার ছোট্ট নৌকো 'ক্যানো'য় চেপে দীর্ঘসময় ধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন কঙ্গো নদীর বুকে। কখনও বা আমাজনে। সেই সফর ছিল দীর্ঘসময়ের, তাড়া ছিল না এতটুকু। কঙ্গোর বুকে ক্যানো চেপে বিলম্বিত লয়ে সফর করছেন বুদ্ধদেব। প্রাণভরে দেখছেন দু-পাশের আদিম জঙ্গল আর ছড়ানোছিটানো আদি জনপদ। কখনও বা দেখা হচ্ছে গরিলাদের সঙ্গে। এক রাতে কঙ্গোর উৎসমুখ থেকে যাত্রা শুরু করে নদীপথে কয়েকশো মাইল ঘুরে বেড়িয়েছেন। ওঁর কথায়, 'বাস্তবে ভীষণ ইচ্ছে করে, হাতে অনেক সময় নিয়ে ওখানে বেড়াতে। আজও হয়ে ওঠেনি বাস্তবের ওই ভ্রমণ। অগত্যা বারবার আমার স্বপ্নের কঙ্গো আর আমাজনে ঘুরে এসেছি স্বপ্নেই।'

অনিতা অগ্নিহোত্রী কর্মসূত্রে ওড়িশার একটা জেলার জেলাশাসক ছিলেন বেশ কিছুকাল। এখন কলকাতায় কাজ আর লেখালেখির চাপে বেড়াবার সময় পান খুব কম। তাতে কী? স্বপ্নের সফরে তো আর বাধা নেই। মাঝেমধ্যেই রাতে চলে যান ওড়িশার ব্রাহ্মণী আর মহানদীর কাছে। এক রাতে অচেনা খুব সুন্দর একটা নদীর ওপরকার ছোট্ট সাঁকোটায় ঘুরে বেড়ালেন অনেকক্ষণ ধরে। ভরাচাঁদের সেই রাতে নদীর জলে ভাঙাচোরা চাঁদ। সেই দৃশ্যের কূল-ছাপানো রোমাঞ্চে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেলেন কবি। 'ইংল্যান্ডে থাকার সময় স্বপ্নে খুব সুন্দর একটা অচেনা পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সুন্দর করে ছাঁটা ঘাসের বিরাট একটা লন। হলদে আর খয়েরি মেশানো রোদ। আমি হাঁটছি। আর রোদের ভাঁজ করা গালিচাটা কে যেন একটু একটু করে খুলে দিচ্ছে আমার সামনে। হঠাৎ তিনটে ময়ূর এল। ওরা নিজেদের ভেতর কথা বলছে মানুষের ভাষায়। অপূর্ব! ওদের রং আর সৌন্দর্যে আমি আপ্লুত। হঠাৎ একটা গুমগুম আওয়াজ শুরু হতেই ওরা বলল এবার আমরা চলে যাই।' স্বপ্নের পার্কের স্বপ্নের ময়ূরেরা মিলিয়ে গেল।

ভ্রমণপিপাসু আর কল্পনাপ্রবণ অনেক মানুষই স্বপ্নে বেড়ান। ভ্রমণপাগল বছর তিরিশের এক গৃহবধূ ভালোবাসেন জঙ্গলে বেড়াতে। গ্রীষ্মের এক রাতে ঘুরে এসেছেন অচেনা এক পাহাড়ি ন্যাশনাল পার্ক থেকে। স্বপ্নের অভয়ারণ্যের গেট খুলে যেতেই ছোট্ট সাদা বাসটা ঢুকে গেল ভেতরে। বাস পিচ বাঁধানো রাস্তা ধরে উঠছে ওপরের দিকে। চারপাশটা কুয়াশা কুয়াশা। ঠিক স্বপ্নের মতো। হঠাৎ শুরু হল তুমুল বৃষ্টি। বাস আর যাবে না। ভিজতে ভিজতে মহিলা উঠে চলেছেন ঘন জঙ্গলে ঘেরা পথ ধরে। কী ভালোই যে লাগছে! শেষ দিকে রাস্তাটা বড় পিচ্ছিল। কে যেন হাত ধরে টেনে তুলেছেন ওঁকে। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটা মন্দির। চারপাশে অরণ্যের নিসর্গ। ছবির মতো।

এক ডেনটিস্ট ভদ্রলোকের নেশা বেড়ানো আর ছবি তোলা। দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ঘুরে বেড়ান সময় পেলেই। পাহাড়ে, জঙ্গলে, সমুদ্রে। ঘুরে বেড়ান স্বপ্নেও। জায়গাগুলো বেশিরভাগই পাহাড়ি। কিছু দিন আগে স্বপ্নভ্রমণ সেরে এলেন অচেনা বরফ ঢাকা এক পাহাড়ের দেশ থেকে। আদিগন্ত বরফের মধ্যে বরফের তৈরি একটা ঘরে শুয়ে আছেন। চারপাশে কয়েকজন বিদেশি মানুষ। ওঁরা খাবার আর পানীয় দিচ্ছে, কম্বলে ঢেকে দিচ্ছে ওঁকে। তবু শীত আর কমে না। 'লোকগুলো সেবা করছে খুব। কিন্তু ওদের অদ্ভুত ভাষা আমি বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি জায়গাটা বিদেশ, লোকগুলোও ইউরোপীয়ান।'

ইচ্ছাপূরণের দুর্দান্ত স্বপ্নের সফরে বেশি যায় শিশুরা। তেমন একটা বেড়ানো হয়নি এদের। আশ্চর্য এই পৃথিবীর অবাক করা হাজারটা বৈচিত্র্যের শত সহস্র তথ্য ওদের মনে ঢুকে যাচ্ছে অবিরাম। বই পড়ে, গল্প শুনে। টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেল বা অন্য ভ্রমণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান আর সিনেমা দেখে। 'স্বপ্নসন্ধান'এ বাচ্চাদের স্বপ্ন সংগ্রহের কাজ করতে গিয়ে অশ্রুতপূর্ব কত যে ভ্রমণকাহিনী শোনবার অভিজ্ঞতা হয়েছে এই লেখকের। এগারো বছরের পাপুর স্বপ্নে সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে ও চলে গেছে সমুদ্রের অতলে। ডিপ-সি-ডাইভার হয়ে পাপু অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের তলদেশে। দেখা হচ্ছে অচেনা নানা জলজ প্রাণী, মাছ আর সামুদ্রিক উদ্ভিদের সঙ্গে। আনন্দে আত্মহারা অবস্থায় ও হঠাৎ দেখা পেয়ে গেল ঝাঁক ঝাঁক ব্ল্যাকমলি আর গাপ্পির। ওদের বাড়ির অ্যাকোয়ারিয়ামে যে ওই বন্ধু মাছগুলো ঘুরে বেড়ায়।

বছর দশেকের রনির স্বপ্নভ্রমণ আরও অভিনব। স্বপ্নে রনি ঘুরে এসেছে খোদ চাঁদের দেশ থেকে। সঙ্গে ছিলেন আরও তিনজন কসমোনট। ওর ভাষায়, 'তিনজন হেলমেট আর অদ্ভুত পোশাক পরা

বৈজ্ঞানিক। একটু দূরে একটা রকেট দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের মাটিতে হেঁটে বেড়াচ্ছি। শক্ত পাথরের কালো মাটি। হাত দিয়ে তুলতে পারলাম না, এত শক্ত। দূরে একটা পাহাড়। কালো কুচকুচে।' নয় বছরের রঙ্গিনী এক গ্রীষ্মের ছুটিতে বাব-মায়ের সঙ্গে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিল। দার্জিলিঙে এক ফোঁটা বরফ নেই খুব মন খারাপ হয়েছিল মেয়েটার। ইচ্ছাপূরণ হল স্বপ্নে। এ বছর গ্রীষ্মের ছুটির এক রাতে বরফে ঢাকা দার্জিলিঙে সারারাত ঘুরে বেড়িয়েছে রঙ্গিনী। ঝুরো বরফ দিয়ে বল বানিয়ে ছুঁড়েছে বাবার দিকে। মনের আনন্দে স্বপ্নের বরফের ওপর দিয়ে দৌড়ঝাঁপ, লাফালাফি। এক জায়গায় 'বরফ দিয়ে ছোট্ট একটা পুতুলের ঘর বানিয়ে তার ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে বসে রইলাম। বাবা-মা বাইরে থেকে ডাকাডাকি করছে। খুঁজে পাচ্ছে না আমাকে। কী মজা।'

এক মহিলা কবি স্বপ্নে ঘুরে এসেছেন আশ্চর্যসুন্দর পাহাড়ঘেরা এক লেক থেকে। কখনও চলে গেছেন অচেনা সমুদ্রের ধারে। বেলাভূমির অভিনব এক বালির টানেলের ভেতর দিয়ে হাঁটছেন। বেরিয়ে এসে দেখছেন সামনে রামধনুর সব কটা রঙের অনবদ্য ছটা। পিছনে সমুদ্র। এক শিক্ষিকা একবার স্বপ্নসফরে ঘুরে এসেছেন পণ্ডিচেরি। স্বপ্নের পণ্ডিচেরিতে 'বিরাট বড় বড মার্বেল হল, মার্বেলের মন্দির। দারুণ সুন্দর পোশাক পরা সুন্দর কয়েক জন মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিশাল এক একটা হলের ভেতর।'

লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ভ্রমণবহুল। 'কত জায়গায় যে বেড়াই—সব অচেনা। অচেনা সুন্দর রাস্তা ধরে হাঁটি।—একটা দারুণ সুন্দর রাস্তা, দুপাশে দেবদারুর সারি।' একটা পাহাড়ে স্বপ্নভ্রমণে গেলেন এক বার। একটা রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে পাহাড়চূড়ার দিকে। ওই রাস্তা ধরে পাহাড়ের শীর্ষে চলে যেতে এতটুকু পরিশ্রম হল না। 'বড় আনন্দ হয় এরকম স্বপ্নভ্রমণে।' '৯৬ সালের জুনের এক রাতে হঠাৎ এক রোমাঞ্চকর সফর সেরে এলেন। একটা নদী, যার কোনও পাড় নেই। একটা রুহিতনের মতো নৌকোয় বসে ছোট্ট দাঁড় বেয়ে গ্লাইড করতে করতে চলে যাচ্ছেন এক প্ল্যাটফর্ম থেকে আর এক প্ল্যাটফর্মে। চারপাশে অনেক পাম গাছ, চেনাচেনা অথচ ঠিক চেনা নয়। মেক্সিকোব নদীর সঙ্গে ভারতের নদীর পরিবেশ মিলেমিশে তৈরি যেন।

চিত্রপরিচালক তপন সিংহ ছবির শুটিং করতে সারাজীবন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন অনেক সুন্দর জায়গায়। 'ডে-ড্রিমার' তপনবাবু বহুবার ঘুরে বেড়িয়েছেন দিবারাত্রির স্বপ্নে। 'অনেক জায়গায় এরকম বেড়িয়েছি—জায়গাগুলো আগে দেখিনি—হয়তো চেনাচেনা কিন্তু জিওগ্রাফিটা আলাদা।' বহু বছর আগের এক স্বপ্নিল রাতে বেড়াতে গিয়েছিলেন পাহাড়ঘেরা একটা মালভূমিতে। আর এক বার চড়াই উতরাই রাস্তা ধরে সারারাত ঘুরে বেড়িয়েছেন এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে।

স্বপ্নভ্রমণে বোধহয় পাহাড়ই আসে বেশি। মহাশ্বেতা দেবী একবার স্বপ্নে চলে গিয়েছিলেন অচেনা একটা পাহাড়ে। 'একটা জায়গায় রয়েছি, সঙ্গে অন্য কেউ, অচেনা। একটা খুব খাড়া রাস্তা চলে যাচ্ছে পিকের দিকে, তারপর যেন ঢেউ খেলানো নীচে নামার পথ। আমি হেঁটে চলেছি পিকের দিকে—আমাকে যেন পাহাড়টা পেরোতেই হবে।'

প্রমোদ বসু এক স্বপ্নময় কবি। স্বপ্নে তুমুল বৃষ্টির ভেতর বারবার চলে যান ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সমুদ্রের কাছে। এক চিকিৎসক কিছু দিন আগে এক রাতে ঘুরে এসেছেন অভিনব এক প্যাকেজ ট্যুরে। জায়গাটা যেন চাঁদিপুর, অথচ সমুদ্রের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। সমুদ্রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুধসাদা বিশাল একটা জাহাজ। একটু এগোতেই সমুদ্র উধাও। পাহাড়ি পথে সর্পিল, খরস্রোতা এক নদী। নদীর পাড়ে বেশ কিছু আদিবাসী ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু বাদে স্বপ্নের জিপ এসে মুহূর্তে ওঁকে পৌঁছে দিচ্ছে একটা জঙ্গলে। শাল, সেগুন, কুরচি, মহুয়ার অপরূপ এক অরণ্য। এক সফরে নিখচায় নদী, পাহাড়, সমুদ্র আর অরণ্য। এক রাতে মাত্র কয়েকঘণ্টায়। ভাবা যায়।

অভিনেত্রী, চিত্রপরিচালক অপর্ণা সেন বেড়াতে ভালোবাসেন ভীষণ। ঘুরে এসেছেন দেশবিদেশের বিখ্যাত, অখ্যাত নানা শহর। সবচাইতে ভালোবাসেন জঙ্গলে বেড়াতে। বিদেশের অনেক অরণ্যে ঘুরেছেন। কাছেপিঠে গিয়েছেন চাঁইবাসা, গরুমারা আর বেতলার জঙ্গলে। একবার কয়েক ঘণ্টার জন্য সারাণ্ডায়। বিখ্যাত এই চিত্রপরিচালকের ভীষণ ইচ্ছে করে কিরিবুরুর জঙ্গলে যেতে। বাস্তবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি আজও। ঘুরে এসেছেন স্বপ্নে। দিবাস্বপ্নে চলে যান মানস সরোবর। ওঁর কথায়, 'খুব ইচ্ছে

করে মানস যেতে—মানস আমার স্বপ্ন।' শুধু রাতের স্বপ্নে নয়, জেগে জেগে কল্পনাতেও অপর্ণা বহুবার ঘুরে এসেছেন মানস।

স্বপ্নের ভ্রমণ বড় প্রিয় বিখ্যাত চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্য-র। এমনিতেই বেড়াবার নেশা। কিছু দিন আগেই ঘুরে এসেছেন কন্যাকুমারিকা, মহাবলীপুরম। স্বপ্নে বহুবার ঘুরে এসেছেন ভরাচাঁদের রাতের উত্তাল সমুদ্রে। সেই সমুদ্রের জল 'গা সির সির করে এমন নীল।' যে নীল মাধ্যম আজও তুলির আঁচড়ে ফোটাতে পারেননি শিল্পী বিকাশ। 'বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, প্রবল তার উচ্ছ্বাস। শুধু শব্দটাই কেন যেন থাকে না।' এরকম স্বপ্নের সফর সেরে ঘুম ভেঙে মনটা দারুণ ভালো হয়ে যায় ওঁর। স্বপ্নের সফরে কয়েকবার ঘুরে এসেছেন কোনারকের মন্দির আর তার আশেপাশে। মন্দিরের 'সুরসুন্দরীরা জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে নৃত্যের নানা ঢঙে।' যা পরে কিছুটা অন্যভাবে বিকাশ ভট্টাচার্য-র বিখ্যাত কয়েকটা ছবিতে এসেছে।

শুয়ে শুয়ে বেড়াতে চলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়া সাহিত্যিক আবুল বাশারের প্রিয় শখ। প্রায়ই স্বপ্নে চলে যান শৈশবের গুমানি আর ভৈরব নদীর কাছে। বারবার পৌঁছে যান আদিগন্ত বিস্তৃত সবুজ এক শস্যভূমিতে। উত্তাল সমুদ্রে। মরুভূমির বুকে হেঁটে বেড়ান দীর্ঘ পথ। ঘুরে বেড়ান জঙ্গলেও। কিছু দিন আগে এক রাতে জঙ্গলের বুকচেরা পাহাড়ি নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলেন নদীর উৎসে, আশ্চর্য এক জলপ্রপাতের দেশে। বাস্তবে কাজের চাপে বেড়াতে যাওয়া হয় কমই। তার জন্য একটুও মন খারাপ নেই বাশারের। গভীর ঘুম আসবার আগে প্রায় প্রতি রাতেই যে চলে যান স্বপ্নের ভ্রমণে।

সাতাশি বছরের যুবক কবি অরুণ মিত্র-র প্রিয় নেশা মানসভ্রমণ। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে আজও শুনতে পান শিশির পড়ার শব্দ। বছরখানেক আগে এক রাতে সুমেরুর আলাস্কায় বরফের ওপর দিয়ে মনের আনন্দে হেঁটে বেড়িয়েছেন অনেকটা সময়। বাস্তবে নয় স্বপ্নে। কর্মসূত্রে একটা সময় ফ্রান্সে ছিলেন কিছু দিন। এক রাতে আঙুরখেতের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেড়িয়ে এসেছেন দক্ষিণ ফ্রান্সের এক গ্রামে। একটা বাড়ির দাওয়ায় বসে ফরাসি কৃষকদের সঙ্গে গল্প করেছেন অনেকক্ষণ। অরুণবাবু থাকতেন ফ্রান্সে নিস শহরের কাছে। কাছেই সমুদ্র। এপারে সান ফ্রান্সিস। ওপারে সান রোপেস। বাস্তবে খাঁড়ি পেরিয়ে ওপারে গিয়েছেন মাত্র একবার। দেশে ফিরে বারবার ইচ্ছে হত ওই জায়গাটায় চলে যেতে। ইচ্ছে মিটেছে স্বপ্নে। স্বপ্নের সমুদ্রের খাঁড়ি পার হয়ে বেশ কয়েকবার ঘুরে এসেছেন সান রোপেস।

ভরদুপুরে দিবাস্বপ্নে হাঁটতে হাঁটতে সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় একবার পৌঁছে গিয়েছিলেন পরিত্যক্ত এক গ্রামে। সমরেশ বসুর এক সংবর্ধনা সভায় গিয়েছিলেন নৈহাটি। নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে চুঁচুড়া এসে হাঁটছেন ব্যান্ডেল গেটের দিকে। হঠাৎ চোখের সামনের দৃশ্যপট গেল বদলে। পৌঁছে গেলেন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের পরিত্যক্ত 'জনপদ' গ্রামের মতো একটা জনমানবহীন জায়গায়। এই দিবাস্বপ্নের কথা আগে বলেছি। সঙ্গী আত্মীয়কে পরে শ্যামলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই গ্রামটা এখানে কী করে এল!' আত্মীয় তো বিস্ময়ে হতবাক। এমন গ্রাম তো তাঁদের পথে পড়েনি। আসলে দিবাস্বপ্নে সেদিন অতীতের মহামারী আক্রান্ত একটা গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। যে স্বপ্নের ভ্রমণ নিয়ে লেখা হয়েছিল তাঁর উপন্যাস 'আরব্যনগরী'।

কবি জয় গোস্বামী স্বপ্ন দেখেন না, স্বপ্নরাই জয়কে দেখে। স্বপ্নের ভ্রমণে বেরোন প্রায়ই, ঘুরে বেড়ান অসীম অনন্ত মহাকাশে। দেখা হয় তারাদের সঙ্গে। সেই ভ্রমণে মেলে চরম মুক্তির স্বাদ। মাঝেমধ্যে ধোঁয়া ঢাকা পাহাড় পেরিয়ে চলে যান ছিমছাম এক শহরে। জয়ের মনে হয়, জায়গাটা যেন ওঁর ছেলেবেলায় দেখা ভিলাই। একবার স্বপ্নে কবি জয় বেরিয়ে এসেছেন আশ্চর্য এক মরুভূমি থেকে। দূরে একটা পাহাড়, ওপরে গাঢ় নীল আকাশের চাঁদোয়া। পাহাড়ের ঢাল শেষ হয়ে মিশে গেছে বিস্তীর্ণ এক মরুভূমিতে। স্বপ্নের ভ্রমণে নীল আকাশকে সাক্ষী রেখে তীব্র আবেগে জয় ছুটে বেড়ালেন সেই মরুভূমির আদিগন্ত বালির ওপর দিয়ে।

কবি, চিত্রপরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র জীবনে স্বপ্ন আর বাস্তবের ফারাক প্রায় নেই। ভীষণ ভালোবাসেন স্বপ্ন দেখতে। স্বপ্নে ঘুরে বেড়ান অচেনা অন্য এক জগতে। দেশ-বিদেশে যে সব জায়গায় গেছেন, যে প্রকৃতি বুদ্ধদেবের চেনা, বুদ্ধদেব স্বপ্নে ঘুরে বেড়ান তার বাইরে অন্য এক জগতে। 'I roam in another world which is beyond my known world' বহুবার বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন

স্বপ্নে। স্বপ্নভ্রমণের সেই জগৎ পৃথিবী থেকে একেবারে আলাদা।

কোনও জায়গায় বেড়াতে গিয়ে হয়তো ফিরে আসতে হল ভালোভাবে জায়গাটাকে না দেখেই। এরকম হলে এক জন মানুষ স্বপ্নে চলে যেতে পারেন আগে দেখা জায়গাগুলোতে। এ ধরনের স্বপ্নে আগে বুড়ি-ছোঁওয়া জায়গাগুলোতে দীর্ঘসময় ধরে ঘুরে বেড়ান স্বপ্নের দর্শক। এটা এক ধরনের পুনরাবৃত্তির স্বপ্ন। ড্রিম অব রিপিটেশন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. মলয় ঘোষাল সান্দাকফু ঘুরে আসবার পর এক রাতে স্বপ্নে বিলম্বিত লয়ে ট্রেক করে এসেছেন সান্দাকফুর পথে। চাকরিজীবী তন্ময় চক্রবর্তী বাস্তবে ঘুরে আসবার পর স্বপ্নে বেড়াতে চলে যান নৈনিতাল লেক, চায়না পিক। জায়গাগুলো এক হলেও হুবহু এক নয়। স্বপ্নে বাস্তবের ষোলো আনা অনুকরণ সম্ভব নয়।

পুরী আর দীঘা বাঙালির দুই প্রিয় ভ্রমণের জায়গা। অনেকে আমাকে জানান এই দুই জায়গায় স্বপ্নে বেড়াতে যাবার কথা। কলেজ ছাত্রী দেবলীনা সেনগুপ্ত স্বপ্নে বারতিনেক ঘুরে এসেছেন পুরীর সমুদ্র থেকে। সাংবাদিক দীপান্বিতা নায়ার বেশ ক-বার স্বপ্নে চলে গেছেন পুরীর নির্জন এক সমুদ্রতটে। স্বামীর পাশে চুপচাপ বসে থেকেছেন বালির ওপর। এরকম সমুদ্রসফরে বড় আনন্দ হয় ওঁর। স্বপ্নে দীর্ঘক্ষণ ধরে দীঘার সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলার ছন্দে দুলেছেন গৃহবধূ প্রতিমা বসু। ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের খেলোয়াড় অনিন্দিতা চক্রবর্তী। অনিন্দিতার মা, অলকা মাঝে মধ্যে চলে যান স্বপ্নের সাগরবেলায়। সমুদ্রের ঢেউ দেখে সময় কাটান স্বামী আর মেয়ে অন্তুর সঙ্গে।

ছোটবেলার পড়া রূপকথার দেশে স্বপ্নে ঘুরে বেড়ান ছাত্রী অরুন্ধতী হাজরা। এক ব্যাঙ্ককর্মী ভ্রমণবিলাসী। ট্রেকিং করা প্রিয় নেশা। প্রত্যেকবার বেড়াতে যাবার আগে সেই জায়গাটার প্রকৃতি, পথঘাট নিয়ে কল্পনা করেন দিনরাত। পিণ্ডারি যাবার আগেই স্বপ্নে চলে যান পিণ্ডারির পথে খেতিতে। স্বপ্নেব ব্রেকফাস্ট সারেন খেতির ট্রেকারস হাটে বসে।

একরাতে দুর্গম পাহাড়ি পথে খুব সাবধানে পাহাড়ের মাথার দিকে উঠছেন গৃহবধূ তানিয়া ভট্টাচার্য। রোমাঞ্চকব যাত্রাপথের এক দিকে গভীর খাদ। অন্যদিকে হিংস্র জন্তুজানোয়ারে ভর্তি জঙ্গল। বাঘ, সিংহের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সেই অরণ্য থেকে। অজানা আনন্দের আশায় তানিয়া উঠে চলেছেন পাহাড়চুড়ার দিকে। স্বপ্নে ঘাটশিলা বেড়াতে গিয়ে ধারাগিরি ঝরনায় পা ডুবিয়েছেন সিসটার কাজল সিনহা। খেলেছেন জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে। পাহাড়ে উঠেছেন দৌড়েদৌড়ে। জঙ্গলে ঘুরেছেন মনের আনন্দে। স্বপ্নে একটা অপূর্ব জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলেন উত্তরপাড়ার ভ্রমণপাগল ব্যাঙ্ককর্মী মানব সরকার। সেই সফরে ছিল একটা বরফের হ্রদ। যা অনেকটা হেমকুণ্ডের হ্রদের মতো।

স্বপ্নে কেউ ট্রেনে করে বেড়াতে যান। কেউ বাসে। অনেকে আবার স্বপ্নের প্লেনে চড়েন। সেই যাত্রাপথের ছবি মনে রেখে যায় গভীর আনন্দের অনুভূতি। কেউ বা স্বপ্নে সারেন সংক্ষিপ্ত রোমান্টিক সফর। চিত্রকলার স্নাতক বিধান বিশ্বাস মাঝেমাঝে ঘুরে বেড়ান হলুদ রঙের এক প্রান্তর ধরে। যার দিগন্তে জমাট ধূসর নীল। সেই প্রান্তর দিয়ে একা কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে হাঁটেন বিধান। কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত এক রাতে হেঁটে বেড়ান ভাঙাচোরা একটা মাঠের ওপর দিয়ে। কাছেই একটা ভাঙা বাড়ি। মল্লিকার সঙ্গে কেউ একজন পুরুষ রয়েছেন। চেনাচেনা, তবু অচেনা। মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। তবু অদ্ভুত একটা নির্ভরতার অনুভূতি হচ্ছিল।

একবার গঙ্গোত্রী-গোমুখ বেড়াতে গিয়েছিলেন বেলঘরিয়ার গৃহবধূ ধৃতিকণা ভট্টাচার্য। নির্জন পাহাড়ি পথে পেছিয়ে পড়ে দেখা হয়েছিল ছোট্ট, সুন্দর এক ময়না পাখির সঙ্গে। সেই আশ্চর্য সুন্দর ময়নার আবেশ কয়েকবার স্বপ্নে ফিরে পেয়েছেন ধৃতিকণা। বাস্তবের হাজারটা সমস্যার মধ্যে নির্জন প্রকৃতির কোলে সেই স্বপ্নের ভ্রমণের স্মৃতি আজও ধৃতিকণার কাছে এক বিরাট 'রিলিফ'। আশি পার হয়ে যাওয়া বৃদ্ধ অশোকানন্দ দাশগুপ্ত এককালে অনেক বেড়িয়েছেন। আজ ভেঙে যাওয়া শরীরে আর বাইরে বেড়ানো সম্ভব নয়। তাতে কি? কিছুদিন আগে এক রাতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে এসেছেন দুর্গম তীর্থ অমরনাথ। দেখে এসেছেন বরফের শিবলিঙ্গ। ঠিক যেমনটা শুনেছেন অমরনাথ ঘুরে আসা এক বন্ধুপুত্রর মুখে।

মনে মনে বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হয় অনেক সাধারণ মানুষের। বাস্তবে হয়তো বিদেশ যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। সমস্যা মেটে স্বপ্নে। আনন্দবাজার সংস্থার টেলিফোন অপারেটার রমা

মজুমদার বহুবার স্বপ্নে ঘুরে এসেছেন অচেনা নানা বিদেশী শহরে। শহরটা অচেনা হলেও রমা বুঝতে পারেন কোনটা ফ্রান্স, কোনটা আমেরিকা আর কোনটা রাশিয়ার ইউক্রেন। মেদিনীপুর জেলার যুবক আকবারুল পাঠান একরাতে দ্রুতলয়ে ঘুরে এসেছেন ভারত, বাংলাদেশ আর চীন। একা নয়, সঙ্গী দুই বন্ধুর সঙ্গে। তিন বন্ধু হেঁটে বেড়িয়েছেন ইতিহাসবিখ্যাত চীনের প্রাচীরের ওপর দিয়ে। কলকাতার এক সাংবাদিক স্বপ্নে ট্রেক করে এসেছেন কিলিমাঞ্জারো পর্বতমালার পথে পথে। এক তরুণ চিকিৎসক এক রাতে দেখে এসেছেন স্বপ্নের ভেনিস! আগেরদিন একটা ইংরাজি চলচিত্রে ভেনিসের ছবি দেখেছিলেন।

পাসপোর্ট, ভিসার হাঙ্গামা নেই স্বপ্নের বিদেশভ্রমণে। নেই ডলারের চিন্তা। নিখরচায় বিদেশ ঘুরে আসবার এমন সুযোগ আসে কারও কারও জীবনে। তিরিশের যুবক শুভ্রাশিস একরাতে ওঁদের পাড়ার লাইব্রেরির মাঠটা দিয়ে ছুটতে শুরু করেন তীব্রবেগে। হঠাৎ পৌঁছে যান এক অজানা দেশে। একটা রাস্তার বোর্ডে লেখা 'ইস্ট আয়ারল্যান্ড'। অজানা আনন্দে আয়ারল্যান্ডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়ালেন স্বপ্নের দর্শক। কোথাও বরফ নেই। চারপাশ নীলাভ। বিরাট চওড়া রাস্তার দুপাশে বড় বড় প্রাসাদের মতো বাড়ি। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই একটাও। সেই শূন্যপুরীর রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে গা ছমছম করছিল শুভ্রাশিসের। এরকম আরও কয়েকশো স্বপ্নের বিবরণ স্বপ্ন সন্ধানের ফাইলে রয়েছে।

সঙ্গীতশিল্পী দীপক রুদ্র তাঁর বছর পঁচিশ বয়সে দেখা স্বপ্নের এক দুরন্ত ভ্রমণের ছবি আজও মনে করতে পারেন। কোনও একটা পৃথিবীবিখ্যাত ট্রেন, সম্ভবত ট্রান্সসাইবেরিয়ান এক্সপ্রেসে চড়ে স্বপ্নের ভ্রমণে বেরিয়েছেন দীপকবাবু। যাচ্ছেন মধ্য ইউরোপের ভেতর দিয়ে। দুপাশের পাহাড়, নদী, জঙ্গল দেখতে দেখতে আনন্দে সফর করছেন। সেই স্বপ্নের স্মৃতি আজও আপ্লুত করে এই শিল্পীকে।

কাকার কাছে মানস সরোবরের যাত্রাপথের গল্প শুনেছিলেন ৩২ বছরের মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রবাল বিশ্বাস। একরাতে স্বপ্নে পৌঁছে গেলেন মানস সরোবরের রাস্তায়। সেই পথে ছিল দুরন্ত রোমাঞ্চ! আর একরাতে প্রবাল চলে যান পিরামিডের দেশ মিশরে। স্বপ্নে অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে বেড়ান পিরামিডের নীচের টানেল ধরে।

কবি, সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী বাস্তবে যেমন স্বপ্নেও বেড়াতে যান প্রায়ই। অনেকবার চলে গিয়েছেন অদ্ভুত সব দ্বীপে, অচেনা আদিবাসীদের গ্রামে। একবার খোদ সূর্যের দেশে। যে দেশটা মহাকাশে নয়। যেন এই পৃথিবীরই কোথাও। ঘরবাড়ি, নদী, গাছপালা সবই আছে। নদীর জলে ঝুঁকে আছে মস্ত কেয়াঝোপ। তার ভেতর থেকে সূর্য উঠছে। একটা চুনি রঙের মস্ত পাথরের ফলকে জ্বলন্ত প্রদীপ গেঁথে গেঁথে লেখা আছে দেশটার নাম। সূর্যের দেশ।

স্বপ্নে প্রতীক

প্রতীকের ছড়াছড়ি স্বপ্নের দেশে। স্বপ্নে প্রতীক আসে কোনও ভাবকে পরোক্ষভাবে প্রকাশ করতে। ফ্রয়েডীয় মনোবিদরা মনে করেন, অচেতন মনের নানা ইচ্ছা বিভিন্ন ধরনের প্রতীক কল্পনা করে নেয়। আব ওই ইচ্ছা প্রতীকের ছদ্মবেশে নানাভাবে চলে আসে স্বপ্নে। স্বপ্নে এত বেশি প্রতীকের উপস্থিতি কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। তবে এ ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্তে হয়তো আসা যায়:

(১) স্বপ্নে অচেতন মনের হাজারটা রুদ্ধ ইচ্ছা চলে আসে। মনের প্রহরীকে ফাঁকি দিতে কোনও গোপন ভাব বা ইচ্ছা চলে আসে প্রতীকের ছদ্মবেশে।

(২) বাচ্চাদের চিন্তাভাবনায় রূপক আর প্রতীকের ছড়াছড়ি। ঘুমন্ত অবস্থায় বড় হয়ে যাওয়া এক জন মানুষের ভাবনাচিন্তাও শিশুদের মতো। তাই স্বপ্নে এত বেশি প্রতীক চলে আসে।

(৩) প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ তাঁদের মনের ভাব প্রকাশ করত মূলত নানা ধরনের প্রতীকের মাধ্যমে। স্বপ্নের জীববৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী, আদিমানবের মনের ওই প্রতীককল্পনা আমরা বংশানুক্রমে বয়ে চলেছি আমাদের মনে।

দেশে দেশে, কালে কালে কোনও একটা প্রতীকের অর্থ একই থাকে। বদলায় না। সবদেশে, সব মানুষের কাছে কোনও প্রতীক কীভাবে একই অর্থ বয়ে আনে, এটা আশ্চর্যের। এ থেকে এরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মানবমনের প্রতীককল্পনা জন্মগত। বেশিরভাগ প্রতীকের অর্থ সরাসরি বা সহজসরল ভাবনাচিন্তায় ধরা পড়ে না। একজন মানুষ হয়তো আরশোলা দেখে ভয় পান। এখানে আরশোলা ওই মানুষের অচেতন মনে কীসের প্রতীক, তা সহজে বোঝার কোনও উপায় নেই। দেশের রূপকথা, লোককথা, পুরাণ, ভাষাতত্ত্ব, চিত্রকলা, লোকগীতি, প্রচলিত প্রবাদ আর বাগধারা, ঠাট্টাতামাসা থেকে শুরু করে সাধারণের মধ্যে চালু অশ্লীল কথাবার্তা, গল্পগুজব বা গালিগালাজের মধ্যে নানাভাবে এগুলো চলে আসে বলে স্বপ্নের প্রতীকের অর্থ বার করতে এসবের সাহায্য নিতে হয়।

স্বপ্নে প্রতীক আর রূপকে তফাত অনেক। রূপকের অর্থ আমাদের কাছে সহজেই ধরা পড়ে। প্রতীকের অর্থ আমাদের কাছে পুরোপুরি অজানা। শরীরকে পিঞ্জর বা খাঁচা আর আত্মাকে পাখি ভাবলে খাঁচা আর পাখি শরীর আর আত্মার রূপক। 'আত্মারাম খাঁচাছাড়া' হবার অর্থ আমরা বুঝতে পারি সহজেই। পাশাপাশি বাড়ি কীসের প্রতীক তা কিন্তু আমরা সহজে বুঝতে পারি না। বাড়ির অর্থ জানতে সাহায্য নিতে হয় লোককথা পুরাণ আর দেহতত্ত্বের গানের। এরকম অনেক গানে বাড়ি বলতে স্ত্রী শরীর বোঝায়। 'বাড়ির শরীর খারাপ'—এরকম কথা এখনও অনেক অঞ্চলের মানুষকে বলতে শোনা যায়। এখানেও বাড়ির অর্থ স্ত্রী। মনুসংহিতার কথা, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'। অর্থাৎ গৃহিণীই গৃহ বা বাড়ি।

অনেক বাউলগানেও বাড়িকে তুলনা করা হয়েছে নারীদেহের সঙ্গে। তাই স্বপ্নে বাড়ি যে নারীদেহের প্রতীক তা বোঝা গেল সাধারণের মধ্যে চালু কথা, পুরাণ আর লোকসঙ্গীতের সাহায্যে। স্বপ্ন প্রতীকের একটা বৈশিষ্ট্য হল, কোনও প্রতীকের অর্থ ঠিকঠিক জানবার পরও মন তা মনে নিতে চায় না। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এক জন রোগী হয়তো মিষ্টি খেতে না পেয়ে প্রচুর পরিমাণে দুধ খেতে শুরু করলেন। এখানে ওই রোগী অচেতনে দুধকে চিনি বা মিষ্টির প্রতীক হিসাবে কল্পনা করছেন। এ কথা রোগীকে বললে, তিনি কখনওই তা মেনে নেবেন না। হয়তো উত্তেজিত হয়ে পড়বেন।

কোনও মনুষ্যেতর প্রাণীতে অতিরিক্ত ভয় বা ভক্তি আরোপিত হলে বুঝতে হবে এর পেছনে কাজ করছে অজানা প্রতীককল্পনা। সাপকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করেন অনেকেই। আবার নিরীহ জীব মাকড়সা, আরশোলা, টিকটিকি—এ সবও অনেকের কাছে অহেতুক ভয়ের কারণ। এর জন্য দায়ী

অচেতন মনের প্রতীককল্পনা। এ নিয়ে আলোচনা করেছি 'স্বপ্নে নিরীহ জীবের ভয়' অংশে।

স্বপ্নে নানা ধরনের প্রতীকের অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও আরও বহু স্বপ্নগবেষক মনোবিদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। স্বপ্নে নানা ধরনের প্রতীকের উপস্থিতি ভাবিয়েছিল ব্রিটিশ লেখক হ্যাভলক এলিসের মতো স্বপ্নসন্ধানী মানুষকেও। তবে এলিস এসব প্রতীকের অর্থ নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামাতেন না।

জার্মান মনোবিদ উইলহেম স্টেকেল ১৯১১ সালে বহু স্বপ্নপ্রতীকের অর্থ প্রকাশ করেন এক গবেষণাপত্রে। আশ্চর্যের বিষয়, স্টেকেলের এরকম বড় কাজের পিছনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ছিল খুব সামান্য। নিজের যা মনে হত, স্বপ্নপ্রতীকের সেই অর্থ ধরে এগোতেন এই গবেষক। স্টেকেলের অনুভূতিলব্ধ (Intuition) এ সব অর্থের বেশির ভাগই পরবর্তীকালে ফ্রয়েডসহ অনেক স্বপ্নগবেষক সঠিক বলে মেনে নেন। এ ছাড়া জার্মান মনোবিদ ই. ব্লিউলের, আমেরিকান মনোবিদ ই. জোনস ও অস্ট্রিয়ান মনোবিদ কে. আব্রাহামের বার করা নানা স্বপ্ন প্রতীকের অর্থ পরবর্তীকালে গৃহীত হয়। এক কালের ফ্রয়েডীয় মনোবিদ সি.জি. ইয়্যুন পরে ফ্রয়েড ও অন্য মনোবিদদের স্বপ্ন প্রতীকের ধারণাকে বর্জন করেন। ইয়্যুন মনে করতেন, মানুষের দেখা স্বপ্নে নানা ধরনের 'আদিরূপ' বা 'মডেল' এর উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায়। এরকম বেশ কিছু মডেল বা 'আর্কিটাইপ'কে আলাদা করে সেগুলোর অর্থ বার করেছিলেন ইয়্যুন।

স্বপ্নে প্রতীকগুলোর অর্থ বলবার আগে এগুলো সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য বলা দরকার:

(ক) কিছু মানুষ তাঁদের স্বপ্নে আসা অনেক প্রতীকের অর্থ অন্যদের চাইতে সহজেই ধরে ফেলতে পারেন। এ ব্যাপারটা হয়তো এদের মানসিক গঠনের ওপর কিছুটা নির্ভরশীল।

(খ) এমন কিছু বস্তু রয়েছে যেগুলো অনেক ধরনের প্রতীকের মাধ্যমে স্বপ্নে চলে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে স্বপ্নের দর্শক স্বপ্নে ওই ব্যাপারটা বুঝতে কোন প্রতীকটাকে বেছে নেবেন, তা একান্তই তাঁর মনের ব্যাপার। এরকম অনেকগুলোর ভেতর থেকে কোনও একটা প্রতীক স্বপ্নে চলে আসা স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক গঠন, পরিবেশ, নৈতিকতাবোধ, যৌনতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব ও আরও কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

(গ) স্বপ্নের বিশ্লেষণে প্রতীকের ওপর খুব বেশি নির্ভর করলে স্বপ্ন ব্যাখ্যায় ভুলপথে চালিত হবার ভয় থেকে যায়। স্বপ্ন বিশ্লেষণের মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বপ্নপ্রতীকের অর্থ কিছুটা সাহায্য করতে পারে মাত্র। প্রতীকের অর্থ ধরে গোটা স্বপ্নের অর্থ খুঁজতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।

(ঘ) নানা ধরনের প্রতীকের অর্থ খুঁজে বার করতে রূপকথা, লোককথা, লোকসঙ্গীত ছাড়াও প্রচলিত নানা ঠাট্টাতামাশার গুরুত্ব খুব বেশি। ফ্রয়েডের এ সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল রয়েছে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'ঠাট্টাতামাশা আর অচেতন মনের সঙ্গে তার সম্পর্ক' ('Jokes and their relation to Unconscious') শিরোনামের এক গবেষণাপত্রে। এই গবেষণাপত্রে অচেতন মনের নানা গোপন আশা আকাঙ্ক্ষা কীভাবে নির্দিষ্ট মানসিক প্রক্রিয়ায় প্রতীক কল্পনার মাধ্যমে প্রচলিত তামাশায় পরিণত হয়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এবার বিভিন্ন স্বপ্ন প্রতীক আর তার অর্থ কি তা জানা যাক। স্বপ্নে বাড়ি বা ঘর সাধারণত নারীদেহ বোঝায়। যদি বাড়ি বা ঘরে ঢোকবার ও বার হবার ব্যবস্থা স্বপ্নে আসে তবে নিঃসন্দেহে তাকে নারী শরীর বলে ধরে নেওয়া যায়। মসৃণ দেয়ালের বাড়ি পুরুষদেহকে বোঝায়। অসমান বা অমসৃণ দেয়ালের বাড়ি স্ত্রীদেহের প্রতীক। স্বপ্নে রাজা, পুলিশ, প্রশাসক এসব স্বপ্নের দর্শকের বাবার প্রতীক। রানি মায়ের প্রতীক। স্বপ্নে কেউ রাজপুত্র বা রাজকন্যাকে দেখতে পেলে বুঝতে হবে এই প্রতীকের অর্থ স্বপ্নদ্রষ্টা (পুরুষ বা নারী) নিজে। সাপ পুরুষ জননাঙ্গের প্রতীক। ছাতা, লাঠি, গাছের কাণ্ডও তাই। পুরুষের জননাঙ্গ স্বপ্নে আসতে পারে আরও নানা প্রতীকের বেশে। এর মধ্যে রয়েছে ছুরি, বর্শা, ছোরা, চপার, রাইফেল, রিভলভার, নখ ঘষার ফাইল, যে কোনও ধারালো অস্ত্র বা লম্বা সোজা বস্তু।

স্বপ্নে পাখি বা মাছের অর্থও একই। হাতুড়ি, লাঙল, নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রও পুরুষাঙ্গের প্রতীক। বিড়াল, শস্বপ্নে জটিল যন্ত্রপাতি পুরুষাঙ্গের প্রতীক। আরশোলা, মাকড়সা স্বপ্নে স্ত্রী জননাঙ্গকে বোঝায়। ইঁদুর, ামুকও তাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য (ল্যান্ডস্কেপ), বিশেষ করে জঙ্গলে ভরা পাহাড় আর সাঁকো কখনও

স্ত্রী জননাঙ্গ কখনও পুরুষ জননাঙ্গ হয়ে স্বপ্নে আসতে পারে। স্বপ্নে ম্যাপ বা চার্ট শরীর বা জননাঙ্গের প্রতীক। স্বপ্নে বাচ্চা আসতে পারে পুরুষ বা স্ত্রী জননাঙ্গের প্রতীক হয়ে। বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা হস্তমৈথুনের প্রতীক। স্বপ্নে সিঁড়ি বা মই দিয়ে দ্রুত ওঠানামা আসতে পারে রতিক্রিয়ার প্রতীক হিসেবে। টেবিল বা বোর্ড আসতে পারে নারীর প্রতীক হয়ে।

সারিবাঁধা পরস্পরযুক্ত ঘর স্বপ্নে গণিকালয়। এরকম ঘরের একটা থেকে আর একটায় যাওয়া 'চরিত্রহীনতার ইঙ্গিত'। এরকম দৃশ্য স্বপ্নে আসতে পারে বিয়ের প্রতীক হয়েও। বাক্স, পেঁটরা, জলের ড্রাম, বুকের খাঁচা, জাহাজ বা যে কোনও জলযান নারীশরীরের জরায়ুর প্রতীক। সিঁদুর স্বপ্নে ছোট বাচ্চাকে বোঝায়। স্বপ্নে সিঁদুরে মাখামাখি হলে বুঝতে হবে এই দৃশ্য স্বপ্নদ্রষ্টা নারীর গর্ভবতী হবার প্রতীক। এরোপ্লেন, রকেট বা যে কোনও ধরনের আধুনিক আকাশযান পুরুষাঙ্গের প্রতীক। এরকম আধুনিক প্রতীক আধুনিক মানুষের স্বপ্নে চলে এসেছে সভ্যতার হাত ধরে। বায়ুযান আবিষ্কারের আগে এরকম প্রতীক স্বপ্নে আসত না।

স্বপ্নে জল আর আগুন সম্ভবত সন্তান জন্মের প্রতীক। 'নুন, ওষুধ, বিষ ইত্যাদি অনেক সময়েই শুক্রের প্রতীক। ক্ষত (Ulcer) স্ত্রী চিহ্নজ্ঞাপক'। আঙটি আর জুতোও তাই। স্বপ্নে জনসমাবেশ দেখলে তা স্বপ্নের দর্শকের গোপন কোনও ভাব বা কথার প্রতীক। চরকা সম্ভবত মায়ের প্রতীক। স্বপ্নে যৌনাঙ্গ আসতে পারে শরীরের অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ছদ্মবেশে। স্বপ্নের দর্শকের কাছে হাত বা পা চলে আসতে পারে লিঙ্গের প্রতীক হয়ে। যোনিমুখ (Female Genital Orifice) স্বপ্নে আসতে পারে কান, চোখ বা মুখ হয়ে। মানুষের শরীরের নানা ধরনের নিঃসরণ (চোখের জল, প্রস্রাব, বীর্য, লালা) স্বপ্নে প্রায়ই একটা অন্যটাকে বোঝায়। চুল কাটার দৃশ্য, টাক বা দাঁত পড়ে যাওয়ার দৃশ্য পুরুষের স্বপ্নে দেখা দিতে পারে লিঙ্গহানির (castration) প্রতীক হিসেবে।

স্বপ্নে যৌন-প্রতীক এত বেশি আসে কেন? এর কারণ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন নয়। শৈশব থেকে শুরু করে বড় হওয়া পর্যন্ত সামাজিক মানুষের মনে যে প্রবৃত্তি (Instinct) সবচেয়ে বেশি অবদমিত হয়, তা হল যৌনতা। আর কোনও প্রবৃত্তিকে এত বেশি চাপা দিতে হয় না মানবমনকে। মানবমনের অচেতনে যৌনতাসংক্রান্ত নানা ধরনের রুদ্ধ ইচ্ছা বা কামনা তাই স্বভাবতই বেশি। আমাদের মনের প্রহরীর চোখেও যৌনতা নিষিদ্ধ বস্তু। অনেক সময়েই রুদ্ধ যৌন আবেগ বা ইচ্ছা তাই চলে আসে প্রতীকের ছদ্মবেশ ধরে।

উইলহেম স্টেকেলের কিছু কথা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। যৌন প্রতীক সম্পর্কে স্টেকেলের কিছু পর্যবেক্ষণ—

(ক) এমন অনেক প্রতীক রয়েছে, যেগুলো কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী চিহ্ন হয়ে স্বপ্নে আসে। যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্য।

(খ) কিছু প্রতীক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনও এক লিঙ্গের (gender) প্রতীক হয়ে এলেও কখনও কখনও বিপরীত লিঙ্গের প্রতীক হয়ে স্বপ্নে আসতে পারে। যেমন জটিল যন্ত্রপাতি। এই প্রতীক স্বপ্নে সাধারণত আসে পুরুষচিহ্ন হয়ে। ব্যতিক্রমী কিছু স্বপ্নে একই প্রতীকের অর্থ হতে পারে স্ত্রীচিহ্ন।

(গ) কিছু প্রতীক সন্দেহাতীতভাবে পুরুষ বা নারী কোনও একটা লিঙ্গকেই বোঝায়। যেমন ছাতা, লাঠি, ধারালো অস্ত্র, সাপ, আরশোলা, মাকড়সা।

স্টেকেলের করা কিছু স্বপ্ন প্রতীকের অর্থ ফ্রয়েড পুরোপুরি গ্রহণ করেননি বা বর্জন করেছেন। তবু এরকম কিছু স্বপ্ন প্রতীকের উল্লেখ পাওয়া যায় ফ্রয়েডের লেখায়। উৎসাহী পাঠক এগুলো নিয়ে ভেবে দেখতে পারেন। এরকম কিছু প্রতীকের কথা উল্লেখ করা যাক। স্বপ্নে ডানদিক 'ঠিক' বোঝায়। এর অর্থ হতে পারে বিয়ে বা যৌনমিলন। বাঁদিক 'ভুল' বা 'পাপের কথা' বোঝায়। এর অর্থ হতে পারে সমকামিতা, অজাচারের ইচ্ছা (Incest) বা যৌনবিকৃতি (Perversion)। স্বপ্নে আত্মীয়স্বজন যৌনাঙ্গকে বোঝায়। ফ্রয়েড ছোটভাই, বোন, ছেলে বা মেয়ে বাদে অন্য আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে এরকম প্রতীকের এই অর্থ গ্রহণ করেননি। স্টেকেলের মতে স্বপ্নে বোঝা বা লাগেজ নিয়ে চলা আসলে পাপের বোঝা। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নে এরকম 'লাগেজ' স্বপ্নদ্রষ্টার যৌনাঙ্গের প্রতীক। স্টেকেল স্বপ্নে নানা সংখ্যাকে প্রতীক হিসেবে ধরে নানা সংখ্যার নানা অর্থ বার করেছিলেন। এর মধ্যে একমাত্র '৩ নম্বর'কে ফ্রয়েডসহ

অনেক মনোবিদ পুরুষ জননাঙ্গের প্রতীক হিসেবে আংশিকভাবে মেনে নিয়েছেন।

স্বপ্নে কোনও একটা উভলিঙ্গ প্রতীকের সঠিক অর্থ খুঁজে বার করবার সময় সাবধান হতে হয়। কারণ স্বপ্নের পুরুষ দর্শক অনেক সময় নিজেকে নারী হিসেবে দেখেন। এর উলটোও হয়। এরকম স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শকের অচেতনে বিপরীতলিঙ্গে রূপান্তরের ইচ্ছা চলে আসে।

স্বপ্ন প্রতীকের আলোচনা থেকে কোনও পাঠকের মনে হতেই পারে, এটা অনেকটা 'তিলতত্ত্ব'র মতো ব্যাপার। 'অমুকস্থানে তিল থাকিলে অমুক হয়' এর মতো 'স্বপ্নে অমুক দেখিলে অমুক হয়'— স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যা লোকসমাজে খুব চালু থাকায় প্রতীকের অর্থকে অনেকে 'ড্রিম বুক' এর স্বপ্নের অর্থের সঙ্গে এক করে ফেলতে পারেন। এরকম ভাবলে তা হবে গুরুতর একটা ভুল। কেন না পাঁজিপুঁথি বা 'ড্রিম বুক' ঘেঁটে স্বপ্নের অর্থ বার করার পেছনে আর যাই হোক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা নেই। যে সব স্বপ্ন প্রতীকের কথা আগে উল্লেখ করেছি, মনোবিজ্ঞানীরা বহু পরিশ্রমে রূপকথা, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত, পুরাণ ও আরও অনেক দেশজ ঐতিহ্যের সাহায্যে এগুলোর অর্থ বার করেছেন। এক একটা প্রতীক অচেতন মনের নির্দিষ্ট একটা ভাবকে আশ্রয় করে তৈরি হয়, তা আগে বলেছি। দেশজ সংস্কৃতি ও লোককথার প্রেক্ষিতে কোনও একটা স্বপ্ন প্রতীক নিয়ে গভীরভাবে ভাবলে তার মনোবৈজ্ঞানিক অর্থ যে সঠিক তা বোঝা যাবে।

বাড়ি যে নারীর প্রতীক তা কীভাবে এদেশের লোককথা, লোকসঙ্গীত বা শাস্ত্রের কথা থেকে বোঝা যায় তা আগে বলেছি। আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রাজা, পুলিশ বা প্রশাসক স্বপ্নে বাবার প্রতীক। এঁদের কাজের সঙ্গে বাবার কাজের মিল অনেক। পুলিশ বা প্রশাসক বাবার মতোই শাসন করেন। আচার-আচরণে সতর্ক নজর রাখেন। প্রয়োজনে শাস্তি দেন। বাবা আর পুলিশ দুজনেই আমাদের সমীহ পান। বাবা আর পুলিশের ক্ষমতা শিশুমনে ঈর্ষার ব্যাপার। এঁদের ভালো দিকগুলো আমরা কম বয়সে সচেতনে প্রায়ই অনুকরণ করতে চাই। 'বড় হয়ে আমি বাবার মতো অফিস যাব বা ডাক্তার হব'র সঙ্গে 'বড় হয়ে আমি পুলিশ হব'র মিল অনেক। বাবা শুধু শাসন নয় পালনও করেন। পুলিশ বা প্রশাসকও তাই।

স্বপ্ন প্রতীক অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যায় স্বপ্নগবেষক মনোবিদ সি.জি. ইয়ুনের 'আর্কিটাইপ' নিয়ে কিছু কথা না বললে। বিভিন্ন দেশের রূপকথা, পুরাণ, ঐতিহ্য, চিত্রকলা—এ সবের সাহায্যে ইয়ুন স্বপ্নে বিভিন্ন ধরনের মডেল বা 'আদিরূপ' খুঁজে পান। ইয়ুনের আবিষ্কৃত এরকম কিছু আর্কিটাইপ হল, ছায়া *(Shadow)*, *ভূমি-মা (Earth-Mother)*, জ্ঞানী বৃদ্ধ ('Old wise man')। ইয়ুন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন তার 'মন্ডল' (Mandala) আর্কিটাইপকে। তিনি এসব জটিল আদিরূপকে মানুষের অচেতনে (ইয়ুনের ভাষায় সম্মিলিত অচেতন বা Collective Unconscious) এর নানা ভাবসমষ্টির দ্যোতক বলে ভাবতেন। প্রসঙ্গত জানাই, সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের দৃশ্যনির্মাণ সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তায় ইয়ুনের প্রভাব ছিল অনেকটাই। সত্যজিৎ যে বেশ খানিকটা ইয়ুন প্রভাবিত ছিলেন তা বোঝা যায় তার কিছু ছবির নানা দৃশ্য থেকে। ছেলেবেলা থেকে সত্যজিতের স্নেহধন্য শিল্পী উজ্জ্বল চক্রবর্তী 'পথের পাঁচালী' ছবিতে বাঁশঝাড়, অন্ধকার, কাশবন—এ সব দৃশ্যের পেছনে ইয়ুনের কিছু আর্কিটাইপের প্রভাবের কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর লেখা কিছু প্রবন্ধে।

স্বপ্নতত্ত্বের জগতে ফ্রয়েডের পাশাপাশি ইয়ুনের কাজকর্মের উল্লেখ এই বইতে নানাপ্রসঙ্গে করেছি। একটা সময় পর্যন্ত স্বপ্নে বিভিন্ন প্রতীকের ফ্রয়েডের বার করা অর্থ ইয়ুন অস্বীকার করেননি। পরবর্তিকালে নির্দিষ্ট কিছু প্রতীকের ফ্রয়েডীয় অর্থকে বর্জন করে ইয়ুন তাঁর নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। নির্দিষ্ট কয়েকটা প্রতীকের ক্ষেত্রে আর ফ্রয়েড আর ইয়ুনের করা প্রতীকী অর্থের তফাৎ এখানে বলব। বাড়ি বা গৃহ ফ্রয়েডীয় মতে নারীদেহের প্রতীক। ইয়ুন মনে করেন, বাড়ি হল স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মস্বরূপ।

ফ্রয়েড মনে করেন স্বপ্নে পাখি বা সাপ পুরুষাঙ্গের প্রতীক। ইয়ুনের মতে পাখি হল আত্মার প্রতীক। আর সাপ স্বপ্নে আসতে পারে শয়তান, মহিলা, পুনরুত্থান বা আরোগ্যের প্রতীক হয়ে। ফ্রয়েড মনে করেন, স্বপ্নে নগ্নতা আসতে পারে অবাধ যৌনতার প্রতীক হয়ে। ইয়ুন তা মনে করেন না। ইয়ুনের মনে হয় স্বপ্নে নগ্নতা আসতে পারে স্বপ্নের দর্শকের আত্মিক অসামান্য থেকে, সাম্য ফিরিয়ে আনবার

চেষ্টা হিসাবে।

ইয়্যুনের বার করা স্বপ্ন প্রতীক আর 'আর্কিটাইপ'গুলো সম্পর্কে ধারণা করা খুব সহজ নয়। জটিলতার ভয়ে ইয়্যুনের স্বপ্নপ্রতীক সম্পর্কিত মতামত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, ফ্রয়েডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার পর থেকে ইয়্যুনের স্বপ্নসম্পর্কিত ভাবনাচিন্তায় মনস্তত্ত্বর চাইতে দর্শন বেশি প্রাধান্য পেতে শুরু করে। 'শুভ আত্মা' (Good soul) অশুভ আত্মা (Bad soul), 'আত্মিক অসাম্য'—ইত্যাদি ইয়্যুনীয় ধারনায় মনোবিজ্ঞান নয়, কাজ করেছে ইয়্যুনের ক্রমাগত বদলাতে থাকা দার্শনিক তথা আধ্যাত্মিক ভাবনাচিন্তা। মনোবিজ্ঞানের আলোয় ইয়্যুনের পরবর্তিকালের কাজকর্ম বা চিন্তাভাবনা আদৌ কতটুকু গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

যে সব স্বপ্ন দেখেন অনেকেই

একজন মানুষ কিরকম স্বপ্ন দেখবেন তা নির্ভর করে তাঁর বয়েস, লিঙ্গ, পড়াশোনা, পেশা, অর্থনৈতিক অবস্থান, ধর্মবোধ, বিশ্বাস, কল্পনাশক্তি, মানসিকতা ও আরও অনেক কিছুর ওপর। এগুলোর তারতম্য ঘটে বলে বয়সে বিভিন্ন পেশার মানুষের স্বপ্নের দেশ আলাদা। তবে এমন কিছু স্বপ্ন রয়েছে, যেগুলো সবাই না হলেও অনেকেই এক বা একাধিকবার দেখে থাকেন। এসব স্বপ্নকে 'বহুমানুষের দেখা স্বপ্ন' বলা যায়। ফ্রয়েডের ভাষায়, 'টিপিক্যাল ড্রিমস'। প্রায় সব দেশের মানুষের একটা বড় অংশের স্বপ্নের দেশে এই স্বপ্নগুলো থাকবেই। তবে পূর্ব আর পশ্চিমের দেশে এই স্বপ্নগুলোতে সামান্য কিছু তফাত রয়েছে বলে আমার মনে হয়।

বহুমানুষের দেখা স্বপ্নগুলোর মধ্যে রয়েছে—

(১) পরীক্ষার স্বপ্ন
(২) পড়ে যাবার স্বপ্ন
(৩) ওড়ার স্বপ্ন
(৪) প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন
(৫) জলে ডোবার স্বপ্ন
(৬) উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন
(৭) চোর ডাকাত বা হিংস্র জন্তুর স্বপ্ন
(৮) স্বপ্নে জীবজন্তুর তাড়া
(৯) দাঁত পড়ে যাবার স্বপ্ন

পরীক্ষার স্বপ্ন

কোনওদিন স্কুলে যাননি এমন মানুষ কখনও পরীক্ষার স্বপ্ন দেখেন না। স্কুল কলেজে পড়াশোনা করেছেন এমন মানুষের অনেকেই কোনও না কোনও সময় পরীক্ষা সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখেন। আমার স্বপ্নসন্ধানের সমীক্ষায় স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এমন প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ এরকম স্বপ্ন দেখেছেন। বাস্তবে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে পরীক্ষার স্বপ্ন দেখা মানুষের সংখ্যা সম্ভবত আরও বেশি। এরকম স্বপ্নদ্রষ্টাদের বেশিরভাগ এই স্বপ্ন দেখেছেন একাধিকবার। কেউ কেউ বহুবার। স্কুলে উঁচু ক্লাসে বা কলেজে পড়াশোনা করছে এমন ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে পড়াশোনা বহুদিন শেষ করা মধ্যবয়স্ক মানুষ, শিক্ষক শিক্ষিকা, এমন কী সত্তর পার হওয়া বৃদ্ধরা পর্যন্ত পরীক্ষার স্বপ্ন দেখেন। পরীক্ষার স্বপ্নের বৈচিত্র্য বোঝাতে এরকম কিছু স্বপ্নের কথা বলি।

স্বপ্ন ১: তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছি—স্বপ্নে দেখলাম পরীক্ষা দিচ্ছি—প্রশ্নপত্রের বেশ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই টেনশান হচ্ছে—কি লিখব।

—রমাপদ চৌধুরী

স্বপ্ন ২: স্বপ্নে পরীক্ষা দিতে হয়েছে বহুবার,—এই স্বপ্ন এখনো আসে—হায়ার সেকেন্ডারি নিয়ে খুব টেনশান ছিল—এম. এসসি. নিয়ে একটুও চিন্তা ছিল না, খুব ভালো হয়েছিল পরীক্ষা—অথচ স্বপ্নে শুধু

এম. এসসি. পরীক্ষাটাই আসে—ভালো করে উত্তর লিখতে পারছি না, কিছুতেই শেষ করতে পারছি না।

—ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, দূরদর্শনের সংবাদ পাঠিকা

স্বপ্ন ৩: পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিচ্ছি—একটা প্রশ্ন লিখতেই প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে গেছে—কিছুতেই শেষ করতে পারছি না—অসম্ভব টেনশান হচ্ছে।

—সুচিত্রা ভট্টাচার্য

স্বপ্ন ৪: হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিতে বসেছি—যাদের সঙ্গে ক্লাসে খুব প্রতিযোগিতা, তারা সবাই খুব ভালো লিখছে—হাজার চেষ্টা করেও আমি কিছু লিখতে পারছি না—কিছু মনে আসছে না—খাতা পুরো সাদা—কলম চলছে না, ভয়ে হাত কাঁপছে।

—অভিজিৎ সরকার, বি. এ. প্রথম বর্ষ, কোচবিহার

স্বপ্ন ৫: খুব তাড়াহুড়ো করছি অথচ পা যেন আর চলছে না—কিছুতেই সময়ে পরীক্ষার হল-এ পৌঁছতে পারছি না। এখনও দেখি।

—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বপ্ন ৬: সময় শেষ হয়ে গেছে, খুব তাড়াহুড়ো করছি—ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে গেল—আমার খাতা কেড়ে নিচ্ছে—লেখার অনেক বাকি রয়ে গেল।

—মধুমিতা দত্ত, শিক্ষিকা, আগরতলা।

স্বপ্ন ৭: সাদা খাতা—কিছু মনে পড়ছে না—লিখতে পারছি না—এদিকে সময় প্রায় শেষ। এই স্বপ্ন একসময় প্রায়ই দেখতাম।

—ডা. বিবেকানন্দ কোলে, চিকিৎসক, আমতা।

স্বপ্ন ৮: অঙ্ক করে যাচ্ছি, করে যাচ্ছি, কিছুতেই শেষ হচ্ছে না—সময় হয়ে আসছে।

—সুমনা সাহা, আইনজীবী, বরিশাল, বাংলাদেশ।

ছাত্রজীবনে পরীক্ষাকে ভয় পাননি এমন মানুষ বিরল। একেবারে ছোটবেলায় শিশুসুলভ দস্যিপনা বা ভুলের জন্য বাবা-মা বা শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে শাস্তি জোটে না কার! বড় হয়ে যাবার পরও শৈশবের শাস্তির এই স্মৃতি মনের অচেতনে থেকে যায়। আর যখনই কিছু ভুল হয় বা কোনও কাজ ঠিকভাবে করা যায় না, ঐ শাস্তির ভীতি পরীক্ষার বেশে দেখা দেয় স্বপ্নে। ছাত্রজীবনের সবচাইতে বড় শাস্তিই যে পরীক্ষা। পরীক্ষা হল-এ ঠিকমতো পৌঁছতে না পারা, লিখতে না পারা। বা সময়ে লেখা শেষ করতে না পারা, লিখতে বসে কিছু মনে না পড়া—এসবই হল দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের বিষয়।

সামনে কোনও কঠিন কাজ থাকলে মনে দুশ্চিন্তা থাকে, পাছে কাজটা ঠিক ভাবে করে না ওঠা যায়। এরকম উদ্বেগ পরীক্ষার বেশে হানা দেয় আপনার আমার স্বপ্নে। যে পরীক্ষা আগেই পাশ করে গেছেন, সেই পরীক্ষায় অসফল হওয়ার স্বপ্ন মানুষ বেশি দেখে। ঘুম ভাঙবার পর ঘুমন্ত চেতনার উদ্বেগ ধাক্কা খায় জাগ্রত চেতনা বা বাস্তবের সঙ্গে। এরকম স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা বলি। পরীক্ষার স্বপ্ন মানুষকে সান্ত্বনা দেয়। *'তুমি এই সমস্যাটা নিয়ে অযথা বিব্রত হচ্ছ। আগে যেমন পরীক্ষার চিন্তা থাকা সত্ত্বেও সফল হয়েছ, এবারও তাই হবে।'* এরকম স্বপ্ন সান্ত্বনা দেবার পাশাপাশি মনকে তিরস্কারও করে। সেই কবে তুমি পরীক্ষায় পাশ করে গেছ, এখনও তোমার পরীক্ষার মতো সমস্যা নিয়ে শিশুসুলভ ভয় গেল না। তুমি ছোট্ট ছেলেই রয়ে গেলে।' 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না, হায় ভীরু মন হায় রে।'

যে পরীক্ষাগুলো নিয়ে ভয় ছিল, সাধারণত সেই সব পরীক্ষা খারাপ হবার স্বপ্ন মানুষ কম দেখে।

ইন্দ্রাণীদেবীর ভয় ছিল হায়ার সেকেন্ডারি নিয়ে। অথচ স্বপ্নে ইন্দ্রাণী সময়ে শেষ করতে পারেন না এম. এসসি. পরীক্ষার উত্তর। যা ইন্দ্রাণী পাশ করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। হায়ার সেকেন্ডারি নিয়ে এরকম স্বপ্ন দেখলে, জেগে ওঠার পর মন সান্ত্বনা পাবে না। বলতে পারবে না, 'সহজেই তুমি সামনের সমস্যায় সফল হবে। যেমন ঐ পরীক্ষাটায় হয়েছিলে।' ফ্রয়েডের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা হুবহু একরকম। স্কুলে ইতিহাসের খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। খুব ভালো নম্বর উঠত ইতিহাস পরীক্ষায়। জীবনে যতবার পরীক্ষা নিয়ে টেনশানের স্বপ্ন দেখেছেন ফ্রয়েড, তার সবগুলোই ইতিহাস পরীক্ষা নিয়ে। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা বা রসায়ন পরীক্ষা নিয়ে নয়। অথচ এই বিষয়গুলো নিয়েই খুব ভয় থাকত ছাত্র সিগমুন্ডের।

ফ্রয়েডের এক সহকর্মী স্টেকেল অস্ট্রিয়ার বহু মানুষের স্বপ্ন সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা ভালোভাবে পাশ করা লোকেরা পরবর্তী জীবনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা খারাপ করার বা অসফল হবার স্বপ্ন দেখেন। ঐ পরীক্ষায় ফেল করেছেন এমন মানুষ এরকম স্বপ্ন দেখেন না। ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্ত মেনে নেন। মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর বসু ফ্রয়েডের এরকম সিদ্ধান্তের সঙ্গে এক মত হতে পারেননি। তাঁর মতে, অনেক মানুষ ফেল করা পরীক্ষা নিয়েও উদ্বেগের স্বপ্ন দেখেন। আমার অভিজ্ঞতায় এরকম ঘটনার সংখ্যা খুব কম।

পরীক্ষার স্বপ্নগুলোকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ না করে ফ্রয়েড ও অন্যান্য কয়েকজন মনোবিদ বহু মানুষের দেখা এরকম স্বপ্নকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন দুরূহ কাজে সাফল্যের ইঙ্গিত হিসেবে। সব সময় পরীক্ষাসংক্রান্ত স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যা সঠিক বলে আমি মনে করি না। যে কোনও পরীক্ষাসংক্রান্ত স্বপ্নে স্বপ্ন দেখার আগের দিনটাতে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে কোনও না কোনও একটা উদ্বেগ থাকে। সেই উদ্বেগ কল্পনার হাত ধরে রাতে স্বপ্নের পরীক্ষাতে এসে জায়গা করে নেয়। পরীক্ষার আগে যে সব প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে তৈরি নেই, সেগুলো নিয়ে যে চিন্তা তা পরীক্ষার স্বপ্নে চলে আসা অসম্ভব নয়।

রমাপদ চৌধুরীর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার স্বপ্নটার কথা ভাবা যাক। স্বপ্নের পরীক্ষার 'বেশ কয়েকটা' (সব কটা নয়) প্রশ্নের উত্তর জানা নেই ছাত্র রমাপদর। ঐ প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো ভালভাবে তৈরি করেনি সে। যদি ওগুলো পরীক্ষায় এসে যায়, কি করবে, মনে এই ভয় থাকা অসম্ভব নয়। এই উদ্বেগ থেকেই সম্ভবত স্বপ্নটা এসেছিল। কোচবিহারের ছাত্র অভিজিৎ (স্বপ্ন ৪) হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার স্বপ্ন দেখেছে ওই পরীক্ষার ঠিক আগে। 'ভয় পেও না এবারও তুমি সফল হবে'—এই ব্যাখ্যা পেতে গেলে সে ভালোভাবে পাশ করা মাধ্যমিকের স্বপ্ন দেখত। ক্লাসে যাদের সঙ্গে নম্বর নিয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, তারা পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে যাবে এরকম উদ্বেগ থেকে স্বপ্নটার জন্ম। প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে দেবার জন্য প্রবল উদ্যমে পড়াশোনা করায় ইন্ধন যোগাতে চেয়েছে এই স্বপ্ন।

স্বপ্ন দেখার আগের দিনের জেগে থাকা অবস্থার কোনও দুশ্চিন্তা বা টেনশান থেকে যে সব সময় পরীক্ষার স্বপ্ন আসে অনেক মনোবিদ তা মানেন না। শারীরিক নানা প্রয়োজনের কারণেও একজন মানুষ এ ধরনের স্বপ্ন দেখতে পারেন। হয়তো ঘুমের ভেতর খুব বাথরুমে যাবার প্রয়োজন দেখা দিল। অথচ ঘুম ছেড়ে টয়লেট যেতে চাইছে না মন। হয়তো যৌন ইচ্ছা দেখা দিল। কিন্তু ঘুমের বারোটা বাজিয়ে সেই ইচ্ছাপূরণ করতে মন খুব একটা উৎসাহ পেল না। এরকম শারীরবৃত্তীয় নানা উদ্বেগ থেকেও পরীক্ষার স্বপ্ন আসতে পারে।

পরীক্ষা নিয়ে একটা অন্যরকম স্বপ্ন উল্লেখ করেছি পরে, 'মুশকিল আসানের স্বপ্ন' বিভাগে। দেরি হয়ে গেছে, হেঁটে সময়ে হল-এ পৌঁছনো যাবে না, এরকম একটা অবস্থায় যান্ত্রিক উপায়ে উড়তে উড়তে পরীক্ষার হল-এ পৌঁছে যান এই স্বপ্নের দর্শক। তরুণ সাংবাদিকের এই স্বপ্নে শৈশবের আনন্দ ফিরে পাবার ইচ্ছার অস্তিত্ব রয়েছে ('ওড়ার স্বপ্ন' দেখুন)। ওড়ার আনন্দে এখানে চাপা পড়ে যাচ্ছে পরীক্ষার হলে সময়ে পৌঁছতে না পারার দুশ্চিন্তা। উড়ে পরীক্ষা দিতে যাবার এই স্বপ্ন বেশ মজার, ব্যতিক্রমী।

পরীক্ষা সংক্রান্ত একটা ব্যতিক্রমী স্বপ্নের কথা না বললে পরীক্ষার স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বহুবার দেখা এই স্বপ্নের কথা আমাকে জানান অর্থনীতির অধ্যাপক সুশান্ত মজুমদার। ছাত্রজীবনে ব্রিলিয়ান্ট স্কলার ছিলেন সুশান্ত। মাঝেমধ্যে স্বপ্ন দেখেন, 'আজ পরীক্ষার রেজাল্ট বার হবে।

আজ বড় আনন্দের দিন!' আগের দিন কোনও মানসিক উদ্বেগে থাকলে রাতে এই স্বপ্ন দেখেন ভদ্রলোক। পরীক্ষা দেওয়ার বদলে 'রেজাল্ট বার হবার' স্বপ্নটা দেখলেই এই স্বপ্নের দর্শকের খুব আনন্দ হয়। মনে হয়, এই দিনটা যেন না ফুরোয়! কেউ ডেকে দিলে খুব রেগে যান। ব্যতিক্রমী এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা অধ্যাপকের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পরীক্ষাগুলো আসে বেশি। এককালের মেধাবী এই ছাত্রের প্রত্যেক পরীক্ষার নম্বর ছিল খুব ভাল। পরবর্তীকালে ঝঞ্ঝাট আর দুশ্চিন্তায় ভরা বাস্তব জীবনের যন্ত্রণা ভোলাতে স্বপ্নে বারবার চলে আসে পরীক্ষার রেজাল্ট বার হবার দিনগুলোর সুখের স্মৃতি, আনন্দের অভিজ্ঞতা। এই স্বপ্ন শ্যেরনারের কিছু কথা মনে করিয়ে দেয়। 'স্বপ্নের কাজ দিনের যন্ত্রণা ভোলানো আর ব্যথা সারানো।' এরকম ব্যতিক্রমী পরীক্ষার স্বপ্ন আরও কেউ কেউ দেখেন।

পড়ে যাবার স্বপ্ন

পড়ে যাবার স্বপ্ন দেখেন না এমন মানুষ সংখ্যায় খুব কম। এরকম স্বপ্ন দেখেন না বা দেখলেও মনে করতে পারেন না একশো জনে মাত্র দশ জন। এরকম স্বপ্ন বেশিরভাগ মানুষ দেখেন বারবার। কোনও একটা উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাচ্ছেন স্বপ্নদ্রষ্টা। মাটি ছোঁবার আগেই ভয়ে ঘুম যায় ভেঙে। স্বপ্নের কল্পনাব জোরে এরকম সাধারণ পড়ে যাবার স্বপ্ন আসতে পারে নানাভাবে। পড়ে যাবার স্বপ্ন কত বিচিত্র ধরনের হতে পারে তা বোঝা যাবে কিছু মানুষের পড়ে যাবার স্বপ্নের বিবরণ শুনলে।

স্বপ্ন ১: বিশাল একটা নাম না জানা বাঁধ—শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছি—হঠাৎ যেন কেউ ঠেলে দিল—আমি চিৎকার করতে করতে পড়ে যাচ্ছি। আকাশকে ধরে বাঁচার চেষ্টা করছি। ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

—সমর চক্রবর্তী, সাংবাদিক, খড়গপুর।

স্বপ্ন ২: অনেক উঁচুতে কোথাও উঠেছি—পা পিছলে নীচে পড়ে যাব—কখনও পড়িনি, তবে ভয় লাগছে এই বুঝি পড়ে গেলাম। আগেও দেখতাম এখনও দেখি।

—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন ৩: পাহাড়ের ওপর থেকে গ্লাইড করবার চেষ্টা করছি—করতে গিয়ে ব্যালান্স না সামলাতে পেরে নীচে পড়ে যাচ্ছি—খুব ভয় করছে—মনে হচ্ছে পড়ে ঠিক মরে যাব—মাটিতে পড়বার ঠিক আগে ঘুম ভেঙে যায়।

—ডা. অশোকবিজয় সেনগুপ্ত, ডেন্টিস্ট, কলকাতা

স্বপ্ন ৪: একটা উজ্জ্বল আলোর বলয়ের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে অনেক ওপরে উঠে গেছি—অনেকটা উঠে নীচের দিকে পড়তে শুরু করলাম। ভয়ে জেগে গেলাম।

—সুব্রত মহাপাত্র, টেলিফোন অপারেটর।

স্বপ্ন ৫: ঘুমের মধ্যে একদিন স্বপ্ন দেখলাম, আমি খাট থেকে নীচে পড়ে গেছি—ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখলাম আমি মাটিতে শুয়ে।

—দেবলীনা সেনগুপ্ত, ছাত্রী, হাওড়া গার্লস কলেজ।

স্বপ্ন ৬: ট্রেনের সিটে ঘুমোতে ঘুমোতে যাচ্ছি—স্বপ্ন দেখলাম হাওড়া স্টেশানে পৌঁছে গেছি। লঞ্চঘাটের দিকে এগোচ্ছি—জেটি থেকে লঞ্চ ধরবার জন্য লাফ দিলাম—পা ফসকে জলে পড়ে যাচ্ছি—সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

—বাসুদেব ভট্টাচার্য, হোসিয়ারি ব্যবসায়ী, হিন্দমোটর।

স্বপ্ন ৭: ছাদ থেকে পড়ে যাচ্ছি—ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্নটা প্রায়ই দেখি।

—স্বাতী রায় চৌধুরী, ছাত্রী।

স্বপ্ন ৮: অনেক ওপর থেকে নীচে পড়ে যাবার স্বপ্ন দেখি প্রায়ই। ঘুম ভেঙে যায়।

—সুমনা সাহা, বরিশাল, বাংলাদেশ।

এরকম স্বপ্নের সাধারণ একটা ব্যাখ্যা অনেক মনোবিদ দিয়েছেন। এঁদের মতে, পড়ে যাবার স্বপ্নের ভেতর দিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টার অচেতনে থাকা নৈতিক অধঃপতনের ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হতে চায়। প্রত্যেক মানুষের ভেতর এমন কিছু কাজকর্ম করবার বাসনা থাকে যেগুলো সমাজের চোখে অনৈতিক। বড় হবার পাশাপাশি সমজের রীতিনীতি, শিক্ষা, সহবত—এসবের প্রভাবে এরকম ইচ্ছা চেতন থেকে চলে যায় অচেতনে। অচেতনের এরকম ইচ্ছা মাঝেমধ্যে আমাদের ঘুমন্ত চেতনায় চলে আসে স্বপ্নের বেশে।

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, এরকম স্বপ্ন যদি অচেতনের অনৈতিক বাসনার কাল্পনিক পূরণ হয়, তবে এরকম স্বপ্নে মানুষ ভয় পায় কেন? বেশিরভাগ সময় স্বপ্নের ভেতর ভয়ে ঘুম ভেঙে যায় কেন? এর একটা ব্যাখ্যা বলি। অনৈতিক ইচ্ছা অচেতন থেকে স্বপ্নে চলে আসে মনের প্রহরী পুরোপুরি সজাগ না থাকায়। যে মুহূর্তে এই ইচ্ছা থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু হল, অমনি মনের প্রহরী সজাগ হয়ে ওঠায়, তার ভয়ে ভয় পেতে শুরু করেন স্বপ্নের দর্শক।

নিরাপত্তার অভাববোধ থেকেও এরকম স্বপ্ন দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি। (৬) নম্বর স্বপ্নদ্রষ্টা লঞ্চে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাবার স্বপ্ন তখনই দেখেন বেশি, যখন তাঁর মনে ব্যবসা বা টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনও বড় উদ্বেগ থাকে। বেশ কয়েকজন গৃহবধূ ও ছাত্রছাত্রীর পড়ে যাবার স্বপ্নের খোঁজখবর নিতে গিয়ে এরকম উদ্বেগ খুঁজে পেয়েছি। গৃহবধূদের ক্ষেত্রে এই উদ্বেগ সংসার, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা বা স্বামীর চাকরিকে কেন্দ্র করে। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা আর চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাকে ঘিরে অনিশ্চয়তাও এরকম স্বপ্নে চলে আসতে পারে।

পড়ে যাবার স্বপ্নের আরও নানা ব্যাখ্যা রয়েছে। একরম স্বপ্নকে জীববিজ্ঞানমূলক তত্ত্ব (Biological Theory) দিয়ে অনেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এঁরা কি বলেন জানা যাক। আদিম পৃথিবীতে গাছেগাছে বাস করা বানরেরা ঘুমোত গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে। ঘুমন্ত অবস্থায় এদের কেউ কেউ নীচে পড়ে মারা যেত। কেউ বা নীচের কোনও ডাল আঁকড়ে ধরে কোনও মতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যেত। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, মানুষের পূর্বপুরুষ বানরদের মনের এই বিশেষ ভাবনা বিবর্তনের সূত্র ধরে চলে এসেছে মানুষের মধ্যে। আর এই ভয় থেকেই মানুষ উঁচু থেকে পড়ে যাবার স্বপ্ন দেখে।

পাঠক খেয়াল করবেন, একরম স্বপ্নে মাটি ছোঁবার আগেই ঘুম ভেঙে যায় স্বপ্নদ্রষ্টার। অনেকসময় পড়ে যাবার স্বপ্ন আসে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে। আধোঘুমে পা দুটো যেন নীচে নেমে গেল, আর তাতে তন্দ্রার আবেশ গেল ভেঙে। এরকম অভিজ্ঞতা আছে অনেকের। কেউ আবার দেবলীনার (স্বপ্ন ৫) মতো স্বপ্ন দেখেন খাট থেকে পড়ে যাবার। ঘুমের ভেতর হাত-পা বেশি ছোঁড়ার জন্য খাট থেকে পড়ে যাবার সময় এরকম স্বপ্ন দেখা অসম্ভব নয়। এখানে যে প্রশ্ন চলে আসছে তা হল, তবে কি ঘুমের ভেতরও আমাদের ঘুমন্ত চেতনা বাস্তবের ছবি দেখতে পায়? পাঁচ পাতায় রমাপদ চৌধুরীর এই সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখুন। এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার চেষ্টা করা যাবে পরে।

অনেকের ধারণা ঘুমের ভেতর পা কোনওভাবে সরে গেলে বা উঁচু করে রাখা পা আচমকা পড়ে গেলে ঘুমন্ত মানুষ পতনের স্বপ্ন দেখে। মনোবিজ্ঞানীরা পড়ে যাবার স্বপ্নের এই কার্যকারণ সম্পর্কে মানেন না। এই স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও মনোবিজ্ঞানীরা নাকচ করে দিয়েছেন।

বহু মানুষের দেখা অন্য স্বপ্নের মতো সাধারণ ব্যাখ্যা ছাড়াও আলাদা আলাদা করে পড়ে যাবার স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। স্বপ্নকল্পনা (Dream Imagination) কত বিচিত্র হতে পারে তা বোঝা যায় এই স্বপ্নের দৃষ্টান্তগুলো ভালোভাবে দেখলে। আমার বাছাই করা দৃষ্টান্তের প্রথম সময়ের

স্বপ্নে সে বাঁধের ওপর শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে। এই বাঁধ স্বপ্নে এসেছে অতীতের কোনও স্মৃতি থেকে। হয়তো কোনও বাঁধের ছবি বা বাঁধে বেড়াতে যাবার কোনও পুরনো স্মৃতি। পড়ে যাবার মুহূর্তে অন্য কিছু নয়, আকাশকে আঁকড়ে ধরে পতন রোধের চেষ্টা চালাচ্ছেন স্বপ্নের দর্শক। এরকম আজগুবি কল্পনা স্বপ্নেই সম্ভব।

টেলিফোন অপারেটারের পতনের স্বপ্নে (স্বপ্ন ৪) তিনি পড়ছেন উজ্জ্বল আলোর বলয় ধরে উঠে যাওয়া মহাকাশ থেকে। কোনও পাহাড় বা উঁচু জায়গা থেকে নয়। অসীম, অনন্ত মহাকাশকে নিয়ে সুব্রতর মনের কোনও কল্পনার সূত্র থেকে এই স্বপ্নের শুরু। বাসুদেবের স্বপ্নে (স্বপ্ন ৬) ও পড়ে যায় জেটি থেকে, গঙ্গায়। কাজকর্মের সূত্রে প্রায়ই তাড়াহুড়ো করে ছেড়ে দেওয়া লঞ্চ লাফিয়ে ধরতে হয় ওঁকে। লঞ্চে উঠতে গিয়ে অসাবধানতায় এক অফিসযাত্রী কয়েকবছর আগে গঙ্গায় পড়ে গিয়ে মারা যান। এই ঘটনার কথা জানা আছে এই স্বপ্নদ্রষ্টার। হয়তো এইসব সূত্র মিলেমিশে চলে আসে ওঁর পড়ে যাবার স্বপ্নে। অনেক উঁচু থেকে নয়, স্বপ্নে ও বারবার পড়ে যায় জেটি থেকে গঙ্গায়।

পড়ে যাবার স্বপ্ন কত বিচিত্র ধরনের হতে পারে তা জানা যায় বিভিন্ন পেশার আর বয়সের মানুষের এরকম স্বপ্ন নিয়ে খোঁজখবর নিলে। সত্তর অতিক্রান্ত বৃদ্ধ সুকুমার দাশগুপ্ত ছেলেবেলায় প্রায়ই দেখতেন এরোপ্লেন থেকে পড়ে যাবার স্বপ্ন। সেই বয়সে প্লেনে চড়বার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না ঐ স্বপ্নদ্রষ্টার। তবু কেন সব কিছু ছেড়ে প্লেন থেকে পড়ে যাওয়া বারবার আসত স্বপ্নে? ছেলেবেলায় আকাশপথে প্লেন যেতে দেখে প্লেনে চড়বার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে শিশুমনে তৈরি হত প্লেনে চড়বার নানা কল্পনা। আর সেই কল্পনার স্মৃতি চলে আসত স্বপ্নে। কবি রতনতনু ঘাটি বারবার দেখেন বাস বা ট্রামের পাদানি থেকে পড়ে যাবার স্বপ্ন। বা নদীর পারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পাড় ভেঙে নীচে পড়ে যাবার স্বপ্ন।

একজন ত্রিশ বছরের যুবক জানান, তাঁর এরকম স্বপ্নে বারবার তিনি পা পিছলে পড়ে যান একটা উঁচু মইয়ের ওপর দিককার সিঁড়ি থেকে। বাংলাদেশের খুলনার চিত্তরঞ্জন মজুমদার স্বপ্নে পড়ে যান কয়েকতলা উঁচু কোনও বাড়ির ছাদ থেকে। এরকম ছাদ থেকে বা কার্ণিশ থেকে পড়ে যাবার স্বপ্ন আরও অনেকে দেখেন। শিক্ষিকা বর্ণিলা পাল নদীর বাঁধানো সিঁড়ি থেকে স্লিপ করে নীচে পড়ে যান। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ মনীষা সেনগুপ্ত বন্ধুদের সাহায্য করতে গিয়ে পাহাড় থেকে পড়ে যাবার স্বপ্ন দেখেন প্রায়ই।

সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তী বেশ কয়েকবার দেখেছেন মোটর সাইকেল চালাতে চালাতে লেকের জলে পড়ে যাবার স্বপ্ন। গৃহবধূ তন্দ্রা মুখোপাধ্যায় দেখেন পাহাড়ি চড়াই পথে উঠতে উঠতে পা পিছলে নীচে পড়ে যাবার স্বপ্ন। দীপঙ্কর আর তন্দ্রার স্বপ্ন ওঁদের জীবনের প্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে মনে হয়, এরকম স্বপ্ন তৈরি হবার মূলে কাজ করে চেতন-অবচেতনে নিরাপত্তাবোধের অভাব আর চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় ভরা জীবন। সবসময় পড়ে যাবার স্বপ্নের নির্দিষ্ট একটাই অর্থ হবে, এরকম নাও হতে পারে।

স্বপ্নদ্রষ্টার নাম প্রদীপ ঘোষ। বয়স ৩৪। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগা জেলার চান্দুয়া গ্রামে। ভদ্রলোক এগারো বছর ধরে ভালোবাসেন এক নারীকে। মেয়েটি অসবর্ণ বলে দুজনের বিয়েতে প্রবল আপত্তি বাড়ির লোকজনের। ঐ মহিলাকে বিয়ে করতে হলে বাড়ি ছাড়তে হবে প্রদীপকে। বঞ্চিত হতে হবে পারিবারিক সম্পত্তি থেকে। অথচ বাস্তবে তাঁর আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল। মনের তীব্র টানাপোড়েন নিয়ে গত দশ বছর ধরে প্রদীপ একটা স্বপ্ন দেখে চলেছেন বারবার। পাহাড়ি চড়াই পথে বাস বা জিপে করে উঠছেন। হঠাৎ গাড়িটা স্লিপ করে পড়ে যায় অতলস্পর্শী খাদে। মনোবিদরা এই স্বপ্নে অচেতন মনের অধঃপতনের ইচ্ছার কাল্পনিক পূর্ণতা খুঁজে পাবেন। আমি এই স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টার চূড়ান্ত সামাজিক আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সম্পর্ক থাকবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছি না। এর ব্যাখ্যা সবিস্তারে বলা যাবে ভয়ের স্বপ্ন নিয়ে আলোচনার সময়।

ওড়ার স্বপ্ন

ওড়ার স্বপ্ন দেখেন প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ মানুষ। মনের আনন্দে শূন্যে উড়ে বেড়ান স্বপ্নের দর্শক। শরীর শোলার মতো হালকা। পাখির মতো অবলীলায় চলে যান মন যেখানে চায় সেখানে। বেশির ভাগ বারবার, কেউ কেউ বহুবার দেখেন এই স্বপ্ন। সব মানুষ যে ওড়ার স্বপ্ন দেখেন তা কিন্তু নয়। ওড়ার কিছু স্বপ্ন উল্লেখ করা যাক।

স্বপ্ন ১: একটা বিশাল সমুদ্র, অথচ ঢেউয়ের কোনও আওয়াজ নেই—তার ওপর দিয়ে আমি উড়ে বেড়াচ্ছি—সমুদ্র পেরিয়ে একটা জঙ্গল—তার মধ্যে হলদে রঙের বিরাট উঁচু একটা মিনার—অবলীলায় পার হয়ে চলে গেলাম ভাসতে ভাসতে—খুব আনন্দ হচ্ছে।

—শঙ্করলাল ভট্টাচার্য।

স্বপ্ন ২: আপনা থেকেই ওপরে উঠে যাচ্ছি—খুব মজা লাগছে—হঠাৎ নীচে পড়ে যেতে শুরু করলাম—ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

—শেখ আজিজুল রহমান, কৃষক, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ।

স্বপ্ন ৩: মাঝদুপুরে ঘাট থেকে লাফ মেরে পুকুরে ঝাঁপ মারছি—পুকুরে নামবার বদলে আমি শালিখের মতো উড়তে শুরু করলাম—তালগাছের সমান উঁচুতে পৌঁছে গাছে পাখির বাসাও দেখতে পাচ্ছি—হাত বাড়িয়ে বাসা থেকে শালিখ তুলে আনতে গিয়েও আবার পড়ে যাবার ভয়ে বারবার হাত গুটিয়ে নিচ্ছি।

—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বপ্ন ৪: আমার বিশেষ ক্ষমতা হয়েছে—আমি উড়তে পারি—একটা বিশেষ উচ্চতায় উড়ে বেড়াচ্ছি—আর উঠছি না—হঠাৎ সামনে একটা পাঁচিল—কিছুতেই পাঁচিলটা টপকাতে পারছি না—চেষ্টা করছি বারবার পাঁচিলের মাথায় উঠতে—কিছুতেই পারছি না—খুব কষ্ট হচ্ছে।

—কল্যাণ দে, ব্যাঙ্ককর্মী, তারকেশ্বর।

স্বপ্ন ৫: আমি দু হাত ছড়িয়ে খোলা বা বন্ধ ঘরে পাখির মতো উড়ে বেড়াচ্ছি—কেউ আমাকে ধরতে পারছে না—নীচে অনেক বন্ধুবান্ধব, আমি ওদের অনেক ওপরে, নাগালের বাইরে—ওদের বলছি, 'দেখ তোরা পারলি না, আমি কেমন পাখি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি।'

—অপর্ণা সাহা, স্বাস্থ্যকর্মী, চুঁচুড়া।

স্বপ্ন ৬: একটা বাড়িতে গেছি—একতলা থেকে ওপরে উঠছি সিঁড়ির ওপর দিয়ে গ্লাইড করে—দোতলায় ব্যালকনিতে বসলাম—তারপর পাখির মতো লাফিয়ে নীচে নেমে গেলাম—যেন এটাই স্বাভাবিক। পাশেই একটা পোড়ো বাড়ি, অনেক গাছ।

—তাসি চক্রবর্তী, গৃহবধূ, কলকাতা।

স্বপ্ন ৭: হাওয়াতে ভেসে বেড়াচ্ছি—একটা লাফ দিলাম, পা দুটো সরসর করে শূন্যে দ্রুত এগিয়ে চলল—পৌঁছে গেলাম ইন্দ্রনাথের দোকান ('সুবর্ণরেখা'*) অবধি। লালবাঁধের এপার থেকে একটা লাফ দিলাম, পৌঁছে গেলাম বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাসে—ঠিক ওড়া নয়, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো। দেখে খুব মজা লাগত—বেজায় আনন্দ হত।

—সোমনাথ হোর, শান্তিনিকেতন।

* 'সুবর্ণরেখা': শান্তিনিকেতনের এই বইয়ের দোকান শুধু নানা ধরনের বইয়ের আশ্চর্য লাইব্রেরি নয়—আজও দু বেলা বহু দিকপাল শিল্পী সাহিত্যিক জ্ঞানীগুণী মানুষকে মোড়ায় বসে আড্ডা দিতে দেখা যায় ইন্দ্রনাথবাবুর দোকানে। অম্লান দত্ত, বিজন নাগ থেকে শুরু করে চিদানন্দ দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেন চৌধুরী, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ হোর। 'সুবর্ণরেখা' শুধু বইয়ের দোকান নয়, শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাঙালি শিল্পসাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী কৃষ্টিকেন্দ্র। ইন্দ্রনাথবাবু নিজেও জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার এক 'রেফারেন্স লাইব্রেরী'। যে কোনও গবেষক, অধ্যাপক, ছাত্র এই বিরলপ্রতিভার মানুষটিকে সহজেই পেয়ে যান প্রয়োজনীয় বইপত্রের মানব-অভিধান হিসেবে।

স্বপ্ন ৮: ওড়ার স্বপ্ন দেখি ছোটবেলা থেকেই—সাঁতার কাটার মতো লাফ দিয়ে উড়তে থাকি হাত পা নেড়ে—অনেক দুরে চলে যাই।

—উদয় নাথ, নিমতা।

স্বপ্ন ৯: স্বপ্নে ডানা মেলে প্রায়ই উড়ি—খুব আনন্দ হয়—মন খারাপ থাকলে এই স্বপ্নটা দেখলে মন ভাল হয়ে যায়।

—আব্দুল বারি, ছাত্র, ঢাকা, বাংলাদেশ।

স্বপ্ন ১০: আমি পাখা মেলে ঘরবাড়ি টপকে টপকে অনেক ওপর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছি—নীচে ঘরবাড়ি, নদী—সব দেখছি—পাহাড় টপকে চলে যাচ্ছি অন্য দেশে—এরকম স্বপ্ন দেখছি খুব ছোটবেলা থেকে—এখনও দেখি—খুব আনন্দ হয়।

—যোগেন চৌধুরী, শান্তিনিকেতন।

ওড়ার বা ভেসে বেড়াবার স্বপ্ন কত বিচিত্র ধরনের হতে পারে তা এই স্বপ্নগুলোর বিবরণ থেকে বোঝা যায়। স্বপ্নদ্রষ্টা উড়ে বেড়াচ্ছেন বা ভেসে বেড়াচ্ছেন। ফ্রয়েডের মতে এরকম স্বপ্নের উৎস শৈশবের স্মৃতি। একেবারে ছেলেবেলায় বাবা, কাকা, মামা বা অন্য বড়দের কোলেপিঠে চড়ে ঘুড়ে বেড়ায় বাচ্চারা। মামা কাকারা ছোট্ট বাচ্চাদের দুহাতে মাথার ওপর তুলে ওপরে ছুঁড়ে আবার ধরে নেন। কখনও আবার শুয়ে শুয়ে দুহাঁটুর ওপর বাচ্চাকে তুলে শূন্যে তোলেন আর নামান। কেউ বা খাটের কিনারে বসে পায়ের পাতার ওপর বাচ্চার দুটো পা রেখে পা দুটো আচমকা ওপরে তুলে আবার নামিয়ে আনেন। এরকম খেলায় বাচ্চারা বেজায় আনন্দ পায়। আর বার বার একই খেলার পুনরাবৃত্তি চায়। শৈশবের এই আনন্দের স্মৃতি বড় হয়ে যাবার পরও মনের অচেতনে থেকে যায়। বড় হয়ে যাবার পর শূন্যে ওড়া বা ভেসে বেড়াবার স্বপ্নের ভেতর দিয়ে মানুষ সেই আনন্দঘন শৈশবে ফিরে যেতে চায়। শুধু বড়দের হাতেপায়ে লাফানো বা ভাসা নয়, একটু বড় হয়ে যাওয়া বাচ্চাদের মনে সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা বা জিমন্যাস্টিকসের নানা লাফ দেওয়ার দৃশ্যের স্মৃতি থেকে যায়। থেকে যায় স্লিপারে চড়া-নামা, ঢেঁকি (See Saw)-তে ওঠানামা বা নাগরদোলায় চড়ার স্মৃতি। এরকম বাল্যস্মৃতিও চলে আসতে পারে ওড়ার স্বপ্নে।

অনেক স্বপ্নগবেষক মনোবিদ শূন্যে উড়ে বেড়ানো বা ভেসে বেড়ানো স্বপ্নের ভেতর স্বপ্নদ্রষ্টার মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুঁজে পেয়েছেন। অপর্ণার স্বপ্নের (স্বপ্ন ৫) 'নীচে অনেক বন্ধুবান্ধব, আমি ওদের অনেক ওপরে—নাগালের বাইরে। ওদের বলছি, দেখ তোরা পারলি না—আমি কেমন—উড়ে বেড়াচ্ছি'র মধ্যে অন্যদের ছাড়িয়ে 'ওপরে ওঠা'র একটা আভাস রয়েছে। কোনও মানুষ জীবনে সফল হলে, প্রতিষ্ঠিত হলে, টাকা বাড়ি গাড়ির মালিক হলে চলতি কথায় আমরা হামেশাই বলি 'লোকটা অনেক ওপরে উঠেছে'। ওড়ার স্বপ্ন দেখেন এমন একশোজন বিভিন্ন বয়সের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার মনে হয়েছে এঁদের প্রায় সবার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা হতে পারে বৈষয়িক বা সৃজনশীলতা সংক্রান্ত। এরকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা উড়তে পারার বিশেষ ক্ষমতার ভেতর দিয়ে স্বপ্নে আসছে।

ওড়ার স্বপ্নের সঙ্গে কম বয়সে সার্কাসে বা অন্য কোথাও দেখা মল্লক্রীড়া (Acrobatic)-র স্মৃতি জড়িত থাকতে পারে। কিছু মনোবিদ ওড়ার স্বপ্ন দেখেন এমন বহু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এরকম স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে তাতে ঐ জাতীয় বাল্যস্মৃতির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। আর যে শৈশবের স্মৃতি এরকম স্বপ্নে জেগে উঠতে পারে তা হল বাচ্চাদের হঠাৎ করে দেখে ফেলা নরনারীর নানা ধরনের সঙ্গমদৃশ্য।

ওড়ার স্বপ্নের যে দৃষ্টান্তগুলো আগে উল্লেখ করছি, সেগুলোর কয়েকটাকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাক। সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য (স্বপ্ন ১) জানিয়েছেন, যখনই কোনও কারণে খুব মন খারাপের মধ্যে থাকেন, তখনই তার ঘুমন্ত চেতনাতে ওড়ার স্বপ্ন আসে। আর এরকম স্বপ্ন দেখলেই মন খারাপ অনেকটা ভাল হয়ে যায় শঙ্করের। বড় হয়ে গেলে জীবনের হাজারটা সমস্যা আর টেনশানের মধ্যে থাকতে হয় শহরের নাগরিকদের। আমার ধারণা, সাংবাদিকদের জীবনে টেনশান আর উদ্বেগ অন্যদের তুলনায় বেশি। এরকম একটা মানসিক অবস্থা, যেখানে কোনও কারণে মন ভালো নেই, সেখানে শঙ্কর তো শৈশবের আনন্দঘন মুহূর্তগুলোতে ফিরে যেতে চাইতেই পারেন। স্বপ্নের ভেতরকার

সমুদ্র, জঙ্গল, উঁচু হলুদ রঙের মিনার, এসব স্বপ্নে এসেছে এই সাংবাদিকের স্মৃতির স্টোররুম থেকে। অচেতন মনে শৈশবকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে তৃপ্ত হলে মনের ব্যথা সারে। মন ভাল হয়ে যায় স্বপ্নের দর্শকের।

দ্বিতীয় স্বপ্নের যুবক আজিজুল প্রথমে ওপরে উঠতে উঠতে শৈশবের আনন্দ ফিরে পায়। স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশে সে নীচে নামতে নামতে পড়ে যাবার ভয়ে আক্রান্ত। আজিজুল একা নয়, উড়তে উড়তে স্বপ্নদ্রষ্টা পড়ে যাচ্ছে বা পড়ে যাবার ভয় দেখা দিচ্ছে মনে, এরকম বহু স্বপ্ন আমার ঝুলিতে রয়েছে।

এই পড়ে যাবার ভয় কেন দেখা দেয় তার যুক্তিগ্রাহ্য একটা ব্যাখ্যা রয়েছে। ছোট বাচ্চাদের লাফালাফি, দৌড়ঝাঁপ, হুড়োহুড়ি বেশিরভাগ সময়ই মারপিট, কান্নাকাটি বা কারও পড়ে গিয়ে চোট লাগা—এ সব দিয়ে শেষ হয়। শৈশবের খেলার আনন্দের স্মৃতিতে ফিরে যাবার স্বপ্ন তাই পড়ে যাওয়ার ভয় দিয়ে শেষ হতে পারে। আজিজুলের স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশে পড়ে যাওয়া এসেছে শিশু আজিজুলের এরকম কোনও স্মৃতি থেকে। হতে পারে যে ওড়ার স্বপ্নের উচ্চাকাঙ্খা কখনও কখনও ঘুমন্ত চেতনায় অনৈতিক ইচ্ছার জন্ম দেয়। যার প্রভাবে উড়তে উড়তে একটা সময় পড়ে যেতে শুরু করেন স্বপ্নের দর্শক। বা পড়ে যাবার ভয় পান। স্বপ্নসন্ধানের অভিজ্ঞতায় এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

তাসির স্বপ্নে (স্বপ্ন ৬) শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে যাবার ইচ্ছা কাল্পনিক পূর্ণতা পাচ্ছে। ঐ বাড়ি, বাড়ির ব্যালকনি স্বপ্নে এসেছে দক্ষিণ ভারতের কোনও টুরিস্ট স্পটেব টুরিস্ট লজে কয়েকদিন থাকার শৈশবস্মৃতি থেকে। পোড়ো বাড়িটা তাঁর স্বপ্নস্মৃতি (Dream Memory)-তে ছিল। যার অস্তিত্ব তাসির জেগে থাকা অবস্থার স্মৃতি (Walking Memory)-তে নেই। স্বপ্ন বিশ্লেষণের সময় এই গৃহবধূ স্মৃতি হাতড়ে এমন কোনও বাড়ির কথা মনে করতে পারেননি। ব্যালকনি থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়া এসেছে ৪-৫ বছর বয়সে কোনও এক সার্কাসে ট্রপিজের খেলা দেখবার স্মৃতি থেকে।

বাহাত্তর বছরের প্রখ্যাত ভাস্কর সোমনাথ হোরের (স্বপ্ন ৭) স্বপ্নের ব্যাখ্যা একইরকম। সোমনাথবাবু থাকেন বোলপুরের লালদীঘির পাড়ের এক সাঁওতাল পল্লীতে। অনাড়ম্বর, সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই প্রখ্যাত শিল্পী অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ। স্বপ্নে বার বার শৈশবের সোনাঝরা দিনগুলোতে ফিরে যেতে চায় সোমনাথবাবুর মন। কল্পনাপ্রবণ, সৃষ্টিশীল এই মানুষটি তার কর্মক্ষেত্র বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাস আর অতিপ্রিয় 'ইন্দ্রনাথের দোকান'—এ সব জায়গায় অবলীলায় চলে যান পাখির মতো ডানা মেলে নয়, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে।

ব্যাঙ্ককর্মী কল্যাণের স্বপ্নটা (স্বপ্ন ৪) সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা যাক। কল্যাণ অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর খুব ভালো হরফ লিখিয়ে। ওঁর তুলিতে নতুন নতুন হরফ তৈরি হয় অবিরত। বিশেষ এই যোগ্যতা সত্ত্বেও তিনি সাদামাটা মধ্যবিত্ত মানুষ হয়েই বেঁচে আছেন। হরফলেখা নিয়ে তেমন কিছু না করতে পারায় এই মানুষটার মনের গভীরে রয়েছে গভীর খেদ। মনের উচ্চাকাঙ্খা কাল্পনিকভাবে মিটছে স্বপ্নের প্রথম অংশে। দ্বিতীয় অংশে মনের আকাঙ্খা পূর্ণ হবার পথে চাকরিজীবী কল্যাণের বাস্তবের হাজারটা বাধা শূন্যে ভাসমান পাঁচিল হয়ে তার সামনে এগোনোর পথ আটকে আছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, মানুষটা বার বার চেষ্টা করছেন এই বাধা পার হতে, 'পাঁচিলের মাথায় উঠতে'। কিন্তু কিছুতেই পারছেন না। মনের সুপ্ত বাসনা পূর্ণ করবার বাধা পার না হতে পেরে 'খুব কষ্ট হচ্ছে' কল্যাণের।

একটা অন্য ধরনের ওড়ার স্বপ্নের কথা বলা যাক। বর্ধমানের এক হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট শেখ আবসার আলির স্বপ্ন। আবসার ওড়ার স্বপ্ন দেখে বারবার। শুধু তাই নয় ওড়বার সময় ধাতব পাখা গজায় ওর দু বুকের দু পাশে। তাতে দুটো সুইচ। সুইচ টিপে পাখা চালু (অন) বা বন্ধ (অফ) করতে পারে আবসার। মাধ্যমিকে খুব ভাল নম্বর পেয়ে 'ন্যাশনাল স্কলারশিপ' পায় ও। খুব ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হবার। 'জয়েন্ট এন্ট্রান্স' দেবার আগে স্বপ্নে ধাতব ডানা মেলে বারবার উড়ে বেড়িয়েছে এই যুবক। প্রথমবার জয়েন্টে চান্স না পাওয়ায় ভর্তি হয় ফার্মাসি কোর্সে। ফার্মাসিস্ট হয়ে সরকারি স্বাস্থ্যদপ্তরে চাকরির নিয়োগপত্র হাতে পাবার দিন রাতে আবসার আবার ওড়ার স্বপ্ন দেখেছে। আগে ও শুধুই উড়ত। এবার একটু উঠেই শুরু হয় দ্রুতগতিতে নীচে পড়ে যাওয়া। ওর ডাক্তার হবার ইচ্ছা রয়ে গেল অপূর্ণ। ও হয়েছে ফার্মাসিস্ট। স্বপ্নে ওর দ্রুতগতিতে পতনের কারণ নিশ্চয়ই আর ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের (স্বপ্ন ৩) পুকুরঘাট থেকে লাফ মেরে পুকুরে নামতে গিয়ে শালিখের মতো উড়তে শুরু করবার স্বপ্নের একটা পটভূমিকা রয়েছে। শ্যামলবাবু ঐ স্বপ্ন দেখতেন বালক বয়সে, কৈশোরে। তখন তিনি থাকতেন এখনকার বাংলাদেশের খুলনা শহরে। তাঁদের বাড়ির সামনে ছিল একটা পুকুর। যার ঘাট ছিল বাঁধানো। পুকুরপাড়ে ছিল দুটো লম্বা তালগাছ। গাছের ওপরে শালিখের বাসা। গ্রীষ্মের রাতে ঝড় উঠত। পরদিন ভোরবেলায় কম বয়সের শ্যামল অনেক সময় তালগাছের নীচে শালিখের পড়ে থাকা ছানা খুঁজে পেত। পাখি বা কুকুর-বেড়ালের বাচ্চা পেলে বাড়িতে এনে তার 'সেবাযত্ন করা', তাকে পোষা এরকম অভ্যাস অনেক ছোট বাচ্চার মধ্যেই থাকে। বালক শ্যামলও কয়েকবার তালগাছের নীচে পড়ে থাকা শালিখছানা বাড়িতে এনে তাকে পুষতো। শৈশবের ঐ আনন্দময় দিনগুলোতে ফিরে পাবার ইচ্ছা থেকেই এই স্বপ্ন একটা সময় দেখতেন শ্যামল।

পুকুরঘাটে চান করতে গিয়ে লাফ দিয়ে জলে পড়বার স্মৃতি থেকে এই স্বপ্নের শুরু। তালগাছের মাথায় শালিখের বাসা থেকে শালিখছানা তুলে এনে পোষার বাসনার কাল্পনিক পূরণ ঘটাতে লাফ দেওয়া বালক জলে পড়বার বদলে শালিখের মতো উড়তে শুরু করে। যদি তা না হত তবে উড়তে উড়তে সে চারপাশে ঘুরে বেড়াত বা অনেক উঁচুতে উঠে যেত। স্বপ্নে কিন্তু ছেলেটা উড়তে উড়তে 'তালগাছের সমান উচ্চতায়' উঠেছে। তার ওপরে নয়। যে উচ্চতায় হাত বাড়ালেই শালিখের বাসার ভেতর থেকে শালিখছানা তুলে আনা যায়। স্বপ্নের পরের অংশে হাত বাড়িয়েও বার বার হাতগুটিয়ে নিচ্ছে সে। পড়ে যাবার ভয়ে। এই ভয় কেন দেখা দিল, তা আগে আলোচনা করেছি।

পার্থিব প্রাপ্তিতে মানসিকভাবে তুষ্ট নন এমন মানুষ দুধরনের স্বপ্ন দেখেন বেশি। ওড়ার স্বপ্ন আর ঘুড়ি ওড়াবার বা ঘুড়ি ওড়ার স্বপ্ন। এরকম স্বপ্ন দেখেন না এমন মানুষ মানসিকভাবে স্বপ্নে ওড়া মানুষের চাইতে আলাদা। আমার তাই মনে হয়।

প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন

বাবা, মা বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেন 'স্বপ্নসন্ধান' এর চৌত্রিশ শতাংশ মানুষ। এই ঘনিষ্ঠজনেরা হতে পারেন ভাই, বোন, দাদা, দিদি, মামা, কাকা, জ্যাঠা, মাসি, পিসি বা অন্য কেউ। এরকম স্বপ্ন দু ধরনের হতে পারে। কিছু স্বপ্নে ঘনিষ্ঠজনকে মারা যেতে দেখার পর সকালে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে কোনও অনুভূতি বা কষ্টের ভাব থাকে না। বাকি স্বপ্নে এরকম মৃত্যুর ঘটনা দেখার পর স্বপ্নদ্রষ্টার মন দুঃখে, যন্ত্রণায় ভরে যায়। অনেক সময় ঘুম ভাঙে কাঁদতে কাঁদতে। এই দুধরনের স্বপ্ন নিয়ে একটু গভীরভাবে আলোচনা দরকার। তার আগে এরকম স্বপ্নের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পাঠক স্বপ্নগুলো থেকে স্বপ্নের বৈচিত্র্য বুঝতে পারবেন।

স্বপ্ন ১: দেখছি, আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে—বাবার আত্মা একটা সবুজ তারা হয়ে আমার মাথার ওপর—আমার সামনে বিরাট একটা লোহার চোঙ— যার মাঝখানটা সবুজ—বাবা বলছেন, ঐ সবুজ অংশে আঘাত করলে আমি আর থাকতে পারব না—এক সময় একটা কালো মোটা লোক এসে বিরাট একটা হাতুড়ি দিয়ে ঐ সবুজ অংশে মারতে শুরু করল—আমি হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তাকে মারতে বারণ করছি, কিন্তু সে শুনছে না—বাবা বলল, '—আমি চলে যাচ্ছি—' দেখলাম একটা সবুজ উল্কা আমার সামনে দিয়ে সূর্যের দিকে চলে গেল।

—ছাত্রী, বারাসত।

স্বপ্ন ২: স্বপ্নে মা, বাবা দু জনকেই মারা যেতে দেখেছি কয়েকবার। আমি খুব কান্নাকাটি করি, তারপর ঘুম ভেঙে যায়—সকালে উঠে মনটা খুব খারাপ হয়ে থাকে।

—আইনের ছাত্রী, রিষড়া।

স্বপ্ন ৩: প্রিয়জন কেউ মরে গেছেন এরকম দেখি—কেঁদে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে ফেলি—

ঘুম ভাঙলে স্বস্তি পাই—তবু মন খারাপের রেশটা থেকে যায়।

—ম. সা. ক.।

স্বপ্ন ৪: বাবা তখনও বেঁচে, স্বপ্নে দেখলাম বাবা মারা গেছেন—পরদিন মনটা খুব খারাপ হয়, বাবা তখন অসুস্থ ছিলেন।

—গৃহকর্ত্রী, সল্টলেক।

স্বপ্ন ৫: আত্মীয় পরিজন মারা গেছেন (যদিও তাঁরাও জীবিত), এরকম স্বপ্ন মাঝে মাঝে দেখি—সকালে উঠে মন খারাপ হয়ে যায়।

—শিক্ষিকা।

স্বপ্ন ৬: দেখলাম মা মরে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়—বাস্তবে এরকম ঘটুক তাতো চাইনি—তবে সকালে খুব ভয় লাগছিল।

—ছাত্রী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

স্বপ্ন ৭: পয়লা সেপ্টেম্বর (১.৯.৯৬) রাতে দেখলাম আমার এক জামাইবাবু মারা গেছেন, কে যেন গুলি করে মারছে—আমি খবরটা পড়ছি কাগজে, *আনন্দবাজার পত্রিকায়* প্রথম পাতায় ছবিসহ ছেপেছে—স্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত লাগছিল, পরদিনও খারাপ লাগছিল—কেন এরকম দেখলাম।

—ভূমিরাজস্ব আধিকারিক, রায়গঞ্জ।

স্বপ্ন ৮: বাবা মারা গেছে, জ্যাঠা মারা গেছে—মনে খুব কষ্ট হয় স্বপ্নে এগুলো দেখলে পরে।

—ছাত্র, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

স্বপ্ন ৯: খুব নিকটজনের মৃত্যুর স্বপ্ন দু একবার দেখেছি, কান্নাকাটি করে গলা দিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ বার হওয়ায় কেউ ডেকে দিয়েছে—মনটা বড় খারাপ ছিল এরকম মৃত্যু দেখার পরদিন সকালে।

—রেলকর্মী, জৌগ্রাম, বর্ধমান।

স্বপ্ন ১০: স্বপ্নে আমার সামনে একবার আমার মামা, আর একবার দিদা মারা যান—স্বপ্নে মনে হয় এই ছিল আমার কপালে, সকলে উঠে তেমন কোনও অনুভূতি ছিল না।

—ডা. সঙ্গীতা রায়, চিকিৎসক, কলকাতা।

স্বপ্ন ১১: একবার ছোট ভাই আর একবার বোনকে স্বপ্নে মারা যেতে দেখেছি—পরদিন সকালে উঠে কোনও অনুভূতি হয়নি।

—দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, ব্যবসায়ী।

স্বপ্ন ১২: দেখলাম দাদু মারা গেছেন—সকালে উঠে কোনও অনুভূতি ছিল না, খুব অবাক লাগছিল।

—সুমনা চক্রবর্তী, গৃহবধূ, জামসেদপুর।

স্বপ্ন ১৩: স্বপ্ন দেখলাম স্বামী মারা গেছেন, সবাই চারদিকে বসে আছে, সবাই কাঁদছে, আমার অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে, আমি কি করব, মেয়ে তো কাঁদছে, আমার অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে, আমি কী করব, মেয়ে তো কাঁদছে না।

— সকালে উঠেও অদ্ভুত লাগছিল।

—কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, গৃহবধূ, লেকটাউন।

এই স্বপ্নগুলোকে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করবার আগে এ বিষয়ে মনোবিদরা সাধারণভাবে কি বলেন জানা যাক। একটা সময় প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এধরনের মৃত্যুর স্বপ্ন নিয়ে ধারাবাহিকভাবে গবেষণা চালিয়েছেন ফ্রয়েড। এবিষয়ে ফ্রয়েডের মত কি, তা বলি। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার পর মনে দুঃখ,

যন্ত্রণা, শোক এরকম অনুভূতি থাকলে সেই স্বপ্নের ভেতর অবশ্যই মৃত্যুচিন্তা বা মৃত্যুকামনা থাকে। আর এরকম স্বপ্ন দেখে অনেক সময় জেগে উঠে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে কোনও অনুভূতি থাকে না। অনেক সময় তিনি নিজেও অবাক হয়ে যান, কেন এরকম স্বপ্ন দেখেও তাঁর খারাপ লাগছে না। স্বপ্ন ১০,১১,১২,১৩-র বিবরণ খুঁটিয়ে পড়লে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। এই স্বপ্নগুলোতে স্বপ্ন দেখার পর দর্শক অনুভূতিহীন। এরকম স্বপ্নে কোনও মৃত্যুকামনা থাকে না।

এ ধরনের স্বপ্ন নিয়ে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত আর যুক্তিনির্ভর। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা কঠিন। এটা শুনে অনেক পাঠকই খুশি হবেন না। কেউ কেউ বলবেন, প্রিয়জনকে নিয়ে অকারণ উদ্বেগ থেকে সেই প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন আসতেই পারে। আর তা নিয়ে সকালে উঠে মন খারাপও হতে পারে। প্রিয়জনের মৃত্যু যে সব সময় কষ্টের, যন্ত্রণার। প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাকে তাই স্বপ্নে 'অকারণ দোষ' খোঁজার চেষ্টা বলে মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

ধরুন, এরকম স্বপ্ন দেখে মন খারাপ হল কোনও স্বপ্নদ্রষ্টার। যে মানুষটাকে মারা যেতে দেখছেন স্বপ্নের দর্শক, তাঁর অচেতন মনে ঐ মানুষটার মৃত্যু হোক এরকম গোপন ইচ্ছা অবশ্যই লুকিয়ে আছে। সচেতনে হয়তো কোনও ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব ভালো। তাঁকে খুব ভালো লাগে আপনার। তাহলে আপনার অচেতন মনে সেই মানুষটা মারা যাক—এরকম ইচ্ছা আসবে কোথা থেকে? আসলে, যে প্রিয় মানুষটার মৃত্যু দেখছেন, এখন হয়তো আপনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ভাল। অচেতনে তাঁর মৃত্যুকামনা আসে অনেক পুরনো চাপা পড়ে থাকা ঐ ধরনের ইচ্ছা থেকে। এরকম ইচ্ছার মূল উৎস স্বপ্নদ্রষ্টার শৈশব।

এব্যাপারে বিশদ আলোচনা না করলে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা থেকে যায়। একেবারে ছোট বাচ্চাদের আমরা সুন্দর, নিষ্পাপ, ফুলের মত সুন্দর ভাবি। অথচ 'শিশুর মন যে কত কুটিল হইতে পারে, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।' ছোট বাচ্চার মন আত্মকেন্দ্রিকতা আর স্বার্থপরতায় ভরা। এরা খুব বেশি মাত্রায় অহংসর্বস্ব (Egoist)। নিজের অস্তিত্ব, নিজের জামাকাপড়, খেলনা, পুতুল, গাড়ি এসব নিয়েই শিশু সব সময় ব্যস্ত। অন্যের কথা ভাবা, চিন্তা করা তার স্বভাবে সেই। বড়রা ছোট বাচ্চাদের এই দিকগুলো যেন দেখেও দেখেন না। না দেখার ভান করেন।

এই ব্যাপারটা বোঝা যায় বাড়িতে বাচ্চার কোনও ভাই বা বোন জন্মাবার পর। নবাগত ভাই বা বোনকে সে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারে না। এক মহিলার দ্বিতীয় বাচ্চা হবার ঠিক আগে তাঁর প্রথম বাচ্চা আমার সামনে হঠাৎ করে কিছু কথা বলে। সে জানতে পেরেছিল, তার নতুন ভাই বা বোন আসছে। এ নিয়ে কথার মধ্যে হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'আমাদের খাটে আর শোবার জায়গা নেই।' কথাগুলোর তাৎপর্য গভীর। কোনও বাচ্চাই চায় না, তার জায়গায় তার নতুন আসা ভাই বা বোন ভাগ বসাক। ফ্রয়েড তাঁর এক বয়স্কা প্রতিবেশীর ছেলেবেলার অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন। ওর চার বছর বয়সে ছোট বোন জন্মায়। চার বছরের মেয়ে তার নবাগতা একদিনের বোনকে স্বাগত জানিয়েছিল অদ্ভুতভাবে। 'আর যাই হোক, আমার লাল টুপিটা ওকে দেব না।'—এক ঘর লোকের মধ্যে মেয়েটা বলে উঠেছিল!

সুইডিশ কবি ও লেখক স্পিৎলার তাঁর নিজের শৈশবের এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন প্রাঞ্জল ভাষায়। 'আবার এক জন এসে গেছে!'—ছোট ভাই জন্মাবার পর এই ছিল তার প্রথম প্রতিক্রিয়া। 'একটা এতটুকু ছোট্ট পুতুল! সে নাকি আবার আমার ভাই! আমি একাই তো যথেষ্ট। কিছুতেই বুঝি না বাবা, মা আমার মতো ওটাকে নিয়েও এত চিন্তা করেন কেন! একটুও বুঝি না ওর দরকারটা কোথায়? আর ও তো পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় একটা জীব। আমি যখন ঠাকুমার সঙ্গে খুনসুটি করব, ও তাই করবে! আশ্চর্য! শুধু কি তাই, প্যারামবুলেটারে অর্ধেক জায়গা জুড়ে বাবু বসবেন! আর ওর পায়ের ঠোকা আমাকে খেতে হবেই!'

বাচ্চার মন নিজের সুখের খোঁজে সব সময় ব্যস্ত। তার ভালোবাসায়, আদরযত্নে, খেলনায়, জামাকাপড়ে কেউ ভাগ বসাক এটা বাচ্চা কখনই চায় না। বাড়িতে নতুন ভাই বা বোন এলে সে বিরক্ত হয়। হিংসা করে। চার পাঁচ বছরের বাচ্চা তার ছোট ভাই বা বোনকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে বা মারছে—এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে। মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর এমন একটা বাচ্চা দেখেছিলেন যে তার

সদ্যোজাত ভাইকে মারতে গলা টিপে ধরেছিল। ছোট পিঠোপিঠি ভাইবোনেরা একসঙ্গে থাকলেই মারপিট করতে চায়। এরকম বাচ্চা তার ছোট ভাই বা বোনের উপস্থিতি মন থেকে মেনে নিতে পারে না। মনে মনে ভাবে 'ভগবান ওকে আবার ফিরিয়ে নিক।'

ফ্রয়েডের এক রোগিণীর একটা স্বপ্নের বিবরণ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। চার বছর বয়সে দেখা স্বপ্নটা তখনও তাঁর মনে ছিল।স্বপ্নে ওর 'বড় চার ভাইবোন এক জায়গায় বসেছে—হঠাৎ ওদের পাখা গজাল—আর ওরা উড়ে পরীর দেশে চলে গেল।' স্বপ্নে বড় ভাইবোনদের মৃত্যু কামনা সরাসরি না এসে এসেছে ছদ্মবেশে। অন্য দেশে চলে যাওয়া আর মরে যাওয়ার অর্থ কোনও শিশুর কাছে একই।

পিঠোপিঠি ভাইবোনদের ভেতরকার হিংসার ভাব অনেক সময় তাদের মনে মৃত্যুচিন্তায় পরিণত হয়। বাচ্চাদের কাছে 'মৃত্যুর অর্থ অন্য কোথাও যাওয়া'। বাড়িতে বয়স্ক কেউ মারা গেলে ছোট বাচ্চারা সাধারণত কাঁদে না। কেন না তাঁদের বোঝানো হয়, মৃত মানুষটা 'স্বর্গে যাচ্ছেন'। শিশুর কাছে স্বর্গ 'অন্য কোনও একটা জায়গা'। ছোট্ট বাচ্চাদের মধ্যে এরকম ইচ্ছা আসে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই বা বোন সেই 'অন্য যায়গায়' চলে যাক। তার রাজ্যপাট তার একারই থাক।

মৃত্যু বাচ্চাদের মনে কি অদ্ভুত অর্থ নিয়ে আসে তা নিয়ে এপর্যন্ত বহু গবেষণা হয়েছে। ১৯১২ থেকে ২১ সালের মধ্যে *ইমেজো* ম্যাগাজিনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'দ্য ট্রু নেচার অব চাইল্ড মাইন্ড' প্রবন্ধ ফ্রয়েডের এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল। ফ্রয়েডের মৃত্যুর পর থেকে এখন পর্যন্ত শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণার ফলাফল ফ্রয়েডের এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।

বড় ভাই বোনেরা সরল মনে ছোট ভাই বা বোনের মৃত্যু চায় মনে মনে। ছোট বাচ্চা বড় দাদা বা দিদির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক সময় একইরকম ভাবে। একটু বড় হবার পর সমাজ, শিক্ষা, রীতিনীতি—এসব বাচ্চাদের শেখায় যে এরকম চাওয়া অনৈতিক, অনুচিত। তখন মনের এই ইচ্ছা সচেতন থেকে চলে যায় অচেতন মনে। একটু বড় হবার পর থেকে এরকম ইচ্ছা অচেতন মনে থেকে যায় আমৃত্যু। আর তা ভাইবোনের মারা যাবার স্বপ্নের মাধ্যমে পূর্ণ হয় স্বপ্নে। স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার পর স্বপ্নদ্রষ্টার মনে কষ্ট হয়। এক কারণ কি? কারণ, চেতনায় ঐ ভাই বা বোনকে তিনি ভালোবাসেন। আর অচেতনে তার মৃত্যু চান। এই দুই পুরাপুরি বিপরীত ইচ্ছার সংঘর্ষে মনে জন্ম নেয় দুঃখ, যন্ত্রণা। বাস্তবে যাকে ভালোবাসি, অচেতনে তাঁর মৃত্যুকামনা স্বপ্নে বিম্বিত হলে ঘুম ভেঙে মনে কষ্ট তো হবেই।

অনেকে বলবেন, অনেক সময় তো ছোট ভাইবোনদের সম্পর্ক খুব ভালও হয়। হ্যাঁ, হয়। প্রথম বাচ্চার সঙ্গে পরের বাচ্চার বয়েসের ফারাক খুব বেশি হলে, বড় বাচ্চা ছোট্ট ভাই বা বোনকে মেনে নেয় সহজেই। মেনে নেয় এরকম একটা ধারণা থেকে যে এই 'কচি বাচ্চার' সে অভিভাবক। একে দেখভাল্ তো তাকেই করতে হবে। দুটো বাচ্চার মধ্যে ব্যবধান যত কম হয়, তাঁদের মধ্যে হিংসা তত বাড়ে। ব্যবধান যত বাড়ে, এই বৈরিভাব তত কমে। বড় ছেলেমেয়েদের ভেতর গড়ে ওঠা 'মাতৃ প্রবৃত্তি' বা 'পিতৃ প্রবৃত্তি' (Maternal or Paternal Instinct) সদ্যোজাত ভাই বা বোনকে ভালোবাসতে শেখায়। বড় করে তুলতে প্রেরণা দেয়।

তবু বেশিরভাগ বড় হয়ে যাওয়া বাচ্চাদের মধ্যে ভাই বা বোনকে হিংসা করবার শৈশবের প্রবৃত্তি থেকে যায়। আমি তেরো বছরের এক মেয়েকে জানি, যে তার এতদিন পরে আসা ভাইকে মেনে নিতে পারেনি দেড় বছর পর্যন্ত। আজও সে ভাইকে কোলে নিতে চায় না, ভাইয়ের সঙ্গে খেলে না। ফ্রয়েড মনে করেন, 'বড়রা যতটা দেখতে পান, পিঠোপিঠি ভাইবোনদের মধ্যে শত্রুতা থাকে তার চাইতে অনেক বেশি মাত্রায়।' শুধু ভাইবোন নয়, বাবা মায়ের প্রতি ছেলেমেয়ের শত্রুতার জন্মও শৈশবে। যা বড় হবার পর অচেতনে চলে যায়। ছোট মেয়েরা বাবাকে আর ছেলেরা মাকে বেশি পছন্দ করে, এটা সবাই জানেন। এরকম আচরণের জন্য ফ্রয়েড শৈশবে বাচ্চাদের ভেতরকার বিপরীতকামিতা বা ইতরকামিতা (Heterosexual Trend)-কে দায়ী করেছেন। অনেকে এটা মানতে চাইবেন না। তবে মনোবৈজ্ঞানিক বহু গবেষণায় যৌনতার উৎপত্তি যে জন্মের পরই—এটা প্রমাণিত। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'যৌনতার বিকাশ' অধ্যায়ে।

ছোট ছেলেরা বাবাকে মনে মনে পছন্দ করে না। কারণ, বাবা তার প্রিয় মায়ের প্রতি তার

ভালোবাসায় ভাগ বসায়। ঠিক উলটোটা ঘটে মেয়েদের বেলায়। ছোট মেয়েদের হামেশাই বলতে শোনা যায়, 'আমি বাবার বউ।' আর সবাই তা শুনে হেসে গড়াগড়ি দেন। মা বাড়িতে না থাকলে ছোট মেয়েদের গিন্নীপনার কথা সবাই জানেন। ছোট ছেলেরা, কাকে সে বিয়ে করবে জানতে চাইলে, প্রায়ই মাকে পাত্রী নির্বাচন করে। আর বাবা বাড়ির বাইরে গেলে 'বাড়ির কর্তা' হয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের ছেলেবেলায় এধরনের আচরণ তাদের মনে মা বা বাবার প্রতি সেই সময়কার ভাবনার প্রতিফলন।

ইতিহাসে, রূপকথায় আর প্রবাদে ছেলেদের বাবার প্রতি শত্রুতার বহু কাহিনী পাওয়া যায়। বাবার নিষ্ঠুর শাসনে ছেলের মনে বাবার প্রতি বিদ্বেষ দেখা দিল। সেই বিদ্বেষ থেকে মনে বাবার মৃত্যুকামনা আসা অসম্ভব নয়। ভারতের ইতিহাসে বাবাকে হত্যা করে ছেলে সিংহাসনে বসেছেন, এমন ঘটনা বিরল নয়। সম্পত্তির জন্য বাবাকে হত্যার বহু ঘটনা ঘটে সব দেশে। বাবা মারা গেলে ছেলে নিজেকে স্বাধীন মনে করতেই পারে। করেন, যে কোনও সামাজিক স্তরে একটা বয়েস পর্যন্ত বাবার উপস্থিতি আর শাসন ছেলেদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে বাধা দেয়।

যৌবন আসার পর মেয়েরা সব অর্থে স্বাধীনতা চায়। আর মায়েরা চান মেয়েকে আগলে রাখতে। মেয়ে মনে করে,স্বাধীনতা সে পাচ্ছে না শুধু মা আছেন বলে। মা ভাবেন, মেয়ে বিকশিত যৌবন নিয়ে দ্রুত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে। কিছু দিন পর আর কেউ তাঁকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে না। এরকম অবস্থায় মেয়ের মনে মায়ের মৃত্যুকামনা আসা অসম্ভব নয়। বিরল নয় মায়ের মনে মেয়ের প্রতি বিদ্বেষ।

মা, বাবার মৃত্যুর স্বপ্নগুলোতে অচেতনের এরকম অজানা ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে তৃপ্ত হয়। একটা ব্যাপার বিশেষভাবে মাথায় রাখতে হবে। যখন স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁর মা বাবার মৃত্যুর স্বপ্ন দেখছেন, তখন তাঁর প্রতি স্বপ্নদ্রষ্টার সচেতন মনে এতটুকু বিদ্বেষ নেই। বরং হয়তো বয়স্কা বাবা বা মায়ের প্রতি রয়েছে তীব্র ভালোবাসা। তাঁদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদ্বেগ। স্বপ্নে এরকম মৃত্যুর দৃশ্য তাই মনে গভীর দুঃখ এনে দেয়।

পুরুষেরা মায়ের মৃত্যুর স্বপ্ন বেশি দেখেন। আর মহিলারা মায়ের। এ থেকে ফ্রয়েডের এই সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ সঠিক বলে মনে হয়। এর ব্যতিক্রম যে স্বপ্নে ঘটে না তা নয়। আমি অন্তত দশটি এরকম ব্যতিক্রমী স্বপ্ন পেয়েছি। সম্ভবত শিশুর শৈশবের কোনও ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা থেকে এরকম বিরল মৃত্যুইচ্ছা (ছেলেদের ক্ষেত্রে মায়ের, মেয়েদের ক্ষেত্রে বাবার) জন্ম। স্বপ্নদ্রষ্টার অচেতনে থাকা এরকম ইচ্ছা যে প্রায় সবক্ষেত্রেই জন্ম নেয় শৈশবে বা কৈশোরে। স্বপ্ন দেখবার বহুকাল আগে।

এটা আশ্চর্যের যে এরকম মৃত্যুর স্বপ্ন কেন অবিকৃতভাবে আসে। মনের প্রহরী সজাগ থাকলে তো তা ছদ্মবেশ ধরে আসত। এর সম্ভাব্য দুটো কারণ আছে। অনেক সময় প্রিয়জনের শরীর খারাপ নিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের সচেতনের উদ্বেগ বা আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে এরকম স্বপ্ন তৈরি হয়। আর স্বপ্ন দেখবার আগে ঐ নির্দিষ্ট প্রিয়জনের মৃত্যুকামনার কথা স্বপ্নের দর্শক 'স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।' সম্ভবত এই কারণে স্বপ্নের 'সেনসার'কে এতটুকু বুঝতে না দিয়ে এরকম ইচ্ছা স্বপ্নে চলে আসে।

কিছু স্বপ্নে মনের প্রহরী সজাগ হওয়ায় স্বপ্নদ্রষ্টার মনের এরকম ইচ্ছা ছদ্মবেশ ধরে আসে। পঞ্চাশ বছরের এক অধ্যাপক এরকম একটা স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর বাবার ঘরের দরজায় বসে একটা বাঘ মাংস খাচ্ছে। গিরীন্দ্রশেখর এরকম একটা স্বপ্নের কথা লিখেছেন। একজন স্বপ্নদ্রষ্টা দেখছেন যে তিনি খালিগায়ে ধুতি পরে, চাদর গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটা যে অশৌচের চিহ্ন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ফ্রয়েডের এক রোগিণীর স্বপ্নের কথা বলি। এক রাতে মহিলা স্বপ্নে দেখছেন, কালো শোকের পোশাক (Mourning Dress) পড়ে তিনি আর তাঁর বোন টেবিলে বসে আছেন। একই স্বপ্ন ঐ মহিলা আর একবার দেখেন একটু অন্যভাবে। তিনি যেন একজন বয়স্কা মহিলার শোকযাত্রায় যোগ দিচ্ছেন। দুটো স্বপ্নেই তাঁর মনে বৃদ্ধা মায়ের মৃত্যুচিন্তা চলে এসেছে। এরকম পরিবর্তিত হয়ে আসা প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন আরও বেশ কিছু পেয়েছি।

স্বপ্নে মা, বাবা, ভাই, বোন বাদে অন্য প্রিয়জনের মৃত্যু সাধারণত 'এদের মৃত্যুচিন্তার রূপান্তর'। সব সময় তা নাও হতে পারে। বত্রিশ বছরের এক যুবক একবার স্বপ্নে তার মামার মৃত্যু দেখেন। বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রায় সমবয়সী ওই মামা 'মামাবাড়িতে মানুষ হওয়া' ছেলেটির খুব ছোটবেলায় তাকে

খুব মারত। এথেকে শৈশবে ওই মামার মৃত্যুচিন্তা স্বপ্নদ্রষ্টার মনে আসা অসম্ভব নয়।

এই পর্যন্ত আলোচনার পর এই পর্যায়ের স্বপ্ন ৬ আর স্বপ্ন ৮ আলাদাভাবে আলোচনার দরকার আছে বলে মনে হয় না।

স্বপ্ন ১ ব্যতিক্রমী। কেননা মেয়ে হয়েও স্বপ্নদ্রষ্টা প্রিয় বাবার মৃত্যু দেখেছে। একই কথা বলা যেতে পারে স্বপ্ন ৪ সম্পর্কে। মহিলা এখানে বাবার মৃত্যু দেখছেন। মনে হয়, খুব ছোটবেলায় কোনও ঘটনা এঁদের মনে বাবার প্রতি তাৎক্ষণিক কিছু বিদ্বেষের জন্ম দেয়। এরকম বিদ্বেষ দ্রুত অচেতনে চলে গিয়ে বহু দিন বাদে এরকম স্বপ্নে জেগে ওঠে। স্বপ্ন ১-এর স্বপ্নের কল্পনা সম্ভবত কোনও রূপকথার কাহিনীর রূপান্তর।

স্বপ্ন ২ আরও ব্যতিক্রমী। কেননা এই ছাত্রীটি বাবা মা দুজনেরই মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছে। শৈশবে বিভিন্ন সময়ে মনে দুরকম বিদ্বেষ না তৈরি হলে তা স্বপ্নে আসত না। এই স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্ন নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিশদ আলোচনা সম্ভব হয়নি। সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ না করে এরকম স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। হুবহু এক ধরনের স্বপ্নের কথা লিখে পাঠিয়েছেন এক জন ৩১ বছরের সরকারি অফিসার। রায়গঞ্জ থেকে। স্বপ্ন ৩, ৫ আর ৯-এর অর্থ আগের আলোচনা থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন।

স্বপ্ন ৭ নিয়ে কিছু তথ্য জানা দরকার। নিজের কোনও দিদি এই যুবকের। জ্যাঠতুতো দিদি মারা যান ৪৩ বছর বয়সে। '৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্টে। ভদ্রমহিলার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে ১৯৯৬ সালে ডাক্তারিতে ভর্তি হয়েছে কলকাতায়। এরকম প্রেক্ষাপটে যুবক এই স্বপ্ন দেখেন। আর জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর স্বপ্নে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ভাগ্নে-ভাগ্নির ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

এই স্বপ্নে *আনন্দবাজার পত্রিকায়* মৃত ব্যক্তির খবর ছবিসহ ছাপা হয়েছে। স্বপ্নদ্রষ্টার স্মৃতিতে থাকা (ঠিক আগের দিনও হতে পারে) কাগজে পড়া এরকম কোনও হত্যাকাহিনীর বিবরণ থেকে সম্ভবত এই দৃশ্য স্বপ্নে এসেছে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এরকম:

দিদির মৃত্যুর জন্য জামাইবাবু দায়ী। এরকম ভাবনা থেকে অচেতনে ওই মানুষটার মৃত্যুচিন্তা এসেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে দিদি মারা যান। যুবক এই স্বপ্ন দেখেছেন পয়লা সেপ্টেম্বর রাতে। দিদির ছেলে ডাক্তারিতে চান্স পাবার পর। ডাক্তারি পড়া আর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ খুলে যাওয়া এদেশের মানুষের কাছে সমার্থক। পাঠক লক্ষ করবেন, জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর কাগজে পড়ে স্বপ্নদ্রষ্টা আতঙ্কিত। স্বপ্নের প্রহরীর প্রভাবে এরকম আতঙ্ক এসেছে।

প্রায় এরকম একটা স্বপ্নের কথা আমাকে জানান প্রতিষ্ঠিত এক অধ্যাপক। প্রাবন্ধিক হিসাবে ইনি সুপরিচিত। তাঁর স্বপ্নটা ছিল এরকম: *'সকালে উঠে কাগজ পড়ছি। ইংরেজি দৈনিক— —এর প্রথম পাতার ডানদিকে একটা খবর। দেশের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী— —মৃত।'* এই স্বপ্ন দেখে পরদিন সকালে খুব মনখারাপ হয় অধ্যাপকের। এই স্বপ্নের মধ্যে মৃত্যুচিন্তার আভাস পাওয়া যায়। কেন এরকম চিন্তা তাঁর মনে এল, এটা বুঝতে পারেননি বা ব্যাখ্যা করতে পারেননি এই অধ্যাপক।

এবার সেই সব প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে ঘুম ভেঙে স্বপ্নদ্রষ্টা অনুভূতিহীন। এসব স্বপ্নে কোনও মৃত্যুচিন্তার অস্তিত্ব নেই। প্রতিটি স্বপ্নই এসেছে স্মৃতিতে কোনও প্রিয়জনের মৃত্যুকে ঘিরে কোনও সুখের অনুভূতি ফিরে পাবার ইচ্ছা থেকে।

সঙ্গীতার স্বপ্ন

সঙ্গীতার মা মারা যাবার স্মৃতি থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। মা যে বছর মারা যান সেই বছর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেয় সঙ্গীতা। দেয় আই. আই. টি-র এন্ট্রাস আর জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষা। হায়ার সেকেন্ডারিতে অপ্রত্যাশিত ভালো নম্বর পায় সঙ্গীতা। মনোনীত হয় ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং আর আই. আই. টি-র কোর্সের জন্য। ওই সাফল্যের বছরের স্মৃতি তাই জড়িয়ে আছে মায়ের মৃত্যুর স্মৃতির সঙ্গে। এবছর ইংল্যান্ডে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার প্রবেশিকা (প্ল্যাব) দিতে যাচ্ছে সঙ্গীতা। যাবার কিছুদিন আগে তিনদিন বাদে বাদে আসে মামা আর দিদার মৃত্যুর স্বপ্ন। মামা বা দিদার মৃত্যুর স্বপ্নে ইংল্যান্ডের 'প্ল্যাব'

পরীক্ষাতে মায়ের মৃত্যুর বছরের মতো সাফল্য ফিরে পেতে চেয়েছে সঙ্গীতার অচেতন মন। আঠারো বছর বয়সের মায়ের মৃত্যুর স্মৃতি জীবিত মামা আর দিদার মৃত্যুকে টেনে এনেছে ওঁর স্বপ্নে।

দেবাশিসের স্বপ্ন

একবার ভাই আর একবার বোনের মৃত্যু স্বপ্নে এসেছে। দেবাশিসের বাবা মারা যান বছর দশেক আগে। সেই মৃত্যু সংসারে সব কিছু বদলে দেয়। ভাই আর বোনের মৃত্যুর স্বপ্নে দেবাশিস কি তাহলে বাবার মৃত্যুর স্মৃতিকে ফিরে পেতে চায়? ঠিক তাই। তাহলে কি সেই স্মৃতি, যা তাঁকে বাবা মারা যাবার সময়ে টেনে নিয়ে যায় স্বপ্নে? সেই সময় ওঁর এক মাসতুতো দাদা হঠাৎ করে এসে পড়েছিলেন বাড়িতে। ছিলেন অনেকদিন। মিলিটারিতে কাজ করা ওই দাদা খুব ভালোবাসতেন কুড়ি বছরের দেবাশিসকে। বাবার মৃত্যুতে শোকাহত যুবকের মনে শোকের মধ্যে সেই নির্ভরতার, ভালোবাসার স্মৃতি থেকে এরকম স্বপ্ন এসেছে। তারপর থেকে আর ওই দাদার সঙ্গে দেখা হয়নি। ওঁর প্রিয় দাদার সঙ্গে আবার দেখা হবার সুপ্ত ইচ্ছা থেকে এই স্বপ্নের জন্ম।

সুমনার স্বপ্ন

স্বপ্ন দেখার আগের দিন সুমনা জানতে পারেন প্রিয় দাদু অসুস্থ। মামাবাড়িতে দাদুকে দেখতে যাবেন ঠিক করেও কোনও কারণে যাওয়া হয়নি। ছেলেবেলায় সুমনার জীবনে 'মামাবাড়ি' ছিল খুব প্রিয় একটা নেশা। দিদিমার মৃত্যুর দৃশ্য রয়েছে তাঁর স্মৃতিতে। তখন মামাবাড়িতে গিয়েছিল ওরা। ওইসময় একদিন মামার এক 'হ্যান্ডসাম বন্ধু' জীবনে প্রথম ভালোবাসার সন্ধান দিয়েছিল সুমনাকে। সেই সুখের অনুভূতি বা সেই মানুষটাকে দেখবার ইচ্ছা থেকে এসেছে দাদুর মৃত্যুর স্বপ্ন। সেই মানুষটার সঙ্গে পরে আর কোনওদিন দেখা হয়নি সুমনার। স্বপ্নের এই অর্থ খুঁজে পেতে সময় লেগেছে প্রায় তিনদিন।

কৃষ্ণার স্বপ্ন

স্বামীর মৃত্যু আদৌ কাম্য নয় কৃষ্ণার অচেতন বা অবচেতনের। কম বয়সে যৌথ পরিবারে মানুষ কৃষ্ণার জ্যাঠা আর জ্যাঠতুতো ভাইবোনেরা ওঁর খুব প্রিয়। ভাইবোনদের সঙ্গে একটানা বেশ কিছু দিন মেলামেশার শেষ সুযোগ হয়েছে ওই বাড়িতে জ্যাঠার মৃত্যুর পর। প্রিয় স্বামীর মৃত্যুর স্বপ্নে কৃষ্ণার অচেতন মন খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে মেলামেশার সেই দিন কটাকে ফিরে পেতে চেয়েছে। স্বপ্নে তাই অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। 'সবাই কাঁদছে—আমি কী করব, মেয়ে তো কাঁদছে না'—এই কথাগুলো এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। কৃষ্ণা নিজে তাঁর এই স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন।

জলে ডোবার স্বপ্ন

স্বপ্ন ১: বারবার জলের স্বপ্ন দেখি—সমুদ্র, দীঘি বা সুইমিং পুল। আমি জলে পড়ে ডুবে যাচ্ছি।

—বাণী বসু।

স্বপ্ন ২: জলে ডুবে যাচ্ছি এরকম স্বপ্ন এক সময় দেখতাম—পরে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

—দিব্যেন্দু পালিত।

স্বপ্ন ৩: আগে দেখতাম সমুদ্রতট লোকে লোকারণ্য—আস্তে আস্তে আমি দূরে চলে যাচ্ছি—বুঝতে পারছি, ডুবে যাচ্ছি—যতবারই বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে যাচ্ছি, একটা বিশাল ঢেউ আছড়ে ফেলছে আমায়।

—সুমিত দে, সাংবাদিক।

স্বপ্ন ৪: বেশ কয়েকবার দেখেছি, জলে ডুবে যাবার স্বপ্ন।

—ধৃতিকণা ভট্টাচার্য, গৃহবধূ।

স্বপ্ন ৫: মাঝেমধ্যে দেখি, জলে ডুবে যাচ্ছি।

—বীণা পাল, গৃহবধূ।

স্বপ্ন ৬: একটা ছোট মেয়েকে জলে ডুবে মারা যাবার হাত থেকে বাঁচালাম—এই স্বপ্নটা একবার দেখেছি বাস্তবে সাঁতার জানি না।

—সুদক্ষিণা মুখোপাধ্যায়, ছাত্রী।

স্বপ্ন ৭: স্বপ্নে নৌকায় কোথাও যাচ্ছি—হঠাৎ করে নৌকা ডুবে গেল। আমিও ডুবে যাচ্ছি।

—অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক।

স্বপ্ন ৮: হঠাৎ দেখলাম, জলে ডুবে যাচ্ছি—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ঘুম ভাঙবার পর দেখি সারা শরীর ঘেমে ঘেমে একাকার।

—তন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, ফার্মাসিস্ট, বাঁকুড়া।

স্বপ্ন ৯: একবার দেখলাম জলে ডুবে যাচ্ছি—আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যায়।

—স্বপ্না সেন, স্বামীপরিত্যক্তা, কর্মী।

স্বপ্ন ১০: একটা মাঠ, জলপ্লাবিত, প্রচণ্ড জলস্রোত। আমি ভাসতে ভাসতে হাঁচোড়পাঁচোড় করছি—হঠাৎ স্কুলের একটা ডেস্ক চলে এল কাছে, আমি অনেক কষ্টে সেখানে উঠে বসলাম—বিরাট রিলিফ।

—নবনীতা দেবসেন, কবি, অধ্যাপিকা।

জলে ডোবা বা জল থেকে কাউকে তোলার স্বপ্ন দেখেন অনেক মানুষ। স্বপ্নসন্ধানের স্বপ্নদ্রষ্টাদের শতকরা বারোজন তাঁদের এরকম স্বপ্নের কথা জানান। জলে ডোবার স্বপ্ন আপাতদৃষ্টিতে ভয়ের স্বপ্ন, আতঙ্কের স্বপ্ন। এরকম স্বপ্ন দেখে অনেকে ভয় পান। আতঙ্কে ঘেমেনেয়ে ঘুম ভেঙে যায় অনেকের।

এরকম স্বপ্নদ্রষ্টার পুরনো কোনও একটা এই সংক্রান্ত উদ্বেগ সাধারণভাবে এরকম স্বপ্নে চলে আসে। বাণী বসু কমবয়সে একবার মামাবাড়ির পুকুরে প্রায় ডুবতে বসেছিলেন। ধৃতিকণা (স্বপ্ন ৪)-র কিশোরী বয়সে প্রায় একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর মাসির বাড়িতে। অপূর্ব (স্বপ্ন ৭) রায়গঞ্জের কুলিক নদীতে এক নৌকাডুবির নৌকোতে ছিলেন। ওঁর স্বপ্নে জলে ডোবা আসে নৌকাডুবি হয়ে। তন্ময় (স্বপ্ন ৮) ছেলেবেলায় একবার একটা পুকুরে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়েছিল। স্বপ্ন দেখার আগেকার, অনেক সময় একেবারে ছেলেবেলার, জলে প্রায় ডুবে যাওয়ার স্মৃতি থেকে এরকম স্বপ্নের জন্ম হতে পারে। তার মানে এই নয় যে কোনওদিন জলে ডোবার অভিজ্ঞতা হয়নি, এমন মানুষ এরকম স্বপ্ন দেখেন না।

মনে হতে পারে, এরকম স্বপ্নের মূলে কাজ করে নিরাপত্তার অভাববোধ। মনোবিদরা তা বলেন না। স্বপ্নগবেষক কিছু মনোবিদ মনে করেন, অচেতন মনের সন্তানলাভের ইচ্ছা থেকে স্বপ্নদ্রষ্টা এরকম স্বপ্ন দেখেন। সন্তানলাভের ইচ্ছা শুধু মেয়েদের মধ্যে নয়, থাকে পুরুষের মনেও। নিজের সন্তানের মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। আর হয়তো তাই সন্তানলাভের ইচ্ছা সব মানুষেরই অচেতনে কমবেশি থাকে।

পাঠক লক্ষ করবেন, এরকম স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে স্বপ্নদ্রষ্টা ভয় পান। এর কারণ কি? মনের প্রহরী সজাগ হয়ে যাওয়ায় সন্তানলাভের ইচ্ছা আসে জলে ডোবার বা জল থেকে কাউকে তোলার ছদ্মবেশ ধরে। স্বপ্নে স্মৃতিতে থাকা জলে ডুবে 'প্রায় মরতে বসা'র কথা এরকম স্বপ্নে মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া সচেতন মনে এরকম ইচ্ছাকে মেনে নিতে পারেন না সব স্বপ্নদ্রষ্টা। তাই স্বপ্নে ভয় করে। কারও স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় ঘেমেনেয়ে।

স্বপ্না-র (স্বপ্ন ৯) স্বপ্নে জলে ডোবা আসে এক অতীত যন্ত্রণার সূত্র ধরে। বাবা মায়ের অমতে কয়েক বছর আগে এক যুবককে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন স্বপ্না। 'ভালোবাসার মানুষ' কিছুদিনের ভেতর খুলে ফেলে ছদ্মবেশ। প্রায়ই মার খেতে হত স্বপ্নাকে। চলত আরও নানা অত্যাচার। এক দিন বাবা মায়ের কাছে ফিরে এসেছিলেন শরীরমনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। জলে ডোবার স্বপ্ন আসে তারপর থেকে। প্রাথমিকভাবে নিরাপত্তার চূড়ান্ত অভাববোধ থেকে এরকম স্বপ্ন তৈরি হয়। আর স্বপ্নের মধ্যে পূর্ণ হয়

অচেতন মনে থাকা মা হবার অপূর্ণ বাসনা।

এই প্রসঙ্গে আর একটা স্বপ্নের কথা বলি। এই স্বপ্ন দেখেন বারুইপুরের স্বরূপ দাস। স্বরূপের ১৮ বছর বয়সে ওর বাবা মারা যান। ওই বয়সে গোটা সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপা আর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মধ্যে তফাত কতটুকু! ওই সময় স্বাভাবিকভাবে ওর মনে কাজ করত চরম নিরাপত্তাহীনতা। স্বরূপের স্বপ্নটা ছিল এরকম—

'একটা কুয়ো—বেশ কিছুটা নীচে জল। আমি নীচে নেমে যাচ্ছি—চারপাশে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ, গা জড়াজড়ি করে থাকা সাপ—প্রচণ্ড আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যায়।'

স্বরূপের স্বপ্নে 'অসংখ্য সাপ' এসেছে তাঁর ওই সময়কার আশ্রয়হীন, নিরালম্ব অবস্থার রূপক হয়ে। যে অবস্থায় তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কুয়োর জলে ডুবতে ডুবতে আতঙ্কে স্বপ্ন যায় ভেঙে। প্রাথমিকভাবে এই স্বপ্ন মানসিক অনিশ্চয়তা আর অসহায়তার প্রতিফলন। তবে স্বপ্নের গূঢ় অর্থ সন্তানলাভের ইচ্ছা। অনেক পাঠক এটা মানতে চাইবেন না। তবু স্বপ্নের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে স্বপ্নটার অর্থ তাই দাঁড়ায়। শুধু বিবাহিত নারী বা পুরুষ নন, যৌবনপ্রাপ্ত যে কোনও কমবয়সী ছেলেমেয়েও এরকম স্বপ্ন দেখতে পারেন।

জলে ডোবা বা জল থেকে কাউকে তুলে আনবার এরকম স্বপ্ন আপাতদৃষ্টিতে জটিল। কেননা সাধারণ বুদ্ধিতে এর সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে নানা দেশের ধর্মীয় গল্পে বা কাহিনীতে এরকম স্বপ্নের গোপন অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। গিরীন্দ্রশেখর বসু লিখছেন, 'পৌরাণিক উপকথায় দেখা যায়, অনেক নায়কেরই উৎপত্তি জল হইতে, যেমন কর্ণ।' রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকে রাজপুত্রকে পাওয়া গিয়েছিল জলের ধারে। আগেকার দিনে অবাঞ্ছিত সন্তানকে অনেকে ঝুড়ির ভেতর শুইয়ে ভাসিয়ে দিতেন জলে। ভাসতে ভাসতে পারে আসা সেই বাচ্চাকে জল থেকে তুলে এনে সন্তান হিসাবে মানুষ করেছেন—এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে বাস্তবে, লোকগাথায়। স্বয়ং কুন্তী কুমারী অবস্থায় সূর্যের বর পরীক্ষা করতে গিয়ে জন্ম দেন কর্ণকে। তারপর তাকে ভাসিয়ে দেন জলে। জলে ভেসে আসা কর্ণকে উদ্ধার করে মানুষ করেন রাধা। জলে ভেসে আসা নবজাতক বা নবজাতিকাকে উদ্ধার করে সন্তান ভেবে কোলে তুলে নেবার এ সব ঘটনায় একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। তা হল, জল থেকে কাউকে উদ্ধার করবার স্বপ্নে সন্তান পাবার গোপন ইচ্ছা।

উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে অনেক মানুষ নানা ধরনের স্বপ্ন দেখেন যেখানে স্বপ্নের দর্শক নিজে পুরোপুরি উলঙ্গ। আমাদের মতো দেশে এরকম স্বপ্ন দেখা মানুষের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। আমার অনুসন্ধানে একশো জনে মাত্র দশ জন। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী এরকম স্বপ্ন কমবেশি দেখার কারণ বোধহয় তাপমাত্রার তফাতের জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের মানুষের পোশাকের পার্থক্য। পশ্চিমের দেশে ঠাণ্ডার জন্য মানুষকে অনেক জামাকাপড় পরে থাকতে হয় ঘরের মধ্যেও, বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় দুতিনপ্রস্থ জামাকাপড় পরে।

বিদেশীরা যখন আমাদের দেশে বেড়াতে আসে তখন এদেশের গরমে স্বল্প জামাকাপড়ে ঘুরে বেড়ায়। কলকাতার রাস্তায় বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে স্বল্প বেশবাসে ঘুরে বেড়ানো বিদেশীদের প্রায়ই চোখে পড়ে। আমাদের মতো দেশে প্রায় সারাবছরই গরম। এখানে মানুষের বেশবাসও তাই স্বল্প। বাড়িতে খালি গায়ে থাকেন অনেক পুরুষ মানুষ। ফ্রয়েডের অভিজ্ঞতা, বিদেশে এমন লোকের সংখ্যা কম যাঁরা স্বপ্নে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ান না। বা যেখানে যে পোশাক পরে যাওয়া 'উচিত নয়' এমন পোশাকে স্বপ্নদ্রষ্টা সেখানে চলে যান। অথবা তার জামাকাপড় এলোমেলো। হয়তো স্বপ্নদ্রষ্টা নারী বা পুরুষের পরনে শুধুই অন্তর্বাস।

আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে শৈশবের 'উলঙ্গ রাজা'টি গভীরভাবে বেঁচে থাকে। পাঠক খেয়াল করবেন, একেবারে ছোট বাচ্চারা জামাকাপড় পরতে চায় না। অনেক বাচ্চা বহুদিন পর্যন্ত উলঙ্গ হয়ে ঘোরাফেরা করে। আর তার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে এতটুকু লজ্জাবোধ থাকে না। একটু বড় হলে

জামাকাপড় পরার মতো সামাজিক রীতিতে বাচ্চারা অভ্যস্ত হয়ে যায়। শৈশবের মতো নিঃসঙ্কোচ নগ্নতায় ফিরে যাবার ইচ্ছাটা চলে যায় মনের অচেতনে। অচেতনে শৈশবের নগ্নতা ফিরে পাবার ইচ্ছা থেকেই স্বপ্নদ্রষ্টা নিরাবরণ ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন দেখেন। এতে মনের রুদ্ধ ইচ্ছা কাল্পনিক পূর্ণতা পায়। এটা এজাতীয় স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা। কারও কারও মতে, এরকম স্বপ্নের মধ্যে মানুষের মনে অন্যাকে নিজের রূপ দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। শীতপ্রধান দেশের মানুষের পোশাকের বাহুল্যে অন্যাকে নিজের রূপ দেখাবার সুযোগ কম। তাই হয়তো ওই সব দেশের মানুষ এরকম স্বপ্ন দেখেন বেশি। আমাদের মতো দেশে এরকম সুযোগ বিস্তর। তাই এরকম স্বপ্ন এদেশের লোকে কম দেখেন। এই সিদ্ধান্ত আমার ব্যক্তিগত।

স্বপ্নভরা ঝুড়ি থেকে কিছু এরকম স্বপ্নের কথা এখানে উল্লেখ করব—

স্বপ্ন ১: একটা নদীতে নামছি একটু একটু করে। প্রথমে হাঁটু জল, তারপর কোমর পর্যন্ত, তারপর বুক,—আমি কিছুই পরে নেই, একেবারে নগ্ন।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বপ্ন ২: কোনও একটা জায়গায় গেছি, জায়গাটা অচেনা—আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—আশেপাশে সব চেনা লোকজন, আমি যে উলঙ্গ তাতে তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই—সবাই কথাবার্তা বলছে, গল্পগুজব করছে—আমার কিন্তু খুব অস্বস্তি হচ্ছে গায়ে জামাকাপড় নেই বলে।

—ডা. স্মরজিৎ জানা, কলকাতা।

স্বপ্ন ৩: অনেক লোকের মাঝে স্বপ্নে আমি পুরোপুরি বস্ত্রহীন—খুব লজ্জা করছে—কি ভাববে লোকে।

—মহাদেব চৌধুরী, সরকারি কর্মচারী, শিলিগুড়ি।

স্বপ্ন ৪: পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার গায়ে জামাকাপড় নেই। খুব লজ্জা করছে। অথচ রাস্তার লোকজন খেয়ালই করছে না আমি উলঙ্গ।

—শুভাশিস খান, সরকারি অফিসার, রায়গঞ্জ।

স্বপ্ন ৫: কলেজে যাচ্ছি—হঠাৎ খেয়াল হল নিম্নাঙ্গে কোনও কাপড় নেই। খুব লজ্জা করে এরকম স্বপ্ন দেখলে।

—নীহারেন্দু মজুমদার, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম।

স্বপ্ন ৬: একটা স্কুল থেকে সবাই আমাকে দেখছে আর মজা পাচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল করলাম আমি রাতের পোশাকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে এসেছি—খুব লজ্জা করছে।

—বাণী বসু।

স্বপ্ন ৭: একটা রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছি—অধোদেশে কোনও কাপড় নেই।

—জয় গোস্বামী।

এই স্বপ্নগুলোকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথম, ষষ্ঠ আর সপ্তম স্বপ্নের দর্শক অনুভূতিপ্রবণ, সৃজনশীল লেখক। নগ্ন শৈশবের আনন্দঘন দিনগুলোকে এঁরা তো ফিরে পেতে চাইতেই পারেন। প্রথম স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা বাদে আর কোনও দর্শক নেই। স্বাভাবিকভাবেই নগ্ন অবস্থায় নদীতে নামায় এতটুকু লজ্জাবোধ নেই। দ্বিতীয় স্বপ্নে দর্শক অনেক। এঁরা সবাই স্বপ্নদ্রষ্টার পরিচিত। স্বপ্নের শুরুতে শৈশবের নগ্ন অবস্থাকে ফিরে পেয়ে কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণ ঘটছে স্বপ্নে। তাই বলে মনের প্রহরী তো আর চুপচাপ বসে নেই। সে সক্রিয় হতেই স্মরজিতের মনে দেখা দিচ্ছে লজ্জাবোধ। বাস্তবে নগ্ন অবস্থায়

অন্যরা তাঁকে দেখে ফেললে যেরকম হয়, সেরকম লজ্জা আর অস্বস্তি দেখা দিয়েছে স্বপ্নের ভেতর। পাঠক লক্ষ্য করবেন, স্মরজিৎ উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ালেও তার আশপাশের মানুষদের সে ব্যাপারে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। বাস্তবে একজন উলঙ্গ মানুষকে কাছেপিঠে ঘুরে বেড়াতে দেখলে কি অস্বস্তিতেই না পড়তে হয় আমাদের! স্বপ্নে এ ব্যাপারে দর্শকরা উদাসীন। যেন, স্বপ্নদ্রষ্টা যে কোনও জামাকাপড় না পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেটাই স্বাভাবিক। জেগে থাকা অবস্থায় বাস্তবে আর ঘুমিয়ে স্বপ্নের দেশে কোনও ঘটনায় দর্শকদের প্রতিক্রিয়ার বৈপরীত্য এর জন্য দায়ী।

বছর তিনেক বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের উলঙ্গ থাকবার আর জামাকাপড় না পরবার প্রবণতার মধ্যে মনোবিদরা 'অন্যকে নিজের রূপ দেখাবার ইচ্ছা' বা 'Exhibitionistic Wish' এর সন্ধান পেয়েছেন। সমাজের রীতিনীতি মেনে জামাকাপড় পরে থাকবার অভ্যাস রপ্ত হলে এই ইচ্ছা রুদ্ধ অবস্থায় অচেতনে চাপা পড়ে যায়। কিছু পূর্ণবয়স্ক মানুষের মধ্যে এই ইচ্ছা সচেতনে থাকলে তা এক ধরনের যৌনবিকারের জন্ম দিতে পারে। মেয়েদের স্কুল কলেজের আশেপাশে এরকম যৌনবিকারগ্রস্ত পুরুষের দেখা পাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। এরকম বিকৃতকাম পুরুষের নানা কীর্তির দর্শক হতে হয়েছে এই বইয়ের পাঠিকাদের ভেতর এমন যুবতী বা মহিলা হয়তো অনেক আছেন।

উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্নের প্রসঙ্গে ফ্রয়েড হ্যানস অ্যানডারসন এর 'দ্য এমপেরেরস নিউ ক্লদস' গল্পের রাজার পোশাকের তুলনা করেছেন। যেখানে দুই ঠগের খপ্পরে পড়ে রাজা ঘুরে বেড়াচ্ছেন উলঙ্গ হয়ে। ঠগেরা রাজাকে বুঝিয়েছে, তার গায়ে রয়েছে দুর্মূল্য সুক্ষাতিসুক্ষ্ম এক পোশাক! যা দেখতে পাবে শুধু অনুগত প্রজারাই! 'সবাই দেখছে রাজা উলঙ্গ, তবু বলছে সাবাস সাবাস।' তা নইলে যে প্রজাকে চিহ্নিত হতে হবে 'রাজবিরোধী' হিসেবে। ভয়ে কারও রাজার পোশাক ছুঁয়ে দেখবার সাহস নেই। ঠগেরা জানাতে ভোলেনি, রাজাকে উলঙ্গ ভেবে সেই পোশাক ছুঁতে গেলে যে কেউ সোনার শবে পরিণত হবে। কেননা, পোশাকটাব মধ্যে রয়েছে পরশপাথরের মতো জাদুক্ষমতা!

'উলঙ্গ রাজা'র রাজাকে উলঙ্গ দেখেও দর্শকরা উদাসীন। স্বপ্নের উলঙ্গ মানুষটাকে দেখে দর্শকদের প্রতিক্রিয়াও তাই। অবচেতনে নিরাবরণ শৈশবে ফিরে যাবার ইচ্ছায় স্বপ্নের স্মরজিৎ বা শুভাশিস উলঙ্গ। দর্শকদের এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। স্বপ্নের পাহারাদারের নজরদারি কখনও স্বপ্নদ্রষ্টার উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো মেনে নিতে পারে না। কোনও মানুষ উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াবে তা কি করে হয়! পাহারাদার সক্রিয় হতেই স্বপ্নের দর্শক নিজের নগ্ন অবস্থার জন্য লজ্জা পেতে শুরু করেন। কারণ, সেন্সারের কাঁচি যে কোনওভাবে এই 'অ্যাডাল্ট' দৃশ্য প্রদর্শন বন্ধ করে দিতে চায়। স্বপ্ন ১ আর স্বপ্ন ৬ বাদে বাকি স্বপ্নের দর্শকরা তাঁদের নিরাবরণ অবস্থা অনুভব করে তাই লজ্জা পাচ্ছেন স্বপ্নের মধ্যে। ৬ নম্বর স্বপ্নের দর্শক লজ্জা পাচ্ছেন রাতপোশাক পরে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে আসায়।

স্বপ্নে জীবজন্তুর তাড়া

অনেক সময় স্বপ্নের দর্শককে বাঘ, ভালুক, সিংহ বা অন্য হিংস্র জন্তু তাড়া করে। এবকম বেশ কিছু স্বপ্নের কথা অনেকে আমাকে জানিয়েছেন। কলকাতার পাহাড়পুর রোডের শিক্ষিকা রমা শর্মা স্বপ্নে প্রায়ই হিংস্র বাঘের তাড়া খান। বাঘটা রমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর রমা প্রাণপ্রণে বাঘের সামনের পা দুটো ধরে থাকেন। নদীয়ার চাকদহ-র এক গৃহবধূ বার দুয়েক তাড়া খেয়েছেন পাগলা হাতির। স্বপ্নের সার্কাসের হাতি ক্ষেপে গিয়ে শেকল ছিঁড়ে একেবারে চলে আসে প্রকাশ্য রাস্তায়। তাড়া করে রাস্তা দিয়ে চলতে থাকা এই গৃহবধূকে। সেল্সগার্ল মন্দিরা বসুকে একবার স্বপ্নের এক অভয়ারণ্যে তাড়া করেছিল একজোড়া হিংস্র ভালুক। রেলের হকার বাবলু দাসের প্রায়ই স্বপ্নে ক্ষেপা ষাঁড়ের তাড়া খাবার কথা আগেই বলেছি।

স্বপ্নগবেষক মনোবিদ গিরীশশেখর বসুর মতে, মেয়েদের ক্ষেত্রে এরকম স্বপ্ন কামজ বা যৌন আক্রমণের স্মৃতি থেকে আসে। আর পুরুষদের ক্ষেত্রে এরকম স্বপ্ন আসে অচেতন মনের সমকামিতা (Homosexuality) থেকে। স্বপ্নে হিংস্র জন্তুর তাড়ার সব স্বপ্নের অর্থ এরকমই হবে তা আমার মনে হয় না। আমার কাছে দুটো এরকম স্বপ্নের বিবরণ রয়েছে। যেগুলোতে এরকম স্বপ্নের মধ্যে কামজ

আক্রমণ বা সমকামিতার কোনও আভাস নেই। এই দুটো স্বপ্নে হিংস্র জন্তু এসেছে স্বপ্নের দর্শকের মনের কোনও ভয়ের প্রতীক হয়ে।

এক বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞের স্বপ্ন। ১২-১৩ বছর বয়সে একটা বাঘ তাড়া করত ওকে। বাড়িতে। ছেলেটা বাঘকে এড়াতে একবার ঘরে ঢুকত, একবার বাইরে বেরিয়ে আসত। কোনওদিন বাঘটা ধরতে পারেনি ওকে। এই স্বপ্নের আনুষঙ্গিক তথ্যগুলো বলি। ওদের পাড়ায় ছিল একটা 'সব পেয়েছি আসর'। যার সক্রিয় সদস্য ছিল ঐ কিশোর। একবার আসরের পরিচালকের সঙ্গে কোনও একটা ব্যাপার নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধে ওর। সেই সময় বাঁকুড়ায় মামাবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে রাগ মেটাতে পরিচালক ভদ্রলোককে বেনামে একটা চিঠি দেয় ছেলেটা। যে চিঠির ভাষা আদৌ ভদ্র ছিল না! ভদ্রলোক হাতের লেখা চিনতে পেরে যান। বাড়িতে ফেরবার পর ছেলেটাকে প্রায়ই ভয় দেখাতেন, পুলিশে ধরিয়ে দেবেন। যে কোনও কিশোরের মনে পুলিশ চরম ভয়ের বস্তু। অন্তত তখনকার দিনে ব্যাপারটা তাই ছিল। পুলিশের ভয় ছদ্মবেশে বাঘের তাড়া হয়ে স্বপ্নে দেখা দিত। পাঠক লক্ষ করবেন, বাঘ তাড়া করলেও কোনওদিন ধরতে পারেনি ছেলেটাকে। স্বপ্নে আক্রমণ আর আত্মরক্ষা এসেছে এক সঙ্গে।

এক চাকুরিজীবী যুবকের স্বপ্নে ওর বাড়িতে সিংহ ঢুকে পড়ত। ঘরের দরজা আটকে লুকিয়ে থাকত যুবক। সিংহটা অনেক খুঁজত। শেষ পর্যন্ত সিংহের হাত থেকে বেঁচে যেত। এই স্বপ্ন যুবক দেখত তার সতেরো বছর বয়সে। ক্লাস ইলেভেন-এ একবার পরীক্ষার সময় অন্যের খাতা দেখে প্রশ্নের উত্তর লিখতে লিখতে মাস্টারমশাইর নজরদারি চোখে পড়ে যায় ও। মাস্টারমশাই দুজনের খাতা থেকে দশ নম্বর করে কেটে নেবার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষা শেষে হল থেকে বেরিয়ে যার খাতা দেখে ও লিখছিল, সেই ছাত্রটি ওকে বেদম শাসায়। বলে, ওর এক দশাসই চেহারার মাস্তানটাইপ দাদাকে বলে ওকে মার খাওয়াবে। ওই 'মাস্তান দাদা'র ভয় থেকে ঐ স্বপ্নের উৎপত্তি। 'শক্তিমান দাদা' স্বপ্নে ছদ্মবেশ ধরে চলে আসত বলশালী সিংহ হয়ে। আর ঘরের দরজা আটকে লুকিয়ে থেকে সিংহের কবল থেকে যুবক মুক্তি পেত স্বপ্নেই।

বাঘ আর সিংহের এই দুটো স্বপ্নেই স্বপ্নদ্রষ্টারা হিংস্র জন্তুর কবলে পড়েও নিজস্ব পদ্ধতিতে বিপদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেত। স্বপ্ন দুটোরই উৎপত্তি কোনও মানুষের প্রতি (পুলিশ বা বলবান দাদা) ভয় থেকে! স্বপ্নের বিপদ থেকে উদ্ধার হয় স্বপ্নেই। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এরকম স্বপ্ন শুধু বিপদের বা ভয়ের নয়। সমাধানেরও।

কলকাতার কাশীনাথ দত্ত রোডের গৃহবধূ অনন্যা বোসের একটা স্বপ্নের কথা বলি। একটা মেলায় বিশাল একটা হাতিকে নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। মেলা থেকে ফেরার পথে অনন্যা দেখেন, সবাই ছুটছে। হাতিটা ক্ষেপে গিয়ে সবাইকে তাড়া করেছে। একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে হাতির কবল থেকে বাঁচেন স্বপ্নের দর্শক। বাসে চেপে চলে যান অন্য একটা জায়গায়। সেখানে ওঁকে তাড়া করে একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়। একটা মাংসের দোকানে ঢুকে ষাঁড়টার হাত থেকে বেঁচে যান অনন্যা। স্বপ্নে অনন্যাকে প্রায়ই তাড়া করে হাতি অথবা ষাঁড়।

বেলুড়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. সন্দীপ সিনহা ছাত্রজীবনে দেখত একটা স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে সন্দীপ দেখত, একটা বাঘ মশারির ওপর থেকে ঝাঁপ দিচ্ছে ওর দিকে। স্বপ্নটা দেখলেই ভয়ে, আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যেত স্বপ্নের দর্শকের। এই স্বপ্নের বাঘটা আসলে ছিল 'ভয়ঙ্কর' একজন মানুষের ছদ্মবেশ। ডাক্তার হয়ে যাবার পর সন্দীপ আর এই স্বপ্ন দেখেননি। 'ভয়ঙ্কর' মানুষদেরকেও যে বিপদে পড়লে ডাক্তারবাবুদের কাছে আসতে হয়!

চোরডাকাতের স্বপ্ন

চোরডাকাতের স্বপ্ন দেখেন অনেকেই। চোরের স্বপ্ন হতে পারে নানা ধরনের। বাড়িতে চোর ঢুকে সমস্ত কিছু চুরি করে পালাচ্ছে বা চোর ঘরে ঢুকেছে, এরকম স্বপ্নই দেখা দেয় বেশি। স্বপ্নদ্রষ্টা 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করে ওঠেন ঘুমের ভেতর। বাস্তবে গলা দিয়ে গোঙানি ধরনের আওয়াজ বার হতে

থাকে। যাকে অনেকে 'বোবায় ধরা' বলেন। অনেকসময় স্বপ্নের দর্শক সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করবার চেষ্টা করলেও স্বপ্নে গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বার হয় না। বা খুব মৃদু আওয়াজ বার হয়। তাঁর চিৎকার কারও কানে যাচ্ছে না—এই তীব্র উদ্বেগ নিয়ে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে ঘুম ভাঙে স্বপ্নের দর্শকের।

চোরের স্বপ্ন আরও নানারকম হতে পারে। স্বপ্নের মধ্যে চোরকে তাড়া করেছেন স্বপ্নের দর্শক এমন বেশ কিছু স্বপ্ন আমার ফাইলে রয়েছে। কেউ কেউ আবার স্বপ্নের মধ্যেই চোরকে ধরে ফেলেন। শুরু হয় ধ্বস্তাধস্তি, লড়াই। এরকম চলতে চলতেই ঘেমেনেয়ে ঘুম ভেঙে যায় স্বপ্নদ্রষ্টার। এসময় অনেকের হাত মুষ্টিবদ্ধ থাকে। একরম লড়াই চলতে চলতেই ঘুম ভেঙে যায় বলে।

এরকম স্বপ্নের মধ্যে ফ্রয়েড শৈশবস্মৃতির উপাদান থাকে বলে মনে করতেন। ছোট্ট বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ে খুব তাড়াতাড়ি। ঘুমন্ত অবস্থায় তার চেতনায় থাকে তাকে ঠিকভাবে শুইয়ে দেওয়া বা বাথরুম করাতে তোলা বাবা অথবা মায়ের আবছা মুখ। ঘুমে ব্যাঘ্যাত ঘটানো এই মুখকে দেখে ছোট্ট শিশু অনেকসময় চমকে ওঠে বা শুয়ে কান্না জুড়ে দেয়। ফ্রয়েডের মতে, বড় হয়ে যাওয়া মানুষের স্বপ্নে শৈশবস্মৃতিতে থাকা ঘুমে-বিঘ্ন-ঘটানো এই মুখগুলো চোরের ছদ্মবেশে চলে আসে। আর স্বপ্নের চোরকে দেখে ছেলেবেলায় তাকে ঘুম থেকে তোলা বাবা বা মায়ের অস্পষ্ট মুখ বলে মনে হয় স্বপ্নদ্রষ্টার। ছোটবেলায় তাকে ঘুম থেকে তোলা বাবা বা মায়ের অস্পষ্ট মুখ দেখে শিশু যেরকম ভয় পেত, স্বপ্নে বয়স্ক মানুষ চোর দেখে ঠিক একরকম ভয় পান। আর স্বপ্নের মধ্যেই চিৎকার করে ওঠেন।

ফ্রয়েডের মত হল, স্বপ্নে চোর দেখার মধ্যে বাবার প্রতি বিদ্বেষ কাজ করে। এই বিদ্বেষ কেন বাবার প্রতি, মায়ের প্রতি নয়, তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ রয়েছে। ছেলেবেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় বাচ্চাদের হাত-পা ঠিক করে দেওয়া বা বাথরুম নিয়ে যাবার কাজটা বাবারাই করেন বেশি। মায়েরা যদিও বা এর জন্য বাচ্চার ঘুমে ব্যাঘ্যাত ঘটান, তবু বাচ্চা সহজেই মাকে চিনতে পারে। কেননা যে কোনও ছোট বাচ্চাকে জীবনধারণের প্রয়োজনে বাবার চাইতে মায়ের ওপর নির্ভর করতে হয় অনেক বেশি।

মেয়েরা চোরের স্বপ্ন দেখে পুরুষের তুলনায় অনেক কম। ছেলেদের মধ্যে বাবার প্রতি বিদ্বেষ দেখা দেয় বেশি। প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন প্রসঙ্গে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। মেয়েদের মধ্যে বাবার প্রতি আকর্ষণ সাধারণভাবে প্রবল। হয়তো এই কারণে চোরের স্বপ্ন মেয়েরা দেখে খুব কম।

চোরের স্বপ্নের এটা সাধারণ ব্যাখ্যা। সব সময় চোরের স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যা ঠিক নাও হতে পারে। আমি পরিচিত একজন মানুষকে জানি, যিনি মাঝেমধ্যেই স্বপ্নে চোরকে পালাতে দেখে 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করে ওঠেন। ঐ ভদ্রলোকের স্বপ্নের পারিপার্শ্বিক সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়, একই পেশার অন্য এক জন মানুষের প্রতি অচেতন মনের শত্রুতা থেকে তিনি বারবার চোরের স্বপ্ন দেখেন।

স্বপ্নে ডাকাতের দেখা পান অনেক মানুষ। আমাদের মতো দেশের মানুষের মনে ডাকাতি আর খুনখারাপি, মারদাঙ্গা, লুটপাট প্রায় সমার্থক। কখনও বা স্বপ্নে বাড়িতে ডাকাত পড়ে। কখনও স্বপ্নদ্রষ্টা ডাকাতের হাত থেকে বাঁচতে ছুটতে চান, পারেন না। স্বপ্নে ডাকাত বা দুষ্কৃতকারীর তাড়া প্রায় সমার্থক। আমার স্বপ্নসন্ধানের অভিজ্ঞতা,মেয়েরা স্বপ্নে এরকম তাড়া খায় বেশি। এরকম স্বপ্ন, কিছু ক্ষেত্রে যৌন আক্রমণের ভয় বা পুরনো স্মৃতি থেকে আসে। যৌবন শুরুর বছরগুলোতে বা আরও কম বয়সে অনেক মেয়ে এমনকি ছেলেরাও বয়স্ক পুরুষ বা নারীর অতৃপ্ত বা বিকৃত কামলালসার শিকার হয় সহজেই। এরকম অভিজ্ঞতা মনে গভীর ক্ষতচিহ্ন রেখে যায় অনেক সময়। বড় হয়ে এরকম নির্যাতনের স্মৃতি সবসময় চেতনায় থাকে না। ঘুমন্ত চেতনায় অচেতন বা অবচেতনের এই স্মৃতি চলে আসতে পারে ডাকাত বা দুষ্কৃতীর স্বপ্নে। এরকম স্বপ্ন তাই বেশির ভাগ সময় ভয়ের, আতঙ্কের।

বিশেষ করে মেয়েদের দেখা ডাকাত বা দুষ্কৃতীর স্বপ্ন আসতে পারে নানাভাবে। গৃহবধূ সুতপা চৌধুরী মাঝেমধ্যে স্বপ্ন দেখেন, দুষ্কৃতীরা তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। এরকম অবস্থায় তীব্র ভয়ের মধ্যে ঘুম ভেঙে যায় সুতপার। চৌত্রিশ বছরের অন্য এক গৃহবধূ কমলিকা সেন নির্জন রাস্তায় কয়েকজন দুষ্কৃতীর তাড়া খেয়ে ছুটতে থাকেন স্বপ্নে। দুষ্কৃতীরা তাকে ধরে ফেলবার ঠিক আগের মুহূর্তে চূড়ান্ত উৎকণ্ঠার

মধ্যে ঘুম ভাঙে আতঙ্কগ্রস্ত কমলিকার।

ডাকাত বা দুষ্কৃতীসংক্রান্ত সব স্বপ্নের অর্থ যে একই হবে তা নয়। স্বপ্নকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে এরকম বেশ কিছু স্বপ্নে অন্য কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। সাংবাদিক নিবেদিতা মজুমদারের এরকম একটা স্বপ্নের কথা বলি। এগারো বছর বয়সে দেখা এই স্বপ্নটা আজও ভীষণভাবে নাড়া দেয় নিবেদিতাকে। ওই সময় দুতিনবার দেখেছেন একই স্বপ্ন। বাড়ির রোয়াকে বসে আছে কিশোরী নিবেদিতা। পাশে ওর ঠাকুরদা। কেউ একটা তাকে নিয়ে যেতে চাইছে। ঠাকুরদা থাকায় পারছে না। কম বয়সে নিবেদিতার খুব কাছের মানুষ ছিলেন ওর ঠাকুরদা। ঠাকুরদার ওপর নির্ভরতা থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। কেউ তাকে নিয়ে যেতে চাইছে, এটা অবশ্যই একটা বড় বিপদ। সেই বিপদের হাত থেকে কিশোরী রক্ষা পাচ্ছে ঠাকুরদা পাশে থাকবার জন্য। যে বিপদই আসুক না কেন, ঠাকুরদা তাকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন—স্বপ্নদ্রষ্টার মনের চেতন-অবচেতনের এই নির্ভরতা, এই নিরাপত্তাবোধ এরকম স্বপ্নের মধ্যে চলে এসে আরও দৃঢ় হচ্ছে। এরকম স্বপ্ন সরল অর্থে এক ধরনের 'সাহস বাড়াবার স্বপ্ন'।

স্বপ্নে চোরকে তাড়া করছেন স্বপ্নদ্রষ্টা—এরকম স্বপ্ন দেখেন কিছু মানুষ। ট্রেনের হকার বিমল দাস একবার স্বপ্নে চোরকে শুধু তাড়া করেননি, জাপটে ধরেও ফেলেছেন। আর তার জন্য সবাই তাকে বাহবা দিয়েছে। জীবনসংগ্রামে জর্জরিত একজন মানুষের মনের ভেতরকার 'নায়ক হবার ইচ্ছা' (Heroic Trend) এই স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, বিমলবাবু নাটক লেখেন। নাটকের নানা চরিত্রে অভিনয়ও করেন।

দাঁত পড়ে যাবার স্বপ্ন

দাঁত তোলার বা দাঁত পড়ে যাবার স্বপ্ন আমাদের দেশের মানুষ দেখেন খুব কম। আমার স্বপ্নসন্ধানের পর্যবেক্ষণ তাই বলে। পশ্চিমের দেশগুলোতে মানুষের দাঁতের সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ খুব বেশি। দাঁতের সমস্যায় ভুগে ওখানে অনেককেই কম বয়সে দাঁত তুলে ফেলতে হয় ডেন্টিস্টের চেম্বারে গিয়ে। এর সঙ্গে ওসব দেশের মানুষের দাঁত তোলার স্বপ্ন বেশি দেখার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে বলে আমার মনে হয়। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, আমাদের দেশেও তো মানুষকে অকালে দাঁত তুলে ফেলতে হয়। তবে তাঁরা কেন দাঁত তোলা সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখেন না? দাঁত তোলার স্বপ্ন আমাদের দেশের লোক কেন এত কম দেখেন? পূর্ব আর পশ্চিমে স্বপ্নের দেশের ভৌগোলিক তারতম্য সম্ভবত এর জন্য দায়ী।

স্বপ্নসন্ধানে আমি দাঁত পড়ে যাবার স্বপ্ন পেয়েছি খুব কম। ফ্রয়েড বহু মানুষের এই জাতীয় স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখছেন, তাঁর দাঁত তুলে ফেলা হচ্ছে বা মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কেউ তাঁর দাঁত তুলে ফেলল। কেউ বা দেখছেন আপনা থেকেই তাঁর একটা বা সব দাঁত পড়ে গেল। আমার সংগ্রহে থাকা কিছু এরকম স্বপ্নের দুএকটাব কথা বলি।

স্বপ্ন ১: একটা সময় প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম, দাঁত, একটা বা অনেকগুলো নড়ছে—পড়ে যাচ্ছে—খুব ভয় হত স্বপ্নের মধ্যে—আমার একটাও দাঁত নেই। অসম্ভব দুশ্চিন্তার মধ্যে ঘুম ভেঙে সব দাঁত আছে বুঝতে পেরে খুব স্বস্তি হত।

—— —, ৩১ বছর, রায়গঞ্জ, পূর্ব দিনাজপুর।

স্বপ্ন ২: বছর পাঁছেক আগে এই স্বপ্নটা বেশ কয়েকবার দেখেছি—আমার ৩২ পাটি দাঁত খুলে হাতে চলে এল—এখন আর দেখি না।

—তারাপদ ঘোষ, এঞ্জিনিয়ার, আন্দুল।

ফ্রয়েড বহু মানুষের দাঁতের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে, এরকম স্বপ্নের মধ্যে অযোনিজ যৌন ইচ্ছা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে, এরকম স্বপ্নের মধ্যে বিশেষ এক ধরনের যৌন ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে তৃপ্ত হয়।

মানুষের মুখ, ঠোঁট আর চোয়ালের সঙ্গে স্ত্রী জননাঙ্গের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। স্বপ্নে দাঁড়িগোঁফের ভেতর নাকের অস্তিত্ব পুরুষাঙ্গের প্রতীক হয়ে দেখা দিতে পারে। কৈশোরের হস্তমৈথুনের অভ্যাস স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক যৌন অভ্যাস শুরু হবার পর সাধারণত সচেতন মন থেকে চলে যায়। বেশি বয়সে দাঁত পড়ে যাওয়া বা দাঁত তোলার স্বপ্নের ভেতর দিয়ে যৌবন শুরুর হস্তমৈথুনের ইচ্ছা চলে আসে। এরকম স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অবচেতনের স্বমেহন-এর (Masturbation) ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে তৃপ্ত হয়।

ফ্রয়েড তাঁর এই তত্ত্বের সমর্থনে বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন; যেখানে দাঁত পড়ে যাবার বা দাঁত তুলে ফেলবার স্বপ্ন দেখবার সময় নিজের অজান্তে পুরুষ স্বপ্নদ্রষ্টার বীর্যস্খলন হয়ে গেছে। পশ্চিমের অনেক মনোবিদ মনে করেন, মেয়েরা এরকম স্বপ্ন দেখে 'মা' হবার সুপ্ত ইচ্ছা থেকে। আমাদের প্রথম স্বপ্নের স্বপ্নদ্রষ্টার বয়েস ৩১। অবিবাহিত। তার স্বপ্নের প্রথম অংশে তাঁর দাঁত নড়ছে, পড়ে যাচ্ছে। স্বপ্নের এই অংশে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায় যুবকের স্বমেহনের ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে তৃপ্ত হচ্ছে। পরের অংশে খুব ভয় হচ্ছে ওর যে ওঁর একটাও দাঁত নেই। এই ভয় কেন? স্বপ্ন বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করলে, এই ভয় দেখা দেবার কারণ মনের প্রহরী সজাগ হয়ে ওঠা। 'অনৈতিক' একটা ইচ্ছা স্বপ্নে পূর্ণ হচ্ছে দেখে পাহারাদার তৎপর হয়ে উঠতেই স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁর অবদমিত যৌনইচ্ছার জন্য 'ড্রিমগার্ড'-কে ভয় পাচ্ছেন। পাঠক লক্ষ করবেন, স্বপ্নদ্রষ্টা এই স্বপ্ন দেখেছেন বহুবার।

দাঁত পড়ে যাবার স্বপ্ন এদেশের মানুষ দেখেন খুব কম। পাশ্চাত্যের দেশের মানুষের দেখা এই স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা আর আমাদের দেশের হাতে গোনা এরকম স্বপ্ন দেখা মানুষের স্বপ্নের অর্থ সবসময় একই হবে, তা আমার মনে হয় না। স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যার মধ্যে অনেকেই 'যৌনতা নিয়ে বাড়াবাড়ি' বা 'সবকিছুর মধ্যেই যৌনতা খোঁজার বাতিক' দেখতে পাবেন, এরকম আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

স্বপ্নের দর্শক প্রথম যুবকের সঙ্গে বহুবার তাঁর এই স্বপ্ন নিয়ে আলোচনার বা প্রশ্ন করবার সুযোগ হয়েছে এই লেখকের। এর মধ্য দিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক গঠন অনেকটাই বোঝা যায়। অর্থনীতির স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এই যুবক একজন W.B.C.S. অফিসার। খুব কম বয়স থেকেই নানা বিচিত্র বিষয়ে পড়াশোনা করবার আর জানবার একটা সহজাত প্রবণতা রয়েছে যুবকের মধ্যে। ওঁর একটা সমস্যা হল, সামান্য ব্যাপারেই অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তা বা টেনশানে ভোগা। মনোচিকিৎসার ভাষায় সে একজন 'অ্যাংশাস পারসোনালিটি'। চলচ্চিত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য, ফোটোগ্রাফি, ইতিহাস ও আরও নানা বিষয়ে প্রচুর বইপত্র এই যুবক পড়েছেন। তত্ত্ব আর তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত ওঁর মগজ। হয়তো তাই মাঝেমধ্যে প্রয়োজনে (যেমন বিদ্বজ্জনের সঙ্গে আলোচনার সময়) জানা তথ্যও তিনি মনে করতে পারেন না। আর তা নিয়ে যুবকের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে যথেষ্ট।

এসব তথ্যের ভিত্তিতে বহুবার দেখা দাঁত পড়ে যাবার এই স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করে যে ব্যাখ্যা খুঁজে পাই, তা ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা থেকে পুরোপুরি আলাদা। স্বপ্নে দাঁত নড়ছে, দাঁত পড়ে যাচ্ছে দেখে অসম্ভব দুশ্চিন্তার মধ্যে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্নদ্রষ্টার। আর ঘুম ভেঙে সব দাঁত আছে অনুভব করে খুব স্বস্তি হচ্ছে ওঁর। এই স্বপ্ন অনেকটা 'পরীক্ষার স্বপ্ন'র মতো। সম্ভবত স্বপ্ন দেখবার আগের দিনের কোনও একটা উদ্বেগ থেকে এরকম স্বপ্নের উৎপত্তি। স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে উদ্বেগের সঙ্গে বুঝতে পারছে তাঁর সব দাঁত নড়ছে, পড়ে যাচ্ছে। দাঁত নড়ে বা পড়ে যায় সাধারণত বুড়ো হলে। আর বার্ধক্যে বেশিরভাগ মানুষ ভোগেন স্মৃতিলোপ সমস্যায়। অনেক জানা তথ্যও মনে রাখতে বা মনে করতে পারেন না বুড়ো মানুষেরা।

আর কিছুই সে মনে রাখতে পারছে না (বা মানসিকভাবে সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে!), এই উদ্বেগ বা ভয়, দাঁত পড়ে যাবার স্বপ্নে এই যুবকের মনে এসেছে বলে আমার মনে হয়। ঘুম ভেঙে উঠে 'সব দাঁতই রয়েছে, যাক বাঁচা গেল'—এই অনুভূতি ওঁর মনকে সান্ত্বনা দেয়। 'তুমি অযথা উদ্বিগ্ন হচ্ছ, তুমি আদৌ বুড়ো হওনি, তোমার সব দাঁতই রয়েছে'। যার অন্য অর্থ, 'তুমি কিছুই ভুলে যাও না, সবই তোমার মনে থাকে'। যুবকের মনকে এভাবে আশ্বস্ত করা এই স্বপ্নের মূল উদ্দেশ্য। মনকে অযথা উদ্বেগের জন্য মৃদু বকুনিও দিতে চেয়েছে বারবার দেখা এই স্বপ্ন। 'তুমি তরতাজা যুবক। বুড়ো মানুষদের মতো শুধুই ভুলে যাবার অযথা উদ্বেগে ভুগছ। এর জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত'।

স্বপ্নদ্রষ্টাকে আশ্বস্ত করা এই স্বপ্নের উদ্দেশ্য। তবে এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে আশ্বস্ত হবার বা উদ্বেগ দূর করবার মতো স্বপ্ন সংক্রান্ত জ্ঞান এই যুবকের ছিল না।

তাই বহুবার তাঁকে দেখতে হয়েছে একই স্বপ্ন। ওঁকে এই স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা আমি জানাই প্রায় এক বছর আগে। এই লেখা প্রেসে যাবার সময় পর্যন্ত এই দীর্ঘসময়ে সে কিন্তু ওই স্বপ্ন আর দেখেনি। এই দেড় বছরে নিয়মিতভাবে তাঁকে প্রশ্ন করে এই তথ্য জেনেছি। 'আশ্বাসের স্বপ্ন'র (Dream of Assurance) বিশ্লেষণ জেনে আশ্বস্ত হয়ে তাঁর মনের অহেতুক উদ্বেগ দূর হয়েছে। তাই এই দীর্ঘসময়ে একবারও যুবকের ঘুমন্ত চেতনায় আর দাঁত পড়ে যাবার স্বপ্ন আসেনি। পাঠক খেয়াল করবেন, এই স্বপ্নের এই বিশ্লেষণ জানার আগে পর্যন্ত যুবক এই স্বপ্ন দেখেছেন বারবার। 'প্রত্যেক মাসে দুএকবার তো অবশ্যই। ব্যাখ্যা জানবার ক-দিন আগেও'।

দ্বিতীয় স্বপ্নের অর্থ এরকম স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা থেকে আলাদা বলে মনে হয় না। অবিবাহিত অবস্থায় দেখা এই এঞ্জিনিয়ারের স্বপ্নে স্বমেহনের ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হয়েছে। বিয়ের পর থেকে স্বপ্নদ্রষ্টা আর এরকম স্বপ্ন দেখেন না। তারাপদবাবু নিজে তাঁর দেখা এই স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

দাঁত খুলে আসার আর একটা মজার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেছি কিছু স্বপ্নের বিশ্লেষণ অধ্যায়ে। স্বপ্নে দাঁত পড়ে যাওয়া অনেক সময় আসে পুরুষত্বহীন (Impotent) হয়ে পড়া বোঝাতে। ঐ মজার স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে পাঠক এ সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাবেন।

স্বপ্নে বিখ্যাত চরিত্র

জীবিত বা মৃত বিখ্যাত চরিত্ররা স্বপ্নের দর্শকের স্বপ্নে চলে আসেন মাঝেমধ্যে। আমার স্বপ্নসন্ধানের প্রায় ছয় শতাংশ মানুষ এরকম স্বপ্ন দেখেছেন এক বা একাধিকবার। মোটামুটি পড়াশোনা করেছেন এমন মানুষই বিখ্যাত চরিত্রদের সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন। কেউ বা বিশেষ কোনও চরিত্র দিয়ে প্রভাবিত হন খুব বেশি। এঁদের স্বপ্নে বিখ্যাত চরিত্ররা ঢুকে পড়তে পারে যখন তখন। পড়াশোনা না জানা মানুষের স্বপ্নে বিখ্যাত চরিত্ররা আসেন না। এঁদের স্বপ্নে কদাচিৎ চলে আসে মহাকাব্যের কোনও চরিত্র, যে চরিত্রের গল্প স্বপ্নদ্রষ্টা শুনেছেন অন্য কারও মুখে। হতদরিদ্র, শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ না পাওয়া মানুষ বিখ্যাত চরিত্রদের কথা জানবে কোথা থেকে। এঁদের স্বপ্নে বিখ্যাত চরিত্রদের বদলে আসেন দেবদেবীরা। দেবদেবীরাই যে এঁদের চূড়ান্ত অনিশ্চিত, অনিরাপদ জীবনের একমাত্র আশ্রয়, সান্ত্বনা।

স্বপ্নে মহাকাব্যের চরিত্র

মহাভারত খুব ভালো করে পড়া সুচিত্রা ভট্টাচার্যর। এই মহাকাব্য সুচিত্রার খুব প্রিয়। মহাভারতের নানা চরিত্র বারবার চলে এসেছে এই লেখিকার স্বপ্নে। একবার দেখা হয়েছিল দ্রৌপদীর সঙ্গে। বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে অর্জুনের সঙ্গে, কথাবার্তা হয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। আর একবার সুচিত্রার স্বপ্নে চলে আসেন কর্ণ। ওঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয় মহাভারতের এই বিখ্যাত চরিত্রর।

মেদিনীপুরের গৃহবধূ সুদীপ্তা পান বেশ কয়েকবার দেখা পেয়েছেন স্বয়ং রামচন্দ্রের। জিজ্ঞাসা করেছেন, সীতাকে অপমানে জর্জরিত হয়ে যে পাতালে প্রবেশ করতে হল, তার জন্য কি তিনি দায়ী নন? উত্তর দেবার সাহস হয় নি অযোধ্যারাজ রামচন্দ্রের। বিষণ্ণ মুখে চেয়ে থেকেছেন সুদীপ্তার দিকে।

ভীষ্মকে একবার শরশয্যায় শুয়ে থাকতে দেখেন হুগলি জেলার ষাট বছরের বৃদ্ধা নিলীমা বল। শুয়ে থাকতে থাকতে ভীষ্মের মুখটা বদলে যায় নিলীমাদেবীর পরিচিত একজন মানুষের মুখে। নিয়মিত মহাভারত পড়া এই ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধার নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ে।

বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ সুকুমার দাশগুপ্ত। বছর দশেক আগে দেখা একটা স্বপ্নের কথা আজও ছবির মতো মনে করতে পারেন। সুন্দর একটা ফুলের বাগান। বাগানে একটা ফুল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দরী এক মহিলা। মনে হল ইনিই রাধা। একটু বাদে রথ চালিয়ে এলেন কৃষ্ণ। হাত ধরে রাধাকে তুলে নিলেন রথে। রথ চলে গেল হাওয়ার বেগে। হঠাৎ কেন এমন একটা স্বপ্ন দেখলেন, আজও বুঝে উঠে পারেন না সুকুমারবাবু।

ডায়মণ্ডহারবারের কাছের এক গ্রামে থাকেন বিপ্লব পাল। বিপ্লববাবু একবার স্বপ্ন দেখেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের। আর লজ্জা, অপমান থেকে দ্রৌপদীকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বপ্নের দর্শক বিপ্লব।

স্বপ্নে বঙ্কিমচন্দ্র

স্বপ্নে সাহিত্যসম্রাটের দেখা পেয়েছেন স্বপ্নসন্ধানের এক স্বপ্নের দর্শক। মহিলার নাম ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়। বেশ কয়েকবার বঙ্কিমচন্দ্র চলে এসেছেন স্বপ্নে। ছোটবেলায় ইন্দ্রাণীর ঠাকুরদাদা ওঁর নাম দিয়েছিলেন কুন্দনন্দিনী। বঙ্কিমবাবু স্বপ্নে এলেই কথাবার্তা হয়েছে বড় হয়ে যাওয়া 'কুন্দনন্দিনী'কে

নিয়ে। এক রাতে দেখা এরকম স্বপ্ন ছিল এরকম:

একদম অবিকল মাথায় পাগড়ি দেওয়া বঙ্কিমবাবু—কথা হল কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে—আমি বললাম, আপনি কুন্দনন্দিনীর ওপর অবিচার করেছেন—আপনি খুব 'অর্থোডক্স।' বঙ্কিমবাবু আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—বললেন, 'আমার সামাজিক পরিস্থিতিতে এছাড়া কোনও উপায় ছিল না।'

স্বপ্নে মাইকেল

অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক মধুসূদন দত্তের জীবন ট্র্যাজেডিতে ভরা। ঢাকুরিয়ার কর্মাশিয়াল ট্যাক্স অফিসার বুড়ি ভট্টাচার্যের স্বপ্নে দেখা দেওয়া মাইকেল নেশার ঘোরে চুর হয়ে মুখ নিচু করে বসে আছেন। বুড়ি যতবার কথা বলতে যাচ্ছেন, মধুসূদন দত্ত ততবারই চোখ তুলে তাকাতে চাইছেন—নেশার ঘোরে পারছেন না!

স্বপ্নে বিদ্যাসাগর

গ্যাসবাতির আলোয় সেকালের কলকাতার রাস্তায় কোনও একটা বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক হচ্ছে বিদ্যাসাগর আর মাইকেলের। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ১৯৭৬ সালে দেখা স্বপ্ন। এই স্বপ্ন দেখবার পর সুনীলের মনে হয়, এই চরিত্রদের জীবন্ত চরিত্র করে সেই সময়টাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয়! এই স্বপ্নটাই ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'সেই সময়' উপন্যাসের মূল প্রেরণা বা অনুঘটক। সুনীল আমাকে বলেন, ঐ সময় ঐ স্বপ্নটা না দেখলে হয়তো সেকালের সময়কে নিয়ে ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস 'সেই সময়' লেখা হত না। বিখ্যাত ঐ উপন্যাসের অনুঘটক এই স্বপ্নকে তাই বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে 'ঐতিহাসিক স্বপ্ন' বলে অবশ্যই চিহ্নিত করা যায়।

স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথ

বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রনাথ একটা প্রতিষ্ঠান। বাংলা ভাষাকে, বাংলা কবিতাকে বিশ্বের দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'রবিঠাকুর'। কবি রবীন্দ্রনাথ, গল্পকার রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, গীতিকার রবীন্দ্রনাথ বাঙালির কাছে প্রথম বাঙালি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। বৈচিত্র্যময় জীবন, বহুমুখী প্রতিভা আর সৃষ্টির বিশালতায় আমাদের প্রায় প্রত্যেকের জীবনে একটা বিরাট জায়গা আমরা ধরে রেখেছি 'বিশ্বকবি'র জন্য। হয়তো এসব কারণে বিখ্যাত চরিত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি স্বপ্ন দেখে সবচাইতে বেশি। স্বপ্নসন্ধানের বাছাই করা দুহাজার দর্শকের মধ্যে চুরাশি জনের স্বপ্নে একবার বা তারও বেশি এসে হাজির হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এর মধ্যে কিছু স্বপ্নের কথা বলি—

স্বপ্ন ১: ছেলেবেলায় একরাতে স্বপ্ন দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে—আলখাল্লা পরা সাদা দাড়িতে মুখ ঢাকা রবীন্দ্রনাথ—আমার সামনে একটা টুলে বসে তাঁরই 'ছবি' কবিতা আবৃত্তি করে আমাকে শোনাচ্ছেন।

—সুভাষ দেব, ওষুধসংস্থার প্রতিনিধি, হিন্দমোটর।

স্বপ্ন ২: একদিন দেখলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত শেখাচ্ছেন।

—সরলা দাশ, ছাত্রী, জলপাইগুড়ি।

স্বপ্ন ৩: মেয়েটা পড়ছিল না বলে সন্ধেবেলা মেরেছিলাম— রাতে স্বপ্নে দেখি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের খাটের পাশে—আমাকে বলছেন, ওভাবে মারলে কেন? এবার থেকে আমিই ওকে পড়াব—কই দেখি 'সহজপাঠ' বইটা দাও দেখি।

—প্রণতি মুখার্জি, গৃহবধূ, বাঁকুড়া।

স্বপ্ন ৪: দেখলাম গ্রামের রাস্তা দিয়ে একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে—গাড়ি চালাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ—হাতে একটা সরু লাঠি।

—প্রদীপ্ত পালচৌধুরী, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র, বালুরঘাট।

স্বপ্ন ৫: জোব্বা পরা রবীন্দ্রনাথ এসে বললেন, আর পড়তে হবে না, এবার শুয়ে পড়—কাল পরীক্ষায় যা মনে আসে লিখবি—এবার তো আমিই খাতা দেখব।

—রুচিরা রায়চৌধুরী, স্নাতকোত্তর ছাত্রী, কলকাতা।

স্বপ্ন ৬: বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথকে বেশ কয়েকবার স্বপ্ন দেখেছি—অনেক কথাবার্তা হয়েছিল—এখন বিস্তারিত মনে পড়ে না।

—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন ৭: দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলছি—একটা সিঁড়ির মুখে লাল মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে—এই রবীন্দ্রনাথের মুখ একেবারে অন্যরকম, ছবিতে কখনও দেখিনি—বিশাল লম্বা আলখাল্লা পরা—কথাবার্তার প্রথমদিকটা ভালো মনে নেই—শেষে আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা আপনি কত লম্বা?' উনি বললেন 'সাত ফুট!' আমি বললাম, 'তবে তো আপনি সত্যজিৎ রায়ের চেয়েও বেশি লম্বা।'

—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সরকারি আধিকারিক।

ত্রিশ বছরের এই যুবক প্রচণ্ডভাবে সত্যজিৎ প্রভাবিত। সত্যজিৎকে নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বিস্তর। স্বপ্ন দেখার আগে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন। সত্যজিতের বহুমুখী প্রতিভায় আপ্লুত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে হয়তো দুজনের একটা তুলনা করছিলেন মনে মনে। আর এই চিন্তা একটু অন্যভাবে স্বপ্নে চলে এসেছে। শরীরের দৈর্ঘ্য, বহুমুখী প্রতিভার ব্যাপ্তির রূপক হয়ে গেছে যুবকের এই স্বপ্নে।

স্বপ্ন ৮: স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি দুতিনবার। একটা ভালো মনে আছে।—ছবিতে যেরকম, ঠিক সেই টিপিকাল জোব্বাটা পরে আমাদের এই ঘরে উনি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর যেন আমার চোখে পড়েছে—আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন—কি খুব যে!—খুব যে তুমি আমার বিরোধিতা কর, তবে গুনগুন করে আমার গান গাও কেন!—গুনগুন করে রবীন্দ্রসংগীত গাই তো, তাই হয়তো বললেন—অনেকসময় বলি তো, এখন আর রবীন্দ্রনাথ পড়ি না—তাই নিয়ে ঠাট্টা করলেন—তাহলে আমাকে নিয়ে এত পড়াশোনা কর কেন!—*প্রথম আলো* লিখছ কেন! সব বারই স্বপ্নে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার কলকাতার বাড়িতে—শান্তিনিকেতনের বাড়িতে নয়।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বপ্ন ৯: রবীন্দ্রনাথকে রাতের স্বপ্নে নয় দিবাস্বপ্নে দেখেছি, অনুভব করেছি শতসহস্রবার—আমার চেতনায়, কল্পনার জগতে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা আর আদর্শ কাজ করে সবসময়—সবসময়ই মনে হয় উনি আছেন—আমার চেতনায়, কল্পনায়, মননে, স্বপ্নে।

—যোগেন চৌধুরী, চিত্রকর।

স্বপ্ন ১০: একটা রবীন্দ্রনাথের নাটক বা নৃত্যনাট্য হচ্ছে—আমিও পৌঁছে গেছি সেখানে। শান্তিনিকেতনী স্টাইলে টিপিক্যাল পোশাক পরে নাচ হচ্ছে। স্টেজের এককোনায় সেই বিখ্যাত জোব্বাটা পড়ে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ।

—দীপক রুদ্র, সংগীতশিল্পী।

স্বপ্ন ১১: আমি যেন কোনও ঢালু পাড়ের ওপর বসে আছি, সামনে এক সরু জলস্রোতে একটা নৌকা ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে, অথচ যাচ্ছেও না, অনেকক্ষণ ধরে যেন দাঁড়িয়েই আছে এক জায়গায়। নৌকায় বসে আছেন, কি আশ্চর্য, মুখোমুখি রবীন্দ্রনাথ আর রথীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথের প্রোফাইল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সম্পূর্ণ দেখছি রবীন্দ্রনাথের মুখ। কিন্তু এ কেমন রবীন্দ্রনাথের মুখ? তখন মনে হল, হ্যাঁ মহর্ষির শ্রাদ্ধের পর শ্মশ্রুমুক্ত যে ছবিটি, তার সঙ্গে যেন এর কিছু মিল আছে। সম্পূর্ণ মিল আছে চশমাটায়। আমি খুব মন দিয়ে দেখে ভাবছি, এ তাহলে কোন বয়সের রবীন্দ্রনাথ? হিসেব করে ভাবলাম ১৯০৭ সাল। ১৯০৭-এর রবীন্দ্রনাথ আর রথীন্দ্রনাথ এরকম প্রায় সমান সমান কেন?—এই রবীন্দ্রনাথের রংকে কি তত গৌরবর্ণ বলা যায়? ওঁর মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছি আমি, ভাবছি কি ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেলাম এতদিনে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে এঁকে দেখে কেন মীনাক্ষীর 'রাজা' বলে মনে হয়েছিল? কই, সেই রাজকীয়তা তো দেখতে পাচ্ছি না। কেন পাচ্ছি না?

—শঙ্খ ঘোষ।

স্বপ্নে বিভূতিভূষণ

একটা অচেনা জায়গা—বড় মাঠ—পোড়ো জঙ্গল—কলকাতা ছাড়িয়ে ঘাটশিলার কাছাকাছি বিহার সীমান্তের কাছে কোনও একটা জায়গা যেন—হাঁটতে হাঁটতে দিগন্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি—একটা পাহাড়ের সিল্যুট—কে যেন বললেন, বিভূতিভূষণ এখানে হাঁটতে আসেন সন্ধ্যের দিকে—ওঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা—কথা হচ্ছে—বললাম, এই পাহাড় আর দিগন্তের একটা স্কেচ এঁকে দিন—উনি আঁকলেন—অপূর্ব, আমার খুব ভালো লাগছে!

—অনিতা অগ্নিহোত্রী।

স্বপ্নে রামমোহন

উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়কে স্বপ্নে দেখেন কয়েকজন স্বপ্নদ্রষ্টা। সানন্দার এক সহ সম্পাদকের স্বপ্নে একবার চলে আসেন রামমোহন। রামমোহন খুব উৎসাহ দিলেন স্বপ্নদ্রষ্টাকে। বললেন, 'দেখ, আমাকে কত লড়াই করতে হয়েছে সারাজীবন—তোমাকেও লড়তে হবে।'

স্বপ্নে নাট্যকার গিরিশ ঘোষ

বাংলা রেঁনেসাঁর সময়কার ইতিহাস আর বিখ্যাত চরিত্ররা ভীষণভাবে টানে সাংবাদিক শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। খুব পুরনো গৌরবময় থিয়েটারগুলো, মিনার্ভা বা স্টার, তাদের অতীতের আলো ঝলমলে গৌরব নিয়ে বারবার চলে আসে শিবাশিসের স্বপ্নে। এই সাংবাদিকের 'প্যাশন' হল থিয়েটার। অতীত বাংলা থিয়েটারের প্রবাদপুরুষ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বারবার নানাভাবে চলে এসেছেন এই সাংবাদিকের স্বপ্নে। একটা সময় পড়ছিলেন 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' বইটা। প্রচণ্ডভাবে গিরিশপ্রভাবিত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে শিবাশিস গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে অদ্ভুত এই স্বপ্ন দেখেন একরাতে:

উত্তর কলকাতার এক গঙ্গার ঘাট। ঘাটের সিঁড়িতে উবু হয়ে বসে বাংলা মদের লম্বা বোতলে গঙ্গাজল ভরে নিচ্ছেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র।

স্বপ্নে সত্যজিৎ রায়

রবীন্দ্রানাথের পর যে বাঙালি প্রতিভাকে বাঙালি বেশি স্বপ্ন দেখে তিনি হলেন সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলোতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমার নজরে এসেছে। বেশ কিছু স্বপ্নদ্রষ্টার সত্যজিৎকে নিয়ে দেখা স্বপ্নে সত্যজিৎ একা নন, পাশাপাশি হাজির রবীন্দ্রনাথও। এর একটা সম্ভাব্য

কাবণ এরকম হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পর একজন বহুমুখী প্রতিভার খোঁজ বাঙালি পেয়েছে সত্যজিৎ বায়ের মধ্যে। তাই স্বপ্নের সত্যজিৎ মাঝে মাঝে হাজির হন রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দেখা স্বপ্নে সত্যজিৎ প্রসঙ্গ রয়েছে ১১৯ পাতায়। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে দেখা স্বপ্নের বাছাই করা কয়েকটার কথা বলি:

স্বপ্ন ১: আমাদেব বাড়িতে এসেছেন সত্যজিৎ রায়—আমাদের দুজনের মধ্যে গভীর আলোচনা হচ্ছে ওঁর 'চারুলতা' সিনেমার নানা দৃশ্য নিয়ে।

—অঞ্জন রায়, ছাত্র, দুর্গাপুর।

সত্যজিতের ছবি দেখা অঞ্জনের নেশা। কদিন আগে টিভিতে 'চারুলতা' দেখেছেন।

স্বপ্ন ২: আমি সাইকেল চালিয়ে স্কুল যাচ্ছি—আর আমার পাশ দিয়ে জোরে জোরে হেঁটে যাচ্ছেন সামনে ববীন্দ্রনাথ, পিছনে সত্যজিৎ রায়।

—সৃষ্টি অগ্নিহোত্রী, ৭ বছর, আলিপুর, কলকাতা।

সৃষ্টি ববীন্দ্রনাথ আর সত্যজিৎ দুজনকেই 'খুব ভালোবাসে'—এই স্বপ্ন দেখার আগের দিন বাড়িতে এসেছিলেন মায়ের এক বন্ধু—বাড়িতে সেইসময় সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে তুমুল আলোচনা হত—সেই দিন মা বন্ধুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আর সত্যজিৎকে নিয়ে।

স্বপ্ন ৩: ঠিকমতো অভিনয় করতে পারেননি বলে সত্যজিৎ রায় খুব বকছেন লালমোহনবাবু (সন্তোষ দত্ত)কে, আব লালমোহনবাবু কাঁদছেন।

—সৌগত মুখার্জী, শ্যামবাজার, কলকাতা।

ফেলুদাকে নিয়ে করা সিনেমাতে সন্তোষ দত্তর ফেলুদার কাছে 'অদ্ভুত, অর্থহীন প্রশ্ন করে বকা খাওয়া'—এই ব্যাপাবটায় সৌগত খুব মজা পায়। বারবার দেখতে ইচ্ছে করে ছায়াছবিব ঐ অংশগুলো।

স্বপ্ন ৪: দেখলাম সত্যজিতের উলটোদিকে বসে আছি—কথা হচ্ছে সিনেমা আর স্টিল ফোটোগ্রাফি নিয়ে—একটু বাদে কথা শুরু হল ওঁর সিনেমার 'ট্রিটমেন্ট' নিয়ে—আমি ওঁকে বললাম, 'মণিহারা'-এর ভৌতিক দৃশ্যটার 'ট্রিটমেন্ট' আমার ভালো লাগে নি—উনি শুনে গম্ভীর হলেন—আমি বললাম, আপনি যদি কালো সুতো দিয়ে আস্তে আস্তে হাতদুটোকে ওপরে তুলে নিতেন, তবে তা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হত—কালো সুতো তো দেখা যায় না।

—ডা. অশোকবিজয় সেনগুপ্ত, বাঙ্গুর অ্যাভেনিউ, কলকাতা।

পেশায় চিকিৎসক, ডা. সেনগুপ্তর প্রিয় নেশা ফোটোগ্রাফি আর ফিলম সংক্রান্ত পড়াশোনা। ইনি একজন দক্ষ ফোটোগ্রাফার। সত্যজিতের 'মণিহারা' ছবির ভৌতিক দৃশ্য নিয়ে ওঁর মনে বেশ ক্ষোভ ছিল। যা স্বপ্নে চলে এসেছে।

স্বপ্ন ৫: সত্যজিৎ পাজামা পরে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন—আমি উলটোদিকে একটা টুলে বসে আছি—ওঁর হাতের বোর্ডের ওপর একটা কাগজে ছবি আঁকছেন—কাগজটার দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার মুখ।

—গৌতম মিত্র, এঞ্জিনিয়ার, বোকারো।

স্বপ্ন ৬: '৬৯ বা '৭০ সাল হবে। একরাতে স্বপ্ন দেখলাম, একটা মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—বিভিন্ন স্টলে বইপত্র সাজানো আছে—দেখলাম একজন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ স্টল থেকে স্টলে ঘুরছেন—একজন আমাকে বললেন, ইনিই সত্যজিৎ রায়—আমি উচ্ছ্বসিত—অটোগ্রাফ নেবার জন্য একটা খাতা বাড়িয়ে দিলাম—উনি লিখলেন, মাইকেলের কবিতা, 'রেখো মা দাসেরে মনে'— চারপাঁচটা লাইন—লেখার টাইপটা আজও আমার চোখের সামনে ভাসে।

—শ্যামলকান্তি দাশ, সহ সম্পাদক, আনন্দমেলা।

স্বপ্ন ৭: 'ঘরে বাইরে' নিয়ে খুব তর্ক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ আর সত্যজিতের মধ্যে—সত্যজিৎ বলছেন, এছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না আমার—রবীন্দ্রনাথ খুব রেগে আছেন—বলছেন, তোমার উচিত ছিল আমার সঙ্গে কথা বলে নেওয়া।

—সুরভি দাশগুপ্তা, ছাত্রী, যাদবপুর।

'ঘরে বাইরে' দেখে সুরভির মনে হয়েছিল সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের ওপর অবিচার করেছেন। ছবিটা ভালো লাগে নি ওঁর।

স্বপ্নে একালের নাট্যকার শম্ভু মিত্র

স্বপ্ন ১: রাজা অয়দিপাউসের পোশাক পরা অবস্থায় অভিনয় করছেন শম্ভু মিত্র—আমি একজন দর্শক, দেখছি।

—সম্রাট সেনগুপ্ত, কলকাতা।

স্বপ্ন ২: স্বপ্নে এক রাতে শম্ভু মিত্র এলেন—উনি 'রাজা অয়দিপাউস' নাটকের সেই বিখ্যাত পোশাক পরে বসে আছেন—আমি ছাড়াও অন্য কয়েকজন রয়েছেন—উনি একের পর এক নানা বিষয়ে বলে যাচ্ছেন—আমার মনে হচ্ছে আরে উনি তো কবিতার গভীর কথাগুলোই বলছেন।

বাস্তবে আমার মনে হয় সৃষ্টির আর জ্ঞানের যে স্তরে উনি পৌঁছে গিয়েছিলেন সেখানে উনি এক মহান কবি। ওঁর নাটকের সব সংলাপ, ওঁর ভাবনাচিন্তা, সবই তো কবিতার কথা।

—জয় গোস্বামী।

স্বপ্নে উৎপল দত্ত

স্বপ্ন ১: উৎপল দত্তর সঙ্গে কথোপকথন হচ্ছে পুরোপুরি ইংরেজিতে—উৎপলবাবু ভিক্টোরিয়ান ইংরেজিতে পণ্ডিত মানুষ—অথচ আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় ইংরেজিতে প্রচুর ভুল করছেন—আমি একসময় বিরক্ত হয়ে গেলাম, বললাম, 'ঠিক করে ইংরেজিটা বলুন'।

—আশিস ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ার, এম. এন. দস্তুর অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা।

স্বপ্ন ২: চেক লুঙ্গি আর হাতকাটা ফতুয়া পরে উৎপল দত্ত খৈনি ডলছেন হাতের তালুতে—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খৈনি খাবে?'

—শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপ্নে একালের কবি, গদ্যকার

স্বপ্নে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী ও বিমল করের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথাবার্তাও হয়েছে লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যর।

স্বপ্নে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ অনুরাগী পাঠিকা বর্ধমানের গৃহবধূ তৃষ্ণা রায়ের। আর সাংবাদিক শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

স্বপ্নে সাগরময় ঘোষ

বেশ কয়েকবার স্বপ্নে দেখা হয়েছে ওঁর সঙ্গে। ওঁর ঘরে ডেকে আমাকে লেখার ব্যাপারে কিছু বলছেন বা বোঝাচ্ছেন, এরকম।

—জয় গোস্বামী

স্বপ্নে শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ‘পদ্য’র জগতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় মানেই ঝড়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় মানেই আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া এক জোরালো সাইক্লোন। ‘হেমন্তের অরণ্যে’র এই ‘পোস্টম্যান’ নিজের শেকলভাঙা জীবনের মতোই ভালোবেসে কাছে টেনে নেন মৃত্যুকে। অনেককে একা করে একদিন হঠাৎ করে চলে গেলেন বেপরোয়া কবি শক্তি। আমার সংগ্রহে থাকা শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে দেখা স্বপ্নের একটা উল্লেখ করি। স্বপ্নদ্রষ্টা শক্তির উদ্দাম, বেহিসেবি জীবনের একসময়ের সদাসঙ্গী, আজীবনেব প্রিয়তম বন্ধু।

‘মারা যাবার পর শক্তিকে বেশ কয়েকবার দেখেছি—শক্তির সঙ্গে ট্রেনে করে কোথাও একটা বেড়াতে গেছি—একদিন দেখলাম, দুজন খুব গল্প করছি, হঠাৎ শক্তি ভরাট গলায় একটা রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে উঠল। একটা স্বপ্ন খুব মনে পড়ে—শক্তি আমার বাড়িতে এসেছে—বসে গল্প করছে আর বারবার বলছে, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, আমাকে চলে যেতে হবে—আমি বললাম, এত তাড়া কিসের?—ও বলল, না গো আমাকে চলে যেতে হবে—একই কথা বারবার বলছে—আমার কেমন অদ্ভুত লাগল—গায়ে হাত দিলাম ওর—না এ তো মৃত নয়, জীবন্ত শক্তি—এই স্বপ্নটার কথা মনে হলেই বড় মন খারাপ হয়ে যায়—কেন বারবার বলছিল, ওকে চলে যেতে হবে!’

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বপ্নে শঙ্খ ঘোষ

একবার কবি শঙ্খ ঘোষকে স্বপ্ন দেখেছিলাম—একটা নীল মশারি খাটানো, পাশে একটা খাটে উনি বসে আছেন—হাতে একটা সেতার—আমি বলছি, ‘বা! আপনি তো দারুণ বাজালেন! এত ভালো সেতাব বাজান জানতাম না তো’—উনি হাসছেন।

—জয় গোস্বামী

স্বপ্নে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে স্বপ্ন দেখেন স্বপ্নসন্ধানের বেশ কিছু মানুষ। কেন সুনীল এত লেখক, কবি বা সাহিত্যরসিকের স্বপ্নে আসেন? হয়তো সাহিত্যের তরুণ প্রজন্মের কাছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দরজা কখনও বন্ধ হয় না বলে। তাঁর উদার প্রসন্নতা আজকের কবি বা গদ্যকারদের স্পর্শ করে বলে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তরুণ সাহিত্যসেবীদের বিরামহীন উৎসাহ দেন সুনীল, ফেরান না কাউকে। ‘অনুশীলন করতে করতে’ যিনি রাগতে ভুলে গেছেন, তিনি তো আজকের কম বয়েসী কবি বা গদ্যকারদের ‘কাছের মানুষ’ হবেনই। এ সব কারণে হয়তো সুনীল এত বেশি মানুষের স্বপ্নে চলে আসেন।

স্বপ্ন ১: বাইরে থাকবার সময় বহুবার দেখেছি ওঁকে—একদিন দেখলাম কোরাপুটের একটা পাহাড়—ওপর থেকে উপত্যকা দেখা যাচ্ছে—নীচে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী—সন্ধ্যে নেমে আসছে—ঝিকমিক করছে আকাশ—সুনীলদা কোথাও একটা আছেন পাহাড়ে—আমি অন্য পথ ধরে উঠছি—দূর থেকে আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন—ইংল্যান্ডে থাকবার সময় একবার সুনীলদাকে দেখি—উঁচু পাহাড়, বেগুনি আকাশ—ওঁর সঙ্গে দেখা—আমাকে দেখে হাসলেন।

বাইরে থাকবার সময় আমার লেখালিখিতে সুনীলদার পরোক্ষ হলেও বিরাট ভূমিকা ছিল—অবিরাম প্রেরণা পেয়েছি—ওঁর প্রসন্নতা আমাকে স্পর্শ করে—মনে হয় সৃষ্টির চূড়ান্ত রূপটাকে উনি দেখে ফেলেছেন।

—অনিতা অগ্নিহোত্রী।

স্বপ্ন ২: সুনীলদাকে দেখেছি তিনবার—তিনবারই সমস্যাসঙ্কুল সময়ে—যেন প্রশ্নের উত্তর চাইছি—বলছি, আমি কি ভুল করছি?—অনেকক্ষণ কথা হয়েছে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে—আর প্রত্যেকবারই সমস্যার সমাধান হয়েছে স্বপ্নে—পরদিন সকালে উঠে সিদ্ধান্ত নিয়ে আর কোনও দ্বিধা থাকে নি।

—জয় গোস্বামী।

জয়ের দেখা এই স্বপ্নগুলো এক ধরনের মুশকিল আসানের স্বপ্ন।

স্বপ্ন ৩: একরাতে দেখলাম, আমাদের বাড়িতে গেঞ্জি পরে, আসনে বসে সুনীলদা ভাত খাচ্ছেন কথা বলতে বলতে। একবার দেখেছিলাম, সুনীলদা গড়িয়াহাটের মোড়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন—তাঁকে ঘিরে প্রচুর বাচ্চা। বাচ্চাগুলো তাঁর পকেট থেকে টাকা বার করে ওড়াচ্ছে—এমন সময় একজন সার্জেন্ট এসে কাঁচি দিয়ে কেটে দিলেন সুনীলদার ঘুড়ির সুতো। আর বাচ্চাগুলোকে তুলে নিলেন কালো রঙের পুলিশ ভ্যানে।

—প্রমোদ বসু, কবি-সাংবাদিক।

স্বপ্ন ৪: হয়তো দেখলাম একটা কবি সম্মেলন—কি কোনও কবিতা পাঠের আসর—সুনীলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—এরকম জয়কেও দেখেছি—সুনীলের সঙ্গে কথাবার্তা হল কবিতা নিয়ে—ওর কবিতা শুনলাম—আমারটাও ও শুনল—এরকম আর কি—আসলে সুনীল বা জয় আমার বড় প্রিয়—আমাকে খুব ভালোবাসে—তাই হয়তো দেখি।

—অরুণ মিত্র।

স্বপ্ন ৫: একদিন দেখলাম, একটা সাহিত্যসভায় সুনীলদা আমাকে কিছু বললেন আমার লেখা নিয়ে—এই জায়গাটা ভালো হয়নি—এটা এরকম হলে ভালো হত—আরও নানা কথা।

—সুচিত্রা ভট্টাচার্য।

স্বপ্ন ৬: একটা বিরাট খোলা ছাদ—ছোটবড় অনেক টব—কোনওটায় ছোট ফুল, কোনওটায় লঙ্কা বা হলুদ ফুল হয়ে থাকা সর্ষে গাছ—পড়ন্ত বিকেল—এক ভদ্রলোক, পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা, বসে আছেন খালিগায়ে, দুধসাদা লোম, জুলফিতে সাদা ছোপ—ভদ্রলোক খুব চেনা, অথচ চিনতে পারছি না—সঙ্গে যে ছিল সে বলল, ইনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—আমি প্রণাম করলাম—পত্রিকার জন্য কবিতা চাইলাম—উনি সাদরে বসালেন—লেখার জন্য কলম তুললেন। স্বপ্ন শেষ।

—শ্যামলকান্তি দাস

কবির স্বপ্নে কবি

কবি শঙ্খ ঘোষকে নিয়ে কবি জয় গোস্বামীর স্বপ্ন আগে বলেছি। এছাড়াও বেশ কয়েকজন কবির স্বপ্নে চলে আসেন তাঁর প্রিয় কবি।

(১) কবি অরুণ মিত্রর স্বপ্নে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে অনুজ কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর কবি জয় গোস্বামীর সঙ্গে।

(২) একরাতে কবি শঙ্খ ঘোষের স্বপ্নে অদ্ভুতভাবে চলে আসেন কবি জয় গোস্বামী।

স্বপ্ন—আবছামতো ঘরে দূরে দূরে কয়েকজন বসে আছে মনে হয়, খাটের ওপর আমি অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়ছি আর বলছি, হবে না, হবে না। সামনে সাদা একটা কাগজ, তার ওপর কয়েকটি কবিতার লাইন। তিন লাইন তিন লাইন করে সাজানো যেন বারো লাইনের কবিতা। সব কটা লেখা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট, কোনও কাটাকুটি নেই, কিন্তু শেষ লাইনের জায়গাটা ফাঁকা। ওটা ভরাট করতে হবে। কিন্তু আমি বলছি, হবে না, হবে না। পারব না। এমন সময়ে দেখি একেবারে সামনেই বসে আছে জয়, জয় গোস্বামী। সে বলল, 'হবে। ধরুন না কলমটা। এই তো দেখুন—' বলে সে কলম তুলে নিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে কী ভাবে শেষ করতে হবে লেখাটা।

স্বপ্নে বিদেশী চরিত্র

স্বপ্নে পাবলো পিকাসো

বছর পাঁচেক আগে সৌম্য চৌধুরী একরাতে স্বপ্নে বহুক্ষণ ধরে দেখেন পাবলো পিকাসোকে, যে পিকাসোকে ছবিতে দেখা যায়, মুখটা অবিকৃত সেইরকম।

সৌম্য চিত্রকর যোগেন চৌধুরীর একমাত্র ছেলে। বয়েস কুড়ি। ছবি আঁকেন। পিকাসো সৌম্যর প্রিয় চিত্রকর। অনেক বই পড়েছেন পিকাসোর, ছবিও দেখেছেন অনেক। সৌম্যর এই স্বপ্ন সরল ইচ্ছাপূরণের।

স্বপ্নে শেকসপিয়ার

ছাত্রজীবনে বহুবার এই স্বপ্নটা দেখেছি—আমি একটা বাড়িতে রয়েছি, পাশের বাড়ির জানালা দিয়ে দেখছি শেকসপিয়ারকে—কোনও দিন দেখেছি পায়চারি করছেন—কোনওদিন চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা খাতার ওপর একটানা লিখছেন।

—অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

স্বপ্নে অ্যালেন গিনস্‌বার্গ

আমেবিকান কবি অ্যালেন গিনস্‌বার্গ—একটা সময় অ্যালেনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল—এক সময় ওঁর সঙ্গে অনেক শ্মশানে আর মন্দিরে গেছি।

অ্যালেনকে স্বপ্নে দেখেছি বেশ কয়েকবার—বাস্তবের জায়গাগুলোতে নয়—একটা জায়গা বেশ মনে পড়ে, স্বপ্নে আমি আর অ্যালেন একটা বিশাল ব্রিজ ধরে হাঁটছি—অনেকটা হাওড়া ব্রিজের মতো—এই ব্রিজটা স্বপ্নে বেশ কয়েকবার দেখেছি।

--সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

স্বপ্নে মাও-সে-তুং (৪২ পাতায়), স্বপ্নে সালভাদর দালি (৩৮ পাতায়)—আগে উল্লেখ করেছি।

স্বপ্নে আধ্যাত্মিক চরিত্র

ভারত সাধুসন্ন্যাসীর দেশ। এদেশের বেশিরভাগ মানুষের চেতনে-অবচেতনে প্রচলিত অর্থে ধর্মবোধ গেঁথে আছে গভীরভাবে। সাধু, সন্ন্যাসী আর ধর্মপুরুষদের প্রতি তীব্র বিশ্বাস রয়েছে বহু মানুষের মনে। এই সব চরিত্র তাই মাঝেমধ্যে চলে আসে কিছু মানুষের স্বপ্নের দেশে।

স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেন স্বপ্নসন্ধানের অনেক মানুষ। গুরুতর সমস্যায় পড়লে অনেকে ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখতে পান সমস্যার সমাধান করে দিতে। এগুলো সমাধানের স্বপ্ন। যাঁরা গভীরভাবে আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী বা এনিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন আধ্যাত্মিকতার ওপরের স্তরে পৌঁছনোর নানা প্রতীকী ছবির সূত্র ধরে। আবার এমন মানুষও আছেন যাঁরা চেতনায় ঘোর অবিশ্বাসী হলেও অবচেতন মনে শ্রীরামকৃষ্ণ বা অন্য আধ্যাত্মিক চরিত্রকে শ্রদ্ধা করেন। আধ্যাত্মিক চরিত্রদের নিয়ে দেখা এঁদের স্বপ্নের জন্ম চেতন-অবচেতনের এই দ্বন্দ্ব থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে দেখা স্বপ্নের কয়েকটার কথা বলি। এর মধ্যে কিছু স্বপ্নে ঢুকে পড়েছেন অন্য আধ্যাত্মিক চরিত্র।

স্বপ্ন ১: একটা মেলা, একটা চৌকির ওপর রামকৃষ্ণদেব বসে আছেন, পাশে বিবেকানন্দ—ঠাকুরের পরনের ধুতি গায়ে জড়ানো। বিবেকানন্দ ছবির মতোই গেরুয়া ধুতি, ফতুয়া পরা, মাথায় গেরুয়া টুপি—লাইন দিয়ে দাঁড়ানো মানুষের কপালে চন্দনের টিপ পরিয়ে দিচ্ছেন—বিরাট লাইনের একদম প্রথমে আমি—আমার কপালে টিপ পরিয়ে দিলেন।

কুর্চি মুখোপাধ্যায়, ছাত্রী, ১০ বছর।

ছোটবেলা থেকে মা-বাবার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনে যাতায়াত করে কুর্চি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর জন্য বাচ্চাদের ওপর লেখা বই পড়েছে। দুজনই ওর খুব প্রিয় চরিত্র।

স্বপ্ন ২: 'ঠাকুর' আমাদের খাটের ওপর বসে পা দোলাচ্ছেন, একটু বাদে দেখি হাতে একথালা সন্দেশ—আমাকে ডাকলেন—আমার মুখে একটা সন্দেশ গুঁজে দিলেন—খুব আনন্দ হচ্ছিল।

কণা মিত্র, গৃহবধূ, নৈহাটি।

৩৮ বছরের কণাদেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণর জীবনকাহিনী ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। দক্ষিণেশ্বর যান প্রায়ই। কালীপ্রতিমাকে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্দেশ খাওয়াবার বিখ্যাত কাহিনী হয়তো এই স্বপ্নের উৎস।

স্বপ্ন ৩: একটা মন্দির—মিশনেরই কোনও আশ্রম, তবে অচেনা—সামনে রামকৃষ্ণদেবের কালো একটা মূর্তি, আমি প্রণাম করে উঠে বসলাম—হঠাৎ ঠাকুরের মূর্তিটা ওপরে উঠতে শুরু করল—আমিও উঠছি পেছন পেছন, আকাশে অনেক ওপরে উঠে গেছি—প্রথমদিকে তাপ আমাদের এখানকার মতোই—তারপর আস্তে আস্তে তাপ বাড়তে শুরু করল, আলোও। একটা স্তরে প্রচণ্ড আলো, সূর্যের আলোব চাইতেও বেশি, চোখ খোলা রাখা যাচ্ছে না—এদিকে তাপও বাড়ছে—একটা সময় আর তাপ সহ্য করতে পারলাম না—রামকৃষ্ণদেবের মূর্তিটা কিন্তু প্রচণ্ড তাপ সহ্য করেও ওপরে উঠে যাচ্ছে—উনি ওপর থেকে আমাকে হাসতে হাসতে বললেন, 'কি রে পারলি না তো।'—একবার দেখা এই স্বপ্নটা বারবার দেখতে ইচ্ছে করে।

—শক্তি ঘোষ, সাংবাদিক।

শক্তিবাবু ছোটবেলা থেকেই রামকৃষ্ণের ভক্ত। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত। এই স্বপ্ন তাঁর বারবার দেখতে ইচ্ছে করে। কারণ প্রিয় আধ্যাত্মিক চরিত্রর সঙ্গে উনিও উঠে গেছেন অনেক ওপরে। প্রতীকী অর্থে, এটা হল আধ্যাত্মিকতায় তীব্র বিশ্বাসী একজন মানুষের 'উত্তরণ'। একটা স্তরে গিয়ে তিনি আর উঠতে পারলেন না। সেটাই স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো আরও ওপরে ওঠা সাধারণ একজন ভক্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এরকম ভাবনা ভক্তর চিন্তায় আসা খুব স্বাভাবিক।

স্বপ্ন ৪: রামকৃষ্ণদেবের বিরাট মুখ—আমার দিকে তাকালেন—কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছিল—এগোব কি পিছিয়ে যাব বুঝতে পারছি না।

অদিতি কুমার বসু, শিক্ষক, হাওড়া।

স্বপ্ন ৫: শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেকদিন আগে একবার স্বপ্নে পেয়েছিলাম।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

ধর্মপ্রাণ এই সাহিত্যিক 'জীবন কেন? কেনই বা এই বেঁচে থাকা?'—এই জটিল প্রশ্নের মৌলিক উত্তর খুঁজে পেতে আশ্রয় করেছেন আধ্যাত্মিকতাকে। তাঁর জীবনের অনেকটা জুড়ে আছে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব। স্বপ্নে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ নন, শীর্ষেন্দু বহুবার দেখা পেয়েছেন তাঁর গুরু অনুকূলচন্দ্রের। বেশ কয়েকবার স্বপ্নে অনেক কথাও হয়েছে দুজনের মধ্যে।

স্বপ্ন ৬: শিবের মাথায় জল ঢালতে গেছি—আসলে ওটা শিবলিঙ্গ নয়—আমার মন বলছে উনি শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার শ্রীরামকৃষ্ণও তিনি নন—তাঁর মাথায় জল কি দুধ ঢালছি—একটা বাক্সে সবাই চিরকুট ফেলছে, 'প্রার্থনা'—আমাকেও বলছে ফেলতে, আমি ফেলছি না—উনি আমার দিকে তাকালেন—যেন বলছেন, কি হল তুমি ফেললে না?—আমি একটা কাগজে 'প্রার্থনা' লিখে বাক্সে ফেললাম।

—বাণী বসু।

কম বয়সে বাড়িতে গুরুর দাপটে খুব কষ্ট পেয়েছেন। তাই গুরু, সন্ন্যাসী, পুজোপাঠ—এগুলো শুনলেই খুব চটে যান বাণী দেবী। ওঁর কথায়, 'শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ এঁরা নিশ্চয়ই ভেতরে আছেন। এই সব চরিত্র চেতনায় না থাকলেও অবচেতনে আছেন তীব্রভাবে।' এরকম স্বপ্নের জন্ম অবচেতনের তীব্র আধ্যাত্মিক তাড়না থেকে।

স্বপ্নে বিবেকানন্দ

স্বপ্ন ১: বাঁশের কঞ্চির বেড়া দেওয়া গ্রাম্য পরিবেশে খড়ের চালার পাশাপাশি দুটি বাড়ি। একটা বেড়ার সীমানা। মনে হল পাশের বাড়ি থেকে কে যেন ডাকছে—স্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠে দেখি, ভোরের রোদ পাশের বাড়ির গায়ে পড়েছে, আর সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন বিবেকানন্দ। যে চেহারায় আমরা তাঁকে চিনি—উনি খুব কাতর কণ্ঠে বলছেন, 'আমাকে এই ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দাও—আমি এই বন্দীজীবনের জন্য জন্মাইনি।'

—তরুণ রায়, অধ্যাপক, চন্দননগর।

তরুণ যেখানে থাকেন সেই চন্দননগরে গঙ্গার ধারে স্ট্র্যান্ডের মাঝে হঠাৎ করে একদিন একটা খাঁচার ঘর তৈরি করে বিবেকানন্দর মূর্তি বসিয়ে দেন কিছু মানুষ। বিবেকানন্দর জীবনদর্শনে বিশ্বাসী তরুণ এই 'বিবেকানন্দ মন্দির' দেখে অবাক হয়েছিলেন। ওঁর মনে হয়েছিল, বিবেকানন্দকেও মন্দিরে ঢোকানো হল! এই যন্ত্রণা স্বপ্নে চলে এসেছে। বিবেকানন্দ ডাকছেন তরুণকেই। বলছেন ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দিতে। এও তো এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ।

স্বপ্ন ২: বিবেকানন্দর সঙ্গে বহু দিন ধরে মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখা হয়, কথাবার্তা হয়—এখনও স্বপ্নে উনি চলে আসেন।

—বিকাশ ভট্টাচার্য, চিত্রকর।

বিকাশের ছোটবেলায় স্কুলের এক মাস্টারমশাই স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে বিবেকানন্দর ওপর একটা নাটক করান। নাটকে বিবেকানন্দর চরিত্রে অভিনয় করে ছাত্র বিকাশ। সেই সময় নাটকের চরিত্রটাকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য ছাত্র বিকাশ পড়েছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ওপর লেখা নানা বইপত্র। ওঁর কথায়, 'সেই সময় থেকে নরেন্দ্রনাথ দত্ত চরিত্রটা আমার মধ্যে একেবারে গেঁথে গেল।' বিকাশ ভট্টাচার্যর স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেন না। কারণ, ওঁর মনে হয়, এই আধ্যাত্মিক চরিত্র জীবনের চাইতে অনেক বড়। 'শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই ধারণা করা সহজ নয়।' সেই তুলনায় চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্যর অনেক কাছের মানুষ বিবেকানন্দ। এই বিখ্যাত বাঙালি চরিত্রের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল আর মানবিকতা সেই ছেলেবেলা থেকে এই চিত্রকরকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। স্বপ্নে বিবেকানন্দর সঙ্গে তাই বারবার দেখা হয় বিকাশ ভট্টাচার্যর। কথা হয় নানা বিষয় নিয়ে।

স্বপ্নে সাম্প্রতিক ঘটনা

যে কোনও বয়সের মানুষের মনে চারপাশের ঘটনা ছাপ ফেলবে, এটা স্বাভাবিক। আর এই সব ঘটনা থেকে তৈরি হওয়া ভয়, উদ্বেগ, অস্থিরতা, নৈরাশ্য এ সব নানাভাবে চলে আসতে পারে তাঁর স্বপ্নের দেশে। হুবহু নয়, একটু বদলে গিয়ে। কম বয়সে আর যৌবন শুরুর বছরগুলোতে ছেলেমেয়েদের নরম আর স্পর্শকাতর মনের ওপর গভীরভাবে ছাপ ফেলে যায় চারপাশে ঘটে চলা ঘটনাগুলো। খবরের কাগজ বা টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যম এদের মনকে প্রভাবিত করে সহজেই। এর কিছু প্রভাব এদের স্বপ্নের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি।

আঠারো বছরের এক উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র আমাকে তার ষোলো বছর বয়সে দেখা একটা স্বপ্নের কথা জানায়। স্বপ্নটা এরকম:

স্বপ্ন: 'আমি যেন কোনও একটা চোরাচালানকারী 'ডন'-এর ডান হাত। আমাকে কিছু হিরের টুকরো সরাবার দায়িত্ব দিলেন ডন, আমি কাজটা করলাম সাফল্যের সঙ্গে।—ডনের হাত থেকে ঐ হিরেগুলো ছিনিয়ে নেয় প্রতিপক্ষ দলের কয়েকজন চোরাচালানকারী—এবার আমি একটা পিস্তল হাতে ওদের তাড়া করলাম—আর ওদের হাত থেকে হিরেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এলাম।'

এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার হিন্দি সিনেমার মতো 'বীরোচিত' ছবি অনেকটা টেলিভিশন বা ভিডিওতে দেখা মারদাঙ্গার ছবির অনুকরণে তৈরি। কিশোররা অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। এদের স্বপ্নে এরকম অ্যাডভেঞ্চার চলে আসতেই পারে। ঝাড়গ্রামের দশম শ্রেণীর এক ছাত্র তার স্বপ্নে আরও তিনবন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে এক অ্যাডভেঞ্চারে। সবার কানে ওয়াকম্যান। হাতে ওয়াকিটকি। ওরা সারাদিন ইচ্ছেমতো ঘোরে অচেনা একটা জায়গায়। লাঞ্চ সারে স্যান্ডউইচ আর মাছভাজা দিয়ে। রাত কাটায় তাঁবুর নীচে। এরকম অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দূরদর্শনের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়।

রাতে টেলিভিশনের 'রিপোর্টার' অনুষ্ঠান দেখেছিলেন একজন ছাব্বিশ বছরের মহিলা। পেশায় ইনি শিক্ষিকা। কিছু বদমাশ লোক কাজের লোভ দেখিয়ে কিছু মহিলাকে ফুসলে নিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে আরবের তেলের দেশগুলোতে। একদিন বাদে স্বপ্ন দেখলেন, তাঁকে ওইভাবে ফুসলে নিয়ে বিক্রি করবার চেষ্টা করছে কিছু লোক। মেয়ে পাচারকারী দলের নেত্রী তাঁরই ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু। যিনি স্বপ্নে চলে এসেছেন টিভির পর্দায় দেখা মেয়ে চালানচক্রের নেত্রীর জায়গায়।

হাবড়ার সতেরো বছরের একটি ছেলে অপহরণের স্বপ্ন দেখে একরাতে। গুণ্ডারা ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে এক গুপ্তডেরায়। বিরাট অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করেছে ওর বাবার কাছে। ভদ্রলোক অত টাকা দিতে পারলেন না। তখন গুণ্ডারা তার ছেলেকে একটা খাটে শুইয়ে ভালো করে হাত পা বেঁধে খাটের চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ঘুম ভেঙে যায় স্বপ্নদ্রষ্টার। এই স্বপ্নের মধ্যে পাঠক জনপ্রিয় এক কিশোরের কাহিনীর সঙ্গে দুএকটি বাজারি ছবির মিশ্র অনুকরণ দেখতে পাবেন।

রাজনৈতিক দলাদলি, রেষারেষি এসবও মাঝেমাঝে চলে আসছে স্বপ্নের দেশে। নিজের বাবাকে প্রতিপক্ষ দলের ভাড়া করা গুণ্ডাদের হাতে খুন হতে দেখেন কুড়ি বছরের এক যুবক। নদীয়ার ধর্মদা গ্রামের এক ছাত্রের স্বপ্নে চলে আসে তাদের বাড়ির ওপর রাজনৈতিক আক্রমণ। কিছু পরিচিত লোক ইটপাটকেল ছুঁড়ছে ওদের বাড়ির ওপর। ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাড়ির লোকেরা পালাতেই ওই লোকগুলো পরিত্যক্ত বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। স্বপ্নদ্রষ্টার চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাদের ঘরবাড়ি। বাড়ি না পুড়লেও বাস্তবে রাজনীতির নাম করে কিছু মানুষ এই বাড়িটার ওপর আক্রমণের ভয়

দেখাচ্ছিল স্বপ্ন দেখার কিছুদিন আগে।

স্বপ্নে মারদাঙ্গা, খুনোখুনি, লাশ আসছে অনেক মানুষের। একটানা এরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে মানসিক অবসাদের শিকার হচ্ছেন কেউ কেউ। এঁদের কথা বলেছি 'স্বপ্ন আর মনের অসুখ' বিভাগে। কিছু মানুষের স্বপ্নে মাঝেমধ্যে চলে আসছে খুন, লাশ বা ধর্ষণের দৃশ্য। কলকাতার চল্লিশ বছরের এক জন মানুষের স্বপ্নের কথা ধরা যাক। স্বপ্নের বিশাল বাড়ির অন্দরমহলের সিঁড়ির নীচে কারা যেন গর্ত খুঁড়ে এক বিবস্ত্রা যুবতীর অর্ধেক লাশ পুঁতে রেখেছে মাটির নীচে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে শরীরের ওপরদিকটা। মুর্শিদাবাদের এক গ্রামের যুবক স্বপ্নে দেখেন ধানক্ষেতের মধ্যে দুজন মাস্তানগোছের লোক এক মহিলাকে ধর্ষণ করছে। এরপর মহিলাকে খুন করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে লোক দুটো পালায়।

দ্রুত বদলে যাওয়া আধুনিক থেকে উত্তর-আধুনিক শহুরে সমাজজীবন এই সমাজের নাগরিক মনে পরিবর্তন আনছে দ্রুত। বদলে যাচ্ছে মূল্যবোধ, পাল্টে যাচ্ছে মানসিকতা। এই মানসিক পরিবর্তন স্বপ্নের দেশে কিভাবে আর কতটা প্রভাব ফেলছে তা সমাজবিদ আর মনোবিদের যৌথ গবেষণার বিষয়। তবে প্রভাব যে পড়ছে তার আভাস পাওয়া যায় বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের দেখা কিছু স্বপ্নে। একটা স্বপ্নের কথা দৃষ্টান্ত হিসেবে বলব। স্বপ্নটা দেখেছে কলকাতার সার্দান অ্যাভিনিউর ক্লাস টেনের ছাত্রী রঙ্গিনী। একবছর আগে ওর বাবা আর মায়ের ডিভোর্স হয়ে গেছে। স্বপ্নের চরিত্র রঙ্গিনী, ওর প্রিয় বান্ধবী সুমনা আর সুমনার মামাতো দাদা বাসব। সুমনা বাসবের প্রেমে আসক্ত।

স্বপ্নের রঙ্গিনীর বয়েস ২৫। সে 'শিখা ম্যানসন' নামের বিরাট বাংলো ধরনের বাড়ির মালকিন। শিখা সুমনার মা। মা-বাবার বিচ্ছেদের পর থেকে রঙ্গিনীর জীবনে শিখাদেবীর ভূমিকা অনেকটা মায়ের মতো। বাড়ির চারপাশে সুন্দর বাগান, সামনে লন। ঐ বাড়িতে এক সঙ্গে থাকে বাসব, সুমনা আর রঙ্গিনী। সুমনা 'এরোনটিক্স এঞ্জিনিয়ার'। বাসবও পেশায় এঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রনিক্স তার বিষয়। আর বঙ্গিনী পেশায় মনস্তত্ত্ববিদ, নেশায় ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। বাসবকে ভালোবাসে রঙ্গিনী, সুমনা দুজনেই। রঙ্গিনীর মনে হচ্ছে, বাসব তাকেই ভালোবাসে। সুমনাকে দেখে বোনের মতো। সুমনার জন্মদিনে সকালে বাগান থেকে টাটকা গোলাপ তুলে বাসব আর রঙ্গিনী এক সঙ্গে ওকে অভিনন্দন জানায়। রঙ্গিনী ঘবের বাইরে বেরিয়ে আসে ওদের দুজনকে এক সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে দেবার জন্য। শুনতে পায় ওদের চুমু খাওয়ার আওয়াজ।

সন্ধের বার্থডে পার্টিতে জমায়েত হয় বড়সড়। সুমনার বন্ধুরা এসেছে অনেকে। টুকুন (বাসবের ডাকনাম) আর রঙ্গিনী সেই পার্টিতে গেয়ে চলে একের পর এক জনপ্রিয় হিন্দি রোম্যান্টিক গান। গান শেষে অতিথিরা চলে গেলে স্বপ্ন যায় ফুরিয়ে।

বাস্তবে টুকুন ভাল গান গায়। আর সুমনার বন্ধুরা সবাই রঙ্গিনীর 'শত্রু'! ক্লাস টেনের এই কিশোরীর মনের একাধিক গোপন ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে এই স্বপ্নে। স্বপ্নের আঙ্গিক আর পরিবেশ, দুই বান্ধবীর এক বন্ধুর সঙ্গে বসবাস—এই স্বপ্ন আধুনিক শহুরে জীবনের বদলে যাওয়া মূল্যবোধ আর মানসিকতার স্বপ্ন। বিবাহবিচ্ছিন্ন এক দম্পতির একমাত্র সন্তানের ভাঙাচোরা মনের স্বপ্ন। রঙ্গিনী জানিয়েছে, 'মা শব্দটার অর্থ' আজ আর ওর কাছে পরিষ্কার নয়।

বাস্তবের আরও বহু ঘটনা চলে আসছে নানা শ্রেণীর নানা পেশার মানুষের স্বপ্নে। বড়বাজারের একজন ব্যবসায়ী একরাতে স্বপ্নের ট্রেনে ট্রেনডাকাতদের হাতে খুন হয়ে যান ওদের হাতে সব টাকা তুলে দিতে অস্বীকার করায়। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রত্যেকমাসে দু একবার অনেক টাকা নিয়ে ট্রেনে এদিক ওদিক যেতে হয় ভদ্রলোককে। আর ডাকাতি আর ডাকাতদের হাতে নিহত হওয়া তো এখন প্রায় নিত্যদিনের খবর। পুরুলিয়ার আর এক ব্যবসায়ীর এক রাতে স্বপ্নে ফাঁসি হয়ে যায় বধূহত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হবার জন্য। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নয় ভদ্রলোকের।

চারজন গৃহবধূর স্বপ্নে চলে এসেছে ধর্ষিতা হবার আতঙ্ক। এঁরা যে স্বপ্ন দেখেছেন তার মূল ব্যাপারটা এক। গুণ্ডা-বদমাস-মাস্তানের হাতে নিগ্রহ। এক গৃহবধূর ঘুম ভেঙে যায় ধর্ষণের মতলবে তাড়া করা বদমাশের তাড়া খেয়ে। আর এক জন ঘেমেনেয়ে জেগে ওঠেন এক অচেনা মাস্তান তাঁকে শরীরী নিগ্রহ

করতে যাবার আগের মুহূর্তে। বাকি দুজন দেখেছেন একই ধরনের স্বপ্ন। গাড়িতে করে তাঁকে মুখে কাপড় বেঁধে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অচেনা কোনও এক রাস্তা দিয়ে। খবরের কাগজ আর অন্য প্রচার মাধ্যমে নিয়মিত চলে আসা ধর্ষণের ঘটনাগুলো থেকে তৈরি হওয়া মানসিক নিরাপত্তাহীনতা এরকম স্বপ্নের মূল অনুঘটক।

পঞ্চাশ অতিক্রান্ত একজন প্রতিষ্ঠিত শল্যচিকিৎসকের দেখা একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আমাকে বিস্মিত করেছে। নিজের একমাত্র মেয়ে গণধর্ষণের শিকার—এরকম আতঙ্কের দৃশ্য দেখে আর্তনাদ করে ঘুম ভেঙে যায় ভদ্রলোকের। খবরের কাগজে গণধর্ষণের একটা ঘটনার কথা কয়েকদিন আগে পড়েছিলেন এই চিকিৎসক। ঘটনাটা তাঁর স্বপ্নে চলে এসেছে চূড়ান্ত নিরাপত্তার পারিপার্শ্বিকতার প্রতিফলন হয়ে।

সংগীতশিল্পী পল্লব কীর্তনিয়ার একটা স্বপ্নে চলে এসেছে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। স্বপ্নটা এরকম:

স্বপ্ন: 'একটা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে কিছু লোক। পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করছে ওরা। হাতে দা, কুড়ুল, শাবল, আগুনের মশাল। বাড়িটায় আগুন লাগানো হল। কয়েক জনকে টেনে বার করা হচ্ছে ঘর থেকে। কারা! সুমিত, টাকো, শাহেদুল—পরিচিত মুখ সব। একি, আমিও আছি। ও! রক্ত! লুটিয়ে পড়ছে এক-একটা মাথা। কি বীভৎস।—ধড়মড় করে উঠে বসলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। শীতেও সারা শরীর জুড়ে ঘাম।'

পল্লব এই স্বপ্ন দেখেন বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনার পর। পল্লবদের গ্রাম বসিরহাটেও পৌঁছে গিয়েছিল সেই সময়কার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার আঁচ। প্রায় দাঙ্গা বেঁধে যায় আর কি! পল্লবরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে সেই সময় একদিন এক দল সশস্ত্র জনতাকে আটকেছিলেন। সেই সব চেনামুখ, যাঁদের ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছেন পল্লব। 'দা, কুড়ুল-কোদাল হাতে কি অসম্ভব অচেনা লাগছিল সেই তাঁদেরই হিংস্র মুখগুলো।' পল্লব খুব ধাক্কা খেয়েছিলেন ভেতরে। সেদিনকার ঐ ঘটনায়। যা কিছুটা বদলে তাঁর স্বপ্নে চলে এসেছে।

এই পর্যায়ের সবচাইতে ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা আমার কাছে আসে চোদ্দ বছরের ক্লাস নাইনের এক ছাত্রের কাছ থেকে। স্কুলের এক মাস্টারমশাই এক দিন কোনও কারণে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন ওদের তিন বন্ধুর জন্য। পরদিন রাতে ছেলেটি স্বপ্ন দেখে, ওরা তিন বন্ধু মিলে 'স্যারকে' একটা বস্তায় পুরে বস্তার মুখ আটকে নিয়ে চলেছে গাড়ি করে। একটা নির্জন বাগানে পুকুরে বস্তাটাকে ফেলে ওরা অপেক্ষা করে ডুবে যাবার। তারপর গাড়ি করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে স্বপ্ন যায় ভেঙে!

এই স্বপ্নদ্রষ্টা ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে কোনও মানসিক সমস্যায় সে ভুগছে, তা মনে হয়নি আমার। আমাদের চারপাশে কম বয়েসীদের নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ঘটনাগুলো কি তবে ছায়া ফেলতে শুরু করেছে কম বয়েসী ছেলেমেয়েদের স্পর্শকাতর মনে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। তবু এদের স্বপ্নের জগৎ যেটুকু আভাস দিচ্ছে, তাতে আতঙ্কিত হবার কারণ রয়েছে যথেষ্ট।

আমার সংগ্রহে থাকা যেসব স্বপ্নে সমসাময়িক নানা ঘটনা ঢুকে পড়েছে তার কিছু উল্লেখ করলাম। এ সব স্বপ্নের গূঢ় অর্থ Latent Content-র সঙ্গে স্বপ্নে আসা সাম্প্রতিক ঘটনার কোথাও যোগাযোগ রয়েছে, কোথাও নেই। স্বপ্নকল্পনা স্বপ্নের আবহ তৈরির খাতিরে অনেক সময় সমসাময়িক নানা ঘটনার বিভিন্ন সূত্রকে টেনে এনেছে স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্নের দেশ চালায় স্বপ্নকল্পনা। আর বাস্তবের দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে সমসাময়িকতা। স্বপ্নকল্পনায় সমসাময়িক ঘটনার ব্যবহার স্বপ্নে সাম্প্রতিক ঘটনাকে টেনে আনে নানাভাবে। কখনও বা সাম্প্রতিক কোনও ঘটনাকে অনুঘটক বানিয়ে স্বপ্নের দর্শকের অচেতনের নানা অসামাজিক ইচ্ছা চলে আসে স্বপ্নে।

বাচ্চাদের স্বপ্ন

একেবারে ছোট্ট বাচ্চারা ঘুমন্ত অবস্থায় কেন হাসে বা কান্নার মতো করে ঠোঁট ফোলায়, তা বলা কঠিন। কেননা কথা বলতে না পারার জন্য কয়েক মাসের শিশুর ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় মনের ভাবের কথা বোঝার কোনও উপায় নেই। তবে এরকম ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে খুব ছোট বাচ্চারাও স্বপ্ন দেখে।

একটু বড় হয়ে কথা বলতে শেখার পর বাচ্চারা যে স্বপ্ন দেখে তা সবাই জানেন। ঘুমের মধ্যে অস্ফুট কথা বলে ওঠা শুনে বোঝা যায়, বাচ্চা স্বপ্ন দেখছে। এই সময় থেকে শুরু করে ১০-১১ বছর বয়েস পর্যন্ত বাচ্চাদের স্বপ্ন এখানে আলোচনা করব। এই স্বপ্নগুলো আলাদাভাবে বিচার করবার কারণ রয়েছে। বাচ্চাদের স্বপ্ন অনেক দিক থেকে বড়দের দেখা স্বপ্নের চাইতে আলাদা।

৭-৮ বছর বয়েস পর্যন্ত বাচ্চারা সাধারণত সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখে। বড়দের স্বপ্নে 'পরিস্ফুট অংশ' (Manifest content) আর 'গভীর অর্থ' (Latent content) সাধারণত আলাদা। মনের প্রহরীর প্রভাবে বিকৃত হওয়ায় বড়দের স্বপ্ন এরকম জটিল। বাচ্চাদের স্বপ্ন একটা বয়েস পর্যন্ত সহজসরল। তখনও তাদের মনে কোনও প্রহরী (Censor) তেমনভাবে কাজ করে না। তাই মনের ইচ্ছা সরাসরি অবিকৃত অবস্থায় চলে আসতে পারে স্বপ্নে। ৫-৬ বছর পর্যন্ত শিশুর মনের সচেতন আর অচেতন অংশের কোনও আলাদা অস্তিত্ব থাকে না। বাচ্চাদের স্বপ্নে সোজাসুজি তাদের মনের ইচ্ছাগুলো চলে আসবার এটা একটা কারণ।

বাচ্চাদের স্বপ্ন বুঝতে গেলে শিশুমনের কয়েকটা বিশেষ দিক জানা দরকার। বাচ্চারা অনুকরণপ্রিয়—এতো সবাই জানেন। শিশু চায় তাঁর বাবা আর মা যা করেন তাই করতে। ছোট্ট মেয়েরা খেলনা সাজিয়ে রান্না করে, খেতে দেয়। পুতুলের সংসারে কর্ত্রী হয়ে পুতুলদের শাসন করে। মায়ের অবর্তমানে অনেক সময় 'বাড়ির কর্ত্রী' হয়ে ওঠে। বাবাকে শাসন করে। বাবার কি প্রয়োজন জানতে চায়। অনেক সময়ে ছোট্ট মেয়েরা পুতুলের বিয়ে দেয়। বিয়ে হয়ে মেয়ে পুতুল ঘরখালি করে চলে গেলে কাঁদে। ঠিক যেভাবে মায়েরা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে কাঁদেন।

ছোট ছেলেরা সাধারণত দুরকম খেলা খেলতে ভালোবাসে। একদিকে সে আইনের রক্ষাকর্তা। অন্যদিকে আইন ভাঙায় তার প্রবল উৎসাহ। প্রথম ভাবের প্রভাবে সে পুলিশ হয়ে চোর বা ডাকাতকে ধরে, পেটায়। দ্বিতীয় ভাবের প্রভাবে সে নিজেই শক্তিমান ডাকাত সাজে। ডাকাতি করে। ছোট ছেলেমেয়েরা অন্যের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে চায় ভীষণভাবে। মনের এই ভাব থেকে সে অফিসের 'বড়বাবু' হয়। অন্য 'দুর্বল' শিশুকে তার অধীনে 'বেয়ারা' হতে হয়। চা নিয়ে আসতে হয়। ছোট মেয়েরা অনেক সময় বাবাদের রোগী বানিয়ে নিজে 'নার্স' হয়। তার কথা শুনে চলতে বাবাকে বাধ্য করে। দাদুকে 'রোগী' বানিয়ে, অন্যকে বাচ্চা ডাক্তারী করে 'রোগী'র ওপর।

বাচ্চাদের, বিশেষ করে ছোট ছেলেদের 'ডাক্তার ডাক্তার' খেলার কথা সবাই জানেন। ডাক্তার রোগীকে দেখে ইঞ্জেকশন দেন বা ফোঁড়া কাটেন। তাঁর পেট টিপে পরীক্ষা করেন। তাঁর নির্দেশমতো ওষুধ খাবার নির্দেশ দেন। এতে একজন শিশু-রোগীর মনে আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। সে নিজে ডাক্তার সেজে অন্য সমবয়স্ক বাচ্চাদের বা দাদুর ওপর তার কর্তৃত্ব ফলাতে থাকে। তাদের ওষুধ-ইঞ্জেকশান দেয়, পেট টিপে দেখে। দেয় খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে কড়া নির্দেশ। এভাবে বেশ কয়েকবার ডাক্তারের ভূমিকা পালন করবার পর আসল ডাক্তারের বিরুদ্ধে তাঁর মনের ক্ষোভ শান্ত হয়। যে কোনও ডাক্তারই শিশুর কাছে স্বেচ্ছাচারী। ডাক্তারের ওপর একই 'স্বেচ্ছাচার' চালাবার সুযোগ তার নেই। তাই অন্যের ওপর ডাক্তারসুলভ স্বেচ্ছাচার বারবার চালিয়ে সে নিজের মনে ক্ষোভমুক্ত হয়।

মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর বসুর এই সম্পর্কিত কিছু কথার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। গিরীন্দ্রশেখর

মনে করেন, যে ডাক্তার কোনও বাচ্চার ফোঁড়া কেটেছেন, বাচ্চা যদি সেই ডাক্তারের শরীরে একই অস্ত্রোপচারের সুযোগ পেত, তবে বাচ্চার ক্ষোভ প্রশমিত হতে পারত একবারেই। 'ডাক্তারের ওপর ডাক্তারি করা'র সুযোগ বাচ্চার নাগালের বাইরে। তাই কল্পিত রোগীদের ওপর বারবার ডাক্তারি করে সে তার মনের ক্ষোভ পরোক্ষভাবে মেটায়।

বাচ্চাদের স্বপ্ন বুঝতে শিশুমনের আর একটা বিশেষ দিক মাথায় রাখা দরকার। শিশুরা সবকিছুকেই অতিরঞ্জিত করতে ভালোবাসে। শিশু কল্পনার জোরে সামান্য ব্যাপারকে বা বস্তুকে বিরাট করে দেখে। সামান্য একটা তথ্য থেকে বানিয়ে বানিয়ে অনেক বড় করে ভেবে ফেলে কল্পনাপ্রবণ শিশুর মন। শিশুর মনের এই বিশেষ দিক তার স্বপ্নেও চলে আসে। বাচ্চাদের স্বপ্নে রসগোল্লা হতে পারে ক্রিকেটবল সাইজের, রাক্ষসের দাঁত টিউব লাইটের মতো। চক হয়ে যেতে পারে বিশাল একটা গোল থামের মতো। বাচ্চাদের স্বপ্নে নানা বস্তুর এই অবাস্তব বড় আকারে আসার ব্যাপারটা ফ্রয়েড, ইয়ুন ও ফ্রয়েড পরবর্তী বহু গবেষককে আকৃষ্ট করেছে। ফ্রয়েড লক্ষ করেছিলেন, বাচ্চাদের স্বপ্নে নানা বস্তু শুধু বড় আকারে নয়, বেশি পরিমাণে আসে। এর কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

বাচ্চারা নিজেদের 'বড়' ভাবতে ভলোবাসে। তাদের মনের সব চিন্তাভাবনা চলতে থাকে 'বড় হবার ইচ্ছা'কে কেন্দ্র করে। সে বাবা বা মায়ের মতো বড় হবার ইচ্ছা মেটায় কল্পনায়। নানা ধরনের খেলায় বড় মানুষের ভূমিকায় অভিনয় শিশু মনের বড় হবার ইচ্ছাকে কিছুটা মিটতে সাহায্য করে। বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি বাবা বা মায়ের মতো বড় হতে চায়। কিন্তু চারপাশ থেকে তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, সে এখনও খুব ছোট। তাই কল্পনার জগতে নিজেকে বড় করেই শিশুমন থেমে যায় না। তার অধিকারে থাকা সব বস্তুকে সে বড় করে ভাবে। বাচ্চাদের অভিধানে 'শেষ' বা 'যথেষ্ট' বলে কোনও শব্দ যে নেই, এটা তার একটা কারণ। গল্প শুনতে শুনতে বাচ্চা বারবার বলে 'তারপর'? একবার কোনও খেলা দেখালে সে হাজারবার একই খেলা দেখতে চায়। শিশু মনের এই বিশেষ 'পুনরাবৃত্তি প্রবণতা' (Trend of Repeatition) তার স্বপ্নেও চলে আসে।

ফ্রয়েড মনে করতেন, একজন শিশুর অতিশৈশবে তার মধ্যে যৌনতাবোধের উন্মেষ ঘটে। যা নানাভাবে পরিবর্তিত হতে হতে যৌবনে স্বাভাবিক যৌনবোধে রূপ নেয়। জীবনের প্রথম পাঁচ-ছ বছর বাচ্চার মনোজগতের ওপর তার ভেতরকার যৌনতার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। প্রথমদিকে এরকম ধারণা না থাকলেও, ১৯১১ সালে শিশু মনের ওপর তার যৌনবোধের প্রভাব নিয়ে ফ্রয়েড মত পরিবর্তন করেন। বাচ্চাদের বিভিন্ন বয়েসে যৌনবোধ আর তার বিবর্তন নিয়ে আধুনিক প্রায় সব মনোবিদ ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত। এ ব্যাপারে 'যৌনতার বিকাশ' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। শৈশবের স্বপ্নে, বিশেষ করে পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চার স্বপ্নের ওপর যৌনতার কোনও প্রভাব নেই, আপাতত এটুকু জানাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

বাচ্চাদের ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন

একটা বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের স্বপ্নে সরল ইচ্ছাপূরণই আসে বেশি। এরকম স্বপ্ন বাচ্চার পক্ষে আনন্দের। কেননা বাস্তবের না পাওয়া অনেক কাঙ্ক্ষিত বস্তু সে পেয়ে যায় স্বপ্নে। পাঁচ বছরের নিন্তির খুব পছন্দ লাল বল। অথচ ওর দুবছরের বড় দাদা সব লাল বল নিয়ে নেয়, ওকে একটাও দেয় না। একরাতে নিন্তি স্বপ্নে হাতের মুঠোয় একটা লাল বল পেয়ে গেল। মনে খুব আনন্দ হল নিন্তির। সকালে ঘুম ভেঙে দেখে লাল বলটা নেই। হাতের আঙুলগুলো তখনও রয়েছে বল ধরে থাকা অবস্থার মতো। চার বছরের বিন্নি একদিন তার প্রিয় পুতুলকে হারিয়ে ফেলে। প্রচণ্ড মন খারাপ নিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্নে পুতুলটাকে ফিরে পায়। ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে ওঠে, 'মোম এসেছে, মোম এসেছে।'

আমার স্বপ্নসন্ধানের সবচাইতে কমবয়সী স্বপ্নদ্রষ্টা প্রতীকের বয়েস এক বছর সাত মাস। ওর একটা স্বপ্নের কথা বলেছি 'ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন' অধ্যায়ে। প্রতীকের স্বপ্নে মাঝেমাঝে ওর মামা ওদের বাড়িতে চলে আসেন। মামা মানেই আনন্দ। মামা মানেই আদর আর খেলা। বাস্তবে মামা অনেক দিন না এলে

স্বপ্নে মামাকে বাড়িতে পেয়ে যায় প্রতীক। চিৎকার করে ওঠে 'মামা এতেতে—মামা এতেতে'। আড়াই বছরের পটলের সবচাইতে পছন্দের বিষয় নানা ধরনের কলকব্জা, যন্ত্রপাতি। বাবা বা দাদুর কোলে চেপে লাইটের সুইচ অন-অফ করতে আর পাখার রেগুলেটার ঘোরাবার চেষ্টা করতে খুব ভালোবাসে। বড়রা একদিন সবাই মিলে ওর এই পছন্দের ব্যাপারটা বন্ধ করে দেন। মাঝরাতে পটল স্বপ্ন দেখতে দেখতে উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠে 'দেগুলেতাল। দেগুলেতাল।'

সাড়ে তিন বছরের সৌমি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই জানায়, 'কি ছুন্দল একটা বাগানে বেলাতে গেছিলাম—কত ছুন্দল ফুল।' আগের দিন দেখা একটা বইয়ের ফুলের বাগানের রঙিন ছবি ওর স্বপ্নে চলে এসেছে সরাসরি। '৯৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে সৌমির মা আমাকে ওর আরও একটা স্বপ্নের কথা জানান। সেদিন সোয়েটার রোদে দেওয়া হয়েছিল ওদের বাড়ির ছাতে। ও বায়না ধরে, সোয়েটার পরবে! মা জানান, সোয়েটার পরে শীতকালে। ও জানত, ওর বাবা বিদেশ থেকে ফিরবেন শীতে। শীতকাল আর বাবা সমার্থক হয়ে গিয়েছিল সৌমির কল্পনায়। পরদিন সকালে উঠেই ও মাকে জানায়, শীত পড়ে গেছে। রাতে স্বপ্ন দেখেছিল, ওর বাবা বাড়িতে ফিরে এসেছেন। আর বাবা ওর মতো সোয়েটার পরে আছেন। এই স্বপ্নে দু-দুটো ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে একসঙ্গে। বাবাকে ফিরে পাওয়া আর সোয়েটার পরা।

৬-৭ বছর বয়সের পরও বাচ্চারা সহজসরল এরকম স্বপ্ন দেখে। তবে এইসময় থেকে শিশুমনের প্রহরী কিছুটা সজাগ হয়ে ওঠে। চেতন আর অচেতন মনের পার্থক্য কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় শিশু মনের এরকম পরিবর্তনের কারণ সমাজ, সামাজিক রীতিনীতি আর শিক্ষার প্রভাব। এটা করা ঠিক, এটা ঠিক নয়—এরকম ধারণা আস্তে আস্তে মেনে নেয় শিশুর মন। সমাজ আর শিক্ষা তাকে আস্তে আস্তে ভালমন্দ বোধে রপ্ত হতে শেখায়। একটা সময় সহজ সরল স্বপ্নের সঙ্গে বাচ্চার মনের পাহারাদার সজাগ হবার জন্য কিছু কিছু জটিল স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। যা অনেকটা বড়দের দেখা স্বপ্নের মতো। সাত-আট বছর থেকে শুরু করে যৌবন আসবার দিনগুলো পর্যন্ত বাচ্চার স্বপ্নের জগতে সহজ সরল স্বপ্ন আর কিছুটা জটিল স্বপ্ন কি অনুপাতে আসছে তা দেখে কোনও বাচ্চার এই সময়কার মনোজগতের চেহারা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায় বলে আমার মনে হয়।

আমি এমন বেশ কিছু বাচ্চার কথা জানি যারা ১০-১১ বছর বয়সেও সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখে বেশি। জটিল স্বপ্ন কম। আবার ৭-৮ বছরের অনেক বাচ্চার স্বপ্নে দেখা যাচ্ছে, জটিল স্বপ্ন আসছে সহজ সরল স্বপ্ন-র চাইতে বেশি। বাচ্চাদের স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নাড়াচাড়া করলে যে কেউ এই বয়সের বাচ্চাদের স্বপ্নে এরকম তারতম্যের কারণগুলো বার করে ফেলতে পারবেন। স্কুলের পরিবেশ, বাড়ির আর চারপাশের পরিবেশ, মা-বাবার সম্পর্ক, খেলাধূলা করবার বা শিশুসুলভ কল্পনার জগতে বিচরণ করবার সুযোগ বা সময়, এসবের ওপর এই বয়সের বাচ্চাদের মনের গঠন আর বিবর্তন অনেকটা নির্ভর করে। এই সময় বাচ্চার মনের গঠন নির্ভর করে সমাজের রীতি মেনে তার মনের প্রহরী (Censor) কীভাবে তৈরি হচ্ছে তার ওপরও।

ন-বছরের বুকুনের স্বপ্নে বেশ কয়েকবার গল্পে শোনা পরীরা এসেছে। বুকুনকে নিয়ে গেছে ওদের দেশে। কল্পনার জগতে পাখি হয়ে উড়ে বেড়ায় অনেক বাচ্চা। বুকুন পাখি হয়ে যায় স্বপ্নে, মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায় এধার থেকে সেধারে। স্টিকার জমানো প্রিয় নেশা দশ বছরে টুপুরের। এক রাতে টুপুর দেখে একটা মজার স্বপ্ন। ও একটা বড় ঘরে রয়েছে। আর ওপর থেকে বৃষ্টির মতো শুধু স্টিকার পড়ছে, স্টিকার পড়ছে আর স্টিকার পড়ছে। একই বয়সের পাপু ভালোবাসে নানা ধরনের খাবার খেতে। আর তারজন্য সবাই 'লোভী' বলে পাপুকে। পাপুর কাছ থেকে অন্তত তিনটে লোভনীয় খাবার খাওয়ার স্বপ্ন আমি জানতে পারি। একরাতে ও পেল্লায় সাইজের একটা আইসক্রিম খেয়েছে সারা রাত ধরে। আর এক রাতে বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ।

আট বছরের রূপকথা ভয় পায় ওদের পাড়ার শিবুপাগলাকে। ভয় কাটাবার দাওয়াই মিলে যায় স্বপ্নে। রূপকথার স্বপ্নে, শিবুপাগল বাধ্য ছেলের মতো ওদের বাড়ির উঠোন ঝাঁট দিতে থাকে। যেন

বাড়ির কাজের লোক! এও তো এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ। যদিও কিছুটা পরোক্ষ। ছ'বছরের বুবকা জঙ্গলে গিয়ে খুব ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করেছিল হাতির পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াবার সময়। স্বপ্ন ওকে সাহসী করে তুলতে চায়। একদিন পর ও স্বপ্ন দেখে হাতির পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে জঙ্গলের ভেতরে। একা একা। আর এরকম বেড়ানোয় খুব আনন্দ হয়েছে বুবকার। আট বছরের ছেলে বাচ্চু একরাতে খাবার পাতে একটার বদলে রসগোল্লা পায় অর্ধেক। রাতে স্বপ্ন দেখে, ফুটবল সাইজের একটা রসগোল্লা একটা বড় থালায় করে এনে ওর হাতে দিচ্ছেন ওর মা।

পাঁচ বছরের নীচের বাচ্চাদের এমন কিছু স্বপ্ন পেয়েছি যেগুলোতে দিনের বেলা ঘটা ঘটনার বা জেগে থাকা অবস্থার ভাবনার হুবহু অনুকরণ দেখা যাচ্ছে। দু-বছরের এক শিশু একদিন রাতে চিৎকার করে কিছু কথা বলে ওঠে। ওর বাবা আমাকে জানান, সেই কথাগুলো ছিল, 'কেটে গেছে! দাদুর হাত কেটে গেছে!' সেদিন সকালে ওর দাদু সত্যিই ছুরিতে হাত কেটে ফেলেছিলেন। তিন বছরের ঝুম্পা একদিন বাবা-মায়ের সঙ্গে চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখেছিল সারা দুপুর। রাতে স্বপ্নে আবার সে একই চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়ায়। চার বছরের রোরো একরাতে স্বপ্ন দেখে যে বাঘ, সিংহ আর প্যাংগোলিন ঘুরে বেড়াচ্ছে বনের মধ্যে। আর এক দিন রোরোর স্বপ্নে একটা রাক্ষস ঘুরে বেড়ায় এদিক থেকে ওদিকে।

এমন হতে পারে যে এরা গোটা স্বপ্নটা পরে আর মনে করতে পারে না। বা ঠিকভাবে বলতে পারে না। তবু এটা মনে হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে বাচ্চাদের স্বপ্নে কোনও ঘটনা, দৃশ্য বা ভাবনার হুবহু ছবি কখনও কখনও চলে আসে। কোনও ঘটনা শিশু মনে অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করলে সেই উত্তেজনা কমিয়ে এনে সহজে ওই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হতে সাহায্য করা এরকম স্বপ্নের উদ্দেশ্য। আমার তাই মনে হয়। বড়দের স্বপ্নে এরকম ঘটনা ঘটে না তা নয়। তবে বাচ্চাদের তুলনায় অনেক কম।

ছ-বছরের মৌ খুব ভালবাসে দরবেশে খেতে। এক রাতে স্বপ্ন দেখে, এক 'কাকা' বিরাট এক প্যাকেট ভর্তি দরবেশ নিয়ে বাড়িতে এসেছেন। ঘুম ভেঙেই মায়ের কাছে দরবেশ চেয়ে বসে মৌ!

ধৈর্য হারাবার স্বপ্ন

যে কোনও বয়সের বাচ্চা এরকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখে। হয়তো কোথাও বেড়াতে যাবে দুদিন বাদে। বা বাড়িতে খুব প্রিয় কাকু বা মামা আসবেন কয়েকদিন পর। এরকম ঘটনার জন্য বাচ্চারা অপেক্ষা করে প্রচণ্ড উত্তেজিত অবস্থায়। ঘুমিয়ে পড়ে এরকম অবস্থায় কিছু বাচ্চা অনেক সময় দেরি সহ্য করতে পারে না। ক-দিন বাকি থাকতেই স্বপ্নে বেড়িয়ে আসে বেড়াতে যাবার জায়গাটায়। বা প্রিয় আত্মীয় দুচার দিন আগেই চলে আসেন স্বপ্নের দর্শকের বাড়িতে। এরকম স্বপ্ন ফ্রয়েডের ভাষায় 'ড্রিমস অব ইমপেসেন্স'। 'ধৈর্য ধরে রাখতে না পারার স্বপ্ন'। বড়রাও এরকম স্বপ্ন দেখেন। তবে সেইসব স্বপ্ন বড়দের স্বপ্নের নিয়ম মেনে অনেক সময় আসে জটিল হয়ে। এরকম বহু বাচ্চাদের স্বপ্ন আমার ঝুলিতে রয়েছে। এখানে দুটো স্বপ্নর কথা বলি।

স্বপ্ন ১: স্কুল থেকে আন্দামান নিয়ে গিয়েছিল—যাবার আগের দিন রাতে খুব উত্তেজনা নিয়ে ঘুমোলাম—স্বপ্ন দেখলাম, আন্দামানে চলে গেছি—সমুদ্রে চান করছি বন্ধুদের সাঙ্গে—সেলুলার জেল দেখছি।

স্বপ্ন ২: বছরখানেক আগে স্বপ্নে একদিন পরীক্ষা দিয়েছিলাম—আসলে দুদিন বাদে ইংরেজি পরীক্ষা, আমার প্রিপারেশান প্রায় শেষ—রাতে স্বপ্ন দেখলাম, বিরাট বড় একটা হলঘরে ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে ইংরেজি পরীক্ষা দিতে বসেছি—প্রশ্নপত্র এল, লিখলাম, খাতা ফেরত দিলাম—গোটা পরীক্ষাটাই দেখেছিলাম।

দুটো স্বপ্নই দেখেছে কলকাতার লা মার্টিনিয়ার স্কুলের ছাত্রী ১০ বছরের টুপুর চট্টোপাধ্যায়। টুপুরের

এই দ্বিতীয় স্বপ্ন নানাদিক থেকে ব্যতিক্রমী। পরীক্ষা যে কোনও বয়সের ছাত্রছাত্রীর কাছেই ভয়ের, চিন্তার, উদ্বেগের। বড়দের পরীক্ষার স্বপ্ন আসে উদ্বেগকে কেন্দ্র করে। আর সেই স্বপ্নে কিছুতেই ভাল পরীক্ষা দিতে পারেন না স্বপ্নের দর্শক। বড়দের পরীক্ষাসংক্রান্ত ভয় বা উদ্বেগ স্বপ্নে সাধারণত আসে অন্যভাবে। পরীক্ষার দুদিন আগেই স্বপ্নে ইংরেজি পরীক্ষার গোটাটাই দিচ্ছে টুপুর। আর পরীক্ষা দিতে দিতে সে এতটুকু চিন্তিত বা ভীত নয়।

বাস্তবে পরীক্ষা হবার আগেই স্বপ্নে পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলা টুপুরের মনকে আসল পরীক্ষার জন্য চিন্তা কমাতে বা তৈরি থাকতে সাহায্য করেছে। স্বপ্নে গোটা একটা পরীক্ষা দিয়ে ফেলতে পারলে, স্বপ্নের দর্শকের আসল পরীক্ষার ভয় যায় কমে। বাস্তবে ওই পরীক্ষাটা দেবার আগে মনের জোর সামান্য হলেও কিছুটা অন্তত বাড়ে। টুপুরের এরকম স্বপ্ন দেখবার কারণ এই। ওর স্বপ্নটা যেন আসল পরীক্ষার স্টেজ-রিহার্সাল। এরকম স্বপ্নকে বলা যেতে পারে 'মনের জোর বাড়াবার স্বপ্ন'।

বাচ্চাদের ভয়ের স্বপ্ন

বাচ্চারা শুধু আনন্দের বা কিছু পাওয়ার স্বপ্ন দেখে না। দেখে ভয়ের স্বপ্নও। বাচ্চাদের মনে বাস্তব আর অলীক নানা বস্তুতে ভয় বড়দের চাইতে বেশি। কম দিন পৃথিবীতে থাকবার জন্য পৃথিবী সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব এর একটা কারণ। অন্য কারণও আছে। বাচ্চাদের শোনা গল্পে বা পড়া বইতে ভূত, পেত্নী, রাক্ষস—এসব ভীতিপ্রদ বিষয়ের ঘনঘটা। বড়রা কারণে, অকারণে বাচ্চাদেরকে ভয় দেখান। বলেন, 'ওদিকে যেও না, ভূতে ধরবে!' 'দুষ্টুমি কোরো না, পেত্নী এসে ঘাড় মটকে দেবে!' শিশুমনে ভূত, পেত্নী, রাক্ষস অবাস্তব নয়, বাস্তব অস্তিত্ব। শিশু এদের নির্দিষ্ট অবয়ব তৈরি করে নেয় কিছুটা শুনে আর বাকিটা কল্পনায়। রাক্ষস এসে তাকে তাড়া করছে বা গাছের ওপর থেকে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে ভূত 'কেঁরেঁ' বলে উঠছে—শিশু মনে মনে এরকম ভয়ংকর অলীক দৃশ্যের মুখোমুখি হলে কি করবে, এই ভয় পায়। ভয় পায় চারপাশের কিছু মানুষকে। কেউ ভয় পায় পুলিশকে, কেউ পাগলকে। শিশু মনের এই ভয় নানা ভাবে তার স্বপ্নে চলে আসে ভয়ের স্বপ্ন হয়ে। বাচ্চাদের কিছু ভয়ের স্বপ্নের কথা বলি:

স্বপ্ন ১: আমাকে একটা পেত্নী তাড়া করল—বড় বড় আগুনের চোখ—শনের চুল—আমি খুব ভয় পেয়ে বাবা মাকে ডাকছি—কেউ শুনতে পাচ্ছে না—ভয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি বাবা মার পাশে শুয়ে আছি।

—আম্রপালী (৭ বছর)।

স্বপ্ন ২: একটা বিরাট ডাইনি—দাঁতফোগলা, লম্বা নখ, বড় বড় সাদা চুল—ঘরে ঢুকে আমাকে মারতে আসছে, প্রথমে আমি ভয় পেলাম—তারপর ডাইনিটাকে মারতে শুরু করলাম—ডাইনিটাও আমাকে মারতে চেষ্টা করছে, পারছে না—তারপর ডাইনিটা মার খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে—আমি আরও মারলাম—ডাইনিটা মরে গেল।

—সুদেষ্ণা (৭ বছর)।

স্বপ্ন ৩: একটা বাড়িতে আমরা এতদিন থাকতাম (অবাস্তব)—সবাই বাড়িটা ছেড়ে চলে যাচ্ছে—মা বাবাও চলে গেছে—আমি একা রয়ে গেছি। একটা ভূত পাখি হয়ে আমাকে তাড়া করেছে—দূরে ওটা পাখি ছিল, সামনে আসতেই ভূত।

—শ্বেতলীনা (৯ বছর)।

স্বপ্ন ৪: সকালে নার্সারিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, নার্সারির লোকটা বলেছিল, 'সাবধান, কোনও গাছে যেন হাত দিও না'—অনেক ফুলগাছ ছিল ওখানে, রাতে স্বপ্ন দেখলাম সাইকেল নিয়ে একজন ফুলওয়ালার দোকানের ওপর উঠে পড়েছি—ওরা আমাকে শাস্তি দিচ্ছে—একটা ফুলগাছে বেঁধে রেখেছে আমাকে।

—পাপু (১০ বছর)।

স্বপ্ন ৫: স্কুলে ফাংশান হচ্ছিল—শেষ হবার পর একা একা বাড়ি ফিরছিলাম—রাস্তায় কেউ নেই—

একটা ভূত এসে গলা টিপে ধরল—গলায় খুব ব্যথা লাগছিল। কষ্টে ঘুম ভেঙে গেল, খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

—বনি (৬ বছর)

স্বপ্ন ৬: আমি তখন ক্লাস ওয়ান কি টুতে পড়ি, বয়েস বছর ছয়-সাত। এক রাতে দেখলাম আমি বিরাট বড় একটা গুদামে আটকে পড়েছি। চারদিকে অসংখ্য তেলের বড় বড় পিপে। একটার ওপর একটা—এভাবে সাজানো। গুদামটা থেকে বাইরে বেরোবার জন্য আমি শুধু এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছি। হঠাৎ এক জন লোকের সঙ্গে দেখা। তার গায়ে সাদালাল ডোরাকাটা টি-সার্ট। গলায় রুমালের মতো কি একটা বাঁধা। লোকটা আমাকে কিছু একটা বলল। আর অমনি তেলের পিপেগুলো হঠাৎ করে গড়াতে গড়াতে আমার দিকে আসতে শুরু করে দিল। ভয়ে চিৎকার করে আমার ঘুম ভেঙে যায়। এই স্বপ্নটার কথা ১৫-১৬ বছর বাদে আজও খুব স্পষ্ট মনে আছে।

—সুমিত।

এই স্বপ্নগুলো থেকে বাচ্চাদের ভয়ের স্বপ্ন সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। ভূত-পেত্নী-রাক্ষসের অলীক ভয় বা বাস্তবের কোনও মানুষের ভয় নানাভাবে চলে এসেছে এই স্বপ্নগুলোতে। পাঠক জানতে চাইবেন, ভয়ের স্বপ্ন দেখা কি বাচ্চার পক্ষে ক্ষতিকর? অবশ্যই নয়। যে কোনও বাচ্চাই মাঝেমাঝে ভয়ের স্বপ্ন দেখে। বাস্তবে বাচ্চা যে ভয়ের মুখোমুখি হতে সাহস পায় না, ভয়ের স্বপ্নে সে সেই ভয়ের মুখোমুখি হয়। এতে আস্তে আস্তে বাচ্চার মনে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার সাহস জন্মায়। সে বড় হয়ে ওঠার পথে এগোয়। শিশুমনের বিকাশে তাই ভয়ের স্বপ্নের পরোক্ষ প্রয়োজন রয়েছে।

তাই বলে কোনও বাচ্চা খুব বেশি এধরনের ভয়ের স্বপ্ন নিয়মিত দেখতে থাকলে আর জেগে ওঠার পরও বাচ্চার মনে স্বপ্নের প্রভাব থেকে গেলে, তা কিন্তু স্বাভাবিক নয়। এরকম স্বপ্ন বাচ্চার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এ সব বাচ্চা আতঙ্ক (Phobia) বা অন্য মনোরোগের শিকার হতে পারে। যদি না ঠিক সময়ে সে মনোসমীক্ষক বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য পায়।

আম্রপালী আর সুদেষ্ণার স্বপ্নে ওদের পেত্নী বা ডাইনি তাড়া করেছে। আম্রপালী ভয় পেয়ে বাবা-মাকে ডাকছে। আর সুদেষ্ণা প্রথমে ভয় পেলেও পরে সাহস করে ডাইনির সঙ্গে 'যুদ্ধ' করে ডাইনিকে মেরে ফেলেছে। এরপর ওদের পক্ষে কল্পনায় ডাইনি বা ভূতের ভয়ের মোকাবিলা করা সহজ হবে। ভূত আর খুব বেশি ভয় দেখাতে পারবে না। বনির স্বপ্নে ভূত বা ডাইনি ওর গলা টিপে ধরেছে। একবার ভূতের এরকম আক্রমণের মুখে পড়লে পরে আর ভূতকে ততটা ভয় না পাবারই কথা।

বাচ্চাদের কল্পনাশক্তি অনেকটা স্বপ্নের কল্পনার মতো। শিশুমনের কল্পনার জোরে স্বপ্নে অদ্ভুত নানা ঘটনা চলে আসতে পারে পাঁচ-ছ বছর পেরিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের স্বপ্নে। যেমন এসেছে শ্বেতলীনার। ওদের স্বপ্নের বাড়িটা ওর স্বপ্নে এল কোথা থেকে? অবশ্যই ওর দেখা বা ছবিতে দেখা এক বা একাধিক বাড়ি মিলেমিশে তৈরি হয়েছে শ্বেতলীনার স্বপ্নের বাড়ি। বাচ্চারা একা থাকতে খুব ভয় পায়। এই স্বপ্নের মূল অংশে সবাই ওকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় বাচ্চা বাড়িতে একা। একা একা বাড়িতে থাকতে ওকে অভ্যস্ত করা স্বপ্নের এই অংশের সম্ভাব্য কাজ। পরের অংশে ভূতের তাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা আগেই বলেছি। এই স্বপ্নে পাখির ভূত হয়ে যাওয়ার উৎস শিশু মনের বিচিত্র কল্পনা।

পাপুর স্বপ্নের সূত্র স্বপ্নের বিবরণ বলার আগে ও নিজেই জানিয়েছে। নার্সারির মালিক ওকে বলে ফুলগাছে হাত না দিতে। এর বিপরীতে, ফুলগাছে হাত না দেওয়া বা ফুল তোলার ইচ্ছা ওর মনে হতেই পারে। স্বপ্নে এই ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে সাইকেল নিয়ে (ও জোরে সাইকেল চালাতে ভালোবাসে) ফুলওয়ালার ফুলের ওপর উঠে পড়ায়। এই স্বপ্ন বড়দের স্বপ্নের মত জটিল হয়েছে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের প্রহরীর প্রভাবে। আর এভাবে ফুল নষ্ট করার দুষ্কর্মের জন্য এই স্বপ্ন এক ধরনের প্রায়শ্চিত্ত। এই স্বপ্নের শেষ অংশ সেদিক থেকে 'নিজেকে নিজে শাস্তি দেবার স্বপ্ন।' ড্রিম অব সেলফ পানিশমেন্ট।

কিছু আট থেকে বারো বছরের ছেলেমেয়ের স্বপ্নে কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। এদের কারও স্বপ্নে বারবার একই আতঙ্কের দৃশ্য ঘুরে ফিরে আসছে। কারও বা স্বপ্নে বাস্তব জীবনের নানা

সমস্যা বারবার এসে হানা দিচ্ছে অতিরঞ্জিত হয়ে। ন বছরের একটি ছেলে পড়ে কলকাতার নামি এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। একদিন স্কুলে 'হোমওয়ার্ক' তৈরি না হওয়ায় শিক্ষিকারা ওকে যে শাস্তি দেন তা একটা ওই বয়সের বাচ্চার পক্ষে আদৌ মানবিক নয়। এরপর থেকে প্রায়ই ঐ বাচ্চা আতঙ্কের নানা স্বপ্ন দেখে রাতে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে ওঠে। ঐ বাচ্চা এখন এক জন মনোরোগী। বাবা মায়ের সঙ্গে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যায় নিয়মিত। 'শিক্ষা ব্যবসা'র সঙ্গে জড়িত অপরাধ বা আত্মনিধনের ঘটনা আমাদের চারপাশে এখন ঘটে চলেছে অবিরত। শিশু বা কিশোরকিশোরীদের নরম, স্পর্শকাতর মনের ওপর চারপাশের অমানবিক আঘাতের প্রতিফলন ঘটছে কিছু বাচ্চার স্বপ্নে।

বাচ্চারা অনেকসময় স্বপ্নে ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি বা রাগারাগি করে। এরকম স্বপ্ন দেখে হয়তো কোনও বাচ্চা চিৎকার করে উঠল ঘুমের মধ্যে। একটি সাত বছরের বাচ্চার বাবা আমাকে জানান, বাচ্চা ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে 'মার, মার' বলে চিৎকার করে ওঠে। এক দিন ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়, আগের রাতে সে স্বপ্নে তার এক সহপাঠীকে মারছিল। এই সহপাঠী ছেলেটি স্কুলে তাকে নিয়মিত বিরক্ত করে। নানা ছুতোয় মারে। বাস্তবে ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে, স্বপ্নে ছেলেটি তার রাগ মেটায় ঐ বন্ধুকে মেরে। এক্ষেত্রে, বাস্তব জীবনের প্রতিক্রিয়া চলে এসেছে স্বপ্নে।

বাচ্চাদের স্বপ্নে এরকম প্রতিক্রিয়া আসে বাস্তব জীবনের কোনও উত্তেজনা থেকে। যে উত্তেজনা জেগে অবস্থায় প্রশমিত হয় না। যে কোনও বাচ্চা এরকম স্বপ্ন মাঝেমধ্যে দেখতেই পারে। তবে এরকম স্বপ্ন খুব ঘনঘন দেখলে বুঝতে হবে বাইরের কোনও উত্তেজনা বাচ্চার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। অনেকসময় বাড়িতে বড়দের খুব বেশি চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাটি বা স্কুলে সহপাঠীদের নির্যাতন, শিক্ষকশিক্ষিকার দুর্ব্যবহার বাচ্চার এরকম স্বপ্ন দেখার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পাঁচ-সাত বছর বয়স থেকে বাচ্চাদের নানারকম ইচ্ছা শিক্ষা, পরিবেশ, রীতিনীতি ও ভালোখারাপ বোধ এ সবের প্রভাবে অবদমিত হতে থাকে। এই ইচ্ছাগুলো শিশুর মনের সচেতন অংশ থেকে আস্তে আস্তে চলে যায় অচেতনে। একদিকে কোনও ইচ্ছার এরকম অবদমন, অন্যদিকে তা সচেতনে প্রকাশ পাবার প্রবণতার টানাপোড়েন চলতে থাকে বাচ্চার মনে। কোনও অবদমিত ইচ্ছার বশে হঠাৎ করে কিছু করে ফেললে মনের পাহারাদারের শাসনে বাচ্চা ভয় পায়। বড় বাচ্চাদের ভয় পাবার এটাও একটা কারণ। এই ভয় অনেক সময় বাস্তবের কোনও বস্তু বা জীবে আরোপিত হতে পারে। এরকম বাচ্চা ওই বস্তু বা জীবকে দেখলে অবদমিত ইচ্ছার প্রভাবে অস্বাভাবিক ভয় পায়। কিছু বাচ্চা বিড়াল দেখে, কেউ বা টিকটিকি দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যায়, ছুটে পালায় পাগলের মতো।

আট বছরের মৌমিতা আরশোলাকে ভীষণ ভয় পায়। আরশোলা দেখলেই 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে চিৎকার করে ওঠে। এমনকি আরশোলার ছবি দেখলেও মৌমিতা ভয়ে ছুটে পালায়। এই ভয় চলে আসে ওর স্বপ্নেও। এক রাতে স্বপ্নে ও দেখে হাজার হাজার আরশোলা। আর একদিন অনেক মরা আরশোলা ওদের ফ্ল্যাটের ডাইনিং স্পেসটাকে ভরে ফেলে। দুদিনই আতঙ্কে চিৎকার করে ঘেয়েনেয়ে ওর ঘুম ভেঙে যায়। বাস্তবে বা স্বপ্নে এরকম ভয় একবার দেখা দিলে তা সারাবার একমাত্র উপায় উপযুক্ত মনোবিদের সাহায্য নেওয়া। তা নইলে এরকম ভয় বড় হয়ে গেলেও থেকে যেতে পারে বাস্তবে, স্বপ্নে। এক কবি ছেলেবেলা থেকে ভয় পেতেন টিকটিকিকে। একটা সময় টিকিটিকি সংক্রান্ত নানা ধরনের আতঙ্কের স্বপ্ন দেখে মানসিকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েন, দুরন্ত প্রতিভাবান চল্লিশের এই কবি। ছেলেবেলা থেকে মাকড়সাকে স্বপ্নে দেখে পরদিন বড় অস্থির লাগে পঞ্চাশ অতিক্রান্ত এক মহিলার।

একটু বড় বাচ্চাদের আনন্দের স্বপ্ন

এরকম স্বপ্নের সঙ্গে বড়দের এই জাতীয় স্বপ্নের ফারাক খুব কম। 'ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন' বিভাগে বড়দের যেসব স্বপ্ন আলোচনা করেছি, তার ভেতরকার কিছু স্বপ্নের সঙ্গে ৮ থেকে ১২ বছর বয়সে দেখা বাচ্চাদের কয়েকটা স্বপ্নের অদ্ভুত মিল রয়েছে। বাচ্চাদের এরকম কিছু স্বপ্নের কথা বলি:

স্বপ্ন ১: ইডেনের পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি—মাঠে ঢুকে গেলাম—শচীন তেণ্ডুলকারের সঙ্গে কথা বললাম—একটু এগোতে দেখি সৌরভ গাঙ্গুলী কয়েকজনের সঙ্গে প্র্যাকটিস করছেন—আমি বললাম, 'আমি আপনাদের দলে খেলতে চাই'—উনি বললেন, 'ঠিক আছে খেলবে', বলে আমাকে প্র্যাকটিস করতে দিলেন ওঁদের সঙ্গে।

—অভিষেক (১০ বছর)

স্বপ্ন ২: একদিন দেখলাম, আমি মিলিটারিদের পোশাক পরে গটগট করে হাঁটছি—হঠাৎ দেখি একটা 'মিলিটারি ট্রেনিং সেন্টার'-এ চলে গেছি—একজন মিলিটারি বলল, 'ইনস্পেক্টর টনি, এবার তুমি ট্রেনিং নাও'—কষ্টকর লাফ, দৌড়, বন্দুকের নিশানা—সহজেই সব পেরে গেলাম—একজন 'বড় মিলিটারি' এসে হ্যাণ্ডশেক করল আমার সঙ্গে।

—টনি (১১ বছর)

স্বপ্ন ৩: দেখলাম আমি ফার্স্ট হয়েছি—মিস্ বলবার পর ক্লাসের বন্ধুরা সবাই হাততালি দিচ্ছে—মিস্‌রা সবাই খুব ভালো বলছে—মা-ও স্কুলে গেছেন, বলছেন, 'ও এবার খুব পড়েছে। তাই এত ভালো করেছে'—খুব আনন্দ হচ্ছে আমার।

—কবিতা (১১ বছর)।

স্বপ্ন ৪: দারুণ সুন্দর একটা পাহাড়ের রাস্তায় উঠছি—চারপাশে কি সুন্দর সুন্দর গাছ—রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে—হঠাৎ দেখি সামনে ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে বললেন, কি বর চাও বল—আমি বললাম আমাকে পরী করে দাও— অমনি আমি পরী হয়ে ডানা মেলে উড়তে শুরু করে দিলাম—হঠাৎ দেখি আমাদের স্কুলের ওপর দিয়ে উড়ছি—বন্ধুরা সবাই নীচ থেকে হাঁ করে দেখছে—আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে ওরা পারছে না, শুধু আমিই উড়তে পারছি।

—সাধেশ্বরী (১২ বছর)।

স্বপ্ন ৫: দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে—খুলতেই ফেলুদা এসে ঢুকলেন—আমি অবাক, ফেলুদা বললেন, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, আমার সঙ্গে এবারের অভিযানে তোমাকে যেতে হবে'—আমি বললাম, 'কেন তোপসে যাবে না?' উনি বললেন, 'তোপসের খুব জ্বর তাই যেতে পারবে না,—তুমি তো তোপসের মতোই বুদ্ধিমান, এবার তুমিই হবে আমার অ্যাসিসটেন্ট'—তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরছি—খুব আনন্দ হচ্ছে।

—কৌস্তভ (১১ বছর)।

বাচ্চাদের জটিল স্বপ্ন

এবার বাচ্চাদের কয়েকটা কিছুটা জটিল স্বপ্নের কথা বলা যাক। স্বপ্নগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে এসব স্বপ্নের অর্থ কত বিচিত্র। বড়দের স্বপ্নের মতো জটিল হয়ে দেখা দেওয়া এ সব স্বপ্নের 'পরিস্ফুট অংশ' আর 'গভীর অর্থ'র মধ্যে তফাত অনেক।

স্বপ্ন ৬: একটা কাঠের পুরনো বাড়িতে গেছি—বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখি, অনেকগুলো ইংরেজ ছেলে, আমার চেয়ে ছোট। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কোন ক্লাসে পড়?' ওরা বলল, 'আমরা পড়ি না'—এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে এক জন ইংরেজ পুলিশ বেরিয়ে এসে আমার হাতে একটা লাঠি আর কিছু গুলি দিল—।

সাত বছরের সাধিত্রর এই স্বপ্নের অর্থ বহু পরিশ্রম করে খুঁজে পাওয়া গেছে। এই স্বপ্নের সূত্রগুলো এরকম:

(ক) সাধিত্র বাসে করে যে রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায় সেই রাস্তায় অনেকটা ওর স্বপ্নে দেখা কাঠের বাড়ির মতো বাড়ি আছে। এই বাড়ি খানিকটা বদলে ওর স্বপ্নে এসেছে।

(খ) স্বপ্ন দেখবার আগের দিন রাতে ও টেলিভিশনের আন্তর্জাতিক কোনও এক চ্যানেলে একটা ইংরেজি সিনেমার কিছু অংশ দেখেছিল। ঐ সিনেমাতে দেখা একজন ব্রিটিশ রাজপুরুষ ওর স্বপ্নে চলে

এসেছে। ওর স্বপ্নের 'ইংরেজ পুলিশ' আসলে সিনেমায় দেখা ঐ ইংরেজ রাজপুরুষ।

(গ) স্বপ্নের 'ওর চাইতে ছোট' ইংরেজ বাচ্চাগুলো এসেছে ওদের বাড়িতে থাকা একটা ইংরেজি বইয়ের পাতা থেকে। সে বইয়ের ঐ পাতাটা বহুবার দেখেছে।

এই স্বপ্নের প্রথম অংশে ইংরেজ বাচ্চাগুলো স্বপ্নদ্রষ্টার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছে, ওরা পড়ে না। অর্থাৎ স্কুলে যায় না। স্বপ্নের বাড়িটাও আসছে স্কুলে যাতায়াতের পথে প্রায় রোজই চোখে পড়া একটা বাড়ির স্মৃতি থেকে। এই স্বপ্নের অপরিস্ফুট অংশের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে 'স্কুল' জড়িত থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধিত্রর 'স্কুলে যেতে একটুও ভালো লাগে না'। তার কারণ, স্কুলে ওর চাইতে বেশি শক্তির বড় ছেলেরা ওকে প্রায়ই ধাক্কা মারে, ফেলে দেয়। মুখ বুঁজে এই অত্যাচার সহ্য করতে হয় ওকে। খালিহাতে ওদের সঙ্গে যুঝে ওঠার সাহস বা শক্তি সাধিত্রর নেই।

স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশের ইংরেজ রাজপুরুষের লাঠি আর গুলি সাধিত্রর হাতে তুলে দেবার কারণটা লুকিয়ে আছে এই জায়গায়। 'পুলিশ' এর হাতে লাঠি আর গুলি থাকে বলে 'পুলিশ শক্তিমান'। অন্তত বাচ্চারা তাই ভাবে। সাধিত্রর 'ইংরেজ পুলিশ'-এর কাছ থেকে বন্দুকের গুলি আর লাঠি পাওয়ার অর্থ, ওর নিজের আরও 'শক্তিমান' হয়ে ওঠা। যাতে স্কুলের ঐ ছেলেরা অত্যাচার করতে এলেই সে রুখে দাঁড়াতে পারে, পাল্টা মার দিতে পারে। মনের গোপন এই ইচ্ছার কাল্পনিক পরিপূরণ ঘটছে স্বপ্নে। প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে, স্বপ্নদ্রষ্টার স্কুলে না যাবার ইচ্ছা থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, এই ইচ্ছা এই স্বপ্নের মূল অর্থ নয়। স্বপ্নের মূল অর্থ অকারণে, বিনা প্ররোচনায় ওর ওপর নির্যাতন চালায় স্কুলের যে ছেলেরা, নিজের শক্তি বাড়িয়ে তাদের মুখোমুখি উপযুক্ত শাস্তি দেবার ইচ্ছা।

স্বপ্ন ৭: আমি, মা আর দাদু একটা লরিতে করে কোথাও একটা যাচ্ছি—দাদু মাঝপথে এক জায়গায় নেমে গেল। বলল, 'তোমরা যাও, আমি এখানেই থাকব।'—একটু বাদে লরিটা এঁকেবেঁকে চলতে শুরু করল—হঠাৎ উলটোদিক থেকে আসা একটা লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগল—জোর ধাক্কা—আমার কিছু হয় নি। মায়ের কপাল ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হচ্ছে—খানিকবাদে মা অজ্ঞান হয়ে গেল। ঘুম ভেঙে মনটা খুব খারাপ হয়েছিল।

এগারো বছরের শর্মিষ্ঠার স্বপ্নের খুঁজে পাওয়া সূত্রগুলো এরকম:

(ক) বছর পাঁচেক আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে একবার লরির কেবিনে অনেকদূর পাড়ি দিতে হয়েছিল। মালপত্রসুদ্ধ ওঁর বাবা যাচ্ছিলেন নতুন কর্মস্থলে।

(খ) শর্মিষ্ঠার মামাবাড়ি ধানবাদে। মামাবাড়িতে দাদু ওকে ভালোবাসেন খুব। দাদুর কাছে থাকতে একেবারে ছোটবেলা থেকেই খুব ভালোবাসে শর্মি।

(গ) আগের দিন সকালে খবরের কাগজে একটা বাস আর লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের খবর ছাপা হয়েছিল ছবিসুদ্ধ। এই দুর্ঘটনা সামান্য অদলবদল হয়ে চলে এসেছে শর্মিষ্ঠার এই স্বপ্নে।

(ঘ) মায়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ভালো নয়। মা ওকে প্রায়ই মারেন, বকেন। ওর ধারণা, মা ভালোবাসেন ছোট ভাইকে, ওকে নয়।

(ঙ) বছর তিনেক আগে ওর এক মেসোমশাই পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে দিন দুই বাদে হাসপাতালে মারা যান।

শর্মির স্বপ্নে লরি করে যেতে যেতে ওর দাদুর মাঝপথে নেমে যাওয়া বিশেষ একটি সূত্র। পাঠক খেয়াল করবেন, দাদু যতক্ষণ লরিতে ছিলেন ততক্ষণ লরি চলছিল ঠিকঠিক। তার কিছুক্ষণ পর থেকেই লরি চলতে শুরু করে এলোপাথাড়ি। যার পরিণতি উলটোদিক থেকে আসা লরির সঙ্গে সংঘর্ষ। দুর্ঘটনায় শর্মি অক্ষত, অথচ ওর মায়ের কপাল ফেটে রক্ত বার হচ্ছে। এটা এই স্বপ্নের আর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এর সঙ্গে কয়েকবছর আগে মেসোর মাথায় চোট লেগে মারা যাবার ঘটনা পাশাপাশি রেখে দেখতে হবে। এই স্বপ্নের গোপন অর্থ স্বপ্নদ্রষ্টার অচেতন মনে মায়ের মৃত্যুকামনা। যা মনের প্রহরীর প্রভাবে অনেক ঘুরপথে স্বপ্নে এসেছে। প্রশ্ন উঠবে দুর্ঘটনায় মা আহত হওয়ার ঘুম ভেঙে

স্বপ্নদ্রষ্টার মনে কষ্ট তাহলে আসছে কেন? এটা হচ্ছে, মায়ের মৃত্যুকামনার মতো সমাজের চোখে 'গর্হিত' একটা অচেতন ইচ্ছা স্বপ্নে চলে আসবার জন্য।

এই স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যার সঙ্গে অনেক পাঠক একমত নাও হতে পারেন। কেউ বলতে পারেন, ওইটুকু বাচ্চার মনে এরকম 'জঘন্য ইচ্ছা' আসতে যাবে কেন? এরকম প্রশ্ন মনে এলে আমি পাঠককে 'প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন' অধ্যায় আবার একবার ভালোভাবে পড়ে দেখতে অনুরোধ করব। তারপরও শর্মিষ্ঠার স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে না পারলে সংশ্লিষ্ট উৎসাহী পাঠক জানা সূত্রগুলোর ভিত্তিতে এই স্বপ্নের অন্য কোনও অর্থ খুঁজে পেতেই পারেন।

স্বপ্ন ৮: স্বপ্নে দেখলাম আমি স্টেশনের একদিকের প্ল্যাটফর্মে, বাবা অন্যটায়—বাবার কাছে আসব বলে আমি ওভারব্রিজে উঠলাম।—হঠাৎ ওভারব্রিজটা দড়ির ব্রিজ হয়ে গেল। অথচ তার ওপর কংক্রিটের স্ল্যাবগুলো পাতা—আমি হাঁটছি আর ব্রিজটা খুব দুলছে—দুলতে দুলতে দড়ির ব্রিজটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল—প্রচণ্ড ভয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল।

আট বছর বয়সে দেখা এই স্বপ্নটার কথা আজও সৌম্য খুব ভালোভাবে মনে করতে পারে। এখন ক্লাস টুয়েলভ-এর ছাত্র সৌম্য থাকে দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত অঞ্চলে। যে বছর ও স্বপ্নটা দেখে তখন ওর বাবা কর্মসূত্রে কলকাতার কাছেই এক শিল্পাঞ্চলে থাকতেন। আর কোনও একটা স্টেশনের একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে প্রায়ই ওভারব্রিজে উঠতে হত ওদের। সৌম্য ভীষণ ভয় পেত স্টেশানের ওপরকার উঁচু ওভারব্রিজে উঠতে।

সৌম্য যখন এই স্বপ্ন দেখে তার কিছু দিন আগে বাবার নতুন চাকরির সুবাদে মা-বাবার সঙ্গে ও কলকাতায় চলে যায়। জন্মের পর থেকে ওই বয়স পর্যন্ত ও থেকেছে যৌথপরিবারে। বড় হয়েছে দাদু, ঠাকুমার কোলে চেপে। দাদু, ঠাকুমা আর কাকারা ছিল ওর খুব প্রিয়। মফস্বল শহরের বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় সৌম্য যেতে চায় নি, খুব কান্নাকাটি করেছিল। পরে আস্তে আস্তে ব্যাপারটাতে ও রপ্ত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বাবা মায়ের সঙ্গে আসত দাদু ঠাকুমার বাড়িতে।

স্বপ্নে সৌম্য রেললাইনের একদিকের প্ল্যাটফর্মে, ওর বাবা অন্যদিকে। মাঝে একটা ওভারব্রিজ। ও যাচ্ছে বাবা যে প্ল্যাটফর্মে রয়েছেন সেটায়। যেতে যেতে ওভারব্রিজে উঠতেই শুরু হয়েছে স্বপ্নকল্পনার কাজ। লোহার ওভারব্রিজ দড়ির ওভারব্রিজ হয়ে দুলতে দুলতে ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। এখানে ওর দেখা সার্কাসের ট্রাপিজের খেলার এক টুকরো ছবি ঢুকে পড়েছে। ওভারব্রিজটা ভেঙে বা ছিঁড়ে পড়ে যায়। কারণ সৌম্য ওর বাবার কাছে যেতে চাইছে না। বাবার কাছে যাওয়া মানেই ট্রেনে চেপে হাওড়া হয়ে কলকাতায় যাওয়া। দাদু-ঠাকুমার কাছ থেকে চলে যাওয়া। যা সৌম্যর অবচেতন বা অচেতন মন চাইছে না।

সৌম্য চাইছে দাদু ঠাকুমার কাছেই থেকে যেতে। ওর মনের এই ইচ্ছা জটিলভাবে এই স্বপ্নে পূর্ণ হচ্ছে। ওভারব্রিজ ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ায় অবচেতন বা অচেতন মনে আনন্দ দেখা দিলেও, সচেতনে এই আনন্দ বদলে যাচ্ছে ভয়ে। কারণ বাবার সঙ্গে কলকাতায় ওদের বাড়িতে ফিরে না যাওয়ার ইচ্ছা আদৌ 'নৈতিক' নয়। এরকম অনৈতিক ইচ্ছা স্বপ্নে আসছে বলেই বাচ্চার স্বপ্ন হয়েও এই স্বপ্ন সহজ সরল নয়, কিছুটা জটিল।

ব্রিজটা দুলতে দুলতে ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে ছিল স্বপ্নটার গোপন অর্থ।

দড়ির ব্রিজ ছিঁড়ে যাওয়ায় ভয়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ার এই স্বপ্নকে কেউ 'ওপর থেকে পড়ে যাবার' স্বপ্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। এভাবে এই স্বপ্নকে দেখা, স্বপ্নটিকে বিশ্লেষণ করবার পর সম্ভব হচ্ছে না।

অন্যকে সাহায্য করার স্বপ্ন

বাচ্চারা আত্মকেন্দ্রিক। নিজের সুখকে কেন্দ্র করে মূলত আবর্তিত হয় বাচ্চার মনোজগৎ। আবার মানুষের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা বাচ্চাদের বিচলিত করে সহজেই। ভিখারি দেখলে ছোট বাচ্চা মা-বাবাকে

বলে তার হাতে পয়সা দিতে। পয়সাটা সে ভিখারিকে দেবে। যে বাচ্চা সামান্য একটা খাবারের ভাগ নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মারপিট পর্যন্ত করে, সেই খিদেয় কাতর মানুষকে অবলীলায় তার সবটুকু খাবার বা টিফিনের পয়সা দিয়ে দেয়। ক্ষুধার্ত কুকুরছানাকে দিয়ে দেয় তার ভাগের সবটুকু দুধ। শিশু মনের এই সরল প্রবণতা তার স্বপ্নেও চলে আসতে পারে। এরকম কিছু স্বপ্নের কথা বলি:

স্বপ্ন ৯: একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি রাস্তায় একজন পঙ্গু লোক পড়ে আছে। তার গায়ে কাদা, গোবরমাখা। ওকে দেখে আমার খুব দুঃখ হল। রাস্তা দিয়ে যেই যাচ্ছে লোকটা তাকেই বলছে—আমার খুব খিদে পেয়েছে—সবাই তার কথা না শুনে চলে যাচ্ছে—আমি ওর পাশে গিয়ে বললাম, 'তোমার কি হয়েছে?' সে খুব ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দেবে?' আমার কাছে একটাও পয়সা ছিল না, শুধু একটা ঘড়ি ছিল—আমি একজন দোকানদারকে ঘড়িটা দিয়ে ওর জন্য খাবার কিনে আনলাম—লোকটা গোগ্রাসে খেতে লাগল—সে বলল, ' ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন!'

—শিবশঙ্কর (১০ বছর)।

স্বপ্ন ১০: একদিন স্বপ্ন দেখলাম মহাদেব জেঠুর (বাড়ির চাকর, বুড়ো হয়ে যাওয়ায় কাজ ছেড়ে মুর্শিদাবাদে দেশে ফিরে গেছে) খুব অসুখ, আমি কিভাবে যেন ওর বাড়িতে চলে গেছি—আমাকে দেখে ও বলল, 'আমি আর বাঁচব না গো!' আমি বললাম, 'কেন তোমার কি অসুখ? ডাক্তার দেখাওনি কেন?' সে বলল, ' ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই'—আমি ছুটে আমাদের পাড়ার ডাক্তারবাবুকে ডেকে ওর বাড়ি নিয়ে গেলাম—ডাক্তারকাকু ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন—আমি ওকে ওষুধ খাওয়ালাম—খুব ঘুম পাওয়ায় ওর পাশে ঘুমিয়ে পড়লাম—একটু পরে উঠে দেখি মহাদেব জেঠু ভালো হয়ে গেছে, হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।

—প্রদীপ্ত (১১ বছর)।

এরকম আরও বেশ কিছু স্বপ্ন বাচ্চাদের থেকে পেয়েছি। এরকম স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার আর্ত, দুঃখীর উপকার করবার ইচ্ছা পূর্ণ হয় কাল্পনিকভাবে। বাস্তবে এরকম ইচ্ছা থাকলেও বাচ্চারা তাদের সীমিত সামর্থ্যে মানুষের দুঃখে কষ্টে সাহায্য করতে পারে না। তাই স্বপ্নে কারও বিপদ হলে তার জন্য যথাসাধ্য করে ফেলে অনেক বাচ্চা।

শিশুর কল্পনা, দিবাস্বপ্ন আর স্বপ্নকল্পনা

শিশুর মন কল্পনাপ্রবণ। কল্পনার জোরে শিশু নিজেই নিজের আলাদা একটা জগৎ তৈরি করে নেয়। বাচ্চাদের সেই জগৎটা ওদের একান্ত নিজস্ব। বাস্তব জগতের সঙ্গে সেই কল্পলোকের কোনও সম্পর্ক নেই। এর নিয়মকানুন, আদবকায়দা কোনও কিছুই বাস্তব জগতের সঙ্গে মেলে না। এই কল্পনার জগতে ডুবে থেকে শিশু অপার আনন্দ পায়। ছোট বাচ্চারা নিজের মনে একাএকা অনেক কথা বলে। কথা বলে গাছ, পাখি, লতা, পাতা, ফুল, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে। এদের ভাষা যেন ওরা বুঝতে পারে। ওদের মধ্যে প্রাণ খুঁজে পায়। খেলনা, পুতুল, খাট, আলমারি, ঘরের দেয়াল, সাইকেল, গাড়ি, দরজা, জানালা—সবকিছুর সঙ্গেই বাচ্চারা কথা বলে। বকে, শাসন করে, আদেশ দেয়, আদর করে।

শিশুর মনের বিকাশে তার কল্পনাশক্তির রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। স্বপ্নে যেমন কোনও একটা কথা বা ধারণা দ্রুত ছবিতে রূপ নেয়, বাচ্চাদের কল্পনাতেও অনেকটা তাই। আব্দুল মাঝির গল্প শুনতে শুনতে সে মনে মনে মাথাকামানো ছুঁচলো দাড়ি মাঝির একটা অবয়ব মনের মধ্যে তৈরি করে নেয়। রাক্ষসীরাও বাচ্চার মনে নির্দিষ্ট অবয়বের। বাচ্চার কল্পনায় শুধু এরা নয় পরী, ভগবান, রাজপুত্র, রাজকন্যা, এরাও থাকে নির্দিষ্ট চেহারার অস্তিত্ব নিয়ে। যে কোনও একটা গল্প শুনলে শিশু মনে সেই গল্প দ্রুত চলচ্চিত্রায়িত হতে থাকে। বাচ্চাদের কল্পনায় চলচ্চিত্রায়ন বা নাট্যায়নের এই পদ্ধতি অনেকসময় বড় হবার পরও কিছুটা থেকে যায়। তবে বাস্তবের চাপে আর আঘাতে বেশিরভাগ বড় হয়ে যাওয়া মানুষের

মনে শিশুসুলভ তীব্র কল্পনাশক্তি যায় হারিয়ে।

বাচ্চাদের কল্পনাশক্তির কোনও গল্প, কাহিনী বা ভাবনাকে দ্রুতলয়ে ছবিতে রূপ দেবার এই বিশেষ ক্ষমতা তাকে দিবাস্বপ্ন দেখায়। ঘরের দেয়ালে মাথা ঠুকে গেলে, ব্যথা দেবার জন্য ছোট্ট টুবাই দেয়ালকে বকে, শাসন করে। আড়াই বছরের তিয়া একা থাকলে কথা বলে দরজা জানালা, খাট-আলমারির সঙ্গে। ছ-বছরের সৃষ্টি ঘরের বিভিন্ন জায়গার নানা আসবাবকে সাতটা 'ভূত বানিয়ে পোষে'! এই সাতটা ভূত শুধু সৃষ্টির কথাই বোঝে, ওর শাসন মেনে নেয়। বিনিময়ে সৃষ্টি ওদের খেতে দেয়, আদর করে, দুঃখের কথা বলে। যে বাচ্চা বাড়িতে বা বাইরে যত বেশি একা থাকবার সুযোগ আর সময় পায়, তার দিবাস্বপ্নের জগৎও হয় তত ব্যাপক আর বিচিত্র।

কল্পনা, দিবাস্বপ্ন আর স্বপ্নের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের সঙ্গে বড়দের খানিকটা তফাত রয়েছে। বড়রা 'কাজের মানুষ'। বাস্তবের হাজারটা প্রয়োজন তাদের অবিরত কল্পনার জগতে ঢুকে পড়তে বাধা দেয়। বাচ্চাদের পৃথিবীটা ঠিক এর উলটো। বড়রা ইচ্ছে করলেই যখন তখন দেখতে পারে না। খুব ব্যতিক্রমী সামান্য কিছু মানুষ ছাড়া বড়রা সাধারণত মনে মনে এমন একটা জগতে ঢুকে পড়তে পারে না, যেখানে একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকে অবলীলায়। বাচ্চারা প্রায় সবাই তা পারে। বাচ্চাদের আর বড়দের দিবাস্বপ্ন দেখায় একটা মিল অবশ্য রয়েছে। দিবাস্বপ্নে ডুবে থাকবার সময় বাস্তবের সঙ্গে যে কোনও মানুষের যোগাযোগ আংশিকভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। কেউ জোরে ডাকলে বা জোরদার কোনও আওয়াজ হলে মুহূর্তে এই স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে যেতে পারে। তা নইলে মনে স্বপ্নের মতো এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

কল্পনার মতো দিবাস্বপ্নও বাচ্চার মনের গঠনের, মানসিকতার বিকাশের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় এক মাধ্যম। বাচ্চার কল্পনা আর দিবাস্বপ্নের জগৎ বিপর্যস্ত হলে বা খুব বেশি বাধা পেলে তার মনের বিকাশ বিপর্যস্ত হতে পারে। বাচ্চার মনের পরিণত হয়ে ওঠার পথে ঘুমিয়ে দেখার স্বপ্নও তাকে বেশ খানিকটা সাহায্য করে। আনন্দের স্বপ্ন দিনের ব্যথা সারায়। স্বপ্নের বল পাওয়া, আইসক্রিম খাওয়া বা উঁচু পাহাড়ের মাথায় ঘুরে বেড়ানো তার জেগে থাকা অবস্থার না-পাওয়াকে মিটিয়ে মনকে শান্ত করে। ভয়ের স্বপ্ন তার মনের জোর বাড়ায়। বাস্তবের উত্তেজক অবস্থার প্রতিক্রিয়ার স্বপ্ন তার মনের উত্তেজনাকে বাইরে বার করে দিতে সাহায্য করে। মনের ব্যথা সারাতে, আনন্দের পথে বাধা দুব করে দিতে, অতিরিক্ত উত্তেজনা কমাতে আর মনের জোর বাড়াতে স্বপ্ন দেখা প্রত্যেক বাচ্চার প্রয়োজন।

ফ্রয়েডের সমসাময়িক পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকজন স্বপ্নগবেষক মনোবিদ বিশেষভাবে বাচ্চাদের স্বপ্ন নিয়ে কাজ করেছেন। এঁরা বাচ্চাদের স্বপ্ন বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে শিশুর স্বপ্নজগৎ নিয়ে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারেন। এঁদের মধ্যে জে. জে. পুৎনাম, জে. ভন হাগ্-হেলমুট, এস. স্পিলরিন, ভি. টস্ক—এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ স্বপ্নবিশ্লেষক মনোবিদ এ. উহগ্যাম বাচ্চাদের স্বপ্ন নিয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে, বাচ্চাদের স্বপ্ন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরল ইচ্ছাপূরণ। 'ফোবিয়া' বা আতঙ্করোগে আক্রান্ত একটি পাঁচ বছরের বাচ্চার স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড দেখান, খুব সামান্য সময়ে বাচ্চার স্বপ্নে প্রচুর পরিমাণ উপাদান এসে জমা হতে পারে। বিশিষ্ট স্বপ্নবিদ ইয়ুনও (C. G. Jung) স্বপ্ন নিয়ে তাঁর গবেষণায় বাচ্চাদের স্বপ্নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিশুর কল্পনাপ্রবণতা তার স্বপ্নকল্পনাতেও প্রবলভাবে প্রতিফলিত। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে বাচ্চাদের স্বপ্নকল্পনার কিছু স্বকীয়তা অবশ্যই রয়েছে। যা শিশুমনের কিছু বিশেষ ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। বাচ্চার স্বপ্নে ভূত, পেত্নি, দত্যিদানো যে এত বেশি চলে আসে, তার জন্য দায়ী অলীক এই ব্যাপারগুলোকে নিয়ে শিশুমনের অবাধ কল্পনা। জড়বস্তুও শিশুর কল্পনায় কথা বলে, রাগ করে, দুঃখ পেয়ে কাঁদে। এর কারণ অনুমান করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। বাচ্চাদের বেশ কিছু স্বপ্নে দেয়াল, আলমারি, খাট থেকে শুরু করে গাছ-পাতা ফুল, ফল, মিষ্টির মানুষের মতো আচার-আচরণ লক্ষ করা যায়। আর শিশুর স্বপ্নে এসব কিছুই আসে বাস্তবের চাইতে আকার-আকৃতিতে বহুগুণ বড় হয়ে। এর কারণ আগে বলেছি।

ন-বছরের সুইটির একটা স্বপ্নে একটা 'বিরাট গাছ' এসেছিল পেল্লায় সাইজের হাত পা নিয়ে। সুইটি ধরতে গেলেই গাছটা দৌড়ে পালাচ্ছিল। সাত বছরের টুয়ার স্বপ্নে একটা আমগাছ এক দিন বাঁদর আম

ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ায় 'ব্যথা পেয়ে খুব কাঁদছিল!' সাড়ে সাত বছরের তিতি একদিন স্বপ্নে একটা পুতুল পায়, যেই পুতুলটা মানুষের মতো ওর বাড়ির সব কাজ করতে পারে। টিভি চালায়, রান্না করে, তিতির ছোট ভাইকে প্যারামবুলেটারে বসিয়ে বেড়াতে নিয়ে যায়। সাত বছরের সৃষ্টি একটা পাতার ওপর বসতেই, পাতার পাশের ফুল পাপড়ি মেলে উড়তে থাকে। উড়তে উড়তে ওকে নিয়ে যায় একটা অচেনা গ্রহে। যে দেশের মাটির রঙ কালো আর আকাশ বরফের মতো সাদা। সেই গ্রহের বিরাট বড় বড় মানুষেরা বড় বিচিত্র। ওরা হাঁটে মাথার ওপর ভর দিয়ে। চলার সময় ওদের পা দুটো থাকে সোজা ওপরে!

নদীয়া জেলার রানাঘাটের ৭ বছরের বাচ্চা শুভদীপ বিশ্বাস। শুভদীপের একটা স্বপ্নের বিবরণ শুনলে বোঝা যায় শিশুর স্বপ্নকল্পনা কত বিচিত্র হতে পারে। শুভদীপের স্বপ্নটা এরকম:

'আমি ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ ব্রিজটা উধাও। একটা লোক বাতাসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল— লোকটা আমাকে দেখে বলল, 'আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন?' আমি বললাম, 'এই তো ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছি।' লোকটা বলল, 'কোথায় ব্রিজ?' আমি নীচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। সত্যিই তো ব্রিজ নেই! লোকটা ডানদিকে আঙুল তুলে বলল, ঐ যে নদীটা দেখতে পাচ্ছেন, তার ওপরে ব্রিজ। আমি ওদিকে এগিয়ে চললাম। আবার সেই ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছি। একটু বাদে ব্রিজটা সূর্য হয়ে গেল। আর সূর্য ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ডুবে গেলাম।'

রানাঘাটের ১৭ বছরের ছাত্রী লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য, তার ৬-৭ বছর বয়সে বারবার দেখা একটা স্বপ্নের কথা আজও স্পষ্ট মনে করতে পারে। স্বপ্নটা হুবহু তুলে দিচ্ছি লোপামুদ্রার ভাষায়। 'একটা সুন্দর মাটির বাড়ি। তার এদিকওদিক কিছু অন্য গাছ আর কলা গাছ। সুন্দর ফুলের বাগান। আমি বেড়াতে বেড়াতে পা পিছলে পড়ে গেলাম। হঠাৎ রাক্ষসের মতো কদাকার কয়েকটা লোক আমাকে পা ধরে টানতে লাগল। আমি খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি—এই সময় বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে করতে হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম।' ঠিক এই সময় ঘুম ভেঙে যেত লোপার। ও দেখত, বালিশ ছাড়িয়েও উঁচুতে উঠে গেছে। আর বালিশটা ওর পিঠের তলায়।

এই স্বপ্নের উদ্দীপনা ঘুমের মধ্যে পিঠে বালিশের চাপ আর তা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা। বিচিত্র গতির শিশুমনের স্বপ্নকল্পনা এই স্বপ্নের স্রষ্টা।

আট বছরের দেবজ্যোতির একটা স্বপ্ন বাচ্চাদের বিচিত্রগতির স্বপ্নকল্পনার বিবরণ। ও আর ওর ভাই একসঙ্গে উড়ে উড়ে চলেছে। দু জন নামল একটা হলুদ পাহাড়ে। দুই ভাই মিলে খড়কুটো দিয়ে একটা ঘর বানায় থাকবে বলে। বাইরে জলের আওয়াজ শুনে বাইরে গিয়ে ওরা দেখে, একটা সাদা কাপড় পরা পেত্নি। ভয়ে ওরা ঘরে একে ঢোকে। একটুবাদে বুঝতে পারে, পেত্নি আসছে। ঘর থেকে বেরিয়ে পেয়ে যায় এক পক্ষীরাজ ঘোড়াকে। ঘোড়ার পিঠে চেপে দুজন পালাতে থাকে উড়তে উড়তে। দূর থেকে দেখে পেত্নীটা একটা ঝোপে পা আটকে মরে গেছে। উড়ে উড়ে ওরা এসে নামে ওদের বাড়ির চত্বরে। সবাইকে বলতে থাকে পাহাড়ের ওই পেত্নির কথা।

শৈশব-স্বপ্নকল্পনার আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। ছ-বছরের এক অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ শিশুর স্বপ্ন। একটা ফ্লাওয়ারভাস থেকে নেমে এসেছে একটা দড়ি। সেই দড়ি বেয়ে স্বপ্নের দর্শক শিশু উঠে যায় মহাকাশে। সেখানে 'লাট্টুর মতো বিরাট বিরাট নক্ষত্র বনবন করে ঘুরছে'। এরকম একটা নক্ষত্রের ওপর উঠে পড়ে শিশু। আর ওকে নিয়ে নক্ষত্রটা ঘুরতে শুরু করে অসীম, অনন্ত মহাকাশে। এত সহজে নক্ষত্রলোকের অসীমের মাঝে স্থান পেয়ে যাওয়া—শিশুর স্বপ্নকল্পনাতেই সম্ভব।

কৈশোরের যৌনস্বপ্ন

বাচ্চার মনের গঠন আর কাঙ্ক্ষিত বিকাশে তার কল্পনা, দিবাস্বপ্ন আর স্বপ্ন একান্তভাবে প্রয়োজন। অবাঞ্ছিত ইঁদুরদৌড় শিশুর কল্পনা আর দিবাস্বপ্নের জগৎকে আঘাত করে, ছোট করে দেয়। এর প্রতিফলন ঘটতে পারে শিশুর স্বপ্নে। শৈশব থেকে কৈশোরে প্রবেশ করবার দিনগুলোতে তার স্বপ্নের জগৎ আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে। কিশোর-কিশোরীরাও দিবাস্বপ্ন দেখে। তবে ভূত-পেত্নি, দৈত্য-

রাক্ষস, গাছ-পুতুল থেকে এই সময় তাদের দিবাস্বপ্নের বিষয়গুলো বদলে যেতে থাকে দ্রুত পড়ার বই, টিভি-সিনেমার ছবি থেকে শুরু করে কিশোরমনের দিবাস্বপ্ন কেন্দ্রীভূত হয় কিছু একটা হবার, করে দেখাবার ইচ্ছায় আর যৌনতায়।

যৌনস্বপ্ন কিশোরকিশোরীর সুস্থ যৌনতার বিকাশের জন্য একাধিক প্রয়োজনের একটা। এ নিয়ে অহেতুক ভয় পাবার বা চিন্তিত হবার কিছু নেই। ভয় পাবার কারণ নেই তথাকথিত 'স্বপ্নদোষ' নিয়ে। এটা খুব স্বাভাবিক একটা শারীরিক ব্যাপার। আদৌ কোনও 'দোষ' নয়। এতে শরীর খারাপ হবার ধারণা পুরোপুরি ভুল। শিশুমনের বিকাশের পাশাপাশি, শিশুর বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বপ্নও ক্রমাগত বদলাতে থাকে। আর এথেকে শিশু মনের ঠিকঠিক বিকাশের ইঙ্গিত মেলে। কোনও বাচ্চা একই স্বপ্নের মধ্যে বহুকাল ধরে আটকে থাকলে তা বাচ্চার মানসিকতার স্থবির অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। শিশু মনের বিবর্তনে, শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবকে রূপান্তরের দিনগুলোতে স্বপ্নের গুরুত্ব কম নয়। বাচ্চাদের জীবনে দিবাস্বপ্ন বা স্বপ্ন আজগুবি বা উদ্ভট কোনও বিলাসিতা নয়। স্বপ্ন দেখা বাচ্চার বড় হয়ে ওঠার জন্য আরও অনেক প্রয়োজনের একটা।

দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্ন

দৃষ্টিহান মানুষও স্বপ্ন দেখে। কেউকেউ দেখে জেগে থাকা অবস্থায় দিবাস্বপ্ন। দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্নের জগৎ সব কিছু দেখতে পান এমন মানুষের স্বপ্নের জগতের থেকে আলাদা হবেই। তাঁদের স্বপ্নের দেশটা কি রকম? কিরকম স্বপ্ন দেখেন পৃথিবীর সবটুকু আলো থেকে বঞ্চিত একজন মানুষ? এঁদের দেখা স্বপ্নগুলো আমাদের মতো দৃষ্টিশক্তি রয়েছে এমন মানুষের স্বপ্নের চাইতে কোথায় আলাদা? স্বপ্নে উৎসাহী পাঠকের মনে এরকম বেশকিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জাগবে। দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্ন সংগ্রহ করতে করতে আর সেগুলো বিশ্লেষণ করে এঁদের নিয়ে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা বলি।

প্রথমেই যে বিষয়ে আলোকপাত প্রয়োজন, তা হল দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্নে ছবির স্বল্পতা বা অনুপস্থিতি। জন্মান্ধ যে কোনও মানুষের স্বপ্নে ছবি একেবারে থাকবার কথা নয়। কারণ জন্মের পর থেকে মানুষ, প্রকৃতি বা পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে কোনও দর্শন-অভিজ্ঞতা (Visual Experience) এঁদের হয়নি। পৃথিবী সম্পর্কে জন্মান্ধ একজন মানুষের ধারণা পুরোপুরি তিনি যা শুনেছেন তার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা। এঁদের স্বপ্নে ছবির অভাব মেটাতে শ্রবণ-অভিজ্ঞতা (Auditory Impression) আর স্পর্শ-অভিজ্ঞতা (Tactile Impression) আসে দৃষ্টিহীন নন এমন মানুষের চাইতে অনেক বেশি। অনেক জন্মান্ধ স্বপ্নে গন্ধ পান। দৃষ্টিহীন নন এমন মানুষের স্বপ্নে গন্ধ পাবার অভিজ্ঞতা বিরল।

স্বপ্নে ছবি দেখার অভাব পূর্ণ করতে জন্মান্ধ মানুষের স্বপ্নে তাই স্পর্শ বা ছোঁয়া আর শোনা আসে অনেক বেশি তীব্রতায়। ছবি না থাকলেও শুধু শোনা আর স্পর্শের ওপর নির্ভর করে স্বপ্ন দেখতে দেখতে জন্মান্ধ স্বপ্নদ্রষ্টার মনে নানা ধরনের অনুভূতি দেখা দেয়। এঁদের স্বপ্নে ছবির অভাব থাকলেও এতটুকু অভাব নেই শোক, দুঃখ, আনন্দ, রাগ বা ঘৃণার। স্বপ্নের অনুভূতির।

জন্মান্ধ নন এমন দৃষ্টিহীন মানুষ পৃথিবীর নানা ধরনের ছবি সম্পর্কে একটা সময় পর্যন্ত ওয়াকিবহাল ছিলেন। তারপর কোনও কারণে তাঁর চোখের সবটুকু আলো গেছে মুছে। এরকম মানুষের স্বপ্নে তাই ছবি থাকে। থাকে শব্দ, স্পর্শ। এঁদের স্বপ্নে ছবি কিভাবে আসবে, কতটা আসবে এ ব্যাপারটা নির্ভর করে কোন বয়সে তিনি চোখের আলো হারিয়েছেন তার ওপর। খুব কম বয়সে দৃষ্টি হারানো মানুষ পরবর্তীকালে স্বপ্নে ছবি দেখেন কম। যেসব ছবি এঁদের স্বপ্নে থাকে তা আসে স্বপ্নের স্মৃতি (Dream Memory) থেকে। তিন বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে এমন তিনজন কিশোর বা কিশোরী জানিয়েছে, তাঁদের দেখা ছবিগুলো 'আবছা, ছায়াছায়া'। এঁদের স্বপ্নে শুনতে পাওয়া আর ছোঁয়া পাবার অভিজ্ঞতা জন্মান্ধদের মতোই তীব্র।

জন্মান্ধ নন এমন দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্নের ছবিতে রঙ থাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষের মতোই। জন্মের পর কোনও রোগে বা দুর্ঘটনায় চিরদিনের মতো চোখের আলো নিভে গেছে এমন মানুষের স্বপ্নে রঙ থাকে না—এমন একটা ধারণার কথা কয়েকজন আমাকে জানান। দৃষ্টিহীনদের নিয়ে স্বপ্নসন্ধানের অভিজ্ঞতায় এরকম ধারণা পুরোপুরি ভুল বলে মনে হয়েছে।

জন্মান্ধ নন এমন দৃষ্টিহীনদের দেখা অনেক স্বপ্ন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির মানুষের মতোই। এই স্বপ্নগুলো হল:

(১) জীবিত প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন

(২) মৃত প্রিয়জন জীবিত, এরকম স্বপ্ন

(৩) বেড়ানোর স্বপ্ন

(৪) পড়ে যাবার স্বপ্ন

(৫) যৌনস্বপ্ন
(৬) ঠাকুরদেবতার স্বপ্ন
(৭) ভয়ের স্বপ্ন
(৮) জলে ডুবে যাবার স্বপ্ন
(৯) ভূতপ্রেত বা রাক্ষসের স্বপ্ন
(১০) পড়াশোনা করছে বা করেছে এমন দৃষ্টিহীন মানুষের ক্ষেত্রে পরীক্ষার স্বপ্ন
(১১) সাপের স্বপ্ন
(১২) ভালোমন্দ খাওয়ার স্বপ্ন

আমার স্বপ্নসন্ধানে যে সব দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্ন সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে কেউ যে সব স্বপ্ন দেখেন না বা দেখেন নি সেগুলো হল:

(১) ওড়ার স্বপ্ন
(২) উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন
(৩) মুদ্রা বা টাকা কুড়ানোর স্বপ্ন
(৪) ট্রেন মিস করবার স্বপ্ন
(৫) দাঁত তোলার স্বপ্ন

তবলিয়া এক জন্মান্ধর দেখা কিছু স্বপ্নর কথা বলি। ভদ্রলোকের বয়েস ৫৯ বছর।

স্বপ্ন ১: তবলা বাজাচ্ছি। বা কেউ বাজাচ্ছেন, আমি শুনছি। (এরকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখি)

স্বপ্ন ২: ওস্তাদ কেরামতউল্লা খাঁ সাহেব আমাকে তবলা শেখাচ্ছেন। হাতে ধরে দেখাচ্ছেন, বোল কিভাবে বাজাতে হয়।
(এই গুরুর কাছে এককালে ভদ্রলোক তালিম নিয়েছেন।)

স্বপ্ন ৩: অনেক ওপর থেকে পড়ে যাচ্ছি, ঘুম ভেঙে যায়।

স্বপ্ন ৪: নদীর জলে বা পুকুরের জলে সাঁতার কাটছি—ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় শরীরে খুব আরাম হচ্ছে—ভীষণ আনন্দও লাগছে। (স্বপ্নদ্রষ্টা বাস্তবে সাঁতার জানেন।)

স্বপ্ন ৫: দাদু যেন মারা গেছেন, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি—বাড়িতে সবাই খুব কান্নাকাটি করছে। (দাদু মারা গেছেন বহু দিন আগে।)

আরও বেশ কয়েকজন জন্মান্ধর দেখা কিছু নির্বাচিত স্বপ্ন এখানে তুলে দিচ্ছি। এঁদের দেখা স্বপ্নের অনুভূতি আর বৈচিত্র্য বুঝতে এই স্বপ্নগুলো সাহায্য করে:

স্বপ্ন ১: খুব বৃষ্টি হচ্ছে, আমি ভিজছি—প্রথমে খুব আনন্দ হচ্ছিল—একটুবাদে জামাকাপড় ভিজে শীত করতে শুরু করল—কে যেন একটা বলছে, 'এত ভিজবেন না, অসুখে পড়বেন।' একটু ভয় ভয় করতে শুরু করল—জ্বরে পড়ে যাব না তো।

[৪৮ বছর, দাদার সংসারে আছেন, কর্মহীন]

স্বপ্ন ২: ট্রেনে গান গাইতে গাইতে ভিক্ষা করছি—খুব ভিড়—এদিক ওদিক থেকে লোকের চাপ লাগছে শরীরে—এক জন গানের খুব প্রশংসা করছেন—অনেকগুলো টাকা (কয়েন) ফেললেন আমার বাটিতে, খুব আনন্দ হচ্ছে।

[৩৭ বছর, বিবাহিত, স্ত্রীও দৃষ্টিহীন, দুজনে একসঙ্গে গান গেয়ে ভিক্ষে করেন]

স্বপ্ন ৩: একটা জায়গায় বেড়াতে গেছি—জায়গাটা একটা পাহাড়। পায়ে ঠাণ্ডা পাথরের স্পর্শ পাচ্ছি—খুব মজা লাগছে, এই প্রথম পাহাড়ে এলাম।

[৩২ বছর, কর্মহীন]

স্বপ্ন ৪: ছোট ভাই (জীবিত) যেন মারা গেছে—বুঝতে পারছি অনেক লোকজন এসেছে—একটু পরে সবাই মিলে বলহরি, হরিবোল বলতে বলতে ওকে নিয়ে শ্মশানের দিকে রওনা হল—সকালে উঠে মনটা খুব খারাপ হয়ে ছিল।

[৪৪ বছর, ধূপকাঠি বিক্রেতা]

স্বপ্ন ৫: বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খাচ্ছি—ওপাড়ার এক জনের মেয়ের বিয়ে—মাংসভাত খাচ্ছি—অনেক রসগোল্লা খেলাম তারপর। খুব আনন্দ লাগছে (ঘুম ভেঙে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।)

[৪০ বছর, ভিক্ষাজীবী]

স্বপ্ন ৬: যেন মা এসেছেন, আমার নাম ধরে ডাকছেন, আমার কাছে এসে সারা শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন— প্রথমে খুব আনন্দ হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কতদিন বাদে মাকে পেলাম, মা বলছেন, 'তুই ভাল আছিস'? আমি বললাম, 'ভাল আছি'—তারপরই মনে হল, মা তো অনেকদিন আগে স্বর্গে গেছেন। মা কোথা থেকে এলেন? খুব আশ্চর্য লাগতে শুরু করল।

[২৭ বছর, দৃষ্টিহীনদের হস্টেলে কাজ]

স্বপ্ন ৭: খুব সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই পায়েস রান্না হচ্ছে। মনে হচ্ছে, পাশের বাড়িতে। ভাবলাম, একটু পায়েস খেতে পেলে বেশ হত।—কে যেন বলে উঠল, 'একটু অপেক্ষা কর, অনেক পায়েস পাবে।'

[১৮ বছর, দৃষ্টিহীন স্কুলের ছাত্র]

স্বপ্ন ৮: খুব হইচই শুনতে পাচ্ছি—কে যেন কানের কাছে এসে বলল, 'চলে যান, এখানে আর দাঁড়াবেন না'—খুব মারপিট হচ্ছে—আমি ছুটতে চাইছি, পাগুলো যেন চলতে চাইছে না—খুব ভয় লাগছে।

[৩৭ বছর, লটারির টিকিট বিক্রেতা]

জন্মান্ধ নন এমন দৃষ্টিহীন মানুষের দেখা কিছু স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করে, এই স্বপ্নগুলোকে দৃষ্টিশক্তি রয়েছে এমন মানুষের দেখা স্বপ্নের চাইতে খুব আলাদা মনে হয়নি। তবে এরকম স্বপ্নে ছবি সাধারণ মানুষের স্বপ্নের চাইতে কম। কথা বা স্পর্শ বেশি। দৃষ্টিহীনদের স্বপ্নে কথা শুধু বেশি নয়, অন্যদের স্বপ্নে যেমন কথা খানিকটা জড়ানো থাকে এঁদের তা নয়। স্বপ্নে এঁরা কথা শুনতে পান আমাদের চাইতে অনেক পরিষ্কার। কথা, হইচই, চিৎকার-চেঁচামেচি, শ্লোগান সব কিছুই। সাধারণের স্বপ্নে স্পর্শ পাওয়া যায় খুব কম। যে কোনও দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্নে শোনার পাশাপাশি ছোঁয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এঁরা বাস্তবে যেমন কোনও মানুষকে বা বস্তুকে স্পর্শ করে অনেক কিছু বুঝতে পারেন, স্বপ্নেও অনেকটা তাই। এঁদের শ্রবণেন্দ্রিয় আর স্পর্শেন্দ্রিয়র অনুভূতিপ্রবণতা (Sensitivity) স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পান এমন মানুষের চাইতে অনেক বেশি। বাস্তবের এই বিশেষ দিক এঁদের স্বপ্নেও চলে আসে।

কলকাতার কাছেই দুটো আবাসিক দৃষ্টিহীন স্কুলের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন সংগ্রহ করা গেছে ঐ দুই স্কুল-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়। এঁরা সবাই 'ব্রেইল পদ্ধতি'তে পড়াশোনা করে। হস্টেলের নিয়মানুবর্তিতায় দিন কাটায়, গল্প করে। করে খেলাধূলাও। এইসব ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে তাদের দেখা নানা ধরনের স্বপ্নের বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা হিসেবে কিছু স্বপ্ন এখানে উল্লেখ করছি—

স্বপ্ন ১: যেন ভূত এসেছে মাথার কাছে। বুঝতে পারি ভয় দেখাচ্ছে—অনেকক্ষণ ধরে ভয় পাবার পর ভয়েই ঘুম ভেঙে যায়। *(সাহস বাড়াবার স্বপ্ন)*

স্বপ্নের দর্শক টিনা দলুই। বয়েস ১৬। বাড়ি কলকাতার গল্ফ গ্রিনে। এই স্কুলের হস্টেলে টিনা আছে সাত বছর।

স্বপ্ন ২: পরীক্ষার আগে এই স্বপ্নটা দেখেছি—সবাই অনেক লিখছে আমি কিছুই লিখতে পারছি না—হাত কিছুতেই চলছে না—সময় শেষ হয়ে আসছে—*(আশ্বাস দেবার স্বপ্ন)*

স্বপ্ন ৩: ছুটিতে বাড়িতে গেলে দেরি করে ঘুম থেকে উঠি—এখানে অনেকদিন ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখি, ছুটিতে বাড়িতে রয়েছি—খুব ভালো ঘুম হয় তখন—হস্টেলের দিদিরা ডাকলেই বুঝতে পারি, হস্টেলেই আছি। ঘুম ভেঙে বাড়ির কথা খুব মনে পড়ে। *(আর একটু ঘুমোবার স্বপ্ন)*

স্বপ্ন ৪: রবিবার দুপুরে ঘুমিয়ে দেখলাম, বাবা হস্টেলে এসেছেন অনেক মিষ্টি নিয়ে। আমি সবাইকে মিষ্টি ভাগ করে দিলাম—নিজেও খেলাম—স্পর্শটা বুঝতে পারলাম—খুব আনন্দ হল—ঘুম ভেঙে দেখি কোথায় কি!

এই স্বপ্ন সরল ইচ্ছাপূরণের। মিষ্টি খাওয়া আর বাবাকে কাছে পাওয়া—এই দুটো সরল ইচ্ছা এই স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হচ্ছে। এই স্বপ্নগুলোর দর্শক টিনা। ও দৃষ্টিহীন হয়েছে জন্মের কয়েকবছর পর। ওর স্বপ্নে ছবি থাকে না, থাকে ছায়া। থাকে কথা আর স্পর্শ।

স্বপ্ন ৫: মাঝেমধ্যে দেখি অনেক পড়াশোনা করে চাকরি পেয়েছি—চাকরি করছি। চাকরির টাকা থেকে বন্ধুদের সাহায্য করছি। *(ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন)*।

স্বপ্ন ৬: কোনও একটা অচেনা জায়গায় ক্রিকেট খেলতে গেছি—প্রথমে ব্যাটিং করছি—অনেক রান হল—তারপর ফিল্ডিং, তারপরই দেখি, আমি বড় ক্রিকেটার—সবাই আমার অটোগ্রাফ নিতে আসছে, অটোগ্রাফ দিচ্ছি। *(ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন)*।

ওপরের দুটো স্বপ্নই ইচ্ছাপূরণের। স্বপ্নদ্রষ্টা লক্ষীনারায়ণের বয়েস এগারো। জন্ম থেকে ওর একটা চোখ অন্ধ। অন্যটায় খুব আবছা দেখতে পায়। পড়াশোনায় খুব ভালো। প্রত্যেক ক্লাসে ফার্স্ট হয়। দৃষ্টিহীনদের বিশেষ পদ্ধতির ক্রিকেটও লক্ষীনারায়ণ খুব ভালো খেলে। ওর চেতন আর অবচেতনের ইচ্ছা তাই পড়াশোনা আর ক্রিকেটকে ঘিরে। এই ইচ্ছাগুলোই স্বপ্নে চলে এসেছে।

আঠারো বছরের বিনুর স্বপ্নে বারবার হানা দেয় ওর ছেলেবেলা। দিদি যেন ছোট হয়ে গেছে। বিনুকে বকছে, মারছে। বিনুর একটা চোখে জন্ম থেকেই আলো নেই। অন্যটায় ভরদুপুরে সাঁঝবেলা। বিনু এক রাতে স্বপ্নের বাসে চেপে হস্টেলের বন্ধুদের সঙ্গে দীঘা যাচ্ছিল। পনেরো বছরের রাধা এক রাতে স্বপ্ন দেখে পাহাড়ে চড়বার। রাধা পুরোপুরি জন্মান্ধ। পাহাড়ের দুধারে যেন খাদ। ভয় লাগে, পাছে পড়ে যায়। পাথরের স্পর্শ পেতে পেতে উঠতে থাকে রাধা। 'খুব আনন্দ লাগে।' স্বপ্ন দেখবার আগের দিন এক বন্ধুর কাছে দার্জিলিং বেড়াবার গল্প শুনেছিল। 'দার্জিলিং মানেই পাহাড়।' দার্জিলিং যাবার তীব্র ইচ্ছে মিটে যায় রাতের স্বপ্নে। সতেরো বছরের সন্তোষ এক রাতে দেখে স্কুল থেকে ওকে বাইরে কোনও একটা জায়গায় সাঁতার প্রতিযোগিতায় নিয়ে গেছে। স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে সাঁতার শুরু করে সন্তোষ। লক্ষ্যে পৌঁছোয় সবার আগে।

খেলাধূলায় দক্ষ আর এক ষোলো বছরের দৃষ্টিহীন যুবক আমাকে তার দিবাস্বপ্নের কথা জানায়। একলা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে ওর মনে অচেনা একটা খেলার মাঠের ছবি ভেসে ওঠে। মাঠে যেন 'স্পোর্টস' হচ্ছে। কোথা থেকে 'শটপাট' (Shotput) ছোঁড়া হচ্ছে, কোথায় রান শুরু হচ্ছে—সব মনে ভেসে উঠতে থাকে। বছর পাঁচেক আগে এই তরুণ স্কুলে স্পোর্টস এর দুটো ইভেন্টে (লং জাম্প আর

'হোয়াইট কেন্ ওয়াকিং রেস') ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল। সেই থেকেই বারবার এই একই ছবি ভেসে ওঠে ওর মনের পর্দায়। ওর অবচেতনে অনেক ইচ্ছা বাসা বেঁধেছে খেলাকে ঘিরে। তাই চলে আসে দিবাস্বপ্নে, স্বপ্নেও। এই তরুণ বছর তিনেক বয়েস থেকে পুরোপুরি দৃষ্টিহীন।

দৃষ্টিহীন মানুষও জীবিত প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে। সাধারণ মানুষের মতো এদের এরকম স্বপ্নে হয়তো অচেতন মনের একই ইচ্ছা কাজ করে। কয়েকটা স্বপ্নের কথা বলি:

স্বপ্ন ১: দেখলাম মা লঞ্চঘাটে পা পিছলে পড়ে মরে গেছেন। সকালে উঠে খুব খারাপ লাগছিল।
[কিশোরী, ১৮ বছর]।

স্বপ্ন ২: বাবা বাড়ি ফেরেন নি—কারা যেন এসে বলছে তোর বাবা আর ফিরবে না। ভীষণ খারাপ লাগে।
[যুবক, ২০ বছর]।

স্বপ্ন ৩: হঠাৎ একদিন দেখি যে আমার জ্যাঠার মেয়ে মারা গেছে। সকালে উঠে কান্না পায়।
[কিশোরী, ১৭ বছর]।

স্বপ্ন ৪: ছুটিতে বাড়িতে গেছি—মাকে ডাকছি, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। আমার সামনে দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে—কে যেন বলল, 'জলের নীচে আয়, মাকে পাবি'।
[কিশোরী, ১৫ বছর]।

দৃষ্টিহীন মানুষের ভয়ের স্বপ্ন বেশ কিছু পেয়েছি। এগুলো অন্যদের দেখা ভয়ের স্বপ্নের চাইতে খুব একটা অন্যরকম নয়। কয়েকটা এরকম স্বপ্ন বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে:

স্বপ্ন ১: হস্টেলে ডাকাত পড়েছে—সব জিনিসপত্র বার না করে দেওয়ায় মারধর করছে বন্ধুদেব, আমাকেও। ওরা বলছে 'সব বার করে দে, নইলে কেটে ফেলব'।—খুব ভয় লাগছে।
—তমাল, ১২ বছর, জন্মান্ধ।

স্বপ্ন ২: জলে চান করতে নেমেছি। কে যেন পা ধরে টেনে জলের গভীরে নিয়ে যাচ্ছে—জলের নিচে নিশ্বাস নিতে পারছি না—দমবন্ধ হয়ে আসছে—খুব ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল।
—তমাল (তমালের স্বপ্নে ছবি বা রঙ কোনওটাই থাকে না)।

স্বপ্ন ৩: কেউ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। চেঁচাতে চেষ্টা করছি—গলা দিয়ে আওয়াজ বার হচ্ছে না—মুখের ওপর যেন কেউ ইট চাপিয়ে দিয়েছে।
—তিন্নি, ১৭ বছর।

স্বপ্ন ৪: কিছু বদলোক আমার পিছু নিয়েছে, প্রাণপণে ছুটছি—খুব ভয় লাগছে। আমার ঠিক পেছনেই ওদের পায়ের আওয়াজ—এই বোধহয় ধরে ফেলল, ভয়ে ঘুম ভেঙে যায় ।
—বান্টি, ১৯ বছর।

স্বপ্ন ৫: একটা রেল লাইন ধরে হাঁটছি—হঠাৎ ঠিক পিছনে রেল গাড়ির আওয়াজ—প্রচণ্ড ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়।
— রাম, ১৫ বছর

দৃষ্টিহীন মানুষের সব ধরনের বেশ কিছু স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে অন্যদের দেখা স্বপ্নের থেকে এঁদের দেখা স্বপ্নের কিছু ফারাক খুঁজে পেয়েছি—

(১) দৃষ্টিহীনদের বেশির ভাগ স্বপ্ন অন্যদের চাইতে সংক্ষিপ্ত। স্বপ্নে ছবির স্বল্পতা বা অনুপস্থিতি এর একটা কারণ।

(২) বেশি বয়সের দৃষ্টিহীন মানুষও একই বয়েস ও আর্থসামাজিক অবস্থানের দেখতে পান এমন মানুষের চাইতে অনেক বেশি সরল ইচ্ছাপুরণের স্বপ্ন দেখেন।

(৩) এঁদের স্বপ্নে স্বপ্নপ্রতীকের ব্যবহার চোখে দেখতে পাওয়া মানুষের চাইতে কম। বিশেষত যাঁদের স্বপ্নে ছবি আসে তাঁদের বেলায়।

(৪) কম বয়সে বা কৈশোরে, যৌবনে দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্নে ভবিষ্যতকে নিয়ে নানা কল্পনা পূর্ণ হয় খুব বেশিমাত্রায়। হয়তো অন্ধকারের প্রতিকূলতা ঠেলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার তীব্র ইচ্ছা আর বাস্তবে ইচ্ছা পুর্ণ না হবার ভয়—এই দুয়ের সংঘর্ষে এরকম স্বপ্ন বেশি আসে।

(৫) জন্মান্ধ মানুষ পূর্ণবয়স্ক হবার পরও জটিল স্বপ্ন দেখেন অন্যদের তুলনায় কম। স্বপ্নে ছবি না থাকা এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

(৬) যে কোনও বয়সের যে কোনও দৃষ্টিহীনের স্বপ্নে শ্রবণ আর স্পর্শ এই দুই অনুভূতির তীব্রতা দৃষ্টিশক্তি অটুট এমন মানুষের চাইতে অনেকগুণ বেশি। ছবির অভাব মেটাতে এঁদের এই ব্যাপারটা আসে বলে মনে হয়।

দৃষ্টিহীন মানুষের মধ্যে প্রচলিত দেবদেবীতে বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মতোই। হয়তো বা একটু বেশি। পড়াশোনা করে এমন দৃষ্টিহীন পঞ্চাশ জন ছাত্রের স্বপ্ন আলাদা করে নিয়ে দেখা যায়, এদের মধ্যে উনত্রিশ জন দেবদেবীর স্বপ্ন দেখে। এরা সবচাইতে বেশি দেখে কালীঠাকুরের স্বপ্ন। এদের চেতনায় আর অবচেতনে শক্তির দেবী বিশেষ কোনও শক্তিবলে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন।

স্বপ্ন ১: মা কালীর স্বপ্ন প্রায়ই দেখি। একদিন দেখলাম লালপাড় সাদা শাড়ি পড়ে মা কালী খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে কি যেন বলছেন। মায়ের চুল কোমর পর্যন্ত ছড়ানো।

স্বপ্ন ২: মা কালীকে স্বপ্নে দেখি। পায়ে আলতা, কপালে সিঁদূরের টিপ। সকালে উঠে খুব আনন্দ হয়।

স্বপ্ন ৩: একদিন রাতে দেখলাম, মা কালী এসে বলছেন, 'উঠে পড়। আমার পুজো করবি না?'

স্বপ্ন ৪: কালীঠাকুর এক দিন স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন, 'আমাকে জবাফুলের মালা দিতে হবে। পুজো দিতে হবে। তাহলে তোর চোখ ভাল হয়ে যাবে।'

নানা বয়সের দৃষ্টিহীন মানুষের দেখা স্বপ্নের মধ্যে দেবদেবীর স্বপ্ন অনেক। সাপের স্বপ্নও খুব কম নয়। সাপ কখনও তাড়া করে, কখনও বা গা বেয়ে ওঠে। কখনও স্বপ্নে সাপ দেখে স্বপ্নদ্রষ্টা ভয় পান, কখনও বা তাঁর মনে ভয়ের ভাব দেখা দেয় না। কখনও 'সাপের নাচ' দেখে আনন্দ হয় মনে।

চোখের আলোয় বাইরের পৃথিবীটাকে দেখার ইচ্ছা দৃষ্টিহীন মানুষের মধ্যে প্রবল। মাঝে মধ্যেই মনে হয়, যদি কোনও জাদুবলে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যেত!—তাহলে অদেখা পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগ করা যেত অপার আনন্দে। এঁদের মনের এই ইচ্ছা এঁদের অনেকের স্বপ্নে চলে আসে নানাভাবে। কিছু স্বপ্নের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক—

স্বপ্ন ১: কেউ এক জন আমার চোখে কীসব ওষুধ দিচ্ছে—তারপর বলল, 'যা এবার থেকে তুই দেখতি পাবি।' স্বপ্নের মধ্যে খুব আনন্দ হচ্ছিল।

স্বপ্ন ২: একটা বুড়ি এসেছে বুঝতে পারছি। একটা ছুরি দিয়ে যেন আমার চোখটা চেঁছে দিল—আমি একাএকা বাড়ি ফিরে এসেছি। যেন আর দৃষ্টিহীন ছিলাম না চোখদুটো চেঁছে দেবার পর—ঘুম ভেঙে কান্না পায়, কোথাও কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না।

স্বপ্ন ৩: একটা টেবিলে শুয়ে আছি। একজন ডাক্তারবাবু চোখের ওপর কীসব কাঁটাছেঁড়া করছেন। তারপর দেখলাম, একাএকা একটা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসলাম, রাস্তা পেরোলাম। (স্বপ্নের দর্শক ৫ বছর বয়স থেকে দৃষ্টিহীন)।

স্বপ্ন ৪: একজন কেউ আমার দুচোখে দুটো যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছে, মনে হচ্ছে এবার সব দেখতে পাব।

দৃষ্টিহীনদের স্বপ্নমাত্রই সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন—এরকম ভাবলে ভুল হবে। বেশ কিছু বয়স্ক দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্ন আমি পেয়েছি, যেগুলো বেশ জটিল। অচেতনের রুদ্ধ নানা ইচ্ছা এসব স্বপ্নে পূর্ণ হয়েছে। স্বপ্নের বিচ্যুতি, ওলটপালট (Reversıon), একত্রীকরণ এসব কিছুই এরকম জটিল স্বপ্নে স্বপ্নবিকৃতির (Dream Dıstortıon) কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম স্বপ্নের আপাত অর্থ আর মূল অর্থ পুরোপুরি আলাদা।

দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্ন নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। বিরাট সংখ্যক বিভিন্ন পেশা আর আর্থসামাজিক অবস্থানের দৃষ্টিহীন মানুষের স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা চালাতে পারলে এব্যাপারে আরও অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে। বহু মানুষের দেখা স্বপ্নের মধ্যে কিছু স্বপ্ন (ওড়া, টাকা কুড়ানো, উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানো) এঁরা আদৌ দেখেন কিনা, না দেখলে কেন দেখেন না—এ সব নিয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো এরকম বিস্তৃত গবেষণা ছাড়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় দৃষ্টিহীনদের স্বপ্নের জগতের নিয়মকানুনগুলোকে বিস্তারিতভাবে খুঁজে বার করা। সেই দায়িত্ব তোলা রইল ভবিষ্যতের কোনও স্বপ্ন-গবেষকেব জন্য।

প্রতিবন্ধীদের স্বপ্ন

শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা এক জন মানুষের স্বপ্নের দেশটাকে কিছুটা হলেও বদলে দেয়। মানসিক প্রতিবন্ধীদের স্বপ্নের দেশে দাপটে ছড়ি ঘোরায় ভয়। শরীর বা মনের দিক থেকে পিছনে পড়ে থাকার ভাবনাচিন্তা এদের মনের জগৎটাকে কিছুটা জটিল করে তুলবে, এটা স্বাভাবিক। প্রতিবন্ধীদের মধ্যে যাঁরা কোনওভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছেন, তাঁদের স্বপ্নের জগৎ অন্য পাঁচজন সাধারণ মানুষের চাইতে খুব একটা আলাদা নয়। এঁদের সংখ্যা কম। বেশিরভাগ মানসিক প্রতিবন্ধীকেই বেঁচে থাকতে হয় অন্যের ওপর নির্ভর করে। সেই নির্ভরতা হারাবার ভয় নানাভাবে, নানামাত্রায় কাজ করে এদের মনে। এদের ঘুমন্ত চেতনাতেও চলে আসে এরকম ভাবনাচিন্তা। চলে আসে স্বপ্নে।

প্রতিবন্ধীদের কিছু ভয়ের স্বপ্নের কথা বলি:

স্বপ্ন ১: ভাগ্নেটাকে কোলে নিয়ে আছি, একটা লোক ওকে কেড়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আমি কিছুতেই দেব না। আমাকে ধাক্কা মেরে ওকে নিয়ে চলে গেল।

—অভী, ২৮ বছর।

স্বপ্ন ২: মাঝেমাঝে ভূত, রাক্ষস, শয়তান তাড়া করে। রাক্ষস খেতে আসে—।

—সুদীপ্ত, ১৮ বছর।

স্বপ্ন ৩: গায়ের ওপর দিয়ে সাপ চলে গেল—খুব ভয় করে।

--দিব্যেন্দু, ১৭ বছর।

স্বপ্ন ৪: ডাকাত এসেছে। কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধছে। ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়।

—সৌরভ, ১৪ বছর।

স্বপ্ন ৫: সাপ ফণা তুলে আমাকে কামড়াতে আসছে, প্রায়ই দেখি, খুব ভয় করে।

—অপূর্ব, ২০ বছর।

এই স্বপ্নের দর্শকেরা সবাই মানসিক প্রতিবন্ধী। এদের ভয়ের স্বপ্নে উল্লেখযোগ্য দিক হল:

(ক) এরা খুব বেশি ভয়ের স্বপ্ন দেখে অনেক বেশি বয়সেও। মানসিকভাবে স্বাভাবিক একজন বাচ্চা যে সব স্বপ্ন দেখে ৭-৮ বছর বয়সে, এঁদের স্বপ্নে তা আসে ১৪-১৫, এমনকি ২০-২১ বছর পর্যন্ত। এদের বিলম্বিত মানসিক বিকাশ সম্ভবত এর জন্য দায়ী।

(খ) একই ভয়ের স্বপ্ন এদের অনেকে বারবার দেখে। এগুলোকে 'সাহস বাড়াবার স্বপ্ন' বলা যায়। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করার শারীরিক, মানসিক শক্তি কম বলে হয়তো একই ভয়ের স্বপ্ন এরা বারবার দেখে। যাতে বাস্তবে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া যায় সহজে।

(গ) চোর-ডাকাত, ভূত-পেত্নি, রাক্ষস—এ সব নিয়ে এদের ভয় অনেক সময় এদের নিরালম্ব হয়ে

যাবার বা আশ্রয় হারাবার ভয়ের রূপান্তর বলে আমার মনে হয়েছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের স্বপ্নে ভয় আসে মানসিক প্রতিবন্ধীদের চাইতে অনেক কম। সঠিক মানসিক বিকাশ এর একটা কারণ। অন্য কারণটা হল এঁরা অনেকেই নানাভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখেন। এঁদের দৈনন্দিন কাজকর্মে অন্যের সাহায্য দরকার হলেও, তা মানসিক প্রতিবন্ধীদের তুলনায় অনেক কম।

নানা ধরনের খাওয়াদাওয়া সংক্রান্ত স্বপ্ন মানসিক প্রতিবন্ধীরা অন্যদের চাইতে বেশি দেখে। এটা অবশ্য কিছুটা নির্ভর করে দৈনন্দিন খাওয়াদাওয়ার মান আর যে পরিবেশে একজন প্রতিবন্ধী বড় হচ্ছে তার ওপর। কলকাতার উপকণ্ঠে কোনও এক আবাসিক প্রতিবন্ধী স্কুলের১ ত্রিশ জন মানসিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বেশি ভয়ের স্বপ্ন দেখে ২২ জন, নানা ধরনের খাওয়ার স্বপ্ন দেখে ১৪ জন। কেউ দেখে পেটপুরে মাংসভাত খাওয়ার স্বপ্ন। কেউ তার প্রিয় পছন্দের মিষ্টি বা কেক খাওয়ার স্বপ্ন। এরকম স্বপ্নগুলো সরল ইচ্ছাপূরণের। এই প্রসঙ্গে আমার একটা পর্যবেক্ষণের কথা বলি। প্রতিবন্ধীরা স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন অনেক বেশি দেখে। এর সম্ভাব্য কারণ, মনের বিলম্বিত বিকাশ। আর বাস্তবে ইচ্ছাপুরণের স্বল্পতা।

প্রতিবন্ধীরা 'টিপিক্যাল ড্রিম' দেখে অন্যদের মতোই। পড়ে যাবার স্বপ্ন, স্বপ্নে চোর-ডাকাতের তাড়া, স্বপ্নে হিংস্র জন্তুর তাড়া—এদের অনেকেই এ সব স্বপ্ন দেখে। 'টিপিক্যাল ড্রিম' শারীরিক প্রতিবন্ধীরা দেখে সাধারণ মানুষের মতো। মানসিক প্রতিবন্ধীরা কিছুটা কম। কোনও মানসিক প্রতিবন্ধীর স্বপ্নের বিবরণে আমি পরীক্ষা সংক্রান্ত স্বপ্ন পাইনি। এঁদের বেশিরভাগ জীবনে কোনওদিন পরীক্ষা দেয় নি। শারীরিক প্রতিবন্ধীর দশজনের মধ্যে পরীক্ষার স্বপ্ন দেখেন দুজন। এঁদের এক জন ক্লাস টেন, আর একজন হায়ার সেকেণ্ডারি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন।

মানসিক প্রতিবন্ধীরা আর যেসব 'বহুমানুষের দেখা স্বপ্ন' (Typical Dreams) দেখে তার কয়েকটা বলি:

স্বপ্ন ১: পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে গেলাম।

স্বপ্ন ২: গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মরে গেলাম। আমাকে ঘিরে সবাই কাঁদছে।

স্বপ্ন ৩: বাবা (বাস্তবে মৃত) এসেছে, কথা বলছে, গল্প করছে, খুব আনন্দ হচ্ছে।

স্বপ্ন ৪: (বাস্তবে মনে হত মৃত বাবা অ'সলে গাছের তলায় লুকিয়ে আছে) মাকে বলছি, 'ঐ দেখ মা, বাবা গাছের তলায় লুকিয়ে আছে, খুঁজে আনলেই আসবে'।

স্বপ্ন ৫: মাঝেমধ্যে দেখি, পুরো স্বাভাবিক হয়ে গেছি, খুব পড়াশোনা করছি।

স্বপ্ন ৬: অচেনা একটা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—খুব মজা লাগছে।

প্রতিবন্ধীরা ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখে ঝুড়িঝুড়ি। এরকম কিছু স্বপ্ন আর সেই সব স্বপ্নের সূত্রগুলো বলি:

স্বপ্ন ১: দেখলাম, পেট ভরে মাংসভাত খাচ্ছি, খুব আনন্দ হচ্ছে।

—প্রদীপ, ২৮ বছর।

সূত্র:

এক বন্ধুর কাছে মাংস খাওয়ার গল্প শুনে মাংসভাত খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল।

স্বপ্ন ২: দেখছি, গঙ্গায় সাঁতার কাটছি, অনেকক্ষণ ধরে।

— বিমল, ১৯ বছর।

সূত্র:

একটা খবরের কাগজে বাচ্চাদের সাঁতার কাটার ছবি দেখে মনে হয়েছিল, আমিও যদি এরকম সাঁতার কাটা যেত।

স্বপ্ন ৩: একবার দেখলাম রেল গাড়িতে চেপে সব মালপত্র নিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছি দাদার সঙ্গে। খুব আনন্দ হচ্ছিল।

সূত্র:

স্বপ্নের দর্শক দীপঙ্করের বয়েস ৩০। ওঁর দাদা কলকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। হস্টেলে থাকতে দীপঙ্করের ভাল লাগে না। মাঝেমাঝে বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা করে।

স্বপ্ন ৪: কালীঠাকুর এসে বলছেন, তোর কোনও চিন্তা নেই, খুব তাড়াতাড়ি তুই ভাল হয়ে যাবি।

সূত্র:

স্বপ্নের দর্শক কালীঠাকুরের ভক্ত। স্বাভাবিক জীবনযাপনের ইচ্ছা স্বাভাবিক কারণেই প্রবল।

স্বপ্ন ৫: দেখলাম, পুরী বেড়াতে গেছি মায়ের সঙ্গে। সমুদ্রে স্নান করছি—ঢেউয়ের দোলায় খুব আনন্দ হচ্ছে।

—রমা, ১৭ বছর।

সূত্র:

একজন ভদ্রলোকের কাছে আগের দিন পুরীর গল্প শুনেছিল।

স্বপ্ন ৬: একটা বিরাট মাঠে স্পোর্টস হচ্ছে, অনেকে দৌড়াচ্ছে—আমি সবার আগে পৌঁছালাম—প্রথম পুরস্কার দিচ্ছে আমাকে।

—সঞ্জয়, ২৩ বছর।

সূত্র:

খেলাধূলার ইচ্ছা তীব্র হলেও ১৮-র এই যুবক ভাল দৌড়োতে পারে না।

স্বপ্ন ৭: প্রতিবন্ধীদের অলিম্পিকে অংশ নিতে আমেরিকায় গেছি। দুটো ইভেন্টে সোনার মেডেল পেয়েছি।

—কার্তিক, ১৯ বছর।

সূত্র:

এক আবাসিক প্রতিবন্ধী স্কুলের ছাত্র মেঘনাদ সাউ আমেরিকায় প্রতিবন্ধীদের অলিম্পিকে গিয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে, এই খবর স্বপ্নদ্রষ্টা জানতে পেরেছে বন্ধুর কাছে।

স্বপ্ন ৮: একজন ডাক্তারবাবু আমার মাথার মধ্যে কি সব যন্ত্রপাতি চালাচ্ছেন—একটু পরে বললেন, 'ওঠো'। আমি উঠতেই দেখি 'একদম ভালো হয়ে গেছি'। খুব আনন্দ হচ্ছে।

—পলাশ, ১৭ বছর।

সূত্র:

এক বন্ধু বলেছিল, 'ডাক্তাররা ইচ্ছা করলে অপারেশন করে আমাদের ঠিক করে দিতে পারে।'

কর্মক্ষম শারীরিক প্রতিবন্ধীদের স্বপ্নের স্বপ্নকল্পনা সাধারণ মানুষের মতোই। দুটো এরকম স্বপ্নের কথা বললেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন।

স্বপ্ন ১: অনেক লোকের মাঝখান দিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। একজন বলবান মানুষ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে হেরে গেল। আমি জানি, কেউ আমাকে মারতে পারবে না। কারণ এক সঙ্গে একলক্ষ গুলি আমার বুকে লাগলে, তবেই আমি মারা যাব। এই খবরটার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। খবরটা চলে গেছে মুখ্যমন্ত্রীর কানেও। এদিকে, আমেরিকা থেকে একটা খবর এসেছে। ওদেশ থেকে আমাকে মারতে চাইছে। বলছে, যেভাবে হোক এরকম শক্তিশালী মানুষকে মারতেই হবে। কোনও গুপ্তচর আমাকে মারতে রাজি হচ্ছে না, কারণ একসঙ্গে একলক্ষ গুলি ছোঁড়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

—শৈলেন্দ্রনাথ ধাড়া, প্রতিবন্ধী শিক্ষক।

স্বপ্ন ২: মুখোশ পরে সাঁতার কাটছি, শরীরে ডুবুরির পোশাক। নাকে নল, পিঠে সিলিন্ডার। ভুস করে জলের নীচে ডুব দিলাম। নীল জলের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে তিমি মাছ আর হাঙরদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আমি একটা সুইচ টিপতেই, 'প্রচণ্ড আলোর আঘাতে' ওরা পালাচ্ছে। আরও নীচে দেখি, একটা ডুবোজাহাজ যাচ্ছে। আমি ওতে উঠে পড়লাম। সবাই খুব খাতির করল। এক সময় জাহাজের ক্যাপ্টেন বলল, আমরা এখন প্রশান্ত মহাসাগরের নীচ দিয়ে যাচ্ছি। আমি ডুবোজাহাজ থেকে লাফ দিলাম—অনেক নীচে নেমে দেখি আর একটা পৃথিবী, একটুও জল নেই। সেখানকার অদ্ভুত দেখতে মানুষেরা আমাকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে ওদের রাজার কাছে—।

—পার্থ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিবন্ধী করণিক।

প্রতিবন্ধী কর্মী মানুষের স্বপ্নে পেশা সংক্রান্ত কাজকর্ম আসে অন্যদের তুলনায় বেশি। যে সব শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী কোনও ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত তাদের স্বপ্নে তাদের কাজকর্ম চলে আসে যখন তখন। কেন অন্যদের তুলনায় কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রতিবন্ধীদের স্বপ্নে পেশাগত কাজকর্ম বেশি আসে? এর সম্ভাব্য কারণ, পেশাগত কাজ এদের একটা বড় অবলম্বন। পেশার কাজকর্মে তীব্র সুখবোধ তাই স্বাভাবিক। 'আমাকে কারও ওপর নির্ভর করতে হয় না, আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি'—এরকম ভাবনা এঁদের স্বপ্নে পেশাগত কাজকর্ম বেশি আসার একটা কারণ বলে আমার মনে হয়। প্রতিবন্ধীদের পেশাগত কিছু স্বপ্নের কথা বলি:

স্বপ্ন ১: স্বপ্নে রান্না করি, নানারকম রান্না, খুব ভালো লাগে।

—বিনয়কান্ত বণিক, হেঁসেল কর্মী।

স্বপ্ন ২: স্বপ্নে বাসন মাজি, রান্না করি, ঝাঁট দিই।

—রবি মণ্ডল, কিচেনের কাজ।

স্বপ্ন ৩: স্বপ্নে প্রায়ই ভ্যান রিকসা চালাই।

—ঝন্টু মল্লিক, স্কুলের ভ্যানচালক।

স্বপ্ন ৪: স্বপ্নে প্রায়ই টেলিফোন বাজে। অনেক সময় ঘুম ভেঙে যায়। দেখি, ফোন বাজছে না। হয়তো দেখলাম বিদেশে ফোন করবে বলে কেউ এসে দরজায় কড়া নাড়ছে।

—কান্তি ভগত, টেলিফোন বুথের কর্মী।

স্বপ্ন ৫: দেখি টেলিফোনের বুথে বসে আছি। লোকজন আসছে, ফোন করছে। পয়সা নিচ্ছি। হিসাব রাখছি।

—দীপঙ্কর সেন, বুথের কর্মী।

স্বপ্ন ৬: দেখি কামরায় লজেন্স বিক্রি করছি, সবাই কিনছে।

—অনাদি দাস, লজেন্স বিক্রেতা।

স্বপ্ন ৭: স্টেশনে বসে গান গাইছি, এরকম স্বপ্ন মাঝেমাঝে দেখি।

—বিমল রায়, পথগায়ক।

প্রতিবন্ধীদের স্বপ্নে স্বাভাবিক ভাবেই আসে নানা ধরনের যৌনস্বপ্ন। ছেলেরা যৌনস্বপ্ন দেখে বেশি। মেয়েরা কম। একজন যুবক দেখে অচেনা নানা নারীকে জড়িয়ে চুমু খাওয়ার স্বপ্ন। কেউ কেউ দেখে যৌনসঙ্গমের দৃশ্য। বিশেষ করে মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে স্বতস্ফূর্ত যৌনতার দরজা বেশির ভাগ সময় চিরদিনের জন্যই বন্ধ । এদের যৌনস্বপ্ন অনেক সময় এদের যৌনপ্রবাহের একমাত্র রাস্তা। হয়তো এই কারণে প্রতিবন্ধীরা যৌনস্বপ্ন দেখে বেশি। আর এই স্বপ্নগুলো দেখা এদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। মানসিকতার বিকাশ খুব বেশি মাত্রায় বিপর্যস্ত, এমন মানসিক প্রতিবন্ধীরা যৌনস্বপ্ন দেখে না। কারণ, স্বাভাবিক যৌনতার বিকাশের যে প্রক্রিয়া, তা এদের ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হয় ছোটবেলা থেকেই। এক জন মানুষের মানসিকতার আর যৌনতার বিকাশ খুব বেশি মাত্রায় পরস্পরনির্ভর।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের স্বপ্নের জগৎটাকে ধরে ফেলা খুব সহজ কাজ নয়। এঁদের অনেকেই ভালোভাবে কথা বলতে পারে না। পারে না ঠিকভাবে যোগাযোগ (Communication) তৈরি করতে। 'স্পিচ থেরাপিস্ট' বা নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতির সাহায্যে এঁদের অস্ফুট কথাবার্তার অর্থ বার করা সম্ভব হলেও, স্বপ্ন দেখে কিনা, দেখলে সেই স্বপ্ন কীরকম, তা উদ্ধার করা খুব কঠিন আর পরিশ্রমসাধ্য একটা কাজ। তাছাড়া কিছুদিন আগে দেখা স্বপ্নের কথা এদের অনেকে বলতে পারে না। খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায় বলে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের স্বপ্নের দেশের নিয়মকানুন সাধারণ মানুষের চাইতে কোথায় আলাদা, তা জানবার পথে এগুলো বড় বাধা।

কথা একেবারেই বলতে পারে না, এমন শিশু মানসিক প্রতিবন্ধীরা কি স্বপ্ন দেখে? আমার মনে হয়, দেখে। তবে সেই স্বপ্ন স্বাভাবিক সমবয়স্ক বাচ্চাদের মতো ধারাবাহিক নয়, খাপছাড়া। এদের স্বপ্ন মানেই কয়েকটুকরো চলমান ছবি। বড় হয়ে যাওয়া মানসিক প্রতিবন্ধীরা সকলেই স্বপ্ন দেখে। এরকম স্বপ্নের গঠন, মান আর স্বপ্ন দেখার মাত্রা কিছু নির্দিষ্ট মানসিক সূত্রের ওপর নির্ভর করে। এই সূত্রগুলো হল:

(ক) মানসিক বিকাশের মাত্রা
(খ) ভাবনাচিন্তার ক্ষমতা
(গ) পরিবেশ
(ঘ) অন্যের ওপর নির্ভরশীলতার মাত্রা
(ঙ) সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধীর প্রতি আশেপাশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের (Orthopedically Handicapped) স্বপ্নের দেশ বেশিরভাগ সময় সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ঐ দেশটার থেকে খুব একটা আলাদা নয়।

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দুটো বিশেষ স্বপ্নের কথা বলা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। ১৯৭৭ সালে হাওড়া স্টেশনের ঠিক বাইরে ব্রেকফেল করা এক ডবল ডেকারের নীচে চাপা পড়ে মারাত্মকভাবে জখম হন এক যুবক। হাসপাতালে তাঁর ডানদিকের পা হাঁটুর ঠিক নীচ থেকে কেটে বাদ দিতে হয়। '৮৭ সাল থেকে ভদ্রলোক কৃত্রিম পা নিয়ে চলাফেলায় অভ্যস্ত। পা কাটা যাবার পর স্বপ্ন দেখতেন, স্বাভাবিক দুটো পা রয়েছে তাঁর। অনায়াসে চলাফেরা করছেন আর দৌড়ে বেড়াচ্ছেন পা দুটো নিয়ে। এরকম স্বপ্ন দেখার পরদিন ঘুম ভেঙে মন খুব খারাপ হয়ে যেত ওর । কৃত্রিম পা নিয়ে চলাফেরায় অভ্যস্ত হবার পর থেকে বহুবার দেখেছেন অন্য আর-একটা স্বপ্ন। কোনও একটা জায়গায় বসে কৃত্রিম পা টা খুলতে গিয়ে কিছুতেই খুলতে পারছেন না। একটু বাদেই অবাক লাগছে, কি করে ঐ পায়ের ওপর আঙুলের স্পর্শ পাচ্ছেন! তীব্র আনন্দের অনুভব, কৃত্রিম পাটা জুড়ে গিয়ে 'স্বাভাবিক পা' হয়ে গেছে!

মোটরসাইকেল অ্যাকসিডেন্টে দু-পা হারানো আর এক মধ্যবয়স্ক মানুষ জানিয়েছেন অদ্ভুত একটা ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নের কথা। তিনি যেন একটা মাঠে বসে আছেন। ওঠার আগে খেয়াল করলেন, পাশে রাখা 'ক্রাচ' জোড়া উধাও। কিভাবে যাবেন এই অবস্থায় ভাবতে ভাবতে ভাসতে শুরু করেন রাস্তার একটু ওপর দিয়ে। 'শুধু পা দুটো মাটিতে পড়ছে না, অথচ আমি এগিয়ে যাচ্ছি তরতর করে'।

স্বপ্ন আর পেশা

একজন মানুষের পেশা তাঁর স্বপ্নের জগতে কোনও ছাপ ফেলে কিনা, ফেললে তা কিভাবে, কতটুকু—এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি ৫৬টা পেশার প্রায় আড়াই হাজার মানুষের স্বপ্ন সংগ্রহ করে। পেশাগত আশা আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা কত বিচিত্রভাবে স্বপ্নে চলে আসে তা বুঝতে কিছুটা সাহায্য করবে নানা পেশার মানুষের দেখা ইচ্ছাপূরণের এই স্বপ্নগুলো:

স্বপ্ন ১: প্রায়ই স্বপ্ন দেখি স্কুলের বাচ্চাদের পড়াচ্ছি—অনেক কঠিন পড়া খুব সহজে হাসতে হাসতে ওদের বুঝিয়ে দিতে পারছি—ওরাও বুঝতে পারছে—প্রশ্ন করলে চটপট উত্তর দিচ্ছে।

— নার্সারি স্কুলের শিক্ষিকা।

স্বপ্ন ২: কোনও পেশাগত কাজ নিয়ে হয়তো চিন্তায় আছি। স্বপ্নে ওই কাজে হয় সফল নয় ব্যর্থ হলাম—এরকম প্রায়ই দেখি।

—সঙ্গীতশিল্পী

স্বপ্ন ৩: স্বপ্ন দেখলাম, রাজ্যের এক স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াচ্ছি।

—গৃহশিক্ষক।

স্বপ্ন ৪: বাস্তবে ওপরওয়ালার বেআইনি আদেশ মানতে বাধ্য হয়েছি। রাতে স্বপ্নে ওপরওয়ালার গালে থাপ্পড় কসালাম—খুব আনন্দ হল।

— চাকরিজীবী।

স্বপ্ন ৫: *সমাধানের স্বপ্ন*

একটা ক্রিটিক্যাল ডিসিশন নিতে হবে। স্বপ্নে ব্যাপারটা এল। যেভাবে ভাবছিলাম, তার চাইতে একটু অন্যভাবে কাজ করে, স্বপ্নে সমস্যাটা মিটে গেল। বাস্তবে তাই করলাম।

—ব্যাঙ্ক অফিসার।

স্বপ্ন ৬: মাঝেমাঝে স্বপ্নে দেখি, সবাই মিলে রান্নাবান্না হচ্ছে। অনেককে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছি।

—গৃহবধূ।

স্বপ্ন ৭: বিখ্যাত নানা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কথা বলছি, ওঁদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি—এরকম স্বপ্ন মাঝেমধ্যে আসে।

—সাংবাদিক।

স্বপ্ন ৮: একদিন দেখলাম, একটা বড় অপারেশন হচ্ছে—আমাকে বিখ্যাত একজন সার্জেনের সঙ্গে অপারেশনে নামতে হয়েছে—যন্ত্রপাতি দেবার জটিল কাজটা সহজেই করতে পারছি—।

—নার্সিং ছাত্রী।

স্বপ্ন ৯: দেশবিদেশের বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি বা একই মঞ্চে বাজাচ্ছি—

আন্তর্জাতিক মানের শিল্পীরা আমার বাড়িতে এসেছেন—এরকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখি।

—খ্যাতনামা সেতারশিল্পী।

স্বপ্ন ১০: স্বপ্ন দেখলাম, রিকশা ভাড়া অনেক বেড়ে গেছে—অনেক প্যাসেঞ্জার পাচ্ছি। একদিনে ৬০০ টাকা রোজগার করলাম।

—রিকশাচালক।

স্বপ্ন ১১: বিড়ির পাতা কাটছি, বিড়ি বানাচ্ছি, অনেক টাকা রোজগার হচ্ছে—এরকম স্বপ্ন মাঝেমাঝে দেখি।

—বিড়িশ্রমিক।

স্বপ্ন ১২: ট্রেনের একটা বগিতেই এক বয়াম লজেন্স বিক্রি হয়ে গেল—আনন্দে বাড়ি ফিরছি।

—লজেন্সবিক্রেতা।

স্বপ্ন ১৩: স্বপ্ন দেখলাম, অফিসার হয়ে দূরে কোথাও একটা বদলি হয়েছি—গাড়িতে কর্মস্থলে যাচ্ছি।

—ব্যাঙ্কের করণিক।

স্বপ্ন ১৪: চেম্বারভর্তি রোগী—আমি একজনকে দেখছি—এরকম স্বপ্ন গত এক সপ্তাহে দুবার দেখেছি।

—পেশায় নতুন নামা চিকিৎসক।

স্বপ্ন ১৫: ১৯৯০ সালে দেখা একটা স্বপ্ন, স্পষ্ট মনে আছে। আমি অফিসের নিউজ ডেস্কে বসে কপি লিখছ, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতে সমাজতন্ত্র এসেছে—পরদিনের 'লিডনিউজ'।

—সাংবাদিক।

স্বপ্ন ১৬: একটা পুরস্কার পেয়েছি, টিভিতে ঘোষণা করছেন সংবাদপাঠিকা।

—তরুণ কবি।

স্বপ্ন ১৭: জাহাজের একটা জেনারেটরে কাজ করতে গিয়ে আটকে গেছি। রাতে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেলাম। স্বপ্ন দেখলাম, একেবারে নতুন একটা পদ্ধতিতে কাজটা করে ফেলেছি। পরদিন স্বপ্নে দেখা পদ্ধতিতে করে একবারেই কাজটা হয়ে গেল।

—মেরিন-ইঞ্জিনিয়ার।

স্বপ্ন ১৮: ওস্তাদ-এর সঙ্গে বাজাচ্ছি, দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে—তারপর দেখলাম, গানশেষে ওস্তাদজী আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

—তরুণ তবলিয়া।

স্বপ্ন ১৯: আমার বিক্রি করা টিকিট থেকে একটা রাজ্য লটারির মোটা টাকার প্রথম পুরস্কার উঠেছে—সবাই বলছে, এবার অনেক টাকা কমিশন পাব।

—লটারির টিকিট বিক্রেতা

স্বপ্ন ২০: এমন হল যে সাংবাদিকতার একটা বিখ্যাত পুরস্কারের জন্য আমার নাম প্যানেলে রয়েছে, স্বপ্ন দেখলাম, আমি পুরস্কারটা পেয়েছি।

—খ্যাতনামা সাংবাদিক।

নিজের পেশাতে কাজের আনন্দ পান এমন মানুষের সংখ্যা সম্ভবত খুব বেশি নয়। এমন বেশ কিছু মানুষের স্বপ্ন পেয়েছি, যেখানে একজন মানুষ তাঁর বর্তমান পেশার বদলে আকাঙ্ক্ষিত পেশাকে নিয়ে নানা ধরনের স্বপ্ন দেখছেন। অথচ বর্তমান পেশা কখনও তাঁদের স্বপ্নে আসেনি। এক মহিলা সাংবাদিক চেয়েছিলেন অধ্যাপনা করতে। স্বপ্ন দেখেন, কলেজে মেয়েদের পড়াচ্ছেন। এক সরকারি কর্মচারীর লক্ষ ছিল, বড় ফুটবলার হবেন। স্বপ্নে মাঝেমধ্যে ফুটবল খেলেন, বড় দলের খেলোয়াড় হয়ে। এক গৃহবধূর স্বপ্ন ছিল নৃত্যশিল্পী হবার। স্বপ্নে প্রায়ই নানা মঞ্চে নাচেন। এক চিকিৎসক দেখতেন পাইলট হবার স্বপ্ন। এখন খ্যাতনামা এই শল্য চিকিৎসক স্বপ্নে মাঝেমধ্যে প্লেন চালান। স্বপ্নের পেশাকে নিয়ে এরকম ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখেন বলে নানা পেশার আরও অনেক মানুষ আমাকে জানান।

যে কোনও পেশাকে জড়িয়ে শুধু আশাআকাঙ্ক্ষা নয়, একজন মানুষের মনে কাজ করে পেশাগত নানা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা আর ভয়। এগুলো নানাভাবে চলে আসতে পারে ওই মানুষের স্বপ্নে। এর মধ্যে থাকে কিছু *'সাহস বাড়াবার স্বপ্ন'*। যাতে বাস্তবের পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় সহজে। কিছু থাকে 'শাস্তি পাবার স্বপ্ন।' যেখানে পেশাগত অনৈতিক কাজের জন্য স্বপ্নদ্রষ্টা শাস্তি পান স্বপ্নে। পেশাগত ভয়ের স্বপ্ন বেশি আসতে পারে দুশ্চিন্তাপ্রবণ মানুষ (Anxious Personality)-এব স্বপ্নে। এবকম কিছু স্বপ্নের কথা বলি।

স্বপ্ন ১: স্বপ্নে পেশা আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। প্রায়ই দেখি বেশ কিছু রাজনৈতিক লোক বা সহকর্মী আমার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করছে।

—মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী

স্বপ্ন ২: একটা নাটক নামিয়েছি বাস্তবে। স্বপ্নে কাগজে পড়ছি নাট্যকাব আমাব বিরুদ্ধে মানহানির মামলা ঠুকে দিয়েছেন—নানাভাবে সমস্যাটা থেকে বার হবার চেষ্টা করছি— পারছি না।

—নাট্যকর্মী, পরিচালক

স্বপ্ন ৩: ছাত্রদের পড়াচ্ছি। যা বলতে চাইছি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না—ক্লাসে এ নিয়ে খুব হইচই হচ্ছে।

—শিক্ষক

স্বপ্ন ৪: দেখি ওয়ার্কশপ দিয়ে যাচ্ছি—যেতে যেতে একটা ক্রেন ভেঙে পডছে মাথার ওপর—প্রচণ্ড ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়।

—ইঞ্জিনিয়ার

স্বপ্ন ৫: গবেষণাব কাজ কিছুতেই এগোচ্ছে না। বকেয়া কাজ নিয়ে মাস্টারমশায়ের কাছে জবাবদিহি কবতে হচ্ছে।

—অধ্যাপিকা

স্বপ্ন ৬: কোনও প্রতিযোগিতায় দৌড় শুরু হল। সবাই দৌড়ে চলে গেছে—আমি হাত পা কিছুই নাড়তে পারছি না। হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছি আর কাঁদছি।

—ম্যারাথনার

স্বপ্ন ৭: অনেক টাকা নিয়ে ফিরছি—হঠাৎ তিন চার জন লোক বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে সব টাকা কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছে। ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

—ব্যবসায়ী

স্বপ্ন ৮: একটা বাস অন্য একটা বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে কয়েকজন পিষে গেল—পাবলিক বাসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কিছু লোক আমাকে তাড়া করেছে।

—ট্রাফিক কনস্টেবল

স্বপ্ন ৯: ভিক্ষার টাকা জমিয়ে বড় নোট বানিয়ে মাথার নীচে নিয়ে শুয়ে আছি—স্বপ্ন দেখলাম, কয়েকজন পুলিশ টাকাটা কেড়ে নিয়ে মারতে মারতে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে—বলছে, 'এই টাকা তুই চুরি করেছিস।'

—ভিখারি

স্বপ্ন ১০: কেবিনে বসে বসে চোখ লেগে গেছে। দেখলাম, কিছু ওয়াগন ব্রেকার বোমা হাতে বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া করেছে, আমি প্রাণ ভয়ে ছুটছি—ঘেমেনেয়ে ঘুম ভেঙে দেখি কেবিনেই বসে আছি।

—মালগাড়ির গার্ড

স্বপ্ন ১১: এক মনোরোগীর বিয়ে হবার পর ওঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন চেম্বারে এসে ঝামেলা করে। তারপর থেকে দু তিনবার দেখেছি, আমাকে কোর্টে তোলা হয়েছে— কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

—মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

স্বপ্ন ১২: ট্যাক্সিতে শুয়ে ঘুমিয়ে গেছি। স্বপ্ন দেখলাম, একটা 'ট্রিপ'-এ যাচ্ছি। পেছন থেকে পিঠে চুরি ঠেকিয়ে একজন আমাকে গাড়ি থামাতে বলছে—বুঝলাম ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি—প্রচণ্ড ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

—ট্যাক্সিচালক

স্বপ্ন ১৩: বউদি খুব বকছে, বাচ্চাটারে নিয়া কিছু গোলমাল, আমি হাপুস নয়নে কান্দি।

—বাড়ির কাজের লোক

স্বপ্ন ১৪: একটা অচেনা ঘর—এক জন অচেনা 'কাস্টোমার' ঘরে ঢুকল—হঠাৎ পকেট থেকে ছুরি বার করে, আমার বুকে বসিয়ে দিল—ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়।

—যৌনকর্মী

স্বপ্ন ১৫: চোরাইসোনা কেনার অভিযোগে আমার জেল হয়ে গেছে—অন্ধ কুঠুরির মধ্যে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি।

—অলঙ্কার ব্যবসায়ী

স্বপ্ন ১৬: একটা বড় ম্যাচ—কোচ আমাকে দল থেকে বাদ দিয়েছেন। আমি তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছি কোচের সঙ্গে—একটু পরে দেখলাম, খেলা দেখছি। আমার দল হেরে যাবে।

—ফুটবল খেলোয়াড়

স্বপ্ন ১৭: দেখলাম বড় বড় ডালিয়াগুলো কারা যেন তুলে নিয়ে গেছে—বাগানে একটাও ফুল নেই—একেবারে নেড়া—মনে হচ্ছে, বড়সাহেব দেখতে পেলে চাকরি চলে যাবে।

—শিল্পসংস্থার মালি

স্বপ্ন ১৮: আমার ভুলে সিগন্যাল লাল থাকায় একটা ভি. আই. পি. গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে—দু জন বড় অফিসার এসে কেবিনেই আমাকে চার্জসিটের মেমো ধরাচ্ছেন—প্রচণ্ড ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

—রেলের সুইচম্যান

স্বপ্ন ১৯: অনেকলোক আমার চেম্বারের বাইরে হই-হট্টগোল করছে—চেম্বারে বসে থাকা এক ভদ্রলোক বলছেন, ডাক্তারবাবু আপনি পেছনের দরজা দিয়ে চলে যান—চেম্বারে ওরা আগুন লাগিয়ে

দিচ্ছে—ঘেমেনেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

—শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ

স্বপ্ন ২০: একটা অচেনা জায়গায় 'রেইড' করতে গেছি—বহুলোক আমাদের ঘিরে ফেলল—তারপর দেখলাম একটা ঘরে আমাদের আটকে রেখেছে—ভীষণ আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেল।

—পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর

পেশাসংক্রান্ত ভয় আর উদ্বেগ থেকে এই স্বপ্নগুলোর জন্ম। কিছু স্বপ্নে পেশাগত ভয় এসেছে সরাসরি। বাকিগুলোতে স্বপ্নের নিয়ম মেনে, একটু অন্যভাবে। এঞ্জিনিয়ারের ওভারহেড ক্রেন ভেঙে পড়ার স্বপ্ন যেমন। রেলের সিগন্যাল অপারেটার বা সুইচম্যানের কাজে ঝুঁকি খুব বেশি। সামান্য ভুলে চাকরির ক্ষতি হয়ে যেতে পারে যখন তখন। এই পেশার পাঁচ জনের স্বপ্ন সংগ্রহ করা গেছে। এঁদের মধ্যে তিনজন এরকম *'শাস্তি পাবার স্বপ্ন'* (স্বপ্ন ১৮) দেখেন বলে জানিয়েছেন। অলঙ্কার ব্যবসায়ীর জেল হবার স্বপ্ন (স্বপ্ন ১৫) ও পানিশমেন্ট ড্রিম। পাঠক লক্ষ করবেন, অনেক স্বপ্নে পেশাগত বাস্তব ভয় আর উদ্বেগ চলে এসেছে সরাসরি। এর মধ্যে রয়েছে কিছু *'সাহস বাড়াবার স্বপ্ন'* (স্বপ্ন ২, ৫, ১০, ১১, ১২, ১৯, ২০)। 'কিছু স্বপ্নের বিশ্লেষণ' অধ্যায়ে একজন প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসকের স্বপ্নের (স্বপ্ন , পাতা) বিশ্লেষণ রয়েছে। এরকম বেশ কিছু স্বপ্নের কথা অনেকে আমাকে জানান। যেখানে স্বপ্নের বিবরণ শুনে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না যে এই স্বপ্ন পেশাসংক্রান্ত। স্বপ্নদ্রষ্টার সাহায্য নিয়ে স্বপ্নটাকে কাটাছেঁড়া করে বোঝা যায় স্বপ্নের গভীরে রয়েছে পেশাগত আশা-আকাঙ্ক্ষার কাল্পনিক পূরণ।

পেশাসংক্রান্ত স্বপ্নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নের দর্শকের মানসিকতা। ভীতু মানুষের স্বপ্নে পেশাগত ভয় বা উদ্বেগঘটিত ছবি বেশি আসতে পারে। পেশায় অসৎ মানুষ পাপবোধ থেকে দেখতে পারেন পানিশমেন্ট ড্রিম। এরকম স্বপ্ন এক জন মানুষ আদৌ দেখবেন কিনা, দেখলে কীভাবে দেখবেন তা নির্ভর করছে স্বপ্নের দর্শকের মনের গঠনের ওপর। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, তাঁর পেশাগত ভাবনাচিন্তা, ন্যায়নীতিবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা—এ সবের ওপর। সাংবাদিকদের স্বপ্নের কথাই ধরা যাক। কলকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রচারিত আর প্রচারসংখ্যায় দ্বিতীয়—এই দুই সংবাদপত্রের বাছাই করা দশ জন দক্ষ সাংবাদিকদের স্বপ্নের বিবরণ খুঁটিয়ে দেখলে এ নিয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা করা যায়। এঁদের মধ্যে পাঁচজনের স্বপ্নের জগতে পেশা আসে না কোনওভাবে। তিনজনের ক্ষেত্রে পেশাগত কাজকর্মের টুকরো টুকরো ছবিকে জড়িয়ে অচেতন বা অচেতনের ইচ্ছা মাঝেমধ্যে স্বপ্নে চলে আসে। বাকি দুজনের মধ্যে একজন আনন্দবাজার পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক। জাফনার গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে আফগানিস্তানে অবিরাম বোমাবর্ষণের মধ্যে সংবাদ সংগ্রহ—এসব পেশাগত অভিজ্ঞতা এই সাংবাদিকের কাছে রীতিমতো রোমাঞ্চকর।

এই সাংবাদিকের জীবনের 'প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ—সবকটা মাত্রা' হল তাঁর পেশা। এরকম মানসিকতার একজন মানুষের চেতন আর অবচেতনে পেশার জায়গা অনেকটা জুড়ে। এক্ষেত্রে আসতে পারে পেশাকে জড়িয়ে ইচ্ছাপূরণের নানা স্বপ্ন। পেশাগত সুখবোধ ফিরে পেতে ঘুমন্ত চেতনায় চলে আসতে পারে পেশার কাজকর্মের টুকরো টুকরো ছবি। বাস্তবে সাংবাদিক, সুমন চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্নের দেশে পেশাগত স্বপ্ন আসে এভাবেই। প্রায় একরকম ভাবে পেশা চলে আসে আনন্দবাজারের এক বিভাগীয় সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্যের স্বপ্নে। হয়তো স্বপ্নে ইন্টারভিউ নিলেন আন্তর্জাতিক কোনও এক প্রখ্যাত ক্রিকেট ব্যক্তিত্বর। বা অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন কোনও এক ফিল্মী মেগাস্টারের সঙ্গে। স্বপ্নে প্রশ্নগুলো পর্যন্ত পরপর গোছানো থাকে। পেশা মনের অনেকটা জায়গা দখল করে নিলে এক জন সাংবাদিকের ঘুমন্ত চেতনায় এরকম স্বপ্নের ইন্টারভিউ চলে আসতেই পারে।

ছাপ্পান্নটা পেশার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ জানিয়েছেন, বাস্তবে যা করেন তাই স্বপ্নে চলে আসে। সাংবাদিক দেখলেন, কপি লিখছেন। চিকিৎসক দেখলেন, চেম্বারে রোগী দেখছেন। বা রেলের সুইচম্যান দেখলেন গেট বন্ধ করে গাড়ি যাবার সবুজ সিগন্যাল করছেন। এরকম ছবি স্বপ্নে আসে বলেই এরকম একটা ধারণা খুব জনপ্রিয় যে, বাস্তবে আমরা যা করি তার অবিকল ছবি স্বপ্নে চলে আসে। অথচ 'বাস্তবদৃশ্যের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা স্বপ্নের কাজ নয়।' অনেকসময় বাস্তবের টুকরো ছবি স্বপ্নে আসে

গোটা স্বপ্নের একটা সূত্র হিসেবে। যাকে কেন্দ্র করে অবচেতন বা অচেতনের কোনও ইচ্ছা চলে আসে স্বপ্নে। স্বপ্ন ভুলে যাবার নিয়ম মেনে অনেক সময় স্বপ্নের দর্শকের কাছে অন্য অংশগুলো বাদ দিয়ে শুধু বাস্তবকে অনুকরণ করা অংশটুকু স্মৃতিতে থেকে যায়। আর তাই মনে হয়, 'যা করি তাই স্বপ্নে দেখি।' খুব সামান্য কিছু ক্ষেত্রে পেশাগত কাজকর্মের এক টুকরো ছবি স্বপ্নে চলে আসতে পারে ওই কাজ করতে করতে পাওয়া আনন্দ বা সুখ (Pleasure) ফিরে পেতে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় টেলিফোন অপারেটারদের স্বপ্নের কথা। ত্রিশ জন টেলিফোন অপারেটারের মধ্যে ষোলোজন টেলিফোনের 'কল' ধরা, সেগুলোকে যথাস্থানে পাঠানো আর 'বাইরের লাইন' যিনি চাইছেন তাঁকে তা ধরিয়ে দেওয়া—এরকম বাস্তবের কাজের স্বপ্ন দেখেন যখন তখন। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ছ'জন অপারেটারের মধ্যে পাঁচজনই জানান, মাঝেমধ্যেই এরকম কাজ তাঁদের স্বপ্নে চলে আসে। বাস্তবে যেমন 'কল' এলেই 'আনন্দবাজার' বলেন, স্বপ্নেও একই কাজ করতে করতে একই কথা বলে যান। কখনও বা 'আনন্দবাজার' বলতে বলতে ঘুম যায় ভেঙে। অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয় টেলিফোন অপারেটারদের। এঁদের এরকম স্বপ্ন থেকে বোঝা যায়, পেশাগত কাজকর্মের ভাবনাচিন্তা অনেক সময় এঁদের ঘুমন্ত চেতনাতেও কাজ করতে থাকে।

যাঁরা এরকম স্বপ্ন দেখেন, তাঁরা স্বপ্নে এই ধরনের কথাবার্তা বলে বা শুনে কোনও একটা আনন্দ (Pleasure) অবশ্যই পান। স্বপ্নে পেশাগত কাজকর্মের অবিকল প্রতিচ্ছবি বা কথা চলে আসবার কারণ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই মনোবিজ্ঞানসম্মত। টেলিফোন অপারেটারদের সবার স্বপ্নে তো আর এই ব্যাপারটা আসে না। যাঁদের স্বপ্নে আসে, তাঁদের পেশাগত কাজের *শ্রবণসুখ* বা *কথনসুখ*—পেশার ছবি আর কথাকে স্বপ্নে টেনে আনে। প্রাথমিকভাবে টেলিফোন অপারেটারদের এই ইচ্ছাপূরণের তত্ত্ববিরোধী বলে মনে হলেও, এগুলো তাই ইচ্ছাপূরণেরই স্বপ্ন। যে কোনও পেশায় বাস্তবের অবিকল ছবি বা কথা স্বপ্নে চলে এলে, ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবে।

বেশ কিছু মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভের স্বপ্নের বিবরণ সংগ্রহ করা গেছে। এই পেশা নানাদিক থেকে ব্যতিক্রমী। এই পেশায় যুক্ত একজন মানুষ পেশায় বেশি সময় দিলে আর বেশি পরিশ্রম করলে অনেক সময় ফল পান হাতেনাতে। অন্তত দেশী বড় আর বহুজাতিক ওষুধ সংস্থার প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে এ কথা অবশ্যই বলা যায়। ওঁরা তাঁদের কাজের অঞ্চলে ('টেরিটারি') কোম্পানির মোট বিক্রির ওপর বাৎসরিক 'ইনসেনটিভ' পান অনেকেই। পড়াশোনায় ভাল আর কথাবার্তায় বুদ্ধিদীপ্ত একজন যুবকের পক্ষে এই পেশা 'চ্যালেঞ্জিং'। বাস্তবে এই চ্যালেঞ্জের পুরোদস্তুর মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না সব সময়। যা স্বপ্নের ভাবনায় চলে আসতে পারে। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই পেশাগত ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখেন বেশি। শুধু ওষুধসংস্থা নয়, জীবনবীমার সঙ্গে যুক্ত কিছু বীমাপ্রতিনিধির স্বপ্নেও এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছি। এরকম কিছু স্বপ্নের কথা বলি—

স্বপ্ন ১: 'টার্গেট'-এ পৌঁছে অনেক ইন্‌সেনটিভ কামাচ্ছি—খুব আনন্দ হচ্ছে।

—পূর্ণেন্দু রায়, কলকাতা।

স্বপ্ন ২: দেখলাম, কোম্পানি একটা ট্রেনিং-এর ব্যাপারে আমাকে হাঙ্গেরি পাঠাচ্ছে—স্বপ্নের মধ্যেই খুব আনন্দ হচ্ছিল।

—প্রবাল বিশ্বাস, কলকাতা।

স্বপ্ন ৩: একটা নতুন 'প্রোডাক্ট' (ওষুধ) নিয়ে বিখ্যাত একজন ডাক্তারকে সহজেই বোঝাতে পারলাম—মনে হল, এবার মার্কেটে প্রোডাক্টটা খুব চলবে।

—মিহির ব্যানার্জি, শ্রীরামপুর।

স্বপ্ন ৪: পূর্বাঞ্চলে খুব ভালো কাজ করার জন্য একটা পুরস্কার পাচ্ছি—পুরস্কার দেবার পর জেনারেল ম্যানেজার আমাকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

—রাজীব শর্মা, মুম্বাই।

স্বপ্ন ৫: কোম্পানিকে জানালাম, হৃদরোগের জন্য একটা গবেষণালব্ধ নতুন ওষুধ বাজারে ছাড়তে। কোম্পানি থেকে আমাকে একটা ওষুধের 'মলিকিউল'-এর কথা বলা হল—আমি ওই মলিকিউলের ওপর বক্তৃতা করছি একটা সেমিনারে—সবাই বাহবা দিচ্ছে।

—বুয়া রায়, দমদম।

ঠিকে ঝি বা বাড়িতে সারাদিন থাকাখাওয়া আর কাজের সঙ্গে যুক্ত ঝিদের কুড়িজনের স্বপ্নের বিবরণ নানাসূত্রে সংগ্রহ করা গেছে। দেখা যাচ্ছে, এঁদের বেশিরভাগ মানুষের স্বপ্নে পেশাগত ভয়, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা আসছে খুব বেশি। সারাদিন কাজের বিনিময়ে এঁরা রোজগার করেন যৎসামান্য। এঁদের কাজে না আছে কোনও পেশাগত সুযোগ-সুবিধা, না আছে চাকরির নিরাপত্তা। যে কোনও সময় সামান্য অজুহাতে চলে যেতে পারে কাজ। এঁদের স্বপ্নে পেশাগত ইচ্ছাপূরণের বদলে, ওই সংক্রান্ত ভয় আর উদ্বেগের ছবি বেশি আসার কারণ এগুলোই। এঁরা স্বপ্ন দেখেন গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর বকা খাওয়ার বা কাজ চলে যাবার। কেউ বা দেখেন, কাজ চলে যাওয়ায় রাস্তায় ভিক্ষা করছেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন কয়েকটা পেশা সংক্রান্ত ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন। তবে পেশাগত দুঃস্বপ্নেব তুলনায় তা অনেক কম। পেশা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা এঁদের বেশিরভাগ মানুষের মনে রয়েছে চেতন-অবচেতনের অনেকটা জুড়ে। যা 'সাহস বাড়াবার স্বপ্ন' হয়ে বা অন্যভাবে স্বপ্নে চলে আসে।

কয়েকজন পুলিশ-প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সংগ্রহ করা গেছে কলকাতার ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে যুক্ত প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষের স্বপ্ন। এঁদের বেশিরভাগই ট্রাফিক কনস্টেবল, ডিউটি করেন কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ নানা রাস্তার মোড়ে। এই পেশার অর্ধেকের বেশি মানুষের স্বপ্নে চলে আসে পেশাগত নানা ঝামেলা ঝঞ্ঝাট বা অন্য কোনও বিষয়। এঁদের কিছু পেশাগত স্বপ্নের কথা বললে ব্যাপাবটা পরিষ্কার হবে:

স্বপ্ন ১: একটা গাড়িকে আটকালাম। লোকটা নেমে অনেক লোকজন নিয়ে ফিরে এল। আমাকে থ্রেট করছে—একটু পরে দেখি, তাড়া খেয়ে দৌড়চ্ছি—।

স্বপ্ন ২: ডিউটি করার পর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম 'সিগন্যাল করছি।'

স্বপ্ন ৩: স্বপ্নে গাড়ি সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল—পেছোতে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করে গেল। (বাস্তবে প্রায়ই কথা শোনে না।)

স্বপ্ন ৪: সিগন্যাল 'ঠিকমতো না করার' জন্য একটা ভি. আই. পি গাড়ি আটকে গেল—অফিসার এসে বকাবকি করছেন—কেন গাড়ি আটকালো, জবাবদিহি করতে হচ্ছে।

স্বপ্ন ৫: হয়তো একটা গাড়ি 'পাল্টি খেয়ে' গেল, বা অ্যাক্সিডেন্ট করল। বাস্তবের এরকম ঘটনাই একটু বদলে স্বপ্নে চলে এল।

স্বপ্ন ৬: [একজন সহকর্মী ডিউটি করতে করতে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল। রাতে স্বপ্ন দেখলাম] আমি মরে গেছি। স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা খুব সমস্যায় আছে—একটাও টাকাপয়সা পায়নি।

স্বপ্ন ৭: একটা গাড়ি রেডলাইট সিগন্যাল ভায়োলেট করে চলে গেল—কম্পিউটার নাম্বার বলে নোট করতে পারলাম না—বাস্তবেও এরকম হয়।

স্বপ্ন ৮: [চার পাঁচবার মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমার চোখের সামনে। স্বপ্নে দেখি] ওই রকম

কোনও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে আমার ডিউটিতে—খুব ভয় করছে।

স্বপ্ন ৯: [দিনের বেলা যা করি তাই স্বপ্নে চলে আসে]—হয়তো দেখলাম, মাঝরাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, ঠেলছি। গাড়ি লাইন পেরিয়ে গেছে, আমি গাড়িতে লাঠি ঠুকছি—'এ্যাই! চলো!' বা হাত নেড়ে একদিককার গাড়ি পাস করাচ্ছি। কি হয়তো খাতা বার করে একটা গাড়ির নম্বর টুকলাম।

স্বপ্ন ১০: প্রথম এই লাইনে এসে স্বপ্নেও ট্রাফিক কনট্রোল করতাম। হাত নাড়তাম—হয়তো বলে উঠলাম, 'এ্যাই চল! চল তাড়াতাড়ি!' পাশ থেকে কেউ ঘুম ভাঙিয়ে দিত।

স্বপ্ন ১১: মাঝেমাঝে দেখি ডিউটি করছে একজন অচেনা কনস্টেবল—গাড়ির ধাক্কা খেয়ে চাপা পড়ল বা মারা গেল—এরকম স্বপ্ন দেখলে খুব ভয় লাগে।

স্বপ্ন ১২: নতুন এ লাইনে আসার পর অ্যাক্সিডেন্টের আর পাবলিকের তাড়ার স্বপ্ন প্রায়ই দেখতাম।

স্বপ্ন ১৩: এক একটা 'বিট' আছে, যেমন 'জীবনদীপ', আটঘণ্টা একা ডিউটি করতে হয়। দু-একবার জল খেতে বা পেচ্ছাপ করতে যেতেই হয়। হয়তো ফিরে এসে দেখলাম, 'রাউন্ড' (নজরদারি গাড়ি) চলে গেছে। আমাকে 'গাফ্‌নি' (ডিউটিতে ছিল না বলে রিপোর্ট) করেছে। ঠিক একই ঘটনা স্বপ্নেও আসে—খুব চিন্তা হতে থাকে—ঘুম ভেঙে যায়।

স্বপ্ন ১৪: চলন্ত গাড়ির সামনে পড়ে গেলাম—ঘেমেনেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

ঝুঁকিবহুল পেশায় পেশাগত স্বপ্নগুলোর বৈচিত্র্য বুঝতে সাহায্য করে কনস্টেবলদের দেখা এই স্বপ্নগুলো। বাস্তবের ঘটনা হুবহু চলে আসে বেশ কিছু এই পেশার মানুষের স্বপ্নে। এর মধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা ভয়ের। কিছু নির্দেশ দেবার। পাঠক লক্ষ করবেন, ভয়ের স্বপ্নগুলোর বেশিরভাগই 'সাহস বাড়াবার স্বপ্ন'। বাস্তবের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মারাত্মক উদ্দীপনা বারবার ওই ঘটনা স্বপ্নে দেখার মধ্যে দিয়ে কমিয়ে আনা এরকম স্বপ্নের উদ্দেশ্য। যাতে বাস্তবে এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় সহজে। গাড়ি নির্দেশ মেনে পিছিয়ে যাচ্ছে—এরকম স্বপ্ন ইচ্ছাপূরণের। ভি.আই.পি গাড়ি আটকে যাওয়ায় উচ্চপদস্থ অফিসার এসে বকছেন—স্বপ্নের দর্শকের সঙ্গে কথা বলে এরকম স্বপ্নকে 'শাস্তি পাবার স্বপ্ন' বলে মনে হয়েছে।

চলমান যানস্রোত নিয়ন্ত্রণের কষ্টকর, উদ্বেগপূর্ণ নানা বাস্তব অভিজ্ঞতা এই পেশার কিছু মানুষের স্বপ্নে হুবহু চলে আসে। কেউ স্বপ্নে যান নিয়ন্ত্রণ করেন। কেউ বা লাঠি ঠুকে লাইন পার হয়ে যাওয়া গাড়িকে বলেন পিছোতে। 'আমার নির্দেশ সবাই মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে'—অবচেতন বা অচেতন মনের এরকম ইচ্ছা এরকম স্বপ্নে কাল্পনিক পূর্ণতা পায়। তা নাহলে পেশাগত কাজের বাস্তব ছবি এভাবে এঁদের স্বপ্ন চলে আসত না। বিশিষ্ট মনোবিদ প্রণব বসু মনে করেন, 'আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে একজন নেপোলিয়ান বসে আছেন।' নিজের নির্দেশ অন্যকে মেনে চলতে বাধ্য করা এক ধরনের স্বেচ্ছাচার। বাস্তবে ডিউটি করতে করতে এই সুপ্ত স্বেচ্ছাচার-প্রবণতা প্রকাশের মধ্যে একজন ট্রাফিক কনস্টেবল একধরনের সুখ (Pleasure) পান। আর এই ঘটনাগুলো স্বপ্নে ফিরে আসার মধ্যেও কাজ করে ওই সুখ ফিরে পাবার ইচ্ছা। আরও একটা ব্যাপার এখানে হয়তো কাজ করে। ডিউটিতে বা ডিউটির বাইরে এক জন ট্রাফিক কনস্টেবল চূড়ান্ত হেনস্থা হন যখন তখন। ডিউটিতে যানচালকদের আদেশ মানতে বাধ্য করার মধ্যে তাই এক ধরনের প্রতিক্রিয়াজনিত সুখবোধ (Reactive Pleasure) কাজ করতে পারে। এই সুখবোধ ফিরে আসতে পারে এই পেশার একজন মানুষের স্বপ্নে।

লেখকদের স্বপ্নে পেশা কীভাবে আসে? চল্লিশজন খ্যাতনামা লেখকের স্বপ্নের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে তা থেকে এ-ব্যাপারে একটা প্রাথমিক ধারণায় আমি পৌঁছতে পেরেছি। এঁদের প্রায়

অর্ধেকের ক্ষেত্রে স্বপ্নে কোনও না কোনওভাবে লেখালেখি চলে আসে। কেউ স্বপ্নে গল্পের প্লট পান। যেমন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বাণী বসু বা সুচিত্রা ভট্টাচার্য। অবশ্য যুক্তির পারম্পর্য না থাকায় এরকম প্লট বেশিরভাগ সময় গল্প লেখায় কাজে আসে না। বেশ কয়েকজন কবি ও গল্পকার জানান, অসমাপ্ত কোনও একটা কবিতা বা গল্প শেষ করতে স্বপ্ন তাঁদের নানা সময়ে নানা ভাবে সাহায্য করেছে। কেউ বা স্বপ্নে পাওয়া লাইনকে কাজে লাগিয়ে কবিতা লিখেছেন। *শাদা ঘোড়ার* লেখক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এই কাহিনী লিখতে লিখতে একটা জায়গায় তিনি আটকে যান। একরাতের স্বপ্নে পেয়ে যান লেখাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সূত্র। কবি শঙ্খ ঘোষ, কবি জয় গোস্বামী, কবি অরুণ মিত্র স্বপ্নে পেয়েছেন কিছু কবিতার লাইন।

লেখক আবুল বাশার জানান, 'অগ্নিবলাকা, উপন্যাস লেখার সময় শৈশবের নদী, জল আর পারিপার্শ্বিকতা বারবার অনেক বড় হয়ে চলে এসেছিল তাঁর স্বপ্নে। স্বপ্নে জায়গাগুলো এতবার এসেছে বলেই হয়তো উপন্যাসে জায়গাগুলোর বর্ণনা এত নিখুঁত। আমার তাই মনে হয়। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় কোনও একটা উপন্যাস বা বড় গল্প লিখতে লিখতে এমন অনেক কিছু পেয়ে যান, যা তাঁর লেখায় কাজে লাগে। লোটাকম্বল উপন্যাসের কচ্ছপটা যেমন। বা অচেনা আকাশ এর নায়িকা চরিত্রটা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের কিছু লেখায় স্বপ্ন বা দিবাস্বপ্ন নানাভাবে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতা, গান ও উপন্যাসের মূল প্রেরণা ছিল কবির দেখা স্বপ্নলব্ধ নানা কাহিনী।

এই সব দৃষ্টান্ত পরোক্ষভাবে হলেও পেশায় স্বপ্নের ভূমিকা সম্পর্কিত। লেখকদের স্বপ্নে লেখালেখি বা ওই সংক্রান্ত পড়াশোনা সরাসরি বা জটিলভাবে চলে আসতে পারে। সবার নয়, কারও কারও ক্ষেত্রে। একজন লেখকের স্বপ্নে পেশা আসবে কিনা তা কিছু সূত্রের উপর তা নির্ভর করে বলে আমার মনে হয়েছে। এই সূত্রগুলো হল:

(ক) লেখকের মানসিকতা
(খ) পেশাগত সুখবোধের তারতম্য
(গ) লেখকের মনোজগতে পেশার জায়গা
(ঘ) ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ আর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পেশার সম্পর্ক
(ঙ) পেশাগত টানাপোড়েন আর উদ্বেগের মাত্রার তারতম্য।

লেখকে লেখকে এই সূত্রগুলোর তারতম্য ঘটবেই। স্বপ্নে পেশাগত ছবিও হয় আসবে না, এলেও আসবে এক একজনের ক্ষেত্রে একেক রকমভাবে।

কয়েকজন লেখকের কিছু স্বপ্ন পেয়েছি যেখানে পেশা এসেছে পরোক্ষভাবে। কবি শঙ্খ ঘোষের বারো লাইনের অসমাপ্ত কবিতার স্বপ্ন উল্লেখ করেছি 'স্বপ্নে বিখ্যাত চরিত্র' অধ্যায়ে (১১৭ পাতায়)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এরকম একটা স্বপ্ন পেয়েছি বর্ষণমুখর এক রাতে, তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়ি থেকে। ১৯৯৬ সালের ৮ অগাস্ট সংগ্রহ করা এই স্বপ্ন সুনীল দেখেন আগের দিন, ৭ অগাস্ট রাতে। স্বপ্নটা এরকম—

আমি যেন বাংলাদেশে রয়েছি, ওখানে আমার একটা অফিস। দেশ-এর অফিসের মতো নয়, একেবারে অন্যরকম। আমি একটা উপন্যাস লিখছি—উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো ডাঁই করে টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া থাকে। এক দিন অফিসে গিয়ে দেখি, আমার সব উপন্যাসের পাতা ময়লা কাগজ ফেলার জায়গায় ফেলে দিয়েছে—টেবিলের ওপর একটা পাতাও নেই। আমি বেয়ারাকে বললাম, 'চলো, কোথায় তোমাদের কাগজ ফেলার জায়গা? আমি খুঁজে দেখি। লেখার পাতাগুলো যদি পাওয়া যায়।'

লেখা পেশা এমন মানুষের স্বপ্নে সরাসরি বা জটিলভাবে লেখালেখি চলে আসার সঙ্গে সম্ভবত সংশ্লিষ্ট লেখকের অচেতন বা অবচেতন মনে লেখার সময়কার কোনও সুখবোধ জড়িত। লেখাসংক্রান্ত

কোনও উদ্বেগ বা তাড়নাকে (Urge) কেন্দ্র করে যা কিছু লেখকের স্বপ্নে চলে আসে। কিছু লেখকের স্বপ্নে লেখা আসে না তাঁদের মানসিক গঠন আর পেশার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যাঁদের স্বপ্নে লেখালেখি আসে, তাঁদের চাইতে আলাদা হওয়ায়। এঁদের স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করবার পর আমার এরকম মনে হয়েছে।

নাট্যকর্মী আর চিত্রগ্রাহকদের কিছু স্বপ্নে পেশাগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়, উদ্বেগ নানাভাবে চলে এসেছে। কোনও একটা নাট্যপ্রযোজনার সাফল্য বা ব্যর্থতা, অভিনয় সংক্রান্ত নানা সমস্যা আর তার সমাধান, নির্দিষ্ট একটা নাটক আর তার অভিনয় একজন নাট্যকর্মীর মনোজগতে অনেকটা জায়গা দখল করে নিতে পারে। চিত্রগ্রাহকদের মনের জগতে অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকতে পারে ছবি তোলা সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা, আশাআকাঙ্ক্ষা, ভয় আর উদ্বেগ। পাশাপাশি এক জন চিত্রপরিচালকের কথা ধরা যাক। 'লোকেশান'এ সুটিং চলাকালীন নানা ধরণের বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হন একজন চিত্রপরিচালক। কোনও ছবি নিয়ে নানা দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় বা আশা থাকতে পারে একজন চিত্রপরিচালকের চেতন-অবচেতনের অনেকটা জায়গা জুড়ে। নাট্যকর্মী, ফোটোগ্রাফার আর চিত্রপরিচালকদের স্বপ্নে পেশাগত নানা ছবি চলে এসেছে, এমন বেশ কিছু স্বপ্ন পেয়েছি। তবে এই সব পেশার যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের স্বপ্ন সংগ্রহে না থাকায় সুনির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করা আমার পক্ষে এখনও সম্ভব হয়নি।

স্বপ্ন আর মনের অসুখ

নানা ধরনের মনের অসুখে আক্রান্ত মানুষের মনোরোগের সঙ্গে তাঁদের ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নের সম্পর্ক কতটুকু? কীভাবে একজন মনোরোগীর স্বপ্নের দেশ প্রভাবিত হয় তার মনের সমস্যা দিয়ে? এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে। ১৮৭৪ সালে মনোবিদ উল্লু য়্যুন্ট তাঁর এক গবেষণাপত্রে লিখছেন, 'পাগলাগারদে যে ব্যাপারগুলো ঘটে, আমরা আমাদের স্বপ্নে সেই ব্যাপারগুলোই ঘটতে দেখি।' তারও আগে মনোবিদ সোপেনহাওয়ার (Schopenhauer, 1862) স্বপ্নকে 'অল্প সময়ের পাগলামি' আর মনোরোগকে 'দীর্ঘদিন ধরে দেখতে থাকা স্বপ্ন' বলে উল্লেখ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর এক মনোবিদ লিখছেন, 'উন্মাদ মানুষ আসলে জেগেজেগে স্বপ্ন দেখে'। ১৮৫৯ সালে মনোবিদ ক্রোশের (A Krauss) মনে হয়েছিল, 'উন্মাদ অবস্থা আসলে সব রকম অনুভূতির তীব্রতা নিয়ে এক জন মানুষের দেখতে থাকা স্বপ্ন।'

ফ্রয়েডের আগেকার ও ফ্রয়েডের সমসাময়িক স্বপ্নগবেষক মনোবিদরা স্বপ্নের সঙ্গে কিছু মনোরোগের বেশ কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এক জন মানুষের উন্মাদ অবস্থা আর এক জন মানসিকভাবে সুস্থ মানুষের দেখা স্বপ্ন—একটা মূল জায়গায় এই দুয়ের চরিত্রে বিরাট মিল রয়েছে। দুটো অবস্থাতেই মনের গোপন ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে মিটতে চায়। মনোবিদ পি. রেডস্টকের কিছু পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। ফ্রয়েড মনে করতেন, এই জায়গা থেকেই খুঁজতে হবে। কীভাবে 'সাইকোসিস' (মনোরোগ) আর স্বপ্নের পেছনে কাজ করা মানসিকতা একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মনোবিদরা স্বপ্নের সঙ্গে উন্মাদ অবস্থার যে সাদৃশ্যগুলো খুঁজে পেয়েছেন তা এরকম:

এই দুই অবস্থাতেই (ক) ভাবনা আর তা থেকে তৈরি ছবি দ্রুতলয়ে ছুটতে থাকে; (খ) আত্মসচেতনতা আর বিচার বুদ্ধি কমে আসে বা একেবারে লোপ পায়; (গ) কমে যায় নৈতিকতার বোধ; (ঘ) সময়জ্ঞান কমে আসে বা পুরোপুরি চলে যায়; (ঙ) ভাবনার প্রবাহ ছুটতে থাকে এলোমেলোভাবে; (চ) চিন্তাভাবনার ভেতরকার মাত্রাজ্ঞান যায় চলে। চিন্তাগুলো একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক হারায়। ফলে নানা ধরনের বিভ্রম দেখা দেয়। সামান্য ব্যাপার দেখা দেয় অতিরঞ্জিত হয়ে। (ছ) সংশ্লিষ্ট মানুষের মন খণ্ডিত হয়ে যায় একাধিকভাগে। কখনও বা অনেকভাগে।

স্বপ্ন আর উন্মাদ অবস্থার একটা উল্লেখযোগ্য বৈপরীত্য রয়েছে। স্বপ্নে দেখা, শোনা, গন্ধ বা স্বাদ পাওয়ার অনুভূতির তীব্রতা স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে কমে আসে। ঠিক এর উলটোটা ঘটে উন্মাদ অবস্থায়।

এখন থেকে একশো বছর বা তারও আগে কিছু মনোবিদ স্বপ্নের মনোরোগ সৃষ্টির কিছু দৃষ্টান্ত লক্ষ করেন। আর তা থেকে তাঁদের ধারণা হয়, স্বপ্ন বেশ কিছু মনোরোগ তৈরি করতে সক্ষম। ফ্রয়েডের সমসাময়িক একজন বিশেষজ্ঞ তাঁর একজন রোগীর ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখবার পর হিস্টিরিয়াতে আক্রান্ত ঘটনার কথা জানান। ওই সময়কার আর একজন মনোবিদ অন্য একজন মানুষের কথা জানান, যিনি একটা স্বপ্ন দেখে হিস্টিরিয়ার প্যারালিসিসে আক্রান্ত হয়েছেন। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে পশ্চিমের নানা দেশের অনেক মনোবিদ হিস্টিরিয়া, সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ততা (Paranoia) ও আরও নানা ধরনের 'সাইকোসিস'-এ আক্রান্ত মানুষের স্বপ্ন নিয়ে নানা ধরনের পর্যবেক্ষণ চালান। দেখা যায়, বেশিরভাগ মনোরোগ এক জন মানুষের জেগে থাকা অবস্থায় চলে আসবার আগে দেখা দেয় তাঁর

স্বপ্নে। অনেক মনোরোগ একজন মানুষের বাস্তবজীবনকে আক্রমণ করবার আগে নানাভাবে হানা দেয় তার স্বপ্নে। আর এ সব স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করে এক জন মানুষের আসন্ন মনোরোগের একটা আভাস হয়তো পাওয়া যায়। একরম একটা স্বপ্নের ব্যাখ্যা পাঠক পাবেন 'কিছু স্বপ্নের বিশ্লেষণ' অধ্যায়ের নয় নম্বর স্বপ্নে।

কয়েকদশক আগেও মনোবিদ আর মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা মনোরোগীর স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতেন অনেকটাই। এখানে আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। চিকিৎসায় কোনও মনোরোগের কবল থেকে বাস্তবজীবনে মুক্ত হবার বরও রোগটা বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকে এক জন মানুষের স্বপ্নের দেশে। মানুষ রোগমুক্তির কিছুদিন পরে এরকম স্বপ্ন চলে যায়। তখন সেরে ওঠা মনোরোগীর স্বপ্নের দেশটাও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

মনোবিদ রেডস্টকের লেখা প্রাসঙ্গিক কিছু কথা এখানে উল্লেখ করব। 'শরীর আর মনের যন্ত্রণায় জর্জরিত এক জন মানুষকে কঠোর বাস্তব যা পেতে দেয় না, তা তিনি পেয়ে যান স্বপ্নের দেশে'। 'ঠিক তেমনি', রেডস্টক লিখছেন, 'মনের রোগে আক্রান্ত মানুষের জীবনে কাল্পনিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, বিত্ত আর সাফল্যের ছড়াছড়ি। কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণের এই ব্যাপারটা ভেঙে যেতেই মানুষটা উন্মাদ হয়ে ওঠেন। সন্তান হারানো মা এই অবস্থায় বিকার বকতে বকতে মাতৃত্বের সুখটুকু ফিরে পান। প্রেমিকের কাছে প্রতারিত একজন মেয়ে পায় প্রিয়পুরুষের ভালোবাসার ছোঁয়া। সর্বস্ব খোয়ানো একজন মানুষ নিজেকে ভাবেন প্রবল বিত্তশালী। ক্ষমতাহীন পুরুষ হয়ে যান দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা।

মনের অসুখ থেকে সেরে ওঠা একজন মানুষ অনেকসময় ভাবেন, তিনি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। কিছু মনোরোগী, রোগাক্রান্ত অবস্থার মধ্যেও মাঝেমধ্যে বুঝতে পারেন, তিনি যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে রয়েছেন। পুরোপুরি স্বাভাবিক আর সুস্থ মানসিকতার একজন মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন নিয়মিত। এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এই স্বপ্ন দেখার পদ্ধতিটা তাঁর জেগে থাকা অবস্থাতে গুরুতরভাবে খুব বেশিমাত্রায় চলে এলে মনের স্বাস্থ্য আর ঠিক থাকে না। মানুষটা আক্রান্ত হন মনোরোগে।

এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভবনা রয়েছে। এই কথাগুলোর অর্থ কোনও পাঠকের কাছে এরকম মনে হতে পারে যে, জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা মানুষ মাত্রই মনোরোগী। ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। দিবাস্বপ্ন আর 'তীব্র স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থা' পুরোপুরি আলাদা। স্বপ্নের মতো অবস্থা তীব্র আকারে জেগে থাকা অবস্থায় একটানা চলতে থাকে নানা ধরনের মনোরোগে। দিবাস্বপ্ন দেখা মানুষের ক্ষেত্রে বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত এরকম অবস্থা দেখা দিতে পারে না তা নয়। তবে তা খুব সাময়িক। আর মনোরোগীর স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থা চলতে থাকে একটানা। নিজের মনের ওপর দিনের পর দিন জেগে থাকা অবস্থাতেও তাঁর আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

কিছু মনোরোগীর স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হয়। মানসিক অবসাদ আর ভীতি রোগে (Depression and Phobia) আক্রান্ত ৪২ বছরের এক মহিলার স্বপ্নের কথাই ধরা যাক। মহিলার একমাত্র ছেলের বয়েস ১৬। এই সন্তান যখন মহিলার পেটে ৪-৫ মাসের, তখন তাঁর সাড়ে তিন বছরের মেয়ে হঠাৎ করে মারা যায়। তারপর থেকে মহিলা সব কিছুতে ভয় পান। বছর দশেক আগে জরায়ুতে টিউমার হবার জন্য জরায়ু বাদ দেবার পর থেকে ওঁর মানসিক অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে। 'সব সময় কেমন ভয় ভয় করে'। ছেলে স্কুলে গেলে, কোচিং সেন্টারে পড়তে গেলে মনে হয়, ছেলে বোধ হয় হারিয়ে গেল। আর ফিরবে না। হতাশার কবলে মহিলার দিনগুলো বিপর্যস্ত হয় সব কিছু হারিয়ে ফেলার ভয়ে। সব কিছুতেই ভয়। স্বামীর কাছে 'অযোগ্য, অপ্রয়োজনীয়' হয়ে যাবার ভয়।

এই সর্বগ্রাসী ভয় আর হতাশা কীভাবে তার স্বপ্নের জীবনে প্রভাব ফেলেছে দেখা যাক। তার আগে বহুদিন আগে মৃত মেয়েকে নিয়ে দেখা একটা স্বপ্নের কথা বলি।

স্বপ্ন ১: সেই বয়সের মেয়েটা, ফ্রক পরা, কোলে ওঠে—কোলে তুলে দোলাই, আদর করি—খুব আনন্দ হয়—ঘুম ভেঙে বড় কষ্ট হয়, খুব কান্না পায়।

স্বপ্ন ২: গঙ্গার ধারে গেছি, একটা শ্মশান। শ্মশানে একটা চালাঘর তৈরি হয়েছে আমার জন্য। আমাকে ওই ঘরে থাকতে হবে—আমার স্বামী বলছেন, 'তুমি এখানেই থাকো, তোমাকে আর বাড়ি যেতে হবে না। এটাই এখন থেকে তোমার বাড়ি।'

স্বপ্ন ৩: অনেকদূরে কোথায় যেন গেছি, সঙ্গে অন্য কেউ—বাড়িতে ফিরতে চাইছি, কিছুতেই পারছি না, পা দুটো একটুও চলছে না—বড় ভয় লাগছে।

স্বপ্ন ৪: কারা যেন তাড়া করেছে, পেলেই মেরে ফেলবে। প্রচণ্ড ভয়ে ছুটতে চাইছি, পারছি না। এই স্বপ্নটা প্রায়ই দেখি।

মহিলার প্রথম স্বপ্ন এসেছে বাস্তবের যন্ত্রণা থেকে তাকে সাময়িক মুক্তি দিতে। দ্বিতীয় স্বপ্নে চলে এসেছে স্বামীর কাছে বাতিল হবার ভয়। তৃতীয় স্বপ্নের উৎস মানসিক নিরাপত্তার অভাববোধ। শেষ স্বপ্নও প্রায় একরকম। স্বপ্নগুলোর গভীরে না গিয়েও পাঠক বুঝতে পারবেন, স্বপ্নদ্রষ্টার বাস্তবের মানসিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটছে তাঁর ঘুমন্ত চেতনার চিন্তাপ্রবাহে।

৪৭ বছর বয়সের এক জন মনোরোগী তাঁর বেশ কিছু স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। ভদ্রলোক চাকুরিজীবী। সংসারে সচ্ছলতার কোনও অভাব নেই। বছর দশেক ধরে এক অজানা ভয়ের দাপটে যখন তখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন মানুষটা। দ্রুতগামী ট্রেনে বা ভিড় ট্রেনে উঠলে খুব ভয় পান, বুক ধড়ফড় করে। প্রচণ্ড ভয় পান দরজা জানলা বন্ধ কোনও ঘরে একা থাকতে। মনে হয় সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। যে কোনও মারাত্মক বিপদ ঘটবে। এই ভদ্রলোকের দেখা দুটো স্বপ্ন এরকম:

স্বপ্ন ৫: ভয়ে দৌড়োচ্ছি, পা চলছে না—পেছনে কারা যেন আসছে, তাকাতেও ভয় লাগছে—ভয়ে ঘুম ভেঙে যায় (এই স্বপ্ন অজস্রবার দেখেছি)।

স্বপ্ন ৬: একটা ভাঙাবাড়ি, পরিত্যক্ত। কেউ কোথাও নেই। সিঁড়ি দিয়ে নীচে বেসমেন্টে নামলাম। হঠাৎ দেখি কয়েকটা লোক আমাকে জাপটে ধরল। জোর করে আমার মানিব্যাগটা কেড়ে নিল।

৪০ বছর বয়সের এক ব্যবসায়ী প্রায় এক ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত। এই ভদ্রলোকের বাববার দেখা দুধবনের স্বপ্নের কথা বলি—

স্বপ্ন ৭: মারদাঙ্গা হচ্ছে। আমি পাশ দিয়ে যাচ্ছি। খুব ভয় করছে।

স্বপ্ন ৮: স্বপ্নে কে যেন গলা চেপে ধরে—চিৎকার করে ঘুম ভেঙে যায়।

ত্রিশ বছরের এক গৃহবধূ আক্রান্ত মনোরোগে। এই মহিলার বারবার দেখা একটা স্বপ্ন আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা বন্ধু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। বহুবার দেখা এই স্বপ্নে কিছু হেরফের থাকলেও মোটামুটি স্বপ্নটা এরকম:

স্বপ্ন ৯: 'দেখি একজন মানুষ, সে পুরুষ না স্ত্রী তা বোঝা যায় না, আমাকে গলা টিপে মারতে আসছে। যতবার তার মুখ দেখতে যাই দেখি মুখটা পেছনে দিকে ফেরানো বা কালো পর্দায় ঢাকা। প্রচণ্ড আতঙ্কিত অবস্থায় ঘুম ভেঙে যায়। প্রচণ্ড ভয়ে তখন বুক ধড়ফড় করছে আর সারা শরীর ঘামে ভেজা।'

মানসিক অবসাদে আক্রান্ত প্রায় পঁচিশজন মানুষ আমাকে তাঁদের এক ধরনের স্বপ্নের কথা জানান। এঁরা কেউ কেউ অনেক দিন ধরে ডিপ্রেশানের শিকার। কয়েকজন সম্প্রতি মানসিক অবসাদে আক্রান্ত। এই স্বপ্নের ধরন মোটামুটি এক।

স্বপ্ন ১০: *দেখি যে খুব* মারামারি, কাটাকাটি হচ্ছে। একজন আর একজনের পেটে বা বুকে ছুরি বসিয়ে দিল। অনেক মৃতদেহ পড়ে আছে। হাত-পা কাটা লাশ পড়ে আছে এখানে ওখানে।

এরকম স্বপ্ন দেখবার সময় খুব ভয় করে স্বপ্নের দর্শকের। ঘুম ভেঙে উঠে শুরু হয় মনখারাপ, কিছুই ভাল লাগে না তখন। কেউ কেউ সকালে উঠে কাঁদতে শুরু করেন। এরকম স্বপ্ন এঁদের প্রায় সবাই নিয়মিত দেখেন। এঁরা প্রত্যেকে নানা ধরনের মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেশানে আক্রান্ত। এরকম স্বপ্ন দেখা মানুষের সঙ্গে কথা বলে কয়েকটা ব্যাপার লক্ষ করা গেছে। (১) এরকম স্বপ্ন দেখতে শুরু করবার বেশ কিছুদিন পর থেকে এরা মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেছেন। (২) অবসাদের তীব্রতা বাড়লে এরকম স্বপ্ন দেখাও বাড়ে। (৩) মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চিকিৎসা করান এঁদের অনেকে। বাস্তব জীবনে চিকিৎসা চলবার সময় মানসিক অবসাদ থেকে কিছুটা মুক্ত হলেও, রাতে মাঝে মাঝে এরকম স্বপ্ন আসে। যদিও তা আগের তুলনায় কম।

আপাতদৃষ্টিতে মানসিকভাবে সুস্থ এক তরুণ অধ্যাপকও এরকম স্বপ্ন মাঝে মধ্যে দেখেন। এই অধ্যাপকের দেখা একটা স্বপ্ন:

স্বপ্ন ১১: মধ্যযুগীয় একটা তরবারি দিয়ে পেটের কাছ থেকে আমাকে কেটে ফেলা হচ্ছে। আমার শরীরের ওপর দিকটা বেঁচে আছে, কথা বলতে পারছি। এরপর আমার এক একটা হাত কেটে ফেলে হচ্ছে। (এরকম স্বপ্ন দেখবার পরদিন বড় বিষণ্ণ, বড় অবসন্ন লাগে।)

এক গৃহবধূ তাঁর দেখা বেশ কিছু স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। মহিলা সমস্যায় আক্রান্ত হতেন স্বপ্নেও। দেখতেন অন্য নারীর সঙ্গে স্বামীর প্রণয়দৃশ্য বা মিলনদৃশ্য। একটা সময় দেখতেন, কোনও এক জন অচেনা নারী তার স্বামীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তিনি অনেক চেষ্টা করেও আটকাতে পারছেন না। মহিলা এখন বাস্তবে ওই সমস্যা থেকে পুরোপুরি মুক্ত। তবু মাঝে মাঝে স্বপ্নে তার স্বামীকে দেখতে পান অন্য এক বা একাধিক চেনা বা অচেনা নারীর সঙ্গে।

ডিপ্রেশানে আক্রান্ত আরও কয়েক জন মানুষ তাঁদের নানা ধরনের স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন গোপনীয়তার শর্তে। এক মহিলার স্বপ্নে বিষধর হাজার হাজার সাপ প্রায়ই তাকে ঘিরে ফেলে, চূড়ান্ত আতঙ্কের দিকে ঠেলে দেয়। আরও নানা ধরনের স্বপ্নে চলে আসে এঁদের বাস্তব জীবনের নানা ভয়-ভীতি, অর্থনৈতিক, পারিবারিক বা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা আর দৈনন্দিন জীবনের চরম অনিশ্চয়তা। এরকম বহু মানুষের বেশ কিছু স্বপ্ন আসলে ভয়ের বা আতঙ্কের স্বপ্ন। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, এরকম কিছু স্বপ্নের উৎস এঁদের অবচেতনে বা অচেতনে লুকিয়ে থাকা নানা ধরনের পাপবোধ। যে 'পাপ' এর জন্য স্বপ্নে নিজেকে শাস্তি পেতে দেখে সচেতনে ভয় বা আতঙ্ক দেখা দিলেও, অচেতনে মনের অশান্তি কমে। এরকম স্বপ্ন 'পানিশমেন্ট ড্রিম'। বাংলায় বলা যেতে পারে 'প্রায়শ্চিত্তের স্বপ্ন' বা 'নিজেকে শাস্তি দেবার স্বপ্ন'।

যৌবন ফুরিয়ে যাবার দিনগুলোতে 'মেনোপজাল ডিপ্রেশান'-এ আক্রান্ত কিছু মহিলার স্বপ্নে থাকে অদ্ভুত শূন্যতা আর হাহাকার। একটা ফাঁকা বাড়ি, সেখানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন স্বপ্নের দর্শক। কোথাও কেউ নেই। অথবা কোনও একটা অচেনা জায়গায় অচেনা পথ। একা একা হাঁটছেন তিনি। কোথাও একটা যাবার আছে। কিন্তু কিছুতেই ঠিক রাস্তাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। পৌঁছতে পারছেন না গন্তব্যে। সদ্য যৌবন চলে যাওয়া পঞ্চাশের এক মহিলা অদ্ভুত এক মানসিক সমস্যার শিকার। তার কেবলই মনে হয়, বড় কোনও রোগ বাসা বেঁধেছে তার শরীরে। ছোটেন এক ডাক্তার থেকে আর এক ডাক্তারের কাছে। মহিলা 'হাইপোকন্ড্রিয়াসিস' রোগে আক্রান্ত। আগে দেখতেন না এমন কিছু আতঙ্কের স্বপ্নের আক্রমণে এখন ওই মহিলার রাতগুলো বিপর্যস্ত হয় মাঝে মাঝে। কখনও বিষাক্ত সাপ কামড়াতে আসে। আবার কখনও বা পাহাড়ের ওপর থেকে কেউ তাঁকে পেছন থেকে ঠেলে দেয় অতলস্পর্শী খাদের দিকে। চরম আতঙ্কে চিৎকার করে ঘুম ভেঙে যায় মহিলার।

২৩ বছর বয়সের এক সদ্য বিবাহিতা মহিলার স্বপ্নের কথা বলি। বিয়ের ছ-মাসের মাথায় ঋতুস্রাব

বন্ধ হবার সমস্যা নিয়ে মহিলা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে আসেন। জানা যায়, তিনি মা হতে চলেছেন। ঋতুস্রাবের দিন পার হবার দিনদশেক বাদে তিনি দেখেন এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। আর এই একটা স্বপ্নের প্রভাবে তার পরের দিনগুলো, রাতগুলো ছেয়ে যায় ভয়ের চাপচাপ কালো মেঘে। চিকিৎসকের কাছে আসতেও ভয় করে তাঁর। ঘরে একলা থাকতে ভয়, বাথরুমে যেতে ভয়, রাতে শুয়ে থাকতে থাকতে কোথাও সামান্য আওয়াজ হলেও ভয়। এই ভয় কীসের তা তিনি জানেন না। মহিলার দেখা স্বপ্নটা এরকম:

স্বপ্ন ১২: আমি বাথরুমে গেছি। বাথরুমে চৌবাচ্চাটা নেই। তার বদলে একটা ড্রাম। ড্রামটার কাছে যেতেই ড্রাম থেকে উঠে আসে বীভৎস চেহারার একটা বাচ্চা। সারা মুখ রক্তাক্ত, সারা শরীর রক্তমাখা। রক্তাক্ত রোমশ হাত দুটো আমার গলা টিপে ধরতে আসছে। আতঙ্কে ঘেমে নেয়ে ঘুম ভেঙে যায়।

বিয়ের আগে ইনি প্রায়ই মারদাঙ্গা, খুনখারাপির স্বপ্ন দেখতেন। খুন-জখম, হাত পা কাটা লাশ— স্বপ্নে এ সব দেখে বড় বিষণ্ণ লাগত পরদিন। বিয়ের পর প্রথম ছ-মাস ওই স্বপ্নগুলো দেখা বন্ধ ছিল। ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত, রোমশ হাতে গলা টিপে ধরছে এক শিশু, এটা দেখবার পর থেকে আবার ফিরে আসে আগেকার খুন-জখমের স্বপ্নগুলো। এই স্বপ্নের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে 'কিছু স্বপ্নের বিশ্লেষণ' অধ্যায়ে।

বিয়ের বারো বছর বাদে প্রথম মা হতে চলেছিলেন ৩৭ বছরের এক মহিলা। ধরে নেওয়া যাক, মহিলার নাম বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়। বহু চিকিৎসার পর পড়ন্ত বেলায় মা হওয়া। বৃষ্টিদেবী আনন্দে টালমাটাল। হঠাৎ আট মাসের মাথায় পেটে বাচ্চার নড়াচড়া গেল বন্ধ হয়ে। দিন পনেরো বাদে মৃত এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন মহিলা। আর সেই সময় থেকেই আক্রান্ত হলেন সাইকোসিস-এ। কখনও হাসেন, কখনও কেঁদে ওঠেন চিৎকার করে। হঠাৎ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে সামনে যে থাকে তার দিকে হাতের কাছে যা পান তাই ছুঁড়ে মারেন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চিকিৎসায় বৃষ্টিদেবী সুস্থ হয়ে বছর দেড়েক বাদে একটা সুস্থ সন্তানের জন্ম দেন। আগেরবার পেটে বাচ্চার নড়াচড়া বন্ধ হবার সময় থেকে মৃত বাচ্চা প্রসবের আগে পর্যন্ত একটা স্বপ্ন বারবার দেখতেন বৃষ্টি। সেই স্বপ্নটা এখনও তীব্রভাবে বেঁচে আছে ওঁর স্মৃতিতে।

বৃষ্টিদেবীর স্বপ্ন: প্রায় রোজ রাতেই দেখতাম স্বপ্নটা। একটা ঘিঞ্জি গলি। কারা যেন আমাকে চেপে ধরেছে। গলাটিপে মেরে ফেলতে চাইছে। শ্বাসবন্ধ হয়ে আসছে। ঘুম ভেঙে যেত এই সময়। আর ঘুম আসতে চাইতো না। অনেক রাতে ওই স্বপ্নটার ভয়ে ঘুমই আসত না।

স্বপ্নের সঙ্গে মনোরোগের সম্পর্ক কেন এত গভীর? স্বপ্নের উৎপত্তি স্বপ্নদ্রষ্টার মনের সচেতন আর অচেতন অংশের নানা ধরনের ভাবনার ভেতরকার দ্বন্দ্ব আর বোঝাপড়া (Conflict and Compromise) থেকে। নিউরোসিস আর সাইকো-নিউরোসিসে আক্রান্ত মনোরোগীদের অনেক উপসর্গ তৈরি হয় হুবহু একভাবে। সৃষ্টির উৎস আর প্রক্রিয়া এক হবার জন্য স্বপ্নের সঙ্গে মনোরোগীদের রোগলক্ষণের সম্পর্ক গভীর। ফ্রয়েড মনোচিকিৎসক হিসেবে তাঁর রোগীদের চিকিৎসা করতে করতে তাঁদের দেখা স্বপ্নের খোঁজখবর নিতেন নিয়মিত। আর বছরের পর বছর এটা করতে করতে তিনি আবিষ্কার করেন স্বপ্নবিশ্লেষণের নিজস্ব পদ্ধতি। যে বিশ্লেষণ মনোরোগে আক্রান্ত একজন মানুষের অচেতন মনের অন্ধকারে ডুবে থাকা নানা ধরনের চিন্তাভাবনাকে মন খুঁড়ে নিয়ে আসতে পারে দিনের আলোর।

ফ্রয়েড লক্ষ করেছিলেন, শৈশবে বা বাল্যকালে নানা ধরনের অসামাজিক ইচ্ছা মানুষের চেতনায় বাসা বাঁধে। পরবর্তীকালে বড় হবার পাশাপাশি সমাজ, শিক্ষা, ভালোমন্দবোধ এ সবের প্রভাবে এই ইচ্ছাগুলো অচেতনে চলে যায়। মানুষের অচেতন মনে লুকিয়ে থাকা নানা ধরনের কষ্টকর ভাব সচেতনে চলে আসতে চায় বলেই কিছু মানুষ বড় হয়ে নানা ধরনের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সাইকো-নিউরোসিসে আক্রান্ত রোগীদের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অচেতন মনের ভাবগুলো বাইরে বার করে আনতে পারলে অচেতনের ওই কষ্টকর ভাবগুলো আস্তে আস্তে প্রশমিত হয়। ফলে রোগীও ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হন। শৈশবে মানুষের মনে যৌনতার উৎপত্তি ও বিকাশের তত্ত্ব আবিষ্কারের মতো মৌলিক কাজ ফ্রয়েড করতে পেরেছিলেন—বহু রোগীর এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা আর স্বপ্নবিশ্লেষণের মাধ্যমে।

ফ্রয়েড দেখলেন, শৈশবে নানা ধরনের অসামাজিক কামভাব মানুষের সচেতন মনে থাকে। পরে যা অচেতনে চলে যায়। অনেক সময় ছোটবেলায় আত্মীয়-স্বজন, চাকরবাকর বা পাড়াপড়শির যৌন নির্যাতনের শিকার হয় বাচ্চারা। আর সেই নির্যাতনের স্মৃতি অচেতনে থেকে পরবর্তীকালে নানা রোগের জন্ম দেয়।

এরকম স্মৃতির কথা মনোরোগী সহজে বলতে পারে না। ফ্রয়েড এগুলো বার করবার জন্য প্রবর্তন করেন 'অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি'র। এর সাহায্যে শৈশবের অনেক কামভাব বা অনৈতিক ইচ্ছার কথা রোগীর স্মৃতিতে চলে আসে। অনেক সময় দেখা যায় রোগী এমন কোনও যৌন লাঞ্ছনার কথা বলছেন যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আসলে অচেতন মনে রোগী বাস্তব বা কাল্পনিক কিছু কামেচ্ছা পুষে রাখতে চান। আর এই ইচ্ছাগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কষ্ট-যন্ত্রণা রোগীর মনে কষ্টকর নানা উপসর্গ তৈরি করে।

ফ্রয়েড লক্ষ করেন, শুধু মনোসমীক্ষণ পদ্ধতিতে নয়, রোগীর স্বপ্ন বিশ্লেষণের সাহায্যেও অনৈতিক ইচ্ছাগুলোকে রোগীর সচেতন মনের গোচরে নিয়ে আসা যায়। আর অবরুদ্ধ ইচ্ছাগুলো এভাবে সচেতনে চলে এলে আর বার বার রোগী সেগুলো জানতে পারলে ধীরে ধীরে অচেতন মনে ওই ইচ্ছাগুলোর সঙ্গে থাকা দুঃখ বা যন্ত্রণার ভাব কমে আসতে থাকে। রোগীও রোগমুক্ত হয়।

নানা ধরনের মনোরোগের চিকিৎসায় ফ্রয়েডের স্বপ্নবিশ্লেষণ পদ্ধতি অন্য পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। দুজন মনোরোগীকে নিয়ে ফ্রয়েডের প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করব। একত্রিশের এক যুবক কিছুতেই ঘরের বাইরে বেরোতে চান না। তাঁর মনে হয়, বাইরে গেলেই কাউকে খুন করে ফেলবেন। মনোসমীক্ষণের সাহায্যে জানা যায়, আসলে 'নিষ্ঠুর' বাবার প্রতি শৈশবে গড়ে ওঠা বিরুদ্ধভাব অচেতনে গিয়ে এই সমস্যা তৈরি করেছে। বাবার কষ্টকর রোগভোগে মৃত্যুর পর অচেতন মনে থাকা বাবাকে মেরে ফেলার অনৈতিক ইচ্ছা থেকে যুবকের এরকম ভয়ের উৎপত্তি। একত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছে এই অনৈতিক ইচ্ছা বাবা থেকে সরে গিয়ে বাইরের অচেনা লোককে 'খুন করে ফেলবার ভয়ে' এ রূপ নেয়। যুবকের মনে হয়, বাবার মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। যে তাঁর নিজের বাবাকে পাহাড়ের ওপর থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দিতে পারে, সে বাইরে বেরোলে যে কোনও অচেনা লোককে খুন করে ফেলবে! এরকম ভাবনা থেকে যুবক আক্রান্ত হয় 'অবসেসানাল নিউরোসিস' রোগে।

আর এক কিশোরী রোগগ্রস্ত অবস্থায় তার মাকে দেখলেই খেপে ওঠে। মারতে যায়। কাছে পেতে চায় বড় দিদিকে। কিছু দিন বাদে এই অবস্থা সেরে যায় আপনা থেকে। এই অবস্থায় কিশোরীর চিকিৎসার ভার নেন ফ্রয়েড। রোগীর স্বপ্নগুলোর মধ্যে দুটো উল্লেখযোগ্য। সে যেন কোনও বয়স্কা মহিলার শোকসভায় গিয়েছে। আর দিদির সঙ্গে সে যেন শোকের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিশোরীর আরও বহু স্বপ্নের বিশ্লেষণে দেখা গেল, অচেতন মনে মায়ের মৃত্যুকামনা রয়েছে রোগ সৃষ্টির মূলে। চিকিৎসায় রোগী সুস্থ হতে থাকে। মনের প্রহরী হয়ে ওঠে সজাগ। তখন তার সব সময় মনে হতে থাকে, 'মায়ের বোধহয় কিছু হয়ে গেল!' হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মনের এরকম ভয় আসলে অচেতন মনে অনৈতিক ভাবকে বুঝে ফেলার প্রতিক্রিয়া (Hysterical Over-reaction)। হিস্টিরিয়াতে আক্রান্ত অনেক মেয়ে একটা সময় তাঁদের মায়ের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে এই কারণে।

জ্বরের ঘোরে ভুল দেখা আর স্বপ্ন

বেশি জ্বর এলে অনেক সময় এক ধরনের ঘোর তৈরি হয় রোগীর মনে। চেতনা কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। নানা ধরনের অদ্ভুত ছবি ভাসতে থাকে রোগীর মনের পর্দায়। কখনও এরকম ছবি দেখতে দেখতে ভুল বকতে থাকেন অসুস্থ মানুষ। শুধু বেশি জ্বরে নয় আরও কিছু শারীরিক সমস্যায় এরকম হতে পারে। অসুস্থ হয়ে ঘোরের মধ্যে দেখা এসব ছবি অনেকটা স্বপ্নের মতো। স্বপ্নের মধ্যে যেমন চলমান দৃশ্যপ্রবাহ স্বপ্নের দর্শকের কাছে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য, অসুস্থ অবস্থায় ঘোরের মধ্যে দেখতে থাকা ছবিও রোগীর কাছে ঠিক তেমনি। তবু এটাকে ঠিক স্বপ্ন দেখা বলা চলে না। কারণ স্বপ্ন দেখা আর জ্বরের ঘোরে ছবি দেখার পদ্ধতি পুরোপুরি আলাদা। স্বপ্ন ঘুমন্ত অবস্থার চিন্তাপ্রবাহের চলমান চিত্ররূপ। আর অসুস্থতার ঘোর ভুল দেখা, বকা বা শোনা এক ধরনের বিভ্রম।

জেগে থাকা অবস্থায় সুস্থ মানুষের সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে থাকা মানুষের আর অসুস্থ অবস্থায় ঘোরের মধ্যে থাকা মানুষের ভাবনা একটা ব্যাপারে পুরোপুরি আলাদা। শেষ দুটো অবস্থায় সুদূর অতীতের অনেক স্মৃতি কিছুটা বদলে ছবি হয়ে চলে আসতে পারে। যা সাধারণত জেগে থাকা অবস্থার ভাবনা-চিন্তায় এভাবে আসে না। এই একটা ব্যাপারে স্বপ্নের সঙ্গে অসুস্থ ঘোরগ্রস্ত মানুষের মিল অনেকটাই। বাহাত্তর বছর বয়সে খাদ্যনালীর ক্যান্সারে আক্রান্ত এক জন বৃদ্ধ তীব্র যন্ত্রণার ঘোরে দেখা পান বহু বছর আগে তার মৃত বাবার। বাবাকে জানান তাঁর যন্ত্রণার কথা। বলেন, তাঁর জন্য একটা সুন্দব জায়গা যেন তিনি ঠিক করে রাখেন। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সেখানে পৌঁছে যাবেন। রোগজর্জর অবস্থায় জীবনের প্রান্তিক লগ্নে অনেক মানুষই এরকম একটা অদ্ভুত বিভ্রমের মধ্যে কাটান। এই অবস্থায় অনেককে নানা ধরনের ভুল বকতে দেখেছি। রোগীর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ থাকায় যেগুলোর সঠিক অর্থ বুঝে ওঠা সব সময় সম্ভব হয়নি।

বেশি জ্বরে আক্রান্ত অনেক মানুষ জ্বরের ঘোরে নানা ধরনের বিভ্রমের কথা জ্বর নেমে যাবার পরেও মনে করতে পারেন। স্বপ্নের মতো এগুলো স্মৃতি থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুছে যায় না। খুব বেশি জ্বরের ঘোর ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত বারো বছরের একটি ছেলে ছোট্টবেলার বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলার ছবি দেখতে থাকে। মাঝে মাঝে খেলা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। বছর আঠারোর আর এক যুবক জ্বরের ঘোরে ছেলেবেলায় পড়া, রবিঠাকুরের 'আমাদের ছোট নদী...' আবৃত্তি করতে থাকে। জ্বর কমলে তাকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়, সে এতক্ষণ প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস করছিল। আর 'স্যার' (মাস্টারমশাই) ওকে কবিতাটা মুখস্ত বলতে বলেছিলেন। বেশি জ্বর হলেই মুখে নানা ধরনের পাটীগণিতের অঙ্ক ধাপে ধাপে করতে থাকে এমন একটি সতেরো বছরের যুবককে আমি জানি।

এক লেখিকা ছেলেবেলায় জ্বরের ঘোরে দেখা এরকম কিছু অদ্ভুত ঘটনার কথা প্রায় চৌত্রিশ বছর পরেও স্পষ্ট মনে করতে পারেন। যে ঘরটাতে শুয়ে সেদিনের ওই ঘটনা দেখা, সেই ঘরে ছিল অনেক মাটির আর কাঠের পুতুল। মেয়েটা জ্বরের ঘোরে দেখতে থাকে, পুতুলগুলো সব জীবন পেয়ে আলমারি থেকে নেমে এসেছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের ভেতর। অনেক পুতুল বিছানার কাছে এসে গল্প করছে মেয়েটার সঙ্গে। মেয়েটাও জ্বরের ঘোরে ওদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে অবিরাম। লেখিকার মনে আছে, জ্বর ছেড়ে যাবার পর বাড়ির সবাই বলেছিল, সে এতক্ষণ জ্বরের ঘেরে ভুল বকছিল। মেয়েটা বুঝতে পারছিল না, ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটেছিল। স্বপ্ন না জ্বরের ঘোরে দেখা দৃষ্টিবিভ্রম আর শ্রবণবিভ্রম (Visual and Auditory Hallucinaiton).

অসুস্থতার ঘোরের বিভ্রমের সঙ্গে স্বপ্নের মিল রয়েছে বেশ কয়েক জায়গাতে। স্বপ্নের মতো

এখানেও ছবি আর কথা আসে বেশি। গন্ধ বা স্পর্শ খুব কম। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জনৈক মনোবিদ এ ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা লেখেন। তাঁর মতে, স্বপ্ন আর জ্বর বা অন্য অসুখের ঘোর— দুটোতেই চিন্তাভাবনার ওপর থেকে মানুষের নিয়ন্ত্রণ যায় চলে। অসুস্থ হয়ে ভুল দেখতে থাকা এক জন মানুষ আর স্বপ্নের দর্শক দুজনেই একের পর এক ছবি দেখতে থাকেন, যা তৈরি হয় শরীরের বা মনের ভেতরকার কোনও উদ্দীপনা (Stimulus) থেকে। যে ছবিগুলোর ওপর তাঁদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

ফরাসি মনোবিদ এফ. ল্যুরেত মনে করতেন, অসুস্থতার ঘোরে ভুল বকা স্বপ্নের মতোই অর্থপূর্ণ। আমরা তা বুঝতে পারি না, কথার মাঝে এক একটা অংশ বাদ পড়ে যাবার জন্য। নিজের অসুস্থ রোগীদের ভুল বকা শোনার অভিজ্ঞতা থেকে ফ্রয়েড ল্যুরেতের এই মতকে আংশিকভাবে মেনে নেন। ফ্রয়েডের মনে হয়, এই অবস্থায় কথাগুলোর মাঝে মাঝে একেকটা অংশকে কেটে বাদ দেয় মনের পাহারাদার। সামরিক বাহিনীর 'সেন্সর' কর্তৃপক্ষের কায়দায় সামান্য আপত্তিকর অংশকেও এই পাহারাদার পুরোপুরি কেটে দেয়। বহু অংশ বাদ পড়ে যাবার জন্য অসুস্থ রোগীর কথাগুলোকে অর্থহীন ভুল বকা বলে মনে হয় তাঁর আশেপাশের মানুষের।

আঠাশের এক সঙ্গীতশিল্পী তাঁর ছেলেবেলায় একটানা অনেক দিন ধরে দেখা এরকম বিভ্রমের কথা জানিয়েছেন। যে খাটে সেদিনের মেয়েটা ঘুমোত, তা ছিল বার্নিস করা সেগুন কাঠের। মাথার দিকে বৃত্তাকার ফুলতোলা কাঠের কাজ। তার চারপাশে কাঠের কাজের বর্ডার। বেশি জ্বর হলেই মেয়েটা দেখতো, ঘরের দেওয়ালগুলো ওই চারকোনা অংশের আকার নিয়েছে। ছাদটাও হয়ে যেত হুবহু একরম। একই ডিজাইনের দেওয়ালগুলো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসত ওর দিকে। একটা সময় সবকটা দেওয়াল ওর খুব কাছে চলে আসায় ভয়ে, আতঙ্কে মেয়েটা চিৎকার করে উঠত 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে। একটা সময় ওদের ঘরে পুরনো খাটের বদলে আসে সানমাইকায় মোড়া নতুন একটা খাট। তারপর থেকে মেয়েটা জ্বর হলেও আর ওই ব্যাপারটা দেখেনি।

জ্বরের ঘোরে নানা ধরনের ডিজাইনের ছবি চোখে ভাসে এরকম অভিজ্ঞতার কথা অনেকেই আমাকে জানিয়েছেন। এরকম ডিজাইন অনেকটা ঘুম আসবার আগে কিছু মানুষের দেখা ছবির মতো। 'চিন্তা, কল্পনা, স্বপ্ন আর দিবাস্বপ্ন' অধ্যায়ে কবি জয় গোস্বামী আর লেখক আবুল বাশারের ঘুম আসবার আগের এরকম অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। জেগে থাকা আর ঘুম আসবার মাঝামাঝি চেতনার কোনও একটা স্তরে এরকম হয়। জ্বরের ঘোরে চেতনার যে স্তরে মানুষ ভুল দেখে তার সঙ্গে ঘুমের আগের এই স্তরের কোথাও একটা মিল রয়েছে বলে আমার মনে হয়।

বেশ কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ছেলেবেলায় তাঁদের দেখা এরকম অনেক ছবির কথা মনে করতে পারেন। একজন জানাচ্ছেন, ছেলেবেলায় জ্বর হলেই কালো এক পশ্চাৎপটে গোল, লম্বা বা ডাম্বেলাকৃতি নানা ছবি তার চেতনায় ধরা দিত। আর 'তারপরই মনে হত কে যেন আমাকে গ্রাস করতে চাইছে'। জ্বর হলেই ঘুমের মধ্যে এরকম ভয়ের বা আতঙ্কের স্বপ্নও অনেকেই দেখে। শুধু ছোটবেলায় নয়, যৌবনে জ্বরে ভোগার সময় ঘুমের মধ্যে ওই ধরনের স্বপ্ন দেখার বা বেশি জ্বরের ঘোরে ওই ধরনের আতঙ্কের ছবি দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে কিছু মানুষের।

ডায়াবেটিস আর ইউরিমিয়াতে আক্রান্ত মানুষের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলি। রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ (ডায়াবেটিসে) বা ইউরিয়ার মাত্রা (ইউরিমিয়াতে) বাড়লে অনেক মানুষ ঘুমের মধ্যে খুব বেশিমাত্রায় দুঃস্বপ্ন দেখেন। কয়েকজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগী জানিয়েছেন, রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লেই তাঁরা খুব বেশি উদ্ভট স্বপ্ন দেখেন। এরকম ভয়ের বা আতঙ্কের স্বপ্ন দেখা কমে আসে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে স্বাভাবিকের কাছাকাছি চলে এলে।

অভিনেতা, লেখক ও খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে এই প্রসঙ্গে তার মৌলিক কিছু ভাবনাচিন্তার কথা জানান। ডা. বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, রক্তে গ্লুকোজ, ইউরিয়া ইত্যাদির মাত্রা বাড়লে মানুষ বেশি দুঃস্বপ্ন দেখে। রক্তে সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদির মাত্রার খুব বেশি তারতম্য ঘটলে মানুষের স্বপ্ন দেখা বাড়তে পারে। এরকম হতে পারে নির্দিষ্ট কিছু অসুখে আক্রান্ত হলেও।

জ্বরের ঘোরে বা অসুস্থতার ঘোরে মানুষের যে দেখা বা শোনার বিভ্রম তৈরি হয়, তা হয়তো স্বপ্ন নয়। তবু স্বপ্নের সঙ্গে এরকম চলমান ছবির অনেক মিল আছে। আছে অমিলও। অসুস্থতার ঘোরে এরকম বিভ্রম দেখতে দেখতে অসুস্থ মানুষ নানারকম কথা বলতে থাকেন। সাধারণ ভাবে মানুষ একে জ্বরের ঘোরে ভুল-বকা বলেন। স্বপ্নে মাঝে মধ্যে দুচারটে অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করলেও স্বপ্ন দেখতে বাস্তবে এত কথা স্বপ্নের দর্শক বলেন না। স্বপ্নে কথাবার্তা যা হয় তার প্রায় সবটাই চলতে থাকে বাস্তবের অগোচরে মনে মনে।

জীবনের অন্তিম সময়ের কিছু ঘটনার কথা হয়তো অনেকে জানেন। মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ অনেক মানুষ ঘোরে অথবা স্বপ্নে তাঁর কল্পনায় থাকা মৃত্যুরাজ যম আর কালো পোশাকে ঢাকা মৃত্যুর দূতদের দেখতে পান বলে মনে হয়। অনেককেই এই সময় 'চলে যাও, চলে যাও', 'না, আমি যাব না', 'ওই ওরা আসছে! আমাকে নিয়ে যাবে!'—এরকম কথা বলে উঠতে শুনেছি। জীবনমৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে এঁরা এই সব কাল্পনিক চরিত্রকে স্বপ্নে দেখেন, নাকি এরকম ঘটে বিভ্রমের জন্য—তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। কারণ জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসায় এই সময় একজন মানুষের মনে ঘটে চলা ভাবনাচিন্তার কথা ভালো করে জানা যায় না।

মোটর অ্যাক্সিডেন্টে আহত এক যুবক মৃত্যুর কিনারা থেকে ফিরে এসে পরে সুস্থ হয়ে তাঁর ওই সময়কার অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানান। ওই সময় স্ট্রেচার হাতে চারজন দৈত্যাকৃতি মানুষ প্রায়ই তাঁর চেতনায় ধরা দিত। তবে এই ঘটনাটা স্বপ্নে আসত নাকি অসুস্থতার ঘোরে, এ ব্যাপারে যুবক নিশ্চিত নন।

ভয়ের স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন

কখনও ভয়ের স্বপ্ন দেখেন নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউকেউ খুব ঘনঘন ভয়ের স্বপ্ন দেখেন। এরকম স্বপ্ন দেখে অনেক সময় স্বপ্নের দর্শকের ঘুম ভেঙে যায়। কখনও প্রচণ্ড ভয়ে, আতঙ্কে ঘুম ভেঙে দেখা যায়, বুক ধড়ফড় করছে। সারা শরীর ঘামে ভেজা। খুব বেশি ভয়ের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখেন বলে বেশ কয়েকজন আমাকে জানান।

ভয়ের স্বপ্ন মানুষ দেখে কেন? এরকম মনে হতে পারে যে, বাস্তবের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা বা ভয় এরকম স্বপ্নে চলে আসে। মনোবিদরা বলেন, বাস্তবের কষ্ট, যন্ত্রণা বা ভয়কে স্বপ্নে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুমের বিঘ্ন ঘটানো স্বপ্নের উদ্দেশ্য নয়। তাই বাস্তবের এরকম ভাবগুলো চলে আসা ভয়ের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখার কারণ হতে পারে না। ফ্রয়েডীয় মতে, স্বপ্নমাত্রই রুদ্ধ ইচ্ছার কাল্পনিক পূর্ণতালাভ। ভয়ের স্বপ্ন যদি ইচ্ছাপূরণ হয় তবে ভয় পাওয়াকে ইচ্ছা হতে হয়। তা কি করে সম্ভব? আর যাই হোক, ভয় পেতে বা যন্ত্রণা পেতে কেউই ভালোবাসেন না। ভয়ের স্বপ্ন ফ্রয়েডের ইচ্ছাপূরণের তত্ত্বের বিরোধিতা করে—প্রাথমিক ভাবে এরকম মনে হয়।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার সমস্যাগুলোর মধ্যে ভয়ের স্বপ্নকে আমরা আলাদা শ্রেণীতে রাখব। কারণ এই স্বপ্নগুলোর সঙ্গে অন্য সব স্বপ্নের গঠনে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। মনোবিদরা ভয়ের স্বপ্নকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

এক

অচেতন মনের এক বা একাধিক অবদমিত ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হতে পারে। এই অবদমিত ইচ্ছা অনৈতিক, অসামাজিক। মনের পাহারাদারের নজরদারি শিথিল না হলে এরকম অনৈতিক ইচ্ছা স্বপ্নে আসতে পারে না। স্বপ্নে এরকম ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে বুঝতে পেরে হয়তো মনের পাহারাদার সজাগ হয়ে উঠল। ফলে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ করে ভয় পেতে শুরু করলেন। সমাজের চোখে দণ্ডনীয় কোনও কাজ করতে গিয়ে আচমকা ঘটনাস্থলে পুলিশ চলে এলে মানুষ শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। এরকম স্বপ্নে ব্যাপারটা হয় অনেকটা সেরকম। বিয়ে বাড়িতে সবাই হয়তো উৎসবের আনন্দে ব্যস্ত আছেন। গৃহকর্ত্রীর মনে হঠাৎ সন্দেহ জাগল যে 'একজন অভ্যাগত ছদ্মবেশী পুরুষ'। এরকম সন্দেহের কথা বলামাত্র সবার মনে বিশেষ ভয় দেখা দেবে। স্বপ্নে ভয়ের কারণ বোঝাতে এই উপমা দিয়েছেন গিরীন্দ্রশেখর। এরকম স্বপ্নের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

স্বপ্ন ১: দেখলাম আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু—একটা চওড়া পিচের রাস্তার ওপর প্রকাশ্যে খুন হচ্ছে—একদল মানুষ হইহই করে ছুটে আসছে নির্জন ঘটনাস্থলের দিকে। ঘেমেনেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

[আইনজীবী, ৩৯ বছর]।

এই স্বপ্নের বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্বপ্নের দর্শক হত্যাকারীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন। বন্ধুকে মারার ইচ্ছা শুধু সমাজের চোখে নয়, স্বপ্নদ্রষ্টার সচেতন মনেও চূড়ান্ত অনৈতিক। সচেতন মন এমন একটা ইচ্ছার কথা ভুলেও ভাবতে পারে না। অথচ অচেতন মনে ওই ইচ্ছা রয়েছে রুদ্ধ অবস্থায়। মনের 'সেন্সর'-এর ভূমিকা এখানে পুলিশের মতো। 'সেন্সর' সক্রিয় হয়ে উঠতেই এরকম একটা অসামাজিক ইচ্ছা মনের অচেতনে পুষে রাখবার জন্য স্বপ্নের দর্শক প্রচণ্ড ভয় পেতে শুরু করেন। স্বপ্নে একদল মানুষ

হইচই করে ছুটে আসছে—এই দৃশ্য তৈরি হয়েছে মনের বিবেকের তাড়নায়। মনোবিদরা একে 'সুপার ইগো' (Super ego) বলেন। যে কোনও অনৈতিক বা অসামাজিক ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন ভয়ের স্বপ্নে পরিণত হবার জন্য দায়ী 'সুপারইগো'।

স্বপ্ন ২: একজন বয়স্কা আত্মীয়ার সঙ্গে মিলিত হয়েছি—হঠাৎ করে খুব ভয় লাগতে শুরু করল।

কুড়ি বছরের এক যুবকের যৌনস্বপ্ন। এই স্বপ্নে বয়স্কা আত্মীয়ার সঙ্গে মিলিত হবার নিষিদ্ধ, অনৈতিক ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ামাত্র সজাগ হয়ে উঠেছে মনের পাহারাদার। আর এর প্রভাবে অচেতনের ইচ্ছাপূরণের আনন্দ সচেতনে রূপ নিচ্ছে ভয়ে।

এই বইতে এরকম বেশ কিছু স্বপ্ন নানাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

দুই

আর এক ধরনের ভয়ের স্বপ্ন রয়েছে যেগুলোকে 'শাস্তি পাবার স্বপ্ন' বা 'পানিশমেন্ট ড্রিম' বলা যায়। এরকম স্বপ্ন অন্য ভয়ের স্বপ্নের চাইতে আলাদা। সাধারণত স্বপ্ন তৈরি হয় চেতন আর অবচেতনের এক ধরনের দ্বন্দ্ব থেকে।এরকম স্বপ্ন তৈরি হয় অচেতনের রুদ্ধ ইচ্ছার সঙ্গে মনের বাস্তব-সূত্র ('ইগো')-র দ্বন্দ্বে। পাঠক জানতে চাইবেন, এরকম স্বপ্নে মনের কোন ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে? মনোবিদ বলবেন, নিষিদ্ধ ইচ্ছা মনে পুষে রাখার জন্য 'আমার শাস্তি পাওয়া উচিত'—স্বপ্নদ্রষ্টার মনের এরকম অবচেতন ইচ্ছা এরকম স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হয়।

মনোবিজ্ঞানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নিয়ে কিছু কথা বলে নিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। আমাদের মনে নানা ধরনের সুখ (Pleasure) পাবার ইচ্ছা যে প্রবৃত্তি (Instinct)-র বশে জেগে ওঠে তাকে মনোবিদরা সুখ-সূত্র বা 'প্লেজার প্রিন্সিপল্' বলেন। এর অন্য নাম 'ইদ্'। এর বশে মনে নানা ইচ্ছা জেগে ওঠে। সুখসূত্রের বশে মনে জেগে ওঠা ইচ্ছাকে মানবমন যে বাস্তবের প্রেক্ষিতে বিচার করে দেখে তার জন্যে দায়ী মনের 'বাস্তব-সূত্র' বা 'রিয়্যালিটি প্রিন্সিপল্'। মনে উঠে আসা কোনও সুখের ইচ্ছা বাস্তবে পূর্ণ করা কতটা যুক্তিযুক্ত আর এর ভালোমন্দ দিকগুলো কি তা বিচারের ক্ষমতা যে মনের আছে তার জন্য দায়ী এই 'বাস্তব-সূত্র'। এর অন্য নাম 'ইগো'।

মনের প্রভাবে মানুষ কোনও কাজ করবে কি করবে না, তা অনেকটা নির্ভর করে 'ইগো'র ওপর। এছাড়া সবার ওপরে রয়েছে শেষ বিচারক 'সুপারইগো' বা বিবেক। মনের বশে আমরা যে কাজকর্ম করি তার ওপর তীক্ষ্ণ নজরদারি চালায় 'সুপারইগো'। কোনও ভুল বা খারাপ কাজের জন্য যার শাসন মেনে নিতে হয় মনকে, মানতে হয় শাস্তি। সোজা কথায় একে আমরা বলি 'বিবেকের তাড়না'। মানবমনের চালিকাশক্তি (Driving Force) নিয়ন্ত্রিত হয় 'ইদ্' (Id), 'ইগো' (Ego), আর 'সুপারইগো' (Superego)—এই তিন সূত্র দিয়ে।

ফিরে আসি 'শাস্তি পাবার স্বপ্ন'তে। এই স্বপ্নগুলোর ব্যাখ্যা বুঝতে এবার সুবিধা হবে। অন্য স্বপ্ন তৈরি হয় অচেতনের চাপা পড়া বা অবচেতনের কোনও ইচ্ছা থেকে। আর এই স্বপ্নগুলোর জন্ম বাস্তব-সূত্র বা 'ইগো'র মনকে শাস্তি দেবার ইচ্ছা থেকে। অচেতন মন নয়, এরকম স্বপ্নের উৎস মনের বাস্তবসূত্র। 'পানিশমেন্ট ড্রিম' তৈরিতে অচেতন মনের বদলে মূল ভূমিকা 'ইগো'র। জেগে থাকা অবস্থার নিষিদ্ধ কোনও সুখের অভিজ্ঞতকে কেন্দ্র করে তৈরি হতে পারে এরকম স্বপ্ন। স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে যে ভয় দেখা দেয় তা ঐ অভিজ্ঞতার ঠিক উলটো। ফ্রয়েড লিখছেন, 'শাস্তি পাবার স্বপ্নের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হল, স্বপ্ন তৈরির ইচ্ছা এখানে অচেতনের কোনও রুদ্ধ ইচ্ছা নয়। বরং "ইগো"র ভেতরকার শাস্তি দেবার ইচ্ছা, যা একই সঙ্গে অবচেতনেরও ইচ্ছা'। ফ্রয়েডের এই মৌলিক সূত্র মনোরোগীর মানসিকতার মূল দ্বন্দ্বকে বুঝতে সাহায্য করে।

'স্বপ্ন আর মনের অসুখ' অধ্যায়ে মানসিক অবসাদে আক্রান্ত কিছু মানুষের এক ধরনের স্বপ্নের কথা বলেছি। যেখানে স্বপ্নদ্রষ্টা বারবার মারামারি বা খুনখারাপির স্বপ্ন দেখেন। দেখেন, কারও হাত বা পা কেটে পড়ে আছে। পড়ে আছে মৃতদেহ। এরকম স্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে এগুলোকে 'পানিশমেন্ট ড্রিম' বলা যায়। এরকম স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মন ভাগ হয়ে যায় বহুভাগে। হত, আহত মানুষগুলোর স্বপ্নদ্রষ্টা

নিজেই। তাঁর মনের বাস্তবসূত্র শাস্তি দেবার জন্য তাঁকে নানাভাবে ভাগ করে এক একভাগকে এক একরকম শাস্তি দেয়। কারও হাত বা পা কাটা যায়। কেউ হয় খুন। এরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে খুব ভয় করতে থাকে স্বপ্নের দর্শকের। ঘুম ভেঙে এই ভয় পরিণত হয় মানসিক অবসাদে।

শুধু মানসিক অবসাদে আক্রান্ত মানুষ নন, পানিশমেন্ট ড্রিম দেখতে পারেন যে কোনও মানুষ। অনেকে তাঁদের যে ভয়ের স্বপ্নগুলোর কথা জানিয়েছেন, তাঁর মধ্যে এরকম স্বপ্ন রয়েছে অনেক। কয়েকটার কথা এখানে বলব।

স্বপ্ন ১: আমাদের বাড়ির পিছনে একটা বাঁধানো পুকুর ছিল। এক সময় স্বপ্ন দেখতাম, আমি স্নান করে পুকুরঘাটে ওঠার চেষ্টা করছি—প্রত্যেকবার একটা সাদা ময়ূর এসে দুডানা মেলে ঠুকরে আমার চোখদুটো খুবলে নেবার চেষ্টা করছে—বারবার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। আশেপাশে আঘাত লেগে রক্ত ঝরছে—সেই রক্ত ঘাট থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পুকুরের জলে এসে মিশছে—(প্রায় ২৫ বছর আগে দেখা এই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে।)

— —, লেখক

স্বপ্ন ২: [ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় খবর পেলাম একটা বড় ধরনের মারপিট হয়েছে। কাকে যেন একটা মেরেছে। রাতে স্বপ্ন দেখলাম] কাকে যেন একটা মারছে রাস্তার ওপর, লোকটা ছটফট করছে। খুব ভয়ে আর অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল।

— —, কবি

'কাউকে একটা মারছে'—এরকম স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা হয় যে মারছে সে। বা যে মার খাচ্ছে সেই লোকটা। এরকম স্বপ্নে মার খাওয়া আর মার দেওয়া স্বপ্নদ্রষ্টার মনের এই দুই বিপরীত ইচ্ছার একটা পূর্ণ হয়। এই স্বপ্নে পূর্ণ হচ্ছে মার খাওয়ার ইচ্ছা।

স্বপ্ন ৩: স্বপ্ন দেখলাম, আমার ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে। একটা ছোট 'সেল'-এ রয়েছি। এখন মাঝরাত। কাল সকালেই আমার ফাঁসি। সারারাত ধরে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করছি আর ভাবছি, আমাকে যদি বিচারক হবার সুযোগ দেওয়া হত, তবে পৃথিবী থেকে মৃত্যুদণ্ড ব্যাপারটাই তুলে দিতাম।

— —, আইনজীবী

এই স্বপ্নে কোনও এক অনৈতিক কাজের জন্য স্বপ্নদ্রষ্টার মনের 'পাপবোধ' (Guilt) থেকে তিনি শাস্তি পাচ্ছেন। স্বপ্নের বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে 'কিছু স্বপ্নের বিশ্লেষণ' অধ্যায়ে।

স্বপ্ন ৪: কোথাও একটা যাচ্ছি। খুব গোলমাল হচ্ছে। কারা যেন মারপিট করছে—পুলিশ এসে সবাইকে ছেড়ে আমাকে ধরে ভ্যানে তুলছে—খুব ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়।

— —, শ্রমজীবী

এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার সাম্প্রতিক কোনও একটা অনৈতিক কাজের পাপবোধ তাঁকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। স্বপ্নের মাঝের অংশে চলে এসেছে বহু বছর আগেকার কোনও এক কারখানার গেটের স্মৃতি।

তিন

এই পর্যায়ে যে ভয়ের স্বপ্নগুলোর কথা বলব সেগুলোকে 'সাহস বাড়াবার স্বপ্ন' বলা যায়। বাচ্চাদের দেখা ভূত বা রাক্ষসের স্বপ্ন এই পর্যায়ের। বাচ্চাদের কাছে ভূত, রাক্ষস বা পেত্নি অলীক কিছু নয়। বাচ্চারা গল্প শুনে, বই পড়ে ভূত বা রাক্ষসদের অস্তিত্বে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। ভূতপেত্নি বা রাক্ষসের মুখোমুখি হলে কি করবে—এই ভয়ে ছোটবাচ্চারা কাঁটা হয়ে থাকে। এই ভয়কে কমিয়ে আনার জন্য স্বপ্নে বাচ্চাকে মাঝেমধ্যে ভূত বা রাক্ষসের তাড়া খেতে হয়। স্বপ্নে বারবার এরকম তাড়া খেলে, বাস্তবে অন্ধকারে এরকম ভয়ের মোকাবিলা করা বাচ্চার পক্ষে সহজ হয়। বাচ্চাদের বেশিরভাগ ভয়ের স্বপ্ন

এই ধরনের।

এরকম ভয়ের স্বপ্ন বড়রাও দেখে। ফ্রয়েড এরকম স্বপ্ন দেখার পিছনে মানবমনের আদিম আর এক চালিকাশক্তির কথা বলেন। সুখসূত্র মানুষকে ভালোমন্দ বিচার না করেই সুখের খোঁজে প্ররোচিত করে। বাস্তবসূত্র তাকে কোনও কাজের ভালোমন্দ বিচার করতে শেখায়। আর এক ধরনের চালিকাশক্তি আমাদের একই অবস্থার মধ্য দিয়ে বারবার যেতে প্রেরণা দেয়। এই শক্তি হল 'পুনরাবৃত্তি সূত্র' বা 'রিপিটেশান কম্‌পালশান্‌'। বাচ্চাদের একই খেলা বারবার খেলতে চাওয়া, একই গল্প বারবার শোনা বা বৃদ্ধদেব একই কথা বারবার বলার মধ্যে এই সূত্রের অস্তিত্ব রয়েছে।

যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অনেক সময় যুদ্ধে অংশ নেওয়া কিছু সৈন্যের মনে এক ধরনের মানসিক বিকারেব জন্ম দেয়। মনোবিদরা একে War Neurois' বলেন। এই রোগে আক্রান্ত মানুষ, যে বিপদ থেকে তিনি একটুর জন্য বেঁচে ফিরেছেন, সেই একই বিপদের স্বপ্ন বারবার দেখেন। এই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন তাঁর মনে প্রচণ্ড ভয় আর যন্ত্রণা তৈরি করলেও, এই স্বপ্ন তিনি বারবার দেখেন 'পুনরাবৃত্তি সূত্র'র প্ররোচনায়। হঠাৎ করে কোনও প্রবল উদ্দীপনার মুখোমুখি হতে হলে, মন ঐ উদ্দীপনার সঙ্গে ঠিকমতো এঁটে উঠতে পারে না। মনে তাই ঐ উদ্দীপনা থেকে যায়। বারবার ঐ একই উদ্দীপনার মুখোমুখি হলে মনের জোর আস্তে আস্তে বাড়ে। দুর্বল মন সবল হয়। তখন মন অনেক সহজে ঐ উদ্দীপনার সম্মুখীন হতে পারে।

গিরীন্দ্রশেখর ফ্রয়েডের এই 'পুনরাবৃত্তি সূত্র' ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দরভাবে। তাঁর মতে, 'বিপদ অর্থেই অপ্রাকৃত উন্মাদনা। পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে উদ্দীপনা প্রতিকারের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পায়। '...অণুকর্ষী পুনবাবৃত্তি (Repetition Compulsion) বারবাব স্বপ্নে রোগীকে বিপদের সম্মুখীন করাইয়া তজ্জনিত উদ্দীপনাকে আয়ত্তে আনিতে সাহায্য করে।' এই মনোবিদ প্রথম মহাযুদ্ধে উড়ন্ত প্লেন থেকে পড়ে আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যাওয়া একজন রোগীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ঐ রোগী প্রায় প্রত্যেক রাতে এরোপ্লেন থেকে পড়ে যাবার আতঙ্কের স্বপ্ন দেখতেন। ফ্রয়েডের 'পুনরাবৃত্তি সূত্র' থেকে সরে এসে স্বপ্নগবেষক গিরীন্দ্রশেখর এই স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করেছেন কিছুটা অন্যভাবে।

তাঁর মতে, আমাদের প্রত্যেক কাজের মধ্যে দুই বিপরীতমুখী কাজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ঐ বোগীর স্বপ্নেও ব্যাপারটা একই। স্বপ্ন-বিশ্লেষণে দেখা গেল, স্বপ্নে বারবার 'পড়ে যাবার' ঘটনা দেখায়, রোগীর মনে এর বিপরীত অর্থাৎ 'ফেলা দেবার' ইচ্ছা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আর তার জন্যেই বাচ্চাদের 'ডাক্তার ডাক্তার খেলা'র মতো রোগী বারবার ঘুমিয়ে ভয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন। ডাক্তার কোনও বাচ্চাকে ইঞ্জেকশান দিলে বাচ্চার মনে ডাক্তারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জন্মায়। এই ক্ষোভ কমে বারবার ডাক্তার সেজে সমবয়সী বাচ্চাদেব ওপর বারবার 'নকল ডাক্তারি' করতে করতে। এরকম খেলার কথা সবাই জানেন।

শুধু বাচ্চাদের নয়, বড়দের বহু ভয়ের স্বপ্ন আমার সংগ্রহে রয়েছে যেগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, ভয়ঙ্কর কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি সাহস সংগ্রহ করা এরকম স্বপ্ন দেখার উদ্দেশ্য।

স্বপ্ন ১: রিক্সা করে কোথাও যাচ্ছি—সিটটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালা অনেক নীচে—আমি পড়ছি না—অথচ যে কোনও সময় পড়ে যেতে পারি—এই স্বপ্নটা একটানা বহুদিন দেখেছি—বেশ ভয় লাগত।

—মহাশ্বেতা দেবী।

স্বপ্নদ্রষ্টার নিজস্ব ব্যাখ্যা: 'যে সময় স্বপ্নটা দেখতাম, সেই সময়কার মানসিক নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে স্বপ্নটার যোগ আছে বলে মনে হয়।'

স্বপ্ন ২: স্কুটার থেকে পড়ে গিয়ে হাত পা কেটেছিঁড়ে গেছে—এরকম স্বপ্ন বেশ কয়েকবার দেখেছি। ভয়ে ঘুম ভেঙে যেত।

—অসিত রায়, আসানসোল।

সদ্য স্কুটার চালাতে শেখা যুবকের মনে দুর্ঘটনার ভয় থেকে এই স্বপ্নের উৎপত্তি। স্বপ্নের উদ্দেশ্য, দুর্ঘটনা (যদি ঘটে)-র জন্য স্বপ্নের দর্শককে মানসিকভাবে তৈরি রাখা।

স্বপ্ন ৩: বেশ কয়েকবার দেখলাম, আমাকে কোর্টে তোলা হয়েছে—আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে—সওয়াল চলছে—খুব ভয় করছিল।

— —, কলকাতা।

এই স্বপ্ন দেখেন এক মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ। তাঁর চিকিৎসায় ছিলেন এক যুবতী। বিয়ের পর সমস্যা দেখা দেওয়ায় ঐ মহিলার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর কাছে আসে। ভয় দেখায় কোর্টকাছারির। বাস্তবে সেরকম পরিস্থিতি হলে তার মোকাবিলার জন্য মনকে প্রস্তুত রাখা এই স্বপ্নের কাজ।

এবার কিছু ভয়ের স্বপ্নের কথা বলব যেখানে নানা কারণে স্বপ্ন জটিল হয়েছে।

স্বপ্ন ৪: [বাচ্চাদের একটা নাটক করাচ্ছিলাম। স্টেজ রিহার্সালে একটা বাচ্চা ছেলে শাড়ি পড়ে মেয়ে সেজেছিল। একটা সময় শাড়িটা খোলার দৃশ্য ছিল। মেয়েটা শেষ মুহূর্তে বলে ওঠে, 'স্যার, গিঁট পড়ে গেছে! কি করব?'] সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখলাম, অনেক লোকের সামনে 'স্টেজ-শো'-তে একই ব্যাপার ঘটছে। প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

—শ্যামল ভট্টাচার্য, নাট্যপরিচালক।

স্বপ্ন ৫: একদিন দেখলাম, আমার চোখ অপারেশন হবে। অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগে আমার চোখ পরীক্ষা করছেন একজন। সামনের এক ভদ্রলোকের চোখ তুলে ফেলতে হবে। ওঁকে ও.টি'-তে নিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক খুব ভয় পেয়ে গেছেন।

—লক্ষ্মী চক্রবর্তী, গৃহকর্ত্রী।

সত্তর বছরের এক মহিলার স্বপ্ন। কয়েকবছর আগে এক চোখে ছানি অপারেশনের পর খুব ভুগেছেন। এবার অন্যচোখে একই অপারেশনের আগে তাঁকে মানসিকভাবে 'তৈরি করতে' চাইছে এই স্বপ্ন। 'সামনের ভদ্রলোকের চোখ তুলে ফেলতে হবে'। এর অর্থ, 'তোমারও এরকম হতে পারে, তৈরি থাকো'। স্বপ্নের দর্শকের মনের ভয় সামনের রোগীর মধ্যে চলে গেছে। মনোবিদের ভাষায় এরকম ঘটনা হল `Transference of Fear'.

স্বপ্নের জটিল গঠনপদ্ধতি আর প্রতীকায়ন অনেক সময় ভয়ের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নকে জটিল করে তোলে। এরকম স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। স্বপ্নের আনুষঙ্গিক তথ্য (Associating Factors)গুলোর ভিত্তিতে স্বপ্নকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে এরকম স্বপ্নের মধ্যে কোনও একটা ইচ্ছার পূর্ণতা অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। ['কিছু স্বপ্নের বিশ্লেষণ' অধ্যায়ে স্বপ্ন ২-এর বিশ্লেষণ দেখুন।] ভয়ের স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন কত জটিল আর বিচিত্র হতে পারে তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে কিছু স্বপ্নের দৃষ্টান্তের কথা বললে:

স্বপ্ন ১: একরাতে দেখলাম, আমাদের বাড়ির পাশের কারখানাটায় আগুন লেগেছে—সবাই ছোটাছুটি করছে—আমাদের বাড়িতেও আগুনের হল্কা দেখতে পাচ্ছি। কি করব বুঝতে না পেরে ভয়ে ছাতে চলে এলাম—বাড়ির কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না—হঠাৎ কে যেন আমাকে ঠেলে দিল—ছাত থেকে নীচে পড়তে পড়তে ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

—গার্গী দাশ, ছাত্রী, ১৯ বছর।

স্বপ্ন ২: বহুবার দেখেছি এই স্বপ্নটা। একটা উঁচু জায়গায় উঠতে হবেই। খুব খাড়াই পথ—ওপরে ওঠা প্রায় অসম্ভব। উঠতে গিয়ে ঘেমেনেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। বহু কষ্টে কিনার পর্যন্ত উঠলাম—আর ওঠা যাবে না—জায়গাটায় আলো কম, ফাঁকা। নামার রাস্তা নেই—নিশ্চিত মৃত্যু। আতঙ্কে শরীর হিম হয়ে আসে।

—মেহেরুন্নিসা, সাংবাদিক, ৩৫ বছর।

স্বপ্ন ৩: প্রায়ই দেখি সাপের স্বপ্ন। নানারকম বিষধর সাপ—আমাকে কামড়াতে আসছে—ভয়ে জেগে যাই।

— —, বিবাহপরিত্যক্তা, ২২ বছর।

স্বপ্ন ৪: আমি একজনকে মেরে ফেলেছি—মৃতদেহ লুকোতে না পেরে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছি—বেগতিক দেখে ভাজা করে সবাইকে খাইয়ে ফেললাম। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি স্বপ্নটা দেখবার পর থেকে।

—গৃহবধূ, ৪৪ বছর।

স্বপ্ন ৫: কতগুলো ভারী জিনিস দেখতে পাই। সেগুলো দুভাগে ভাগ হয়ে আমার মাথার ওপর ঝুলছে। একভাগে কম, অন্যভাগে প্রায় নব্বই শতাংশ জিনিস। ভারী অংশটা আমার মাথার ওপর এসে পড়ে। অনেকবার দেখেছি এই স্বপ্নটা—শেষপর্যন্ত 'মা, মা' বলে কেঁদে উঠে বসে পড়ি। জেগে উঠেও মনে হয়, আমি খুব বড় একটা বিপদের মধ্যে রয়েছি।

— —, ছাত্র, ১৮ বছর।

স্বপ্ন ৬: [এই স্বপ্নগুলোর প্রত্যেকটাতে আমি একই বাড়ি দেখি। চেনা কোনও বাড়ির সঙ্গে এই বাড়িটার সামান্যতম মিলও নেই। অথচ চোখ বুঁজলেই বাড়িটার ছবি ভেসে ওঠে। বাড়িটাতে অনেক ভাঙা সিঁড়ি।] দেখি, আমি একটার পর একটা ভাঙা সিঁড়ি পেরিয়ে বাড়িটার ওপরে উঠছি। একেবারে ওপরে ওঠার পর যখন নীচে নামার কথা ভাবছি, তখন আর একটাও সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি না—লাফিয়ে পড়া ছাড়া নীচে নামার কোনও পথ নেই। ঠিক এই সময়ে প্রচণ্ড ভয় আর উদ্বেগের মধ্যে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

—মৌসুমী ভট্টাচার্য, গৃহবধূ, ৩০ বছর।

স্বপ্ন ৭: দেখলাম আমি ফিলোসফি পড়তে কোচিন গেছি (এখন আর কোচিন যাই না, পরীক্ষা হয়ে গেছে)। ওখানে আমার প্রচণ্ড কাশি শুরু হয়েছে—কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বার হচ্ছে—ভীষণ ভয় করছে। আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে— ডাক্তার বলছেন, আমি আর বাঁচব না। খুব ভয় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘেমেনেয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

—রেখা মহাপাত্র, ছাত্রী, ২৩ বছর।

স্বপ্ন ৮: পরিচিত কোনও এক পরিবারের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় চলেছি—পাহাড়ী বন্ধুর পথ—ধর্মপ্রাণ বয়স্কা এক মহিলা লাঠি হাতে চলেছেন—হঠাৎ শুনি মহিলার মেয়ে 'বাঁচাও! বাঁচাও!' বলে আর্তনাদ করছেন—দৌড়ে গিয়ে দেখি, মহিলার পায়ে বিরাট মোটা কালো রং-এর একটা সাপ পেঁচিয়ে আছে—সাপের মুখটা বাইরে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে সাপের মুখটা চেপে ধরলাম। সাপটা মহিলার পা ছেড়ে লেজ দিয়ে আমাকে বারবার ঝাপটা মারছে—আমি বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টায় সাপের মুখটা চেপে ধরে আছি—এক সময় হাতটা ছেড়ে গেল—আর সাপটা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কামড়ে দিল। ঘুম ভেঙে দেখি, প্রচণ্ড জোরে পাখা চলছে, তবু সারা শরীর ঘামে ভেজা।

—শ্রী ঘোষ, জামসেদপুর, ৬০ বছর।

স্বপ্ন ৯: গ্রামের দোতলা বাড়ির ওপরতলায় একা শুতাম। তখন বয়েস ১৩-১৪ বছর। দেখতাম, একজন মহিলা, সামনের অর্ধেকটা মানুষ। পেছনের দিকটা সিংহের মতো, চতুষ্পদ। সিঁড়ি দিয়ে সেই চতুষ্পদ অর্ধনারী ওপরে উঠে আসত। খুব ভয় পেয়ে জেগে উঠতাম। সারা শরীর তখন ঘামে ভেজা।

— —, ৪০ বছর।

স্বপ্ন ১০: একটা বিরাট জল থই থই নদী। তার মাঝে একটা চওড়া ব্রিজ। ব্রিজের মাঝখানটা ভেঙে গেছে। আমি মেয়েকে কোলে নিয়ে ব্রিজটা পেরোতে চেষ্টা করছি। যতবার ঐ অংশটা পেরোতে চাইছি, ততবার মেয়ে আমার কোল থেকে স্লিপ করে পড়ে যাচ্ছে। বেশ কয়েকবার এই স্বপ্নটা দেখেছি। খুব ভয় করে এটা দেখলে।

—সুচিত্রা ভট্টাচার্য।

ভয়ের স্বপ্ন নিয়ে মনোবিজ্ঞানের কিছু কথা বলা দরকার। কোনও নিষিদ্ধ সুখের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে সব ভয়ের স্বপ্ন তৈরি হয়—তা কিন্তু নয়। অনেক সময় দেখা যায়, বাস্তবের কষ্ট-যন্ত্রণার কোনও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে এরকম স্বপ্ন তৈরি হচ্ছে। স্বপ্নে পাওয়া সুখের আনন্দ বাস্তবের যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে গেলে স্বপ্নের মধ্যে ভয়ের ভাব দেখা দেয় না। বরং স্বপ্ন দেখতে দেখতে ভয়ঙ্কর কাণ্ডকারখানা ঘটা সত্ত্বেও স্বপ্নদ্রষ্টা অদ্ভুত উদাসীন থাকেন। এরকম অনেক স্বপ্নের কথা অনেকে আমাকে জানিয়েছেন। চারপাশে আগুন লেগেছে, ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ছে বা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে গাছপালা মাটি থেকে উপড়ে আকাশে উড়ছে! অথচ স্বপ্নের দর্শকের মনে বিস্ময়! একটুও ভয় লাগছে না। খুব বেশিমাত্রায় নিষিদ্ধ কোনও সুখ স্বপ্নে চলে এলে মনের বাস্তবসূত্র স্বপ্নে বড় ভূমিকা নেয়। এরকম স্বপ্ন তাই তীব্র ভয় বা কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যে শেষ হয়। চূড়ান্ত ভয় বা কষ্টের মধ্যে ঘুম ভেঙে যায় স্বপ্নের দর্শকের।

দীর্ঘদিন নানা বয়েস, পেশা আর নানা শ্রেণীর বহু মানুষের ভয়ের স্বপ্ন সংগ্রহ করে স্বপ্নগুলো কাটাছেঁড়া করবার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। বেশিরভাগ ভয়ের স্বপ্নকে আমার 'সাহস বাড়াবার স্বপ্ন' বলে মনে হয়। বাস্তবের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে এরকম স্বপ্ন একজন মানুষকে পরোক্ষভাবে হলেও কিছুটা সাহায্য করে। এই স্বপ্নগুলো একজন মানুষের উত্তেজনা সহ্য করবার ক্ষমতা বাড়ায়। তাঁকে আরও ঘাতসহ করে তোলে। বেশ কয়েকজন মানুষ খুব বেশি ভয়ের স্বপ্ন দেখেন বলে জানান। এ সম্পর্কে কিছু কথা বলি। একটানা বেশ কিছু দিন খুব বেশি ভয়ের স্বপ্ন দেখতে থাকলে তা একজন মানুষের মনোজগতে ভবিষ্যত দুর্যোগের ইঙ্গিত হলেও হতে পারে। এরকম হলে অভিজ্ঞ মনোবিদ বা মনোরোগ-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

তিনজন যুবকের স্বপ্ন পেয়েছি, যেখানে স্বপ্নদ্রষ্টা মাঝেমাঝে স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠেন। রাতের আতঙ্ক বা 'নাইট টেরার'-এর এই স্বপ্নগুলো নিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা যুবকদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলি। এদের বয়েস ১৫ থেকে ১৯-এর মধ্যে। তিনজনের ক্ষেত্রেই 'নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছি'র পাপবোধ কাজ করছে স্বপ্নগুলোর মূলে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে নানাধরনের যৌন অনুসন্ধিৎসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠাও খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। সঠিক যৌনশিক্ষার অভাবে এরকম পাপবোধ তাড়া করে বেড়িয়েছে দুজনকে। আর ১৫ বছরের এক কিশোরের রাতের ভয়ঙ্কর স্বপ্নের উৎস খুব ছোটবেলায় মা-বাবাকে যৌনক্রীড়ারত অবস্থায় দেখে ফেলা। এরকম শৈশবস্মৃতি কোনও বাচ্চার মনে গভীর ছাপ ফেলতে পারে। যা বয়ঃসন্ধিক্ষণে বা যৌবনে অকারণ নানা পাপবোধের জন্ম দিয়ে নানা সমস্যা ডেকে আনে। দেখা দেয় অকারণ উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা। মনোবিজ্ঞান বলে, এরকম শৈশবস্মৃতি বাচ্চার ভবিষ্যত মনোজগতে মারাত্মক সমস্যা তৈরি করতে পারে। যে কিশোরের কথা বলছি, টেলিভিশনে দেখা একটা শয্যাদৃশ্যের ছবি স্মৃতির অতলে ডুবে থাকা শৈশবের ছবিকে তার স্মৃতিপথে নিয়ে আসে। তারপর থেকেই সে মাঝেমধ্যে আতঙ্কের স্বপ্ন দেখে চিৎকার করতে শুরু করে।

'ভয়ের স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন' অধ্যায় শেষ করব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সংক্রান্ত স্বপ্ন দিয়ে। সারাজীবন অসংখ্য দুঃস্বপ্ন দেখেছেন কবি। অনেকসময় এরকম স্বপ্ন দেখে, পরে কষ্ট পেয়েছেন খুব। একটা স্বপ্নের কথা বলি—

স্বপ্ন ১: কাল সমস্ত রাত ধরে স্বপ্ন দেখেছি যে তুমি (স্ত্রী মৃণালিনী দেবী) আমার ওপর রাগ করে আছ এবং কী সব নিয়ে আমাকে বকছ...সেই স্বপ্নের রেশ নিয়ে আজ সকালেও মনটা কিরকম খারাপ হয়ে ছিল।

স্বপ্নের দর্শক রবীন্দ্রনাথ। ১৯০০ সালের ১৭ ডিসেম্বর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠি থেকে এই স্বপ্ন পাওয়া যায়। 'কলিকাতার সমাজ এবং সংসার হইতে দূরে নির্জনে শিলাইদহে নিভৃতভাবে' তখন দিন কাটাচ্ছেন মৃণালিনী। আর কবি রয়েছেন কলকাতায়। স্ত্রীকে দূরে পাঠাতে বাধ্য হয়ে রবীন্দ্রনাথ ভুগছেন চরম মানসিক অশান্তিতে। কলকাতার 'অবসরহীন কর্মস্রোতের' মাঝে সারাটা দিন চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে, রাতে ঘুমিয়ে স্ত্রীকে একাকিত্বের মধ্যে ফেলে রাখার শাস্তি রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন এই স্বপ্নে। আর স্বপ্নের প্রভাবে সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মনে মনে চূড়ান্ত কষ্ট পেয়েছেন কবি। রবীন্দ্রনাথের দেখা এই স্বপ্নকে 'পানিশমেন্ট ড্রিম' বলা যায়। কবির দেখা আর একটা এরকম স্বপ্ন:

স্বপ্ন ২: হঠাৎ মনে হল যেন আমি চুপচাপ শুয়ে আছি, আর একটা লোক, তার হাতে ধারাল ছুরি, সে আমার পেট চিরে দেখছে।...তারপর আমি যেন খুব বিরক্ত হয়ে তাকে বললুম, এ কী রকম তোমার ব্যবহার, কে তুমি? সে বললে—আমি নারদ, আর তার হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেল।

১৯৩৯ সালে মংপুবাসের সময়ে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে একরাতে এই স্বপ্ন দেখেন রবীন্দ্রনাথ। এই স্বপ্ন ঠিক ভয়ের নয়। মৈত্রেয়ী দেবীর কথায় 'বিশ্রী অদ্ভুত স্বপ্ন'। দুঃস্বপ্নও বলা যেতে পারে। দুঃস্বপ্ন বা ভয়ের স্বপ্ন নিয়ে ১৯০০ সালে মৃণালিনী দেবীকে লেখা কবির একটা চিঠির অংশ-বিশেষের উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। কবি লিখছেন, "যখন স্বপ্ন বই নয় তখন সুস্বপ্ন দেখলেই হয়—সংসারে জাগ্রত অবস্থায় সত্যকার ঝঞ্ঝাট অনেক আছে—আবার মিথ্যাও যদি অলীক ঝঞ্ঝাট বহন করে আনে তাহলে তো আর পারা যায় না।" দুঃস্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের মতো তীব্র অনুভূতিশীল একজন ব্যতিক্রমী মানুষের ঘুমে আর জাগরণে কি গভীর কষ্ট-যন্ত্রণার জন্ম দিতে পারে, কবির কথাগুলো থেকে তা খানিকটা বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে দুঃস্বপ্নের ভূমিকা নিয়ে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে প্রখ্যাত রবীন্দ্রগবেষক 'রবিজীবনী' রচয়িতা শ্রী প্রশান্তকুমার পালের সঙ্গে। একটা দুঃস্বপ্নের কথা কবি বারবার উল্লেখ করেছেন তাঁর ডায়েরিতে, একান্ত আলাপচারিতায় আর চিঠিপত্রে। প্রশান্তবাবুর কথায়, "একই ধরনের ভয়ঙ্কর স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরে বারবার দেখেছেন খুব ছোট বয়েস থেকে। বলেছেন যে, যতবার ঐ স্বপ্ন দেখেছেন, ততবারই খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।" কবি ভয় পেতেন, ঐ স্বপ্নটা দেখলে কিছু একটা ক্ষতি তাঁর হবেই। ১৮৯০ সালে বিলাতবাসের সময় 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র খসড়ায় ৬ অক্টোবর তারিখে কবি এ সম্পর্কে লিখছেন, 'কাল সমস্ত রাত ধরে ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি। ঠিক এই রকমের স্বপ্ন আমি কতবার দেখেছি তার ঠিক নেই, মনে হয় কোনদিন সত্য হয়ে দাঁড়াবে। এই একরাত্তিরের মধ্যে ঠিক যেন মাসখানেকের অসহ্য কষ্ট পেয়েছি এমনি মনে হচ্ছে।'

এই ডায়েরির ১২ অক্টোবর তারিখের লেখা থেকে কবির এরকম এক দুঃস্বপ্নের বিবরণ উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রগবেষক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। কবির দেখা এই দুঃস্বপ্ন ছিল এরকম:

স্বপ্ন ৩: কাল রাত্তিরে আবার সেই রকমের স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নে বোধ হচ্ছিল মনের কষ্টে আমি যেন উর্ধশ্বাসে চিৎকার করে কোথায় ছুটে চলেছি।

কবির বারবার দেখা 'ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন' এটা নয়। প্রশান্তবাবু জানিয়েছেন, "ঐ স্বপ্নটা যে কি, ঘনিষ্ঠ যাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ হয়তো স্বপ্নটার কথা বলে থাকবেন, তাঁরাও কোথাও ঐ স্বপ্নের বিবরণ লিখে যান নি।" শেষ যিনি এ ব্যাপারে বলতে পারতেন, যাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি মুখ খুলতেন, সেই মৈত্রেয়ী দেবীর কোনও লেখাতেও কবির এই দুঃস্বপ্নের কোনও উল্লেখ নেই। এই দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তবাবু এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত খোঁজ পান নি। অনুসন্ধান থেমে নেই।

রবীন্দ্রনাথের এই দুঃস্বপ্ন সম্পর্কে রবিজীবনীকার আমাকে আলোচনার শেষভাগে কিছু আভাস দিয়েছেন। প্রশান্তবাবু জানাচ্ছেন, "বন্ধু অ্যানড্রুজকে লেখা একটা চিঠিতে এরকম একটা স্বপ্নের সামান্য আভাস রয়েছে। শান্তিনিকেতনের তৈরি বাড়িগুলো যেন ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, তার নীচে তিনি চাপা পড়ে যাচ্ছেন, অনেকটা এরকম। শান্তিনিকেতনকে নিয়ে কবির সাময়িক স্বপ্নভঙ্গের প্রতিফলন হয়তো ঘটেছিল এই স্বপ্নে।" তবে এটাই কবির দেখা 'সেই দুঃস্বপ্ন' বলে প্রশান্তবাবু মনে করেন না। কাদম্বরী দেবী থেকে শুরু ধারাবাহিক একের পর এক মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে, সারা জীবন ধরে। রবিজীবনীকারের অনুমান, 'ঐ ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন মৃত্যুঘটিত হলেও হতে পারে।"

ভয়ের স্বপ্ন একজন বিরলপ্রতিভার মানুষকেও কতটা প্রভাবিত করতে পারে, তা বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের ডায়েরিতে লেখা 'একরাত্তিরের মধ্যে ঠিক যেন মাসখানেকের অসহ্য কষ্ট' পাওয়ার অভিজ্ঞতার উপমা থেকে। 'কবি-কাহিনী'তে পাঠক খুঁজে পাবেন দুঃস্বপ্নের প্রভাবে কবির মানসিক প্রতিক্রিয়া—

"দিনে দিনে ভাবনায় শীর্ণ হয়ে গেল দেহ,
প্রফুল্ল হৃদয় হল বিষাদে মলিন,
রাক্ষসী স্বপ্নের তরে ঘুমালেও শান্তি নাই,..."

যৌনতার বিকাশ

'যৌনতার অঙ্কুরোদগম ঘটে শৈশবে।' শিশুমনে যৌনতার বিকাশ নিয়ে ফ্রয়েডের এই তত্ত্বকে অনেকেই ভালো চোখে দেখেন না। মেনে নিতে পারেন না। এ নিয়ে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হবার সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে অভিযোগ মোটামুটি এক। তা হল, শিশুর সরল নিষ্পাপ মনে যৌনতা খুঁজতে গিয়ে ভদ্রলোক যৌনতাকে নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি করেছেন। গিরীন্দ্রশেখর বসুসহ বেশিরভাগ মনোবিদ ফ্রয়েডের এই তত্ত্বকে মেনে নিয়েছেন। এই তত্ত্ব মনগড়া নয়। হাজার হাজার শিশুর মনের ওপর দীর্ঘদিন ধরে চালানো পর্যবেক্ষণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ফ্রয়েডের এরকম সিদ্ধান্ত। তাই, কেউ এই তত্ত্বকে উড়িয়ে দিতে চাইলে, তাঁকে শিশুমনে এরকম পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দিয়ে এই তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করতে হবে। এখনও পর্যন্ত কোনও মনোবিদ তা করে দেখাতে পারেননি।

শিশু মনে যৌনতার বিকাশের এই সূত্রকে পাঠক মেনে নাও নিতে পারেন। তবে এবিষয়ে ফ্রয়েডের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে একটা সহজ সরল ধারণা থাকা দরকার। তা না হলে বাচ্চাদের মন আর বাচ্চাদের স্বপ্ন বুঝতে অসুবিধা হয়। অসুবিধা হয় পরিণত বয়স্ক মানুষের যৌনতা, যৌনবিকার আর যৌনস্বপ্ন বুঝতে। অতিশৈশব থেকে শুরু করে পরিণত বয়স্ক মানুষের মনে যৌনবোধের বিকাশ আর রূপান্তরের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

মায়ের গর্ভে শিশু গভীর সুখবোধে বেঁচে থাকে। আর এই সুখ কোনও বস্তুর উপর নির্ভরশীল নয়। বস্তু নিরপেক্ষ এই সুখবোধ জন্মের পরে কিছুদিন থেকে যায়। মানব-শিশু বেঁচে থাকবার প্রয়োজনে স্তন্যপান করে, হাত পা চালায়, মলমূত্র ত্যাগ করে। এসব ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হলে সুখ (Pleasure) আসে। এই সুখবোধ শিশুর বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজন। এরকম শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন ছাড়া শিশু শুধু সুখের প্রয়োজনেও অনেক কাজকর্ম করে। শারীরিক প্রয়োজন নিরপেক্ষ এই সুখবোধই যৌনতা। ফ্রয়েড সুখ পাবার ইচ্ছাকে এরকম যৌন ইচ্ছা বলেছেন।

পাঠক এখানে একটা ধাক্কা খেতে পারেন। কারণ, সাধারণভাবে আমরা যৌনতা বলতে জননেন্দ্রিয়কেন্দ্রিক সুখবোধকে বুঝি। মনোবিদরা শিশু মনের যৌনতা বলতে প্রয়োজন নিরপেক্ষ যে কোনও ধরনের সুখবোধকে বোঝেন। আর এই সুখ খোঁজার ইচ্ছা শিশু মনের একটা প্রধান চালিকাশক্তি (Driving Force)। যৌনতাকে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারলে শিশু মনে যৌনতার বিকাশ বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাচ্চাদের মনে যৌনতা খোঁজার মধ্যে যৌনতাকে নিয়ে বাড়াবাড়ির অভিযোগও ফিকে হয়ে আসে।

শিশু জীবনধারণের প্রয়োজনে মায়ের বুকের বা বোতলের দুধ খায়। স্তনবৃন্ত (বা বোতলের নিপ্‌ল) চোষার ফলে সুখ পায়। জন্মাবার পর থেকেই বাচ্চাদের একটু ভালোভাবে নজর করলে দেখা যায়, বাচ্চা নানাভাবে আঙুল মুখে পোরার চেষ্টা করে। একটু বড় হয়ে সুযোগ পেলেই আঙুল চোষে। এর মধ্যেও কাজ করে মুখের ভেতর সুখ পাবার ইচ্ছা। বাচ্চাদের জীবনের একেবারে প্রথম পর্ব হল'Phase of Oral Pleasure' মনোবিদরা এই পর্বে শিশুর যৌনতাকে Oral Libido বা সুখকামভাব বলেন।

এরপর শিশুর মনে মলমূত্র ত্যাগের সময়কার সুখবোধ পাবার ইচ্ছা জন্মায়। এই সময় সে মাকে কাছে পায়, মা তাকে পরিষ্কার করিয়ে দেন আর মল বা মূত্রত্যাগের ব্যাপারে 'সামাজিক' করে তুলতে চেষ্টা করেন। এরকম ত্যাগের সময় মায়ের সান্নিধ্য আর মলদ্বারের আরামের বোধ তাকে বারবার এই

সুখ পেতে ইচ্ছুক করে তোলে। শিশু মনের এই পর্যায় হল `Phase of Anal Pleasure' বা পায়ুকামভাব।

মুখের সুখ আর পায়ুসুখের এই দুটো পর্যায় পুরোপুরি আলাদা নয়। একটার সঙ্গে অন্য পর্যায় জড়িয়ে থাকে। বাচ্চার বয়স বছর তিনেক হলে, সে তার নিজেরযৌনাঙ্গ সম্পর্কে সচেতন হয়। এসময় ছেলেরা লিঙ্গ নিয়ে আর মেয়েরা ভগাঙ্কুর (Clitoris) বারবার ধরতে বা তা নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। এই পর্যায়কে বলে `Phallic Phase' বা 'শৈশ্নিক অবস্থা'। বাচ্চার যৌনবোধ এভাবে চলে পাঁচ-ছ বছর বয়েস পর্যন্ত। তারপর থেকে এগারো-বারো বছর বয়েস পর্যন্ত বাচ্চার যৌনতায় একটা স্থিতাবস্থা চলতে থাকে। একে মনোবিদরা ঐ্ওদগঠদ চেওথগ´ বা 'অনুপক্রমকাল' বলেন।

দশ থেকে বারো বছর বয়সে বাচ্চার যৌনাঙ্গ নানা হরমোনের প্রভাবে পুরোপুরি বিকশিত হয়ে ওঠে। যৌনাঙ্গ কর্মক্ষম আর ক্রিয়াশীল হলে, কিশোর মনে যৌনতা যৌনাঙ্গকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। শিশু বড় হয়ে গেলে তাই আগেকার পরপর তিন অবস্থা রূপ পায় যৌনাঙ্গকেন্দ্রিক যৌনতায়। এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। তারা হস্তমৈথুনে (Masturbation) অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বাচ্চাদের যৌনতার এই প্রান্তিক আর চূড়ান্ত পর্যায় হল 'Genital Phase' বা 'যৌনাঙ্গ পর্যায়'যা যৌবনপ্রাপ্ত হবার সময় থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যৌবনপ্রাপ্তির পর থেকে মানুষের যৌনসুখ মূলত লিঙ্গ আর যোনির কামসুখ। অযোনিজ (যেমন মুখ, পায়ু, ভগাঙ্কুর বা লিঙ্গ নাড়াচাড়া) কামবোধ যে বয়স্ক মানুষের মধ্যে পুরোপুরি মিলিয়ে যায় তা নয়। প্রায় সব মানুষের যৌন অভ্যাসের মধ্যে এরকম অযোনিজ সুখবোধ কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায়। কারও ক্ষেত্রে এটা থাকে বেশি, কারও কম।

এবার একটু অন্যভাবে বাচ্চাদের যৌনবিকাশকে বোঝার চেষ্টা করা যাক। জন্মাবার পর থেকে বাচ্চা বোধহীন অবস্থায় নানা সুখ পায়। যেমন স্তন্য পানের সুখ বা মলমূত্র ত্যাগের সুখ। শিশু জানে না সুখের উৎস কোথায়। কিন্তু সুখের অনুভব তার মনে বোধগম্য। শিশুমনের এই পর্যায় হল স্বতকাম পর্যায় (Phase of Auto-eroticism). কিছুদিন বাদে শিশু নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়। বুঝতে পারে, সুখবোধ হচ্ছে তার মুখে (মায়ের দুধ বা বোতলের দুধ খাবার সময়) বা পায়ুতে (মলমূত্র ত্যাগের সময়)। এই সময় শিশু নিজের কামস্থানগুলোতে সুখের উৎস খুঁজে পায়। তাই নিজের শরীরে এরকম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি তীব্র ভালোবাসা জন্মায় তার মনে। শিশুমনের এই অবস্থা হল আত্মকাম পর্যায় (Phase of Narcissism). এই পর্যায়ে বাচ্চারা তাদের যৌনাঙ্গকে ভালোবাসতে শেখে।

আরও একটু বড় বলে বাচ্চারা চারপাশের নানা ধরনের সুখদায়ক বস্তু সম্পর্কে সচেতন হয়। এই সময় সে বুঝতে পারে মায়ের স্তন, কোল, হাত,পা থেকে শুরু করে লজেন্স-চুষিকাঠি-বিস্কুট—এ সবই তার সুখের উৎস। তাই শিশু ওই সব বস্তু থেকে সুখ পেতে চায়। শিশু মনে যৌনতার এই পর্যায়কে মনোবিদরা বস্তুকামের পর্যায় বলেন। পরবর্তী স্তরে বাচ্চা নিজের মাকে ভালবাসতে শেখে। শিশুর মনে ভালোবাসার পাত্রী শিশুর মা। আত্মকাম পর্যায়ে সে নিজের যৌনাঙ্গকে ভালোবাসতে শিখেছে। এই পর্যায়ে বাচ্চা তার মাকে মনে করে একই লিঙ্গের। বাচ্চা ছেলের কাছে এই পর্যায়ে মা পুরুষ। মেয়ের কাছে নারী।

শিশু মনে যৌনতার বিকাশের এই পর্যায়ে ভালোবাসার পাত্রী তার মনে একই লিঙ্গের। এই অবস্থা হল সমকামিতার পর্যায় বা `Phase of Homesexuality'. পাঠক খেয়াল করবেন, যে কোনও শিশুর স্বাভাবিক যৌনতার বিকাশে মানুষের প্রতি প্রথম ভালোবাসায় সমকামি। আর একটু বড় হলে এই সমকামিতা কেটে যায়। তখন ছেলেরা বাবাকে মায়ের প্রতি তার ভালবাসার বাধা ভাবে। মেয়েরা মাকে ভাবে বাবার প্রতি ভালবাসার বাধা। এই পর্যায় হল ইতরকামিতার পর্যায় বা `Phase of Heterosexality'. এই পর্যায়ের যৌনবোধ যৌবনপ্রাপ্ত হবার পরও যে কোনও ছেলেমেয়ের মধ্যে থেকে যায়। আর এটাই হল পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক যৌনতা।

স্বতকাম, আত্মকাম, বস্তুকাম, সমকাম আর ইতরকামের এই পর্যায়গুলোকে বয়স অনুযায়ী একেবারে আলাদা করা সম্ভব নয়। একটা পর্যায় প্রায়শই অন্য পর্যায়ে কিছুটা প্রভাব রেখে যায়। যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেরা যে মেয়েদের প্রতি আর মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়—এই সুস্থ যৌনবোধ গড়ে

ওঠার জন্য আগেকার প্রতিটা স্তর ঠিকঠিকভাবে পার হয়ে আসা একান্ত প্রয়োজন।তা না হলে নানাধরনের কামবিকৃতি (Sexual Perversion) দেখা দিতে পারে। যেমন, কোনও পূর্ণবয়স্ক মানুষ সমকামি হলে বুঝতে হবে, তার শৈশবে মনে যৌনতার বিকাশ সমকামিতার পর্যায়ে আটকে গেছে। তা থেকে স্বাভাবিক ইতরকামিতায় পরিণত হয় নি।

পরিণত বয়সের মানুষের স্বাভাবিক কামবোধ ইতরকামিতা হলেও কামপর্যায়ের অন্য স্তরের ইচ্ছাগুলো অল্পস্বল্প পরিমাণে সবার মনের মধ্যেই থাকে। আর এটা পুরোপুরি স্বাভাবিক। যেমন মেয়েদের রূপচর্চা,সাজতে ভালবাসা, ছেলেদের একটানা অনেকক্ষণ আয়নায় মুখ দেখা—এ সবের মধ্যে আত্মকামের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর বসু লিখছেন, "স্বতকাম না থাকিলে কেহ সুখের জন্য চেষ্টা করিত না; স্বকাম আছে বলিয়াই আমরা নিজের শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উৎসুক হই। বন্ধুবান্ধবদের প্রতি যত্ন ভালবাসায় ও আমাদের সমাজপ্রীতির মূলে সমকামিতা বর্তমান। অর্থোপার্জন ইত্যাদি চেষ্টায় ও নানা কান্তরসের অনুশীলনে বস্তুকাম সহায়ক। পারিবারিক জীবন ইতরকামিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

বয়স্ক মানুষের যৌনতায় ইতরকামিতার আগেকার কোনও একটা পর্যায় খুব বেশি পরিমাণে থাকলে নানা ধরনের কামবিকৃতি দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। সমকামি পুরুষ বা নারীর কথা তো সবাই জানেন। পাগলের মতো টাকাপয়সা জমানো আর বিত্তের শিখরহীন শিখরে পৌঁছনোর চেষ্টা সেই অর্থে একজন মানুষের অস্বাভাবিক রকম বস্তুকামী হবার লক্ষণ। নিজের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা থেকে জন্ম নিতে পারে নার্সিসিসম বা 'নার্সিসাস কমপ্লেক্স'। এরকম পুরুষ বা নারীর স্বাভাবিক যৌনজীবন বিপর্যস্ত হতে পারে নানাভাবে। অতিরিক্ত স্বতকাম থেকে জন্ম নিতে পারে শরীর নিয়ে নানাধরনের বাতিক। স্বতকাম মনে বেশিমাত্রায় থেকে গেলে একজন মানুষের জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে শুধুই সুখ খোঁজার চেষ্টায়।

একটা প্রশ্ন পাঠক করতেই পারেন। তা হল, মনোসমীক্ষক মনোবিদদের মতে মা বাবার প্রতি ভালোবাসাও তো কামভাবে আচ্ছন্ন।তা কি করে সম্ভব? আসলে বড় হয়ে গেলে, মাবাবার প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা তাকে আমরা অনুভব করি বিশুদ্ধ পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি হিসেবে। এরকম ভালোবাসার কামজ দিকটা সচেতন মন থেকে মনের অচেতন অংশে চলে যায়। তাই এরকম ভালোবাসার এই অংশের অস্তিত্ব আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় বুঝতে পারি না। বাস্তবে দেখা যায়, প্রত্যেক মানুষের মাবাবার জন্য ভালোবাসা নিখাদ, গভীর, চাওয়া-পাওয়া নিরপেক্ষ। পুরুষরা যে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে বেশি ভালবাসেন, এর মধ্যে যৌনতার লক্ষণ রয়েছে বললে, অনেকেই তা মেনে নিতে চাইবেন না। মনোবিদরা বলেন, বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গলাভ বা তার সঙ্গে কথাবার্তায় আনন্দ—এ সবের মধ্যেই পরোক্ষভাবে কাজ করে একজন মানুষের যৌনচেতনা।

শিশুমনের যৌনতার বিকাশের এই পর্যায়গুলো বোঝা গেলে আর একটা ব্যাপার বোঝা সহজ হয়। তা হল কিভাবে অচেতন মনে চলে যাওয়া সমাজের পরিপন্থী নানা ইচ্ছা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পায় সৃজনধর্মী নানা কাজে, নানা ধরনের সদ্‌গুণে বা রোগে। পায়ুকাম (Anal Pleasure) অচেতন মনে চলে গিয়ে প্রকাশিত হতে চাইলে তা থেকে কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation), কার্পণ্য এসবের জন্ম দিতেপারে। আবার একই ইচ্ছা সমাজের চোখে ভালো নানা অভ্যাসের জন্ম দিতে পারে। যেমন শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা বা পরিচ্ছন্নতাবোধ। এরকম হয় অচেতনের রূদ্ধ ইচ্ছা অন্যভাবে বাইরে প্রকাশ পাবার জন্য। অসামাজিক ইচ্ছা অচেতন থেকে সচেতন মনে সরাসরি আসবার চেষ্টা থেকে একজন মানুষ নানা ধরনের মনোরোগে আক্রান্ত হতে পারেন। আবার একই ইচ্ছা অন্য ভাবে সচেতনে আসতে পারে কামকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত বা অন্য ধরনের সৃজনশীলতার মাধ্যমে। মনের অচেতনে থাকা রুদ্ধ ইচ্ছার এরকম প্রবাহকে মনোবিদরা 'উদ্‌গতি' বা 'সাবলিমেশান' বলেন।

পরিণতবয়স্ক মানুষের কামচেষ্টা মূলত যৌনমিলন বা রতিক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয়। অন্য নানা ধরনের কামচেষ্টা অল্পপরিমাণে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই কামচেষ্টা আসলে নানা ধরনের ইচ্ছা। ভালোভাবে লক্ষ করলে, বিপরীতমুখী দুটো এরকম ইচ্ছার অস্তিত্ব সব মানুষের যৌন অভ্যাসের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। পরস্পর বিরোধী হবার জন্য এক সঙ্গে দুরকম ইচ্ছা প্রকাশ পেতে পারে না। যে ইচ্ছা প্রকাশ পায় তার বিপরীত ইচ্ছা অচেতন মনে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে। অচেতন মনের এই রুদ্ধ

যৌনইচ্ছা স্বপ্নে নানাভাবে চলে আসে। স্বপ্নতত্ত্ব বুঝতে এই ইচ্ছাগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই ইচ্ছাগুলো হল :

১. (ক) প্রেমাস্পদকে নিজের রূপ দেখানোর ইচ্ছা—বিলসনকামেচ্ছা বা Exhibitionistic wish.
(খ) প্রেমাস্পদের রূপ গোপনে দেখার ইচ্ছা—ইক্ষণকামেচ্ছা বা Observationistic wish.
২. (ক) বিপরীত লিঙ্গের প্রেমাস্পদকে পীড়ন করার ইচ্ছা—ধর্ষকামেচ্ছা বা Sadistic wish.
(খ) প্রেমাস্পদকে দিয়ে নিজে পীড়িত হবার ইচ্ছা—মর্ষকামেচ্ছা বা Masochistic wish.
৩. বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন ইচ্ছা—এরকম কামেচ্ছা সমাজ অনুমোদিত পথে পুরোপুরি চালিত না হয়ে পরস্ত্রী বা পরপুরুষের প্রতি অসামাজিক ইতরকামেচ্ছা হিসাবে মনের অবচেতনে বা অচেতনে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে। যা নানাভাবে স্বপ্নে দেখা দেয়।
৪. বিপরীত লিঙ্গের আত্মীয়স্বজনের প্রতি যৌনইচ্ছা বা Incestuous wish.
৫. সমকামিতা বা Homosexual wish.
৬. স্বকামেচ্ছা বা Narscisistic wish.
৭. স্বতকামেচ্ছা বা Autoerotic wish.
৮. নানাধনেরর বিকৃত যৌন ইচ্ছা বা Perverse wish.

এই ইচ্ছাগুলো মনের মধ্যে থেকে নানাভাবে প্রকাশ পেতে চায়। পরের অধীনে চাকরি করা এক ধরনের মর্ষকামেচ্ছা। আড়ি পেতে মেয়েদের শরীর দেখার ইচ্ছা ইক্ষণকামেচ্ছার রূপান্তর। কিছু পুরুষের সচেতনভাবে রাস্তাঘাটে বা অন্য জায়গায় শরীর দেখানো বা যৌনাঙ্গ দেখানোর প্রবণতার কথা সবাই জানেন। এটাও এক ধরনের বিলসনকামেচ্ছা। এরকম নানা ইচ্ছা আর নানা ধরনের বিকৃত যৌনইচ্ছা কমবেশি সব মানুষের মধ্যেই থাকে। সমাজের চোখে নিষিদ্ধ, তাই এসব ইচ্ছা অচেতন মনে রুদ্ধ অবস্থায় থাকে। যা নানাভাবে স্বপ্নে চলে আসতে পারে। এছাড়াও আর এক ধরনের ইচ্ছা সব মানুষের মধ্যে থাকে। তা হল পুরুষের নারী হবার ইচ্ছা বা নারীর পুরুষ হবার ইচ্ছা। শারীরবৃত্তীয় কারণে প্রত্যেক পুরুষ বা নারীর শরীরে কিছু পরিমাণে বিপরীত লিঙ্গের শারীরিক ভাবের অস্তিত্ব রয়েছে। অচেতনের বিপরীত লিঙ্গে পরিণত হবার সুপ্ত ইচ্ছা রয়েছে আমাদের সবার মধ্যেই। এরকম সুপ্ত ইচ্ছা মাঝেমধ্যে স্বপ্নে চলে আসে। পুরুষ হয়তো দেখলেন, তিনি শাড়ি পরে বাজার করতে বেড়িয়েছেন। অন্যদিকে একজন মহিলা নিজেকে স্বপ্নে দেখতেপারেন পুরুষের বেশে। এরকম বেশ কিছু স্বপ্নের কথা এই বইতে নানা প্রসঙ্গে এসেছে।

যৌনস্বপ্ন

জীবনে কখনও যৌনস্বপ্ন দেখেননি এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কি পুরুষ, কি নারী, জীবনের নানা পর্যায়ে কোনও না কোনও ধরনের যৌনস্বপ্ন এক জন মানুষ অবশ্যই দেখেন। হতে পারে যে, এরকম স্বপ্নের কথা স্বপ্নের দর্শক ভুলে গেলেন। সুতরাং তাঁর মনে হল, তিনি এরকম স্বপ্ন কখনও দেখেন নি। আবার অনেক সময় মনের প্রহরীর কড়া পাহারায় যৌনতা সম্পর্কিত স্বপ্ন আসে ছদ্মবেশে। যার অর্থ স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে ধরা পড়ে না। অনেকের ধারণা, শুধুমাত্র পুরুষ যৌনস্বপ্ন দেখেন। এরকম ধারণা পুরোপুরি ভুল। পুরুষের তুলায় কম হলেও মেয়েরা যৌনস্বপ্ন দেখেন।

যৌনস্বপ্ন কেন এত বেশি আসে তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন নয়। একজন মানুষের অন্য সব ইচ্ছা বা কামনাগুলোর চাইতে, জীবনের নানা পর্বে, অনেক বেশি অবদমিত হয় তাঁর যৌনতা নিয়ে নানাধরণের ইচ্ছা। পরিবার, সমাজ, ন্যায়-অন্যায় বোধ, শিক্ষা, সামাজিক নিয়মকানুন—এসবের প্রভাবে যৌন কামনা অবদমিত হয় একেবারে ছেলেবেলা থেকে। বয়ঃসন্ধিতে যৌবনপ্রাপ্তির পর যে কোনও ধরনের মানুষের মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার উপায় বাস্তবে বেশিরভাগ সময় থাকে না। যৌন কামনা তৃপ্ত হয় স্বপ্নে।

যৌবন শুরুর বছরগুলোতে, যৌবন নিয়ে উন্মাদনা স্বাভাবিকভাবেই তীব্র হয়। এই বয়সে একজন মানুষের মনে যৌন কামনা প্রচণ্ড গতিশীল। এই সময় থেকে শুরু করে ২০-২২ বছর পর্যন্ত সাধারণত 'যৌনস্বপ্ন' আসে সবচাইতে বেশি। নরনারীর স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের পরও যৌনস্বপ্ন আসে। তবে তুলনায় আগের চাইতে অনেক কম। এটা খুব আশ্চর্যের যে বিশেষ করে যৌবন শুরুর দিনগুলোতে এরকম স্বপ্নে মনের যৌনকামনা অনেক সময় পূর্ণ হয় অবিকৃতভাবে—মনের পাহারাদার সজাগ না থাকবার জন্য সম্ভবত এরকম হয়। এরকম স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত মানুষের সঙ্গে ইপ্সিত যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বেশির ভাগ সময় মনের 'সেন্সার' সজাগ হয়ে ওঠে। তখনই স্বপ্নদ্রষ্টার মনে শুরু হয় তীব্র পাপবোধ। যার রেশ অনেক সময় থেকে যায় সকালে ঘুম ভাঙার পরও।

কমবয়সে যৌনস্বপ্নকে দুভাগে ভাগ করা যায়। স্বপ্নদ্রষ্টা যৌন মিলনে রত হচ্ছেন তাঁর চেনা বিপরীত লিঙ্গের কোনও চরিত্রের সঙ্গে। সামাজিকভাবে যাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হয়তো চূড়ান্তভাবে 'গর্হিত'বা নিন্দার ব্যাপার। আবার অনেক সময় স্বপ্নদ্রষ্টা দেখেন পুরোপুরি অপরিচিত কোনও চরিত্রের সঙ্গে শরীরী মিলনের স্বপ্ন। প্রথম ধরনের স্বপ্ন তৈরি হয় মনের পাহারাদারের নজরদারি ঢিলে হবার মুহূর্তে। আর দ্বিতীয় ধরনের স্বপ্নের অচেনা, অপরিচিত চরিত্র আসলে স্বপ্নদ্রষ্টার কাঙ্ক্ষিত কোনও চরিত্রের ছদ্মবেশ। মনের পাহারাদারের নজরদারি এড়াতে যে চরিত্র অচেনা চরিত্রের বেশে এরকম স্বপ্নে চলে আসে।

একজন মানুষ যখন ঘুমোন, তখন দুই বিপরীতমুখী ইচ্ছার সংঘর্ষে তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। বিশ্রামের প্রয়োজনে গভীর ঘুমের ইচ্ছা বাধা পেতে পারে খিদে, তেষ্টা, মলমূত্র ত্যাগের ইচ্ছা বা যৌন ইচ্ছার তাড়নায়। এর মধ্যে মলমূত্র ত্যাগের ইচ্ছা যে নানা ধরনের স্বপ্নের জন্ম দেয় সেগুলোর মধ্যে অনেক সময় কামভাব খুঁজে পাওয়া যায়। কিছু মনোবিদের মতে, মুত্রত্যাগের ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত শৈশবের যৌনবোধ বয়স্ক মানুষের স্বপ্নে (Dreams of Urinary Stimulus) কিছুটা জটিলভাবে তার বর্তমান যৌন ইচ্ছাকে নানাভাবে নিয়ে আসে। যৌন ইচ্ছা থেকে সরাসরি যে যৌনস্বপ্নের জন্ম, তা একজন মানুষকে ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করে। কারণ চরম সুখবোধের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো যৌন তাড়না যায় মিলিয়ে।

এক জন মানুষের যৌন চেতনার সঙ্গে তাঁর যৌনস্বপ্নের সম্পর্ক গভীর। একজন মানুষ তার যৌবনের

শেষ পর্যায়ে (অর্থাৎ বেশি বয়সে) যৌনস্বপ্ন দেখবেন কিনা, দেখলে তা কি ধরনের স্বপ্ন, তা নির্ভর করে যৌনতার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। স্বাভাবিক যৌনক্রিয়ায় অক্ষম বেশি বয়সের বহু মানুষের নানাধরনের যৌনস্বপ্নের কথা এই লেখক জানেন। আবার একটা বয়সের পর নানা (ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক) চিন্তায় ডুবে থাকা মানুষ আর যৌনস্বপ্ন দেখছেন না, এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়। একজন ষাট পার করে দেওয়া প্রৌঢ় কম বয়েসী মহিলাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের স্বপ্ন দেখেন প্রায়ই। আবার একজন ছাপ্পান্ন বছরের মানুষ যৌনস্বপ্ন দেখেন না বেশ কয়েক বছর। এই দুজন মানুষের যৌনতাবোধ বা যৌনরুচি আলাদা হবার জন্য যৌনস্বপ্নের এই তারতম্য।

কৈশোরের যৌনস্বপ্ন নানা ধরনের অপরাধবোধ তৈরি করে। এক কারণ অনেক। কৈশোর বা যৌবন শুরুর এরকম স্বপ্নে, বিশেষ করে ছেলেদের ক্ষেত্রে, স্বপ্নের দর্শক অনেক সময় মিলিত হন নানা বয়সের খুব চেনা বা পরিচিত নারীর সঙ্গে। হয়তো তিনি স্বপ্নদ্রষ্টার নিকটাত্মীয়া। সামাজিকভাবে যাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক চূড়ান্ত অন্যায়, অশ্লীল। এরকম স্বপ্ন দেখে মনে অপরাধবোধ জাগা স্বাভাবিক। আবার কৈশোর বা প্রথম যৌবনে এরকম যৌনস্বপ্ন সাধারণত শেষ হয় স্বপ্নদ্রষ্টার বীর্যস্খলন (Ejaculation) দিয়ে। অবৈজ্ঞানিক নানা ধ্যানধারণার বশে এই বয়েসের ছেলেরা অনেকেই ভাবে, এরকম স্খলন মানেই 'শরীরের ক্ষয়' বা 'স্বাস্থ্যের ক্ষতি'। প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানসম্মত যৌনশিক্ষার অভাব আর যৌনতা নিয়ে ব্যবসা করা কারবারিদের ভ্রান্ত প্রচারের প্রভাব—এই দুই মিলে এরকম স্বপ্ন দেখার পর মনে অহেতুক অতিরিক্ত অপরাধবোধের বোঝা চাপে এই বয়সে।

এরকম স্বপ্ন দেখার পর মনের প্রহরী সজাগ হয়ে ওঠায় মনে ভয় ও অপরাধবোধ তৈরি হবার কথা আগে বলেছি। আমাদের মতো দেশে বেশিরভাগ কিশোরবা যুবকের যৌনস্বপ্ন তাঁদের মনে প্রত্যাশিত যৌনরোমাঞ্চ তৈরি করতে পারে না সঠিক যৌন চেতনার অভাবে। যৌনস্বপ্নের কথা কেউ অন্যকে খুলে বলতে পারেন না। যৌনস্বপ্ন দেখাটা সমাজের চোখেযেন একটা 'অপরাধ'। স্বাভাবিক কামচেতনা থেকে তৈরি হওয়া যৌন ইচ্ছা স্বপ্নে পূর্ণ হয় যৌনস্বপ্নের মাধ্যমে। এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। শরীরী কামনা কাল্পনিকভাবে তৃপ্ত করে যৌনস্বপ্ন মনে তৃপ্তি আনে। শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবকে রূপান্তরের দিনগুলোতে যৌনস্বপ্ন প্রত্যেকের জীবনে প্রয়োজনীয়। এরকম স্বপ্ন যৌন চেতনার স্বাভাবিক বিকাশে সাহায্য করে। যৌনতা নিয়ে শুচিবাতিকগ্রস্ত মানুষ মনোবিজ্ঞানের এই তত্ত্বকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারবেন না—এটাই স্বাভাবিক।

যে কোনও পুরুষ বা নারীর যৌন চেতনা বহুগামী (Polygamy or Polyandry) কিনা সেই জটিল বিতর্কে না যাওয়াই ভালো। তবে যৌনস্বপ্নের দর্শক যে বহুগামী তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষ করে পুরুষের যৌনস্বপ্নে বিপরীতলিঙ্গের চরিত্রগুলো বদলে যায় ঘনঘন। কখনও কখনও স্বপ্নের মিলন ঘটে কোনও প্রিয় পরিচিত নারীর সঙ্গে। কখনও প্রিয় স্বপ্নের নায়িকার সঙ্গে। একই মহিলাকে নিয়ে নিয়মিত যৌনস্বপ্ন দেখেন এমন মানুষ বিরল। আমি মাত্র তিন জন স্বপ্নদ্রষ্টার কথা জানি, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে একই নারীর সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন দেখেছেন। এঁদের স্বপ্নবর্ণনার প্রতি পুরোপুরি আস্থা রেখেও বলা যায়, এঁরা ব্যতিক্রম।সাধারণত বেশিরভাগ মানুষের এরকম স্বপ্নের মিলন ঘটে এক একটা স্বপ্নে এক একজন নারীর সঙ্গে। হতে পারে যে কিছু স্বপ্নে আসছেন একজন, আর বাকিগুলোতে অন্যরা।

অন্য সব স্বপ্নের মতো যৌনস্বপ্নও উপাদান খুঁজে নেয় জেগে থাকা অবস্থার বাস্তব জীবন থেকে। বাস্তব জীবনে দেখা, শোনা, ভাবা বা দেখা নানা উপাদান যৌনস্বপ্নে স্বপ্নকল্পনার রঙে নানাভাবে চিত্রিত হয়ে চলে আসে। কম বয়সে বিকৃতকাম পুরুষ বা নারীর বিকৃত যৌন তাড়না বা কামনার শিকার হয় অনেক ছেলেমেয়ে। এরকম অভিজ্ঞতা থেকে মনে তৈরি হওয়া অপরাধবোধ অনেক সময় ছেলেমেয়েদের কম বয়সের স্বপ্নে ভয়ের স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। একজন পঁয়ত্রিশ বছরের আইনজীবী তার কমবয়সে দেখা একটা স্বপ্নের কথা আজও মনে করতেপারেন। স্বপ্নে একজনকালো কুচকুচে বিশাল চেহারার মহিলা জোর করে তাকে দিয়ে যৌনক্ষুধা মিটিয়ে নেন। এই ভয়ের স্বপ্নের উৎস ১৩-১৪ বছর বয়সে বয়স্কা এক অতৃপ্ত নারীর তাকে একা পেয়ে এরকম আচরণের এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।

যৌনস্বপ্নের একটা বৈশিষ্ট্য হল, অন্য সব স্বপ্নের চাইতে কিছু যৌনস্বপ্ন বহু বছর, এমনকি আজীবন মনে থেকে যেতে পারে। ১৪-১৫ বছর বয়সে দেখা এক সদ্য যুবকের এরকম একটা স্বপ্নের কথা বলি। স্বপ্নদ্রষ্টা আমাকে এই স্বপ্নের কথা জানাচ্ছেন তাঁর সত্তর বছর বয়সে। স্বপ্নে এক মাতৃস্থানীয়া নিকটাত্মীয়ার সঙ্গে সহবাসের কথা আজও এই প্রৌঢ়ের স্মৃতিতে তীব্রভাবে বেঁচে আছ। এই স্বপ্নের পারিপার্শ্বিকতা এরকম। মহিলা ছিলেন নিঃসন্তান। আর তাঁর স্বামী কর্মসূত্রে থাকতেন বিদেশে। মাঝেমধ্যে মহিলার স্বামীর এক বন্ধু ওঁর কাছে আসতেন। যৌথ পরিবারের মহিলাদের মধ্যে এই দু জনের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হত। এই শোনা কথা কিশোরের স্বপ্নে ওই আত্মীয়ার সঙ্গে তার যৌন মিলনের দৃশ্যে রূপ নেয়। প্রথমে অপরাধবোধ হলেও 'প্রথম স্বপ্নের সহবাস' এর স্মৃতি পরে বারবার রোমাঞ্চিত করেছে কিশোরকে। হয়তো তাই বিশেষ এই স্বপ্নটাতাঁর স্মৃতিতে আজও অমলিন।

আর একজন বয়স্ক ভদ্রলোক চল্লিশ বছর আগে স্বপ্নেতাঁর স্ত্রীর বড় দিদির সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা আজও মনে করতে পারেন। ওই ভদ্রমহিলা ছিলেন অবিবাহিতা। স্ত্রী ও শালীরা ভদ্রলোকের সামনেই নানাধরনের কেচ্ছাকাহিনী আলোচনা করতেন। এর মধ্যে ছিল পাড়ার এক ভদ্রলোকের তাঁর শ্যালিকার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা। এই শোনা কথা তাঁর নিজের শ্যালিকার সঙ্গে সহবাসের স্বপ্নে পরিণত হয়। বড়দের মধ্যে এরকম কেচ্ছাকাহিনীর আলোচনা, অশ্লীল গল্পগুজব, আদিরসাত্মক নানা ঠাট্টাইয়ার্কি—এসব কিশোর কিশোরীদের মনে ছাপ ফেলে। ছাপ ফেলে পত্রপত্রিকার নানা আশালীন ছবি, টেলিভিশনের কুরুচিকর দৃশ্য। কম বয়সে দেখা যৌনস্বপ্নের অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারে এরকম নানা ধরনের সূত্র।

মনের প্রহরী সজাগ থাকবার জন্য যৌনস্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার বিপরীত পাত্র বা পাত্রীঅনেক সময় বিচিত্র ছদ্মবেশে স্বপ্নে চলে আসেন। একজন আঠারো বছরের যুবক এক রাতে স্বপ্নে মিলিত হন এক মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে। এই মনুষ্যেতর প্রাণী যুবকের স্বপ্নে এসেছে স্বপ্নবিকৃতির নিয়ম মেনে। যুবকের স্বপ্নের বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ওই প্রাণী আসলে তার পাড়ার এক সুন্দরী বিবাহিতা মহিলার ছদ্মবেশ। স্বপ্নে ওই মহিলার সঙ্গে মিলিত হলে যুবকের মনে দেখা দিত অপরাধবোধ। মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে স্বপ্নের মিলনে যুবকের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। এটা এরকম স্বপ্নে মনের প্রহরীর প্রভাবে স্বপ্ন-বিকৃতির একটা সুফল।

স্বপ্নকল্পনার জোরে যৌনচিন্তা কি বিচিত্রভাবে স্বপ্নে চলে আসে, স্বপ্নের বিচ্যুতি (Displacement) কি অদ্ভুতভাবে কাজ করে, তা বোঝা যায় বাইশ বছরের এক যুবকের দেখা একটা স্বপ্নের বিবরণ শুনলে। স্বপ্নটা এরকম :

স্বপ্ন: এক বন্ধুর সঙ্গে এক জন পরিচিত মানুষের বাড়িতে গেছি— ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা নিষিদ্ধ দৃশ্য চোখে পড়ে যায় এ বাড়ির ছাদ থেকে। দেখলাম আমার চেনা এক মহিলাকে অন্য দু জন ইউনিফর্ম পরা মহিলাকর্মী দু হাত ধরে কোথাও নিয়ে যাচ্ছেন—মহিলার মুখে উত্তেজনা আর ভয় মেশানো। রাস্তা দিয়ে ওঁকে নিয়ে যাবার সময় আমি পিছু নিলাম—দেখলাম আরও একজন মহিলাকে এক সঙ্গে দু জন কর্মী ধরে নিয়ে আসছেন—যে জায়গাতে ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লুকিয়ে সেখানে ঢুকে পড়লাম—বুঝতে পারলাম, যেসব মহিলার যৌন তাড়না খুব বেশি,তাঁরা ওখানে যান—আর ওই তাড়না মেটায় কোনও পুরুষ নয়, ঘোড়া। আমি দেখলাম এক দল ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে—আমি ঘুরে ব্যাপারটা দেখতে গিয়ে এক জন মহিলা দেখে ফেলে তাড়া করে—বুঝতে পারি, গোটা ব্যাপারটা মহিলাদের দিয়ে পরিচালিত, আর ওখানে ছেলেদের প্রবেশ নিষেধ— তাড়া খেয়ে ছুটতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

এই স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শকের যৌন আনন্দলাভ ঘটছে মহিলাদের সঙ্গে ঘোড়ার নিষিদ্ধ সঙ্গমদৃশ্য দেখে। পাঠক খেয়াল করবেন, প্রথম যে মহিলাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তিনি স্বপ্নের দর্শকের পরিচিত। আর মনের প্রহরী সজাগ হতেই এই নিষিদ্ধ আনন্দলাভে ইতি টেনে স্বপ্নদ্রষ্টাকে ছুটে পালাতে হচ্ছে মহিলাকর্মীর তাড়া খেয়ে। এই যৌনস্বপ্ন স্বপ্নকল্পনার বিচিত্র গতির সন্ধান দেয়। স্বপ্নটার বিশদ বিশ্লেষণ এখানে অপ্রয়োজনীয়। পঞ্চাশ পার হয়ে যাওয়া বেশ কিছু পুরুষ গোপনীয়তার শর্তে জানান,

তাঁরা নিয়মিত বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন নারীর সঙ্গে যৌন মিলনের স্বপ্ন দেখেন। একই বয়সের অন্য পুরুষেরা গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ঠিক বিপরীত কথা জানান। এঁরা আগে যৌনস্বপ্ন দেখলেও এখন আর দেখেন না বলে জানিয়েছেন। একই বয়সের পুরুষদের মধ্যে যৌন রুচির পার্থক্য প্রতিফলিত হয় তাদের স্বপ্নেও। সমবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে স্বপ্নের এই বৈপরীত্য তার প্রমাণ। যৌনতাকে জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে মনে করেন এমন একজন উচ্চশিক্ষিত এঞ্জিনিয়ারের দেওয়া তথ্য এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। পঞ্চাশ পার হবার আগে ভদ্রলোক যৌনস্বপ্ন দেখলেও এখন আর দেখেন না। তার আগে দেখা যৌনস্বপ্নে প্রায় প্রতিবার তিনি মিলিত হতেন সহজ-সরল বনবালাদের সঙ্গে।

জঙ্গলপ্রিয় এই মানুষটি আগে প্রায়ই ছুটতেন জঙ্গলের টানে। জঙ্গলের মানুষের সহজ-সরল, প্রকৃতিনির্ভর অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি তার আকর্ষণ সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলো থেকে। যৌনস্বপ্নে কখনও কখনও মানুষের মানসিকতার প্রতিফলন কিভাবে চলে আসে, এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের এই স্বপ্ন তার প্রমাণ। এক চিকিৎসক আমাকে বিবাহ পরবর্তী নানা ধরনের যৌনস্বপ্নের কথা খোলাখুলি জানান। দেখা যায়, বিয়ের বাইশ বছর পরও তাঁর বিবাহ বহির্ভূত কাল্পনিক যৌনতার জগৎ তার ছাত্রজীবনের সহপাঠী প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে। ওই মহিলার সঙ্গে আজ আর কোনও সম্পর্ক নেই তাঁর। তিনি আজ অন্য এক কৃতী পুরুষের স্ত্রী। এই চিকিৎসকও একজন আদর্শ স্বামী। বাস্তব জগতে স্ত্রী আর স্বপ্নের জগতের যৌবনের প্রেমিকা—এর বাইরে এই চিকিৎসকের যৌন চেতনায় আর কোনও নারীর জায়গা নেই। থাকলেও তিনি তা মনে করতে পারেন না। এও তো একজন মানুষের স্বচ্ছ মানসিকতার সরল প্রতিফলন।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় জার্মান স্বপ্ন গবেষক মনোবিদ ওয়াই. ডিলেজ (Y. Delege)-এর প্রেম আর যৌনস্বপ্ন সংক্রান্ত তত্ত্বের কথা। ডিলেজের সিদ্ধান্ত "যদি প্রেমিকপ্রেমিকার মধ্যে ভালোবাসা খুব গভীর হয়, তবে তাঁরা সাধারণত বিয়ের আগে বা মধুচন্দ্রিমার সময় পর্যন্ত একে অন্যকে নিয়ে যৌনস্বপ্ন দেখেন না। যদি তাঁরা একে অন্যকে নিয়ে যৌনস্বপ্ন দেখেন, তবে বুঝতে হবে তাঁরা একে অন্যের প্রতি ষোলোআনা বিশ্বস্ত নন। হয়তো তৃতীয় কোনও পুরুষ বা নারী এই বিশ্বস্ততার পথে একটা বাধা।" ডিলেজের এই তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

যৌনস্বপ্নে নানা ধরনের প্রতীকের উপস্থিতি স্বপ্নকে জটিল করে তোলে। অনেক সময় এরকম স্বপ্নে কামজ ইচ্ছার উপস্থিতি স্বপ্নটাকে ঠিকভাবে বিশ্লেষণ না করলে ধরা পড়ে না। যৌনস্বপ্নের প্রতীকগুলো সহজে বোঝা যায় না। সাধারণ স্বপ্নের প্রতীকের মতো যৌনস্বপ্নের প্রতীকগুলোর অর্থ খুঁজে পেতে দেশের লোকগাথা, ইতিহাস, মহাকাব্য, প্রচলিত প্রবাদ, বাগ্‌ধারা, সাধারণের মধ্যে চালু অশ্লীল কথাবার্তা, লোকসংগীত—এ সবের সাহায্য নিতে হয়। এই সব প্রতীকের অর্থ অন্য স্বপ্নপ্রতীকের মতো দেশেদেশে যুগেযুগে একই। সময়ের সঙ্গে বা ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে এগুলোর অর্থ বদলায় না।

ঘর বা বাড়ি নারীদেহের প্রতীক। বাড়ির বিভিন্ন অংশ প্রতীকী অর্থে নারীদেহের নানা অংশকে বোঝায়। টোব্যাকো পাইপের মুখে দেবার অংশ বা তুলোওঠা কাপড় (ফার) পুরুষাঙ্গের প্রতীক। সঙ্কীর্ণ এক ফালি জায়গায় চারপাশে অনেক বাড়ি প্রতীকী অর্থে স্ত্রী জননাঙ্গের বাইরের অংশ। যোনি যৌনস্বপ্নে আসতে পারে নরম, পিচ্ছিল, সরু একটা রাস্তা হয়ে যার মধ্যে দিয়ে পুরুষ স্বপ্নদ্রষ্টাকে যেতে হচ্ছে। যৌন প্রতীক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'স্বপ্নে প্রতীক' অধ্যায়ে।

দোলনায়, দোলনাচেয়ারে বা নাগরদোলায় দুলতে দুলতে অনেক সময় যৌন উত্তেজনা অনুভব করেন কিছু মানুষ। একই ব্যাপার ঘটতে পারে সিঁড়ির সিমেন্টের বা কাঠের রেলিং এ বসে বা স্লিপারে বসে দ্রুতলয়ে নামবার সময়। দোলনায় দুলতে দুলতে যৌন উত্তেজনার স্মৃতি চলে আসতে পারে বড় হয়ে যাওয়া মানুষের শূন্যে ওড়ার স্বপ্নে। ওড়ার স্বপ্নের মধ্যে কামভাবের আভাস খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। সিঁড়ির রেলিংএ বসে দ্রুত নামার স্মৃতি চলে আসতে পারে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত ওঠানামার স্বপ্নে। অন্তত দশ জন বিভিন্ন বয়সের স্বপ্নদ্রষ্টা এরকম স্বপ্নের কথা আমাকে জানিয়েছেন। প্রতীকী অর্থে এরকম স্বপ্নের অর্থ যৌনক্রীড়া। এক জন একুশের যুবক জানিয়েছেন, এরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে বীর্যস্খলন হয়ে তাঁর ঘুম ভেঙে যাবার কথা। এরকম স্বপ্নের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনও যৌনতার আভাস বেশিরভাগ সময়

পাওয়া যায় না। প্রতীকী অর্থ বুঝতে পারলে এগুলো অবশ্যই যৌনস্বপ্ন। যুবকের স্বপ্নের পরিণতি তার প্রমাণ।

আমার সংগ্রহে থাকা আরও বহু স্বপ্নেরমধ্যে বিশ্লেষণে যৌনতার বা কামভাবের আভাস রয়েছে। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অপ্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয়। এখানে কিছু কথা বলা দরকার। যে কোনও যৌবনপ্রাপ্ত মানুষের অন্য সব স্বপ্নের মতো যৌনস্বপ্নও জন্ম নেয় অচেতন বা অবচেতন থেকে। যৌন অভ্যাসে বিঘ্ন ঘটলে বা স্বাভাবিক যৌনজীবন ব্যাহত হলে অনেক সময় যৌনস্বপ্ন দেখা বেড়ে যায়। এরকম হয় স্বপ্নদ্রষ্টার মনের স্বাস্থ্য অটুট থাকলে। এর উলটোটা হতে পারে মনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে। এক নারীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের ভালোবাসার সম্পর্ক অপ্রত্যাশিত ভাবে ভেঙে যাওয়ায় আটাশের এক যুবক ভুগতে শুরু করেন তীব্র মানসিক অবসাদে। তারপর থেকে তাঁর স্বপ্নের জগতে যৌনস্বপ্ন স্থান পায়নি এতটুকু। এর সঙ্গে যুবকের তীব্র মানসিক আঘাতের বশে সাময়িকভাবে কামশীতল (Frigid) হয়ে পড়বার সম্পর্ক আছে। এরকম আরও কয়েকজন পুরুষ আর নারীর কথা আমার জানা আছে।

ঔৎসক্যু জাগা স্বাভাবিক, যৌনস্বপ্নের সঙ্গে পেশার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা? থাকলে তা কী ধরনের? কলকাতার এক নিষিদ্ধপল্লীর প্রায় ষাটজন যৌনকর্মীর স্বপ্ন নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে। যে পেশায় মূলধন শরীর, সেখানে আর যাই হোক যৌনতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের চাইতে কিছুটা আলাদা হতে বাধ্য। এই যৌনকর্মীদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলে মনে হয়েছে, এঁদের স্বপ্নের জগতে যৌনস্বপ্ন আসে অন্যদের তুলনায় অনেক কম। যৌনতাকেন্দ্রিক রুটিরুজি এঁদের অবচেতন আর অচেতনের যৌন কামনাগুলোকে প্রভাবিত করে অনেকটাই। মাত্র দুজন যৌনকর্মী এসংক্রান্ত স্বপ্ন বেশি দেখেন বলে জানিয়েছেন।

কিছু মেয়েদের দরজি, খুচরো শাড়ি বিক্রেতা ও মেয়েদের নানা ধরনের অন্তর্বাসের খুচরো বিক্রেতার স্বপ্নে যৌনস্বপ্নের বাহুল্য লক্ষ্য করেছি। এঁরা সবাই পুরুষ। এই সব পেশার মানুষকে নিয়ে আর তাঁদের স্বপ্ন নিয়ে আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান না চালিয়ে এঁদের পেশার সঙ্গে যৌনস্বপ্নের বাহুল্য আদৌ সম্পর্কিত কিনা, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তবে যে ছত্রিশ জন এরকম পেশার মানুষেব স্বপ্ন সংগ্রহ করা গেছে, তাঁরা সমবয়সের অন্য পুরুষদের তুলনায় বেশি যৌনস্বপ্ন দেখেন। পেশাগত কারণে এঁদের নানা ধরনের মহিলার সংস্পর্শে আসতে হয় অবিরত। এটা হয়তো এঁদের স্বপ্নের জগতে যৌনস্বপ্নের আধিক্যর একটা কারণ। এঁদের সামাজিক অবস্থান আর যৌনতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি—এই দুটো ব্যাপার মাথায় রেখে দেখা যাচ্ছে, এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাস্তব জীবনে বহুগামিতায় অভ্যস্ত। আর এটাকেই এঁরা 'স্বাভাবিক যৌনজীবন' বলে মনে করেন।

সুস্থ যৌনবোধ স্বাভাবিক জীবনবোধের অপরিহার্য আর আবশ্যিক একটা অঙ্গ। যৌবন শুরুর বছরগুলোতে যৌনস্বপ্ন মনে যৌন চেতনার বিকাশে সাহায্য করে। অবদমিত কাম এরকম স্বপ্নে চলে এসে কাল্পনিক পূর্ণতা পায় যে কোনও বড় হয়ে যাওয়া মানুষের স্বপ্নে। কিছু যৌনস্বপ্ন অবশ্যই বাস্তব জীবনে সমাজনির্দিষ্ট 'অনৈতিক' পথে পা দেবার ইচ্ছা থেকে মানুষকে সরিয়ে আনে 'নৈতিক' পথে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, যৌনস্বপ্ন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জীবনে অসামাজিক যৌন ইচ্ছার 'সেফটি ভালভ্' হিসাবে কাজ করতে পারে। এরকম স্বপ্ন দেখার পর যৌন পীড়ন (Sexual Tension) কমে আসে। কমে মনের অস্থিরতা। যাতে দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাপনের যোগ্য হয়ে ওঠে এক জন মানুষের অস্থির, অশান্ত মন। যৌনস্বপ্ন দেখাকে সুস্থ মানসিকতার সহায়ক বললে হয়তো খুব একটা ভুল বলা হবে না।

বিশেষ কিছু স্বপ্ন

ঘুম ভাঙাবার স্বপ্ন

ভোরবেলা হয়তো কোথাও যেতে হবে কোনও জরুরি কাজে। দেরি করে ঘুম থেকে উঠতে অভ্যস্ত মানুষ এরকম অবস্থায় কিছু স্বপ্ন দেখতে পারেন। যাতে তার ঘুমটা ভেঙে যায়। একদিক থেকে এরকম স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে প্রয়োজনীয়। এরকম স্বপ্নকে 'ঘুম ভাঙাবার স্বপ্ন' বলা যেতে পারে। স্বপ্নতত্ত্বের ভাষায় 'অ্যারাউসাল ড্রিমস'। 'স্বপ্নের উদ্দীপনা আর উৎস' অধ্যায়ে অ্যালার্ম ঘড়ি সংক্রান্ত যে স্বপ্ন উল্লেখ করেছি সেগুলো এই ধরনের। পাঠক লক্ষ করবেন, ঘড়ির অ্যালার্ম বাজা শুরু হবার সময় থেকে স্বপ্ন দেখে স্বপ্নদ্রষ্টার জেগে ওঠার সময়ের মধ্যে ব্যবধান এক্ষেত্রে খুব কম। তাই এরকম স্বপ্ন ঘড়ির কাঁটা ধরে না হলেও, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। আমার স্ত্রী আমাকে তাঁর এরকম বেশ কয়েকটা স্বপ্নের কথা জানান। দুটো স্বপ্নের কথা এখানে বলব।

ঘড়ির অ্যালার্ম শুনে এক দিন সুপ্তি স্বপ্ন দেখেন, দুধওয়ালা এসে ফ্ল্যাটের সামনের লনে দাঁড়িয়ে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাচ্ছে একটানা। আর মাঝেমধ্যে 'ভাবী, ভাবী, দু-উ-উ-ধ' বলে চিৎকার করছে। এতে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। আর এক দিন ঘড়ির একই আওয়াজ স্বপ্নে তাঁর ছেলের স্কুল বাসের হর্ন হয়ে ঘনঘন বাজতে থাকে। ছেলেকে স্কুল পাঠাতে দেরি হয়ে গেল, এরকম দুশ্চিন্তায় ঘুম ভেঙে যায় ওঁর। ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া ছিল ঠিক ছ'টায়। আর ঘুম ভেঙে হাতঘড়িতে সুপ্তি দেখতে পান, তখন বাজে ছ-টা পাঁচ। এরকম স্বপ্নকে 'ঘুম ভাঙাবার স্বপ্ন' না বলে উপায় নেই।

এরকম স্বপ্ন আসতে পারে আরও নানাভাবে। এক ব্যাঙ্ক-অফিসারকে কর্মসূত্রে রোজ ছ-টার ট্রেন ধরতে হয় হাওড়া স্টেশন থেকে। উঠতে হয় ভোর সাড়ে চারটেয়। একদিন খুব ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছেন। পরদিন এত ভোরে ঘুম ভাঙাটাই অস্বাভাবিক। ভোরে স্বপ্ন দেখলেন, হাওড়া স্টেশনে তিনিও দৌড়ে ঢুকলেন, আর তাঁর ট্রেনটাও স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। টেনশানের মধ্যে ঘুম ভেঙে যায় ভদ্রলোকের, ঘড়িতে তখন চারটে চল্লিশ। এই স্বপ্নকে 'ট্রেন মিস করার স্বপ্ন' হিসাবেব্যাখ্যা করা যায়। তবে ভোরে ঘুম ভাঙবার প্রয়োজনের বিচারে এই স্বপ্ন 'ঘুম ভাঙাবার'।

নৈহাটির তরুণ নাট্যকর্মী দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর এরকম কিছু স্বপ্নের বিবরণ আমাকে জানান। এমনিতে ওঁর ঘুম ভাঙে দেরি করে। কোনও কোনও দিন নাটকের কাজে খুব সকালে বেরোতে হয়। রাতে ঘুমোতে যাবার আগে চিন্তা থাকে, ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙবে কিনা। ভোরে স্বপ্ন দেখে ঠিক সময়ে ঘুম ভেঙে যায়। কখনও স্বপ্নে ট্রেন চলে যায়। কখনও তাঁকে ফেলে সবাই চলে যায়। অনেক সময় দেখেন, ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পেরে জরুরি কাজটা গেল পণ্ড হয়ে। উদ্বেগে ঘুম ভেঙে উঠে দেখতে পান ঠিক সময়ে জেগে গেছেন। তৈরি হয়ে বেরোবার মতো যথেষ্ট সময় হাতে আছে। ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছোতে না পারার জন্য অ্যাটেনডেন্স খাতায় লাল দাগ পড়ে গেছে। এরকম স্বপ্ন দেখে বহুবার ঘুম ভেঙেছে বারাসতের এক কর্মীর। আর প্রত্যেকবারই ঘুম ভেঙেছে মোটামুটি ঠিক সময়ে।

এরকম স্বপ্নের আরও বহু দৃষ্টান্ত আমার কাছে রয়েছে। এই স্বপ্নগুলো স্বপ্নের দর্শকের কাছে 'প্রয়োজনীয় স্বপ্ন'। কেননা এরকম স্বপ্ন না দেখলে ঠিক সময়ে জেগে উঠতে না পেরে জরুরি কোনও কাজ পণ্ড হয়ে যেতে পারে। সবাই এরকম স্বপ্ন দেখেন বা দেখবেন, তা নয়। কেউ কেউ দেখেন। কিছু মনোবিদ এই ধরনের স্বপ্নকে 'কার্যকরী স্বপ্ন' বা `Dreams of utilitarian purpose' বলে চিহ্নিত করেছেন।

আর একটু ঘুমোবার স্বপ্ন

এরকম স্বপ্ন ঘুম ভাঙাবার স্বপ্নের ঠিক উলটো। স্বপ্নের দর্শকের পক্ষে ঘুম ভাঙা প্রয়োজন। কেননা তার কোনও জরুরি কাজ রয়েছে। অন্যদিকে ক্লান্ত শরীর চাইছে আর একটু ঘুমোতে। এই অবস্থায় স্বপ্নদ্রষ্টা দেখতে পারেন, যে কাজে তাঁর যাবার কথা, স্বপ্নের মধ্যে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই যেন সেই কাজটা করে যাচ্ছেন। এরকম স্বপ্নকে 'আর একটু ঘুমোবার স্বপ্ন' বলা যায়। কেননা, জরুরি কাজে ঘুম ভাঙার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে, এই স্বপ্নের সাহায্যে বিনা উদ্বেগে কোনও মানুষ নিশ্চিন্তে আরও কিছুটা সময় ঘুমিয়ে নিতে পারেন।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর রচনাবলীতে নিজের চিকিৎসক জীবনের এরকম বেশ একধরনের মজার স্বপ্নের কথা লিখেছেন। আর একটু ঘুমোতে ঘুমোতে সিগমুন্ড প্রায়ই দেখতেন, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছেন। বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখহাত ধুচ্ছেন। তৈরি হচ্ছেন হাসপাতালে যাবার জন্য। ছাত্রজীবনে হস্টেলের বিছানায় ঘুমোতে ঘুমোতে, তৈরি হয়ে কলেজে গিয়ে সকালের ক্লাস করছেন, এরকম স্বপ্ন দেখতেন আমার বেশ কয়েকজন মেডিকেল কলেজের সহপাঠী। আমি নিজেওবেশ কয়েকবার সকালের মেডিসিন, সার্জারি বা স্ত্রীরোগের ক্লাস করেছি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, স্বপ্নে! বেশি রাত পর্যন্ত পড়াশোনা বা অন্য কাজ করবার অভ্যাস থাকায় সকালে উঠে ওই ক্লাসগুলো করা আর বাকি ঘুমটুকু ঘুমোনো, এই দুই প্রয়োজনের দ্বন্দ্বে তৈরি হত এই স্বপ্নগুলো।

এরকম স্বপ্নের কিছু বিশেষ দিক রয়েছে। অন্য সব স্বপ্নের মতো, এই স্বপ্নগুলো সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয় না। অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে এরকম স্বপ্ন দেখা। এধরনের স্বপ্ন দেখা মানুষের ঘুম ভাঙার সময় আর যে সময়ে তার ওঠা দরকার ছিল—এই দুয়ের সময়ের ফারাকটা লক্ষ করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ছাত্রজীবনে আমি বেশ কয়েকবার প্রায় এক ঘণ্টা সময় ধরে এরকম স্বপ্ন দেখেছি।

এক কম বয়সী চিকিৎসক ভাড়া থাকেন এক বয়স্কা ভদ্রমহিলার বাড়িতে। একদিন ঘুমোতে ঘুমোতে হাসপাতালে যাবার সময় গেল পেরিয়ে। চিকিৎসক স্বপ্ন দেখছেন, তিনি যেন একটা বেডে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার কাছে ঝোলানো একটা 'বেডহেড-টিকিট'। অর্থাৎ, তিনি হাসপাতালেই রয়েছেন। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের এর তরুণ সহকর্মীর এই স্বপ্নের কথা ফ্রয়েড তার লেখায় উল্লেখ করেছেন।

সাত বছরের সাধিত্র পড়ে ক্লাস টু-তে। সকালে ঘুম ভেঙে স্কুলে যেতে খুব কষ্ট হয় ওর। ইচ্ছে করে, আরও একটু ঘুমোতে। একদিন কোনও কারণে ঘড়ির অ্যালার্ম ঠিক সময়ে না বাজায় ওর মায়ের ঘুমও ভাঙেনি। আধঘণ্টা বাদে ঘুম ভেঙে সাধিত্র জানায়, সে এতক্ষণ সিকিমের রাস্তায় বেড়াচ্ছিল। আগের পুজোর ছুটিতে মা-বাবার সঙ্গে দক্ষিণ সিকিম বেড়াতে গিয়েছিল সাধিত্র। স্বপ্ন দেখল, ঘুম ভেঙে মা-বাবার সঙ্গে সানরাইজ পয়েন্টের রাস্তায় হাঁটছে। প্রথম সূর্যের আলোয় কাঞ্চনঝঙ্ঘা আর পান্ডিম পর্বতশ্রেণীর চোখ জুড়োনো রূপ দেখছে। ওকে একটা ছবি তুলতে দেবার জন্য বাবার কাছে বায়না ধরেছে। সিকিমের রাবংলায় থাকবার সময় সকালে ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে হাঁটতে যে ব্যাপারগুলো ঘটত, হুবহু না হলেও তার অনেকটাই চলে এসেছে ওর স্বপ্নে। এরকম স্বপ্নের প্রয়োজন আর নতুন করে বলবার কিছু নেই। বাচ্চার এরকম স্বপ্ন দেখবার উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হল আর একটু নিশ্চিন্ত ঘুম।

এরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্নের দর্শকের মনে ঘটতে থাকা ঘটনাগুলো সম্পর্কে কোনও সংশয় বা অবিশ্বাস দেখা দেয় না। চিকিৎসক দেখেন, তিনি হাসপাতালে কাজ করছেন। ছাত্র দেখে, সে মন দিয়ে ক্লাস করছে। বাচ্চা দেখে, সে বাবা-মায়ের সঙ্গে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই এরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোনও দ্বিধা বা অবিশ্বাস তৈরি হয় না স্বপ্নের দর্শকের মনে। এর উদ্দেশ্য একটাই। নিশ্চিন্তে আর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া। স্বপ্ন যে অনেক সময় ঘুমের সহায়ক হয়ে ওঠে, এরকম স্বপ্নগুলো তার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

ধৈর্য ধরে রাখতে না পারার স্বপ্ন

ইংরেজিতে এরকম স্বপ্ন হল, 'ড্রিমস অব ইমপেসেন্স'। এরকম স্বপ্নের কথা বহু মানুষ আমাকে জানিয়েছেন। 'বাচ্চাদের স্বপ্ন' অধ্যায়ে এরকম স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করেছি। ক্লাস ফাইভের ছাত্রী টুপুরের এরকম দুটো স্বপ্নের কথাও বলেছি। এরকম আর বেশ কিছু স্বপ্ন আমার ঝুলিতে আছে।

বাবা-মায়ের সঙ্গে গ্যাংটক বেড়াতে যাবার কথা দশ বছরের এক মেয়ের। মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা, কখন গিয়ে পৌঁছোবে সেই স্বপ্নের দেশে। এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারল না মেয়েটা। স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে বেড়াল স্বপ্নের দেশ গ্যাংটককে। মনের আনন্দে, বাবার হাত ধরে সারা রাত ধরে খুশির হাটে স্বপ্নের ভ্রমণ! পরীক্ষায় প্রত্যেকবার সেকেন্ড হয় ক্লাস সেভেনের নবনীতা। সেবার পরীক্ষা দিয়েছে খুব ভালো। মনে আশা, এবার ও ফার্স্ট হবেই। তার জন্য তো অপেক্ষা করতে হবে রেজাল্ট বার হবার দিনটা পর্যন্ত। অতদিন ধৈর্য ধরে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াল ১২ বছরের নবনীতার পক্ষে। রেজাল্ট বেরোবার দিন সাতেক আগে নবনীতা স্বপ্ন দেখল, রেজাল্ট বেরিয়েছে। আর ফার্স্ট হবার জন্য ক্লাস-টিচার অভিনন্দন জানাচ্ছেন ওকে।

প্রেসিডেন্সিতে অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে হায়ার সেকেন্ডারিতে ভালো নম্বর পাওয়া রিয়া মিত্র জানত, ও অবশ্যই চান্স পাবে। প্রেসিডেন্সি কলেজ ওকে টানে অনেক দিন থেকে। টেস্টের রেজাল্ট বার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি রিয়ার মন। একরাতে স্বপ্ন দেখল, সে তার আগের স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়ে গেছে। কলেজের সবুজ লনে পা ছড়িয়ে বসে আড্ডা মারছে সবাই মিলে। হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে নজর পড়তেই কলেজ বাড়ির দিকে ছুটল সবাই—তখনই যে একটা ক্লাস শুরু হবে! সরল ইচ্ছাপূরণের এই স্বপ্নকে 'ড্রিম অব ইমপেসেন্স' তো বলা যেতেই পারে।

২৪ বছরের এক খেলাপাগল ব্যাঙ্ককর্মী উজ্জ্বল সাহা আমাকে জানান, তিনি বিশেষ করে খেলা নিয়ে এরকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখেন। হয়তো ভারতের সঙ্গে দুদিন বাদে কোনও একটা দেশের কোনও একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ রয়েছে। দুদিন আগে স্বপ্নে দেখে ফেললেন খেলাটা। পরীক্ষা নিয়েও বহুবার এরকম স্বপ্ন দেখেছেন এই যুবক।

বড়দের স্বপ্নেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যখন তখন। বিশেষ করে বেড়াতে যাবার আগে। বা সামনে কোনও আনন্দের উৎসব থাকলে। নাটকের রিহার্সাল চলবার সময় সেই নাটক মঞ্চস্থ হবার স্বপ্ন বেশ কয়েকবার দেখেছেন নাট্যকর্মী ফটিক পুরকাইত। ১৮৬২ সালে অমরনাথ বেড়াতে যাবার আগে অমরনাথের পথে ভ্রমণের স্বপ্ন দেখেছিলেন গৃহবধূ প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুজোর দিন তিনেক আগে মণ্ডপ থেকে মণ্ডপে ঘুরে বেড়িয়েছেন ২৮ বছরের সৌরভ সান্যাল। সান্দাকফু ট্রেক করতে বেরোবার আগের রাতে সারা রাত সান্দাকফুর পথে রুক্স্যাক কাঁধে হেঁটেছেন চৌত্রিশ বছরের অরিত্র বসু। বাস্তব অভিযানের আগেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে সৌরভ আর অরিত্রর। স্বপ্নের এরকম সফর 'ধৈর্য হারাবার স্বপ্ন'। বেড়াতে যাবার ঠিক আগে স্বপ্নে বেড়াতে চলে যাবার ঘটনার কথা জানিয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন।

বড়দের এই ধরনের স্বপ্ন সব সময় এত সহজ সরল ভাবে আসে না। এক অস্ট্রিয়ান মহিলার এরকম স্বপ্নের বিবরণ শুনলে, এরকম স্বপ্ন কত জটিলভাবে আসতে পারে তা বোঝা যায়। মহিলা এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর দিদির ছোট ছেলেটা মারা গেছে। আর তার শবদেহ শোয়ানো রয়েছে কালো কফিনে। এরকম স্বপ্ন দেখবার পর মহিলা ছুটে এলেন মনোবিদের কাছে। বিশ্লেষণে দেখা গেল, দিদির বড় ছেলের মারা যাবার স্মৃতি থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। সেই সময় দিদির বাড়িতে স্বপ্নদ্রষ্টার দেখা হয়েছিল তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে। এই স্বপ্ন দেখবার আগে, বেশ কিছু দিন দু জনের দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। কয়েকদিন বাদে একটা কনসার্টে দেখা হবার কথা ছিল ওঁদের। ধৈর্য হারিয়ে তখনই প্রেমিককে দেখার সুপ্ত বাসনা থেকে দিদির বড় ছেলের মারা যাবার স্মৃতি চলে এসেছে বিরহকাতর মহিলার স্বপ্নে। ধৈর্যচ্যুতির স্বপ্ন এরকম জটিল ভাবে অনেকেই দেখেন। বিশ্লেষণ না করলে স্বপ্নের অর্থ বোঝা যায় না সব সময়। বলা যায় না এগুলো আসলে ধৈর্য হারানোর স্বপ্ন।

বহু যুবক ও বয়স্ক মানুষের যৌনস্বপ্নকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন দেখছি না। ধৈর্য হারাবার স্বপ্নের আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। রোগিণী ব্রততী রায়চৌধুরী

একদিন গেলেন একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের চেম্বারে। জানতে পারলেন, তিনি মা হতে চলেছেন। বাচ্চার জন্মের তখনও মাস আটেক বাকি। এত ধৈর্য সহ্য হল না ব্রততীর। রাতে স্বপ্ন দেখলেন, নরম তুলতুলে, ফুলের মতো সুন্দর একটা মেয়ে হয়েছে। আর সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন।

ধৈর্য হারাবার স্বপ্ন বাচ্চারা দেখে বেশি। বাচ্চাদের মানসিক গঠনে সহজেই অধৈর্য হয়ে পড়বার প্রবণতা এর একটা কারণ। আর একটা সম্ভাব্য কারণ, বাচ্চারা সহজ সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখে বেশি। বড়রা অনেকেই সরাসরি এরকম স্বপ্ন এক-আধবার দেখেন। এটা নির্ভর করে আসন্ন ঘটনা বা ভ্রমণের জন্য তার মনের আগ্রহ কতটা তীব্র তার ওপর। তবে বড় হয়ে এরকম ধৈর্য হারাবার স্বপ্ন বারবার দেখতে থাকলে তা থেকে স্বপ্নের দর্শকের মানসিকতার একটা নির্দিষ্ট প্রবণতাকে ধরে ফেলা যায় বলে আমার ধারণা। আমার গবেষণায় যে তিনজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এরকম স্বপ্ন ঘনঘন দেখেন, তাঁরা প্রত্যেকেই খুব বেশিমাত্রায় ছটফটে আর অসহিষ্ণু স্বভাবের। এঁদের মনের গঠনগত এই বিশেষ দিক এঁদের স্বপ্নেও চলে আসে।

আশ্বাস দেবার স্বপ্ন

'পরীক্ষার স্বপ্ন' আলোচনার সময় এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যে কোনও পরীক্ষার স্বপ্নই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'ড্রিম অব অ্যাসিওরেন্স' বা আশ্বাস দেবার স্বপ্ন। পরীক্ষার স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মনকে আশ্বাস দেয়, 'তুমি বৃথাই চিন্তা করছ। আগের মতো তুমি এবারও সমস্যার সমাধান করতে পারবে।' তবে এই স্বপ্নের সঠিক অর্থ জানা না থাকলে স্বপ্নের দর্শকের কাছে জেগে উঠে স্বপ্নের এরকম আশ্বাস পরিষ্কার হয় না। একই কথা বলা যায় বাস, ট্রেন বা প্লেন মিস করার স্বপ্ন সম্পর্কে। স্বপ্নের এরকম যাত্রা মৃত্যুর প্রতীক। এটা না জানলে ট্রেন বা প্লেন মিস করবার স্বপ্নের অর্থ বুঝে ওঠা কঠিন। এরকম স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার অচেতন মনে থাকা ঘুমের ভেতর মারা যাবার ভয় দূর করতে চায়। মনকে আশ্বস্ত করতে চায়, তুমি বেঁচে থাকবে, মরে যাবে না। এরকম আশ্বাসদায়ক স্বপ্ন দেখেন অনেকেই। বিশেষ, করে পরীক্ষার স্বপ্ন। নিজে মারা যাবার স্বপ্নকেও এই পর্যায়ে রাখা যেতে পারে। পরে এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

মুশকিল আসানের স্বপ্ন

এরকম স্বপ্নে কোনও বিশেষ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় সহজেই। এগুলো, তাই 'সল্যুশান ড্রিমস' বা সমাধানের স্বপ্ন। এই বইতে এরকম অনেক স্বপ্নের উল্লেখ বিভিন্ন অধ্যায়ে করা হয়েছে। ঘুমের ভেতর হয়তো তেষ্টা পেল আপনার। স্বপ্ন দেখলেন গ্লাসের পর গ্লাস সরবত খাচ্ছেন। বা রাতে না খেয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় খিদে পেল। স্বপ্নে পেট ভরে মাংসভাত খেলেন। প্রচণ্ড গরমে স্বপ্নের লেকে সাঁতার কাটলেন অনেকক্ষণ ধরে। এ সবই মুশকিল আসানের স্বপ্ন। টাকার অভাবে জর্জরিত মানুষ স্বপ্নে পেয়ে গেলেন কয়েক লক্ষ টাকা। সাময়িক হলেও, এরকম স্বপ্নও তো মুশকিল আসানের।

এবার বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন পেশার মানুষের বিচিত্র কিছু সমাধানের স্বপ্নের কথা বলি:

স্বপ্ন ১: আমি সমুদ্রের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—একটা হাঙর আমাকে খেতে আসছে—(আমি ওর মুখে একটা ফাইল ঢুকিয়ে দিলাম), হাঙরটা ছুটে পালাচ্ছে।

—সৃষ্টি, ৭ বছর।

স্বপ্ন ২: দেখলাম একটা ভূত আমাকে তাড়া করেছে—সামনেই একটা ছুরি পড়ে ছিল, (তার ওপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে ভূতটার পা কেটে গেল)—ভূতটা ভয়ে দৌড়ে পালাল।

—ঋজু, ১০ বছর।

স্বপ্ন ৩: স্কুল জীবনে এই স্বপ্নটা কয়েকবার দেখেছি। স্কুল বাসের দরজার বাইরে ঝুলতে ঝুলতে স্কুলে যাচ্ছি—স্কুলের গেট এসে গেছে, গেটের মাপটা এমন যে বাসটা টায়টায় ঢুকতে পারে, ওই অবস্থায় ঝুলতে ঝুলতে গেলে পিলারে থেঁতলে যাব—আমি দরজা ছেড়ে ওপরে উঠে উড়তে শুরু করে দিলাম, স্কুল মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি।

—উজ্জ্বল চক্রবর্তী, শিল্পী।

স্বপ্ন ৪: পরীক্ষা শুরু হতে আর সামান্য সময় বাকি, হেঁটে এত তাড়াতাড়ি হল-এ পৌঁছনো যাবে না—আমি দুটো ধাতব পাখা কাঁধের দুপাশে লাগিয়ে উড়তে শুরু করলাম—ল্যান্ড করলাম স্কুলের ছাদে—ছাদ ফুটো করে ঢুকে গেলাম হলে।

—অভীক ভট্টাচার্য, সাংবাদিক।

স্বপ্ন ৫: কয়েকটা লোক আমাকে নির্জন রাস্তায় তাড়া করেছে—ওরা প্রায় আমাকে ধরে ফেলেছে, এমন সময় হঠাৎ ওপরের দিকে উঠতে শুরু করে দিলাম—চলে গেলাম ওদের নাগালের বাইরে।

—কৃষ্ণা আইচ, শিক্ষিকা।

স্বপ্ন ৬: আমি কোথাও যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি সামনে একটা বিশাল চেহারার লোক পথ আগলে দাঁড়িয়ে—আমি খুব ছোট হয়ে লোকটার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গেলাম। ওর সামনে গিয়ে আবার আগের মতো লম্বা হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

—ড. অনুপম গোস্বামী, চিকিৎসক।

এই স্বপ্নগুলোতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে স্বপ্নে, সমস্যার সমাধানও হচ্ছে স্বপ্নেই।

এমন অনেক সমাধানের স্বপ্ন রয়েছে যেখানে বাস্তবেব সমস্যার সমাধান ঘটছে স্বপ্নে। এক শিশু চিকিৎসক পেশাগত কারণে এদেশের সরকারি চাকরি ছাড়তে চাইছেন। পারছেন না, ভাল অন্য একটা চাকরি না পাবার জন্য। বাস্তবের এই কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এক রাতে দেখা স্বপ্নে। স্বপ্নে ইতালির একটা বড় হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ দেবার অবিশ্বাস্য একটা অফার পেয়ে যান মধ্যচল্লিশের এই চিকিৎসক। কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত আমাকে তাঁর একটা মুশকিল আসানের স্বপ্নের কথা জানান। এই স্বপ্ন '৯৬র জুলাইতে দেখা। আগের দিন মল্লিকা আর ওঁর স্বামী আলোচনা করছিলেন ফ্ল্যাট কেনা নিয়ে। 'আট-দশ বছর হয়ে গেল দাম্পত্যের, এখনও একটা ফ্ল্যাট কেনা হল না আমাদের'। সমস্যার সমাধান ঘটল স্বপ্নে। মল্লিকা রাতে স্বপ্ন দেখলেন, 'বন্ধু বলছে, তুমি তো একটা সাহিত্য পুরস্কার পেয়ে গেছ—এবার অনেক টাকা পাবে, এবার তোমাদের ফ্ল্যাট কেনা হয়ে যাবে'।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে এপার বাংলায় দাদার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন মিলন দে। একমাস থাকবার ভিসা নিয়ে। এক রাতে চোর এসে ঘরের জানলায় আঁকশি গলিয়ে ওঁর জামাটা বাইরে টেনে নেয়। জামাটার সঙ্গে অনেক টাকা চলে যায় চোরের পকেটে। এতগুলো টাকা হারিয়ে বিপদে পড়ে যান মিলন। কীভাবে চলবে এতগুলো দিন। মুশকিল আসান হয়ে ফিরে আসে সেই চোর। বাস্তবে নয় স্বপ্নে। পা ধরে ক্ষমা চেয়ে চোর এসে গোটা টাকাটাই ফিরিয়ে দেয় মিলনকে। কত সহজে বাস্তবের জটিল একটা সমস্যার অবিশ্বাস্য সমাধান ঘটে গেল স্বপ্নে।

আরও বহু সমাধানের স্বপ্নের কথা অনেক মানুষ আমাকে জানিয়েছেন। বেশ কয়েকজন লেখক জানিয়েছেন, গল্প লিখতে লিখতে একটা অবস্থায় গিয়ে, রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সূত্র খুঁজে পাওয়ার কথা। এক তরুণ কবি জানিয়েছেন, তার প্রথম কবিতার বই বার হওয়া নিয়ে দেখা একটা সমাধানের স্বপ্নের কথা। কবির প্রথম কবিতার বই বার হবে কোনও বড় প্রকাশকের 'ঘর' থেকে, এই কবির ইচ্ছা। বাস্তবে ব্যপারাটা বেশ কঠিন। এই অবস্থায় একরাতে স্বপ্নে পেয়ে গেলেন বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা 'আনন্দ'র কর্ণধারের চিঠি। কবির কবিতার বই ওঁরাই ছাপবেন। কবি যেন বইয়ের পাণ্ডুলিপিসহ দ্রুত দেখা করেন ওঁদের অফিসে। আরও বেশ কয়েকজন কম বয়েসী কবি তাঁদের নানা ধরনের মুশকিল আসানের স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন।

তরুণ স্থপতি বিজন চৌধুরীর কাছ থেকে বেশ কিছু সমাধানের স্বপ্নের কথা জানা গেছে। এর ভেতর থেকে দুটো স্বপ্ন এখানে উল্লেখ করব

স্বপ্ন ১: ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশান আমার একদম ভাল লাগে না। এটা ছাত্রজীবনের স্বপ্ন। ক্লাসে 'আর্কিটেকচারাল ম্যাথস'-এর একটা সমস্যার কিছুতেই সমাধান হয়নি। ব্যাপারটা কেন হচ্ছে না এই নিয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্ন দেখলাম, ওই ক্যালকুলেশানটার প্রথম আর শেষ অংশ বারবার ঘুরে ফিরে আসছে আমার সামনে, মাঝের অংশটা দেখতে পাচ্ছি না। পরদিন ঘুম ভেঙে সমস্যাটা নিয়ে বসতেই সমাধান হয়ে গেল।

স্বপ্ন ২: একবার বাড়িতে একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার ওপর দশটা ফ্ল্যাটের ডিজাইন করছি—তিন চার দিন চেষ্টা করেও কিছুতেই ড্রইংটা হচ্ছে না, অথচ ক্যালকুলেশানে ঠিক আসছে—ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম ড্রইং-এ সামান্য রদবদল করে ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে—হঠাৎ কীসের একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল—উঠে বসে ডিজাইনটা নিয়ে বসতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল—অথচ তিনদিন ধরে চেষ্টা করেও প্রব্লেমটা মিটছিল না।

প্রথম স্বপ্নে সরাসরি সমাধান খুঁজে পাননি বিজন। তবে স্বপ্নের প্রভাবে সমস্যার সমাধান হয়েছে বাস্তবে। দ্বিতীয় স্বপ্নে কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে সরাসরি স্বপ্নে। এই দুটো স্বপ্নকেই তাই 'সল্যুশান ড্রিম' বলা যায়।

বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে স্বপ্নের প্রভাবের কথা হয়তো অনেকেই জানেন। অনেক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের সমস্যার সমাধান হয়েছে স্বপ্নে। রসায়নবিদ কেকিউল (Kekule)-এর 'বেঞ্জিন রিং'-এর গঠন আবিষ্কারের সমস্যার শেষ সমাধান হয়েছিল রাতে ঘুমিয়ে দেখা এক স্বপ্নে। পৃথিবীতে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে, নতুন তত্ত্ব এসেছে, নতুন থিওরি তৈরি হয়েছে এরকম নানা ধরনের সমাধানের স্বপ্নের প্রভাবে। ওয়াটসন আর ক্রিক্ এর ডি. এন. এ.-র গঠন আবিষ্কারে স্বপ্নের ভূমিকার কথা তো অনেকে জানেন। কোপেনহেগেনের নীলস বোর ইনস্টিটিউটের প্রখ্যাত পদার্থবিদ আইজেনবার্গের নতুন গাণিতিক ধারণা (Mathematical Concept) 'ম্যাট্রিক্স' আবিষ্কারের পেছনেও স্বপ্নের ছিল পরোক্ষ ভূমিকা। আশ্চর্যপ্রতিভা ভারতীয় গণিতজ্ঞ রামানুজম নিজেই বলতেন, স্বপ্নে তিনি বহু গাণিতিক সূত্রের সমাধান খুঁজে পান। ঘুম ভেঙে উঠে রামানুজন ওই সব সমাধানসূত্র দ্রুত লিখে ফেলতেন। তাঁর জীবনে জ্যামিতি ও বীজগণিতের বহু মৌলিক সূত্রের আবিষ্কার হয়েছে সমাধানের স্বপ্নে।

এক শিশুর দেখা মুশকিল আসানের একটা স্বপ্নের কথা বলি। বাচ্চাটা এখন অনেক বড় হয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্র। তাঁর স্মৃতিতে আজও স্বপ্নটা বেঁচে আছে। স্বপ্নে বাচ্চাটার দিকে তাড়া করে আসছে একদল ভূত। ছেলেটাকে বন্দি করে ওরা নিয়ে চলল ভূতের দেশে। ভূতের রাজার দরবারে। ভূতের রাজা বসে আছে সিংহাসনে। সামনে প্রহরীবেষ্টিত বন্দী শিশু। বিচারে প্রাণদণ্ড হল বন্দীর। ঠিক হল, ওকে শূলে চড়ানো হবে। স্বপ্নের সমস্যা মারাত্মক। স্বপ্নের দর্শক এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবে কী করে? স্বপ্নে মুশকিল আসান হল সহজেই। ভূতের দেশের রাজকন্যা এল ছেলেটার কাছে। ছেলেটাকে ওর খেলার সঙ্গী করতে চাইল। দুজনে খেলতে শুরু করল ওরা।

আট বছরের একটা বাচ্চা আমাকে তার দেখা মজার একটা স্বপ্নের কথা জানায়। রাতে শুতে যাবার আগে ঠাণ্ডা লেগে গলাব্যথা হয়ে খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর। স্বপ্ন দেখল, জুনিয়র পি. সি. সরকার ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। মঞ্চে রয়েছে স্বপ্নের দর্শক। জাদুকর জাদুবলে ওকে কেটে তিন টুকরো করে ফেললেন। তারপর 'গলাটা বাদ দিয়ে' ওকে জুড়ে দিলেন। গলা নেই, অথচ কথা বলতে পারছে স্বপ্নের দর্শক শিশু! এই স্বপ্নে শিশুমনের বিচিত্র ইচ্ছাপূরণের ইঙ্গিত মেলে সহজেই। বছর দুয়েক আগে স্কুলের এক অনুষ্ঠানে এক জাদুকরের দেখানো ম্যাজিক আর একটা বাচ্চাদের ম্যাগাজিনে দেখা পি. সি. সরকারের মানুষ কেটে জোড়া লাগাবার ছবি থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। স্বপ্নটাতে ইচ্ছাপূরণের পাশাপাশি সমাধান হচ্ছে একটা বাস্তব সমস্যার। তা হল স্বপ্নের দর্শক কষ্টকর গলাব্যথার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে পি.সি. সরকার ওর শরীর থেকে গলাটা বাদ দিয়ে জুড়ে দেওয়ায়। এই স্বপ্ন একদিক থেকে তাই মুশকিল

আসানের স্বপ্ন।

ছয় বছর বয়সের এক শিশু জানিয়েছে বিচিত্র এক সমাধানের স্বপ্নের কথা। একদিন সন্ধেবেলা ওর খুব ইচ্ছে হয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সুভাষগ্রামে ওর মাসির বাড়ি যেতে। অনেক দূরের পথ। তখন বেরোলে যাওয়া অসম্ভব। সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ওই রাতের স্বপ্নে। একটা ছোট্ট প্লেনে চেপে ও যেন কোথায় যাচ্ছে। প্লেন চালাচ্ছেন ওর বাবা। একটা জায়গায় প্লেন খারাপ হয়ে 'পাক খেতে খেতে নীচে নেমে যায়'। মাটিতে নেমে ওরা বুঝতে পারে জায়গাটা একটা ধানক্ষেত। অঞ্চলের নাম সুভাষগ্রাম।

মুশকিল আসানের স্বপ্ন শেষ করব বাংলাদেশের এক অধ্যাপকের স্বপ্ন দিয়ে। ভদ্রলোকের নাম নারায়ণ সাহা। থাকেন বাংলাদেশের বরিশালে। যতবার ভারতে এসেছেন প্রায় প্রত্যেকবারই সীমান্তে পাসপোর্ট-ভিসা সংক্রান্ত ব্যাপারে নানা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে ভদ্রলোককে। সাতানব্বইর জানুয়ারিতে সস্ত্রীক এসেছিলেন কলকাতায়। অসুস্থ হওয়ায় বাড়াতে হল ভিসার মেয়াদ। ফেরার আগের রাতে স্বপ্নে সীমান্ত পার হয়ে গেলেন অবলীলায়। কোনও চেকিং ছাড়াই। এই স্বপ্নকে দেশে ফেরার ধৈর্য হারাবার স্বপ্নও বলা যেতে পারে।

গপ্পো খোঁজার স্বপ্ন

সৃজনশীল কবি আর গদ্যকারদের এরকম বহু স্বপ্নের খোঁজ পাওয়া যায় তাদের দেখা স্বপ্নের বিবরণ ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখলে। গল্পকারদের দেখা এরকম স্বপ্ন প্রয়োজনীয়। কেননা এগুলো তাঁদের গল্পের বা কাহিনীর প্লটের খোঁজ দিতে পারে। একজন গদ্যকার স্বপ্নে পাওয়া এরকম প্লট বা ঘটনা স্বপ্নে ব্যবহার করবেন কিনা, সেই প্রশ্ন আলাদা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও আরও বহু গদ্যকারের স্বপ্নের মধ্যে আমি এরকম স্বপ্ন খুঁজে পেয়েছি। এগুলোকে 'প্লট-সিকিং-ড্রিমস' বা 'গপ্পো খোঁজার স্বপ্ন' বলা যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন, তাঁর দেখা নানা স্বপ্ন তিনি তাঁর নানা গল্পে বা উপন্যাসে ব্যবহার করেন ঠিকই। তবু এই স্বপ্নগুলোকে 'গল্প খোঁজার স্বপ্ন' বলা যায় কিনা তা নিয়ে ওঁর মনে সন্দেহ আছে। লেখিকা বাণী বসু অবশ্য এরকম স্বপ্নকে 'প্লট সিকিং' হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভাবনা একটু অন্যরকম। শীর্ষেন্দু কয়েকবার স্বপ্নে গল্পের প্লট পেয়েছেন। পরে জেগে উঠে ঘুম ভেঙে দেখেছেন, প্লটটা গল্প তৈরির ঠিক উপযুক্ত নয়। তাতে যুক্তির পারম্পর্য থাকে না। প্রায় একই কথা বলেছেন আরও কয়েকজন গদ্যকার।

এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। স্বপ্নে পাওয়া গল্পের প্লট স্বপ্নকল্পনার জোরে উদ্দাম, যুক্তিহীন। বাস্তবের ভাষায় তাকে লিপিবদ্ধ করা হয়তো কঠিন। এরকম স্বপ্নকে আমি 'প্লট সিকিং' বলছি না। 'গল্প খোঁজার স্বপ্ন' গদ্যকারদের দেখা এমন কিছু স্বপ্ন যে স্বপ্নগুলোকে একটু অদলবদল করে অনায়াসে স্বপ্নদ্রষ্টা নিয়ে আসতে পারেন তাঁর লেখা গল্পে।

স্বপ্নকল্পনা অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের এরকম বেশ কিছু স্বপ্নের উল্লেখ করেছি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অচেনা স্টেশনে নেমে পড়বার স্বপ্নের (এই পর্যায়ের স্বপ্ন ২ দেখুন) কথাই ধরা যাক। এই স্বপ্ন সুনীল ব্যবহার করেছেন তাঁর 'আমিই সে' উপন্যাসে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধায়ের 'রত্নখচিত রথের স্বপ্ন' বা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাঘের সবজি খাওয়ার স্বপ্ন'কে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'অদ্ভুত স্বপ্নের বাড়ি'কে রাখা যায় এই স্বপ্নের পর্যায়ে। এছাড়াও লেখকদের দেখা আরও বহু স্বপ্নকে 'গল্প খোঁজার স্বপ্ন' বলা যায়। এগুলোর ভেতর থেকে নির্বাচিত কিছু স্বপ্নের কথা এখানে উল্লেখ করছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে সব স্বপ্নের বিবরণ কবির লেখায় বা চিঠিপত্রে পাওয়া যায় তার মধ্যে বেশ কয়েকটা স্বপ্নকে 'গল্প খোঁজার স্বপ্ন' বলা যেতে পারে। এখানে একটা স্বপ্নবিবরণ উল্লেখ করব। এই স্বপ্ন কবি দেখেন ১৮৯২ সালের ২ জুলাই রাতে। পরদিন ইন্দিরাদেবীকে লেখা চিঠি থেকে এই স্বপ্ন তুলে দিচ্ছি।

স্বপ্ন ১: *'কাল রাত্তিরে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথাও এক জায়গায় লেফটেনেন্ট গভর্নর এসেছে এবং তার অভ্যর্থনা উপলক্ষে উৎসব হচ্ছে। অন্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। আমি বাইরে থেকে সমস্ত শুনতে পাচ্ছি। গাইয়েটা একটা বড়রকম ইমনকল্যাণ গান গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে তারপর তৃতীয়বারের বার নিরাশ হয়ে তার কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ তার সুরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল—সবাই মনে করছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) 'আহা আহা' করে উঠলেন, একজন প্রকৃত আর্টিস্টের মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন।—বাইরে থেকে তার এই আন্তরিক শোকের সুর শুনে আমারও ভারী কষ্ট হতে লাগল—পাছে শ্রোতাদের মধ্যে এমন ঢের লোক থাকে যারা এই গায়কের হঠাৎ এই শোকোচ্ছ্বাস ভারী অদ্ভুত বলে মনে করে, এর যথার্থ মর্মটুকু না বুঝতে পেরে লোকটার উপর আধা বিরক্তি আধা পরিহাস প্রকাশ করে, আমার ইচ্ছা করছিল তাকে আড়াল করে রাখতে। তার পরে নানা অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হল এবং বাংলা মুলুকের লেফটেনেন্টে গভর্নর যে কোথায় উড়ে গেল, তার কিছুই মনে নেই...'*

—রবীন্দ্রনাথ।

এই স্বপ্নকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন তার কবিতায়। প্রথমে 'সভাভঙ্গ', পরে 'গানভঙ্গ' কবিতার আখ্যানভাগ এই স্বপ্নের অনুকরণে লেখা।

স্বপ্ন ২: দু একবার এমন হয়েছে শুয়ে আছি, স্বপ্নের ঘোরে হয়তো মাথায় কিছু একটা ফ্ল্যাশ করে গেল, সঙ্গে সঙ্গে উঠেপড়ে লিখে ফেললাম। যেন উঠতেই হবে, তখনই লিখতেই হবে এমন একটা অবস্থা। একবার রাত দেড়টায় উঠে এরকম লেখা লিখেছি। সেই স্বপ্নটা এরকম—

একটা অচেনা স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছি আমি—আরও অনেকে নেমেছেন—কেন নেমেছি জানি না—হঠাৎ একটা বেঁটেখাটো ময়লা জামাকাপড় পড়া দেহাতী মানুষ আমার দিকে এগিয়ে এল— 'তুমি ফটিক লয়, ফটিক লয়?' বলে লোকটা আমাকে ডাকছে। ফটিক নামের চেনাজানা কেউ নেই আমার, অন্তত অন্তরঙ্গ মহলে।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

তাঁর 'আমিই সে' উপন্যাসে সুনীল এই স্বপ্নকে ব্যবহার করেছেন।

স্বপ্ন ৩: বিশাল লম্বা একটা খাবার টেবিল, প্রায় এক মাইল লম্বা। জার্মান জেনারেলদের সঙ্গে আমিও খাবার খেতে বসেছি—অনেক জেনারেল বসে আছেন। একজন জার্মান সৈন্য মোটর সাইকেলে করে এল—আস্তে আস্তে চালাচ্ছে—এক হাতে হ্যান্ডেল ধরে অন্য হাতে টেবিলে এক একজনকে এক একটা প্লেট দিতে দিতে চলে যাচ্ছে।

—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বপ্ন ৪: একটা বিশাল প্রান্তর, দূরে দূরে অনেকগুলো দুর্গ। আমি কোনও একটা বহুতল বাড়িতে যাব। আমার সঙ্গী বললেন, 'ওগুলোই বহুতল বাড়ি।' আমি বললাম, 'তা কি করে হবে। ওগুলো তো দুর্গ।' সঙ্গী বললেন, বাইরে থেকে দুর্গ মনে হলেও ভেতরে রয়েছে বাড়ির সব ব্যবস্থা। কী করে যাব ওই বাড়িতে? এমন সময় দেখলাম অনেক ঘোড়া রয়েছে কাছেই। আমি একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম। ঘোড়ায় চেপে চলেছি একটা দুর্গের দিকে।

—বাণী বসু।

স্বপ্ন ৫: নদী, জল, নৌকো, সার্চলাইট জ্বালানো স্টিমার, সুন্দর ঘাসে ঢাকা মাঠ। মাঠে অনেক বসবার জায়গা। চেয়ার, বেঞ্চ—বেঞ্চে বসে আছেন সাদাচুল বৃদ্ধরা, সুখীসুখী মুখ তাঁদের—আমি লঞ্চে করে এসে নামছি, তাঁরা আমাকে হইহই করে ডাকছেন। 'আরে! এসো! এসো!—সেখানে গিয়ে বসলাম—মাঠে সাদাপাখি, পাশের পুকুরে একঝাঁক রাজহাঁস।

—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

স্বপ্ন ৬: দুটো পরী উড়ে বেড়াচ্ছে একটা ফলের বাগানে। কটা আম আর লিচু তুলে নিল ওরা। একটা কাঁঠাল তুলতে গিয়ে নীচে পড়ে গেল। পরী দুটো মাটিতে নেমে দু জনে মিলে কাঁঠালটা নিয়ে উড়ছে। বেশি দূর যেতে পারছে না, কারণ কাঁঠালটা খুব ভারী। একটা শকুন এসে ওদের সাহায্য করছে। শকুন নিজের ওড়ার সীমানা ছাড়িয়ে অনেক ওপরে পরীদের দেশে কাঁঠাল পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছে। শকুন পরীদের দেশ দেখে আপ্লুত। আনন্দের ছটায় শকুনের মুখের সব ক্রূরতা চলে গিয়ে ওর মুখটা ঋষির মতো লাগছে। শকুনের মুখে পরীর দেশের গল্প শুনছে গাছপালা, পশুপাখি। ওরা খুব আনন্দ পাচ্ছে, বলছে, 'পরীরা যেন বারবার আসে। তা হলে আর আমাদের শকুনের বিশ্রী মুখটা বারবার দেখতে হবে না।'

—স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

স্বপ্নময় এই স্বপ্নকে বাচ্চাদের জন্য লেখা গল্পে ব্যবহার করেছেন।

বিশ্লেষণ করলে এই স্বপ্নগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে স্বপ্নগুলো যে পর্যায়ের তাতে এগুলোর অর্থ খোঁজার কোনও প্রয়োজন অনুভব করছি না।

একজন কবির স্বপ্নে উঠে আসতে পারে কবিতার লাইন। যেমন আসে কবি জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, শ্যামলকান্তি দাস বা অনীক রুদ্রর। আপনি হয়তো কবিতা লেখেন না, বা কবিতা নিয়ে ভাবেন না। আপনার স্বপ্নের ছবিতে কবিতার লাইন আসবে না। গদ্যকারের স্বপ্নে চলে আসতে পারে গল্পের প্লট। গল্প লেখেন না বা লেখার চেষ্টা করেন না এমন মানুষের স্বপ্নে এরকম প্লট আসার সম্ভাবনা খুব কম।

দুজন গৃহবধু, তিনজন ছাত্রছাত্রী আর এক জন রেলের হকার আমাকে তাঁদের দেখা এমন কিছু স্বপ্নের কথা বলেছেন। গৃহবধূদের এক জন সৃজনশীল। কিন্তু গল্প লেখেননি বা লেখার চেষ্টা করেননি কোনওদিন। আর একজন সাহিত্যপিপাসু। ছাত্রছাত্রদের তিন জনের মধ্যেই সৃজনশীলতা সুপ্ত রয়েছে বলে মনে হয়েছে। রেলের হকার ভদ্রলোক নাটক লেখেন।

মাথা গরমের স্বপ্ন

স্বপ্ন গবেষক শ্যেরনার প্রায় দেড়শো বছর আগে কিছু মানুষের দেখা কিছু স্বপ্নকে 'ড্রিমস অব ইলটেমপ্যার' বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন। বাংলার এরকম স্বপ্নকে বলা যেতে পারে 'মাথা গরমের স্বপ্ন' বা 'মেজাজ হারাবার স্বপ্ন'। আমার স্বপ্নসন্ধানের অভিজ্ঞতা, শান্ত আর নির্বিরোধী মানুষ এরকম স্বপ্ন দেখেন বেশি। বাস্তবে শান্ত স্বভাবের একজন মানুষ স্বপ্নে প্রচণ্ড রেগে যেতে পারেন, করতে পারেন বকাবকি। স্বপ্নে শান্ত স্বভাবের মানুষের এরকম স্বভাববিরোধী আচরণের দৃষ্টান্ত আমি অনেক পেয়েছি।

বাস্তবের ভীতু মানুষও স্বপ্নে প্রচণ্ড সাহসী হয়ে উঠতে পারেন। বাস্তব দুর্বলতার এরকম কাল্পনিক পরিপূরণ (compensation) খুঁজে পাওয়া যায় অনেক স্বপ্নের মধ্যে। বাস্তবে এক জন মানুষ হয়তো বেজায় শান্ত। স্বপ্নে তিনি হয়ে উঠতে পারেন প্রচণ্ড রাগী। বকাঝকা করতে পারেন একেওকে। তেমনি দুর্বল মানুষ প্রচণ্ড বলশালী হয়ে উঠতে পারেন স্বপ্নেই। স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শকের এরকম বাস্তববিরোধী আচরণ একধরনের Compensatory Behaviour বা পরিপূরক আচরণ। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বাস্তবে শান্ত, নির্বিরোধী মানুষ। স্বপ্নে মাঝেমধ্যে স্বভাববিরোধী হয়ে যান। বকাঝকা করেন একে ওকে। রেগে যান। ওঁর কথায় 'কারও ওপর রেগে গেছি বা ভায়োলেন্ট হয়ে গেছি এরকম দেখি মাঝেমধ্যে।'

নির্বিবাদী গৃহবধূ শিপ্রা চৌধুরী স্বপ্নে প্রায়ই এর ওর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। তর্কে কোণঠাসা করে ফেলেন অন্য একজনকে। স্বপ্নে এরকম বাস্তববিরোধী আচরণের কথা জানিয়েছেন আরও অনেক মানুষ।

কলকাতার কোনও এক ভ্রমণপত্রিকার সহকারী সম্পাদক মহাশ্বেতা চক্রবর্তী তাঁর এরকম একটা মাথা গরমের স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। বাস্তবে রাগ করতে পারেন না বলেই হয়তো এই স্বপ্নের দর্শক ঘুমন্ত চেতনায় খুব রাগী। স্বপ্নটা এরকম:

স্বপ্ন: নার্সিংহোমে একজন বাবাকে দেখতে এসেছেন। আমি জানি, এঁকে বাবা একেবারেই পছন্দ করেন না। আমি ওঁকে বললাম, আপনাকে কিছুতেই বাবার কেবিনে যেতে দেব না। কেমন যেন ভায়োলেন্ট হয়ে পড়লাম। আজেবাজে কথা বললাম লোকটাকে। কিছুতেই ওকে যেতে দিলাম না বাবার কাছে।

এক মধ্যচল্লিশের সরকারি কর্মচারীর এরকম একটা স্বপ্ন উল্লেখ করা যাক। ভদ্রলোক বাস্তবে শান্ত, অন্তর্মুখী, 'ভালোমানুষ' গোছের। কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের অন্যায় অবিচার অবলীলায় মেনে নেন মুখ বুঁজে। এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন:

স্বপ্ন: আমি আমার বসের টেবিলের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে ওঁর সঙ্গে প্রবল তর্ক জুড়ে দিয়েছি। একটা ফাইল নিয়ে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল করছি ভদ্রলোককে। একটা সময় টেবিল চাপড়াতে চাপড়াতে ওঁর মুখে মারলাম এক ঘুঁষি।

বাস্তবে ওপরওয়ালার ওপর মনে জমা ক্ষোভ প্রকাশ পেতে পারে না বলেই এক্ষেত্রে স্বপ্নদ্রষ্টার ঘুমন্ত চেতনায় তা বাইরে এসেছে। মাথা গরম করে শুধু তর্ক নয়, ওপর ওয়ালাকে রাগের মাথায় আক্রমণ করে বসেছেন স্বপ্নের দর্শক। স্বপ্ন এখানে তাঁর মনের ক্ষোভ প্রশমনের 'সেফটিভালভ'।

প্রয়োজনীয় স্বপ্ন

বাস্তবের সমস্যার স্বপ্নে সমাধান হবার কথা বলেছি 'সমাধানের স্বপ্ন' নিয়ে আলোচনায়। এমন কিছু স্বপ্নের কথা অনেকে আমাকে জানিয়েছেন, যেগুলো দেখা সেই সময় স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। এগুলোকে ঠিক 'সমাধানের স্বপ্ন' না বলে, বলা যেতে পারে 'প্রয়োজনের স্বপ্ন' বা *প্রয়োজনীয় স্বপ্ন* । 'এসেনসিয়াল ড্রিম'।

লেখক আবুল বাশার তাঁর বারবার দেখা এরকম কিছু স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন। এই স্বপ্নগুলো বাশার দেখেন 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'অগ্নিবলাকা' উপন্যাস লেখার সময়। 'অগ্নিবলাকা' উপন্যাসে খাল, নদী আর জল একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। জলের ওপারে বিপ্লবীদের 'মুক্তাঞ্চল'। জল অতিক্রম করে পুলিশ সেখানে পৌঁছতে পারছে না। ছেলেবেলা, কৈশোর আর যৌবনে দেখা মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও এক অঞ্চলের নদী, খাল, জল আর ওপারের গ্রামগুলো এই উপন্যাসে বারবার এসেছে। লিখতে লিখতে বারবার ওই সব টুকরো ছবি চলে এসেছিল বাশারের স্বপ্নেও। এরকম স্বপ্নগুলোকে লেখক আবুল বাশারের দেখা 'প্রয়োজনীয় স্বপ্ন' অবশ্যই বলা যায়।

'দেশ' এর পাতায় এখন নতুন ধারা বাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে উপন্যাস 'কাছের মানুষ'। লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য আমাকে জানিয়েছেন, এই উপন্যাসের নানা চরিত্রের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই স্বপ্নে দেখা হয়। *চলে দীর্ঘ কথোপকথন।* অবচেতনে নিজের উপন্যাসের চরিত্রদের নিয়ে নানা ধরনের অসম্পূর্ণ ভাবনাচিন্তা সম্ভবত এরকম স্বপ্নের উৎস। এরকম ভাবনাচিন্তা এক জন ঔপন্যাসিকের পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজনীয়। চরিত্রগুলোকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে যা হয়তো সাহায্য করে। হয়তো এই স্বপ্নগুলো কিছুমাত্রায় হলেও নিয়ন্ত্রণ করে কাহিনী কোন পথে যাবে, কি মোড় নেবে—এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারকে। এগুলো তাই 'প্রয়োজনীয় স্বপ্ন'।

কবি, লেখক, শিল্পী ও অন্য পেশার অনেক মানুষের এমন অনেক প্রয়োজনীয় স্বপ্ন আমার সংগ্রহে রয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ফোটোগ্রাফার শিবনাথ বসুর এরকম একটা স্বপ্নের কথা বলা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

বাস্তবে, একটা নির্দিষ্ট ধরনের ছবি তুলতে খুব ইচ্ছে হয়। স্বপ্নে পেয়ে যান ওই ধরনের ছবির এক আশ্চর্য প্রেক্ষাপটের দেখা:

স্বপ্ন: একটা নীল পাহাড়ে যেন চলেছি। আকাশটা রক্তিম। অদ্ভুত লাল। পাহাড়ের কোলে নীলাভ একটা কাস্ট। সামনেই একটা তিরতিরে নদী সূর্যের লাল আলোয় চকচক করছে। সন্ধে হবোহবো। একফোঁটা বাতাস নেই। একদল পুরুষমহিলা সারবেঁধে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় নদী পার হচ্ছে। প্রত্যেকে হাতে একটা করে মোমবাতি। এরা সম্ভবত বিদেশী। গায়ের রঙ সাদা। সোনালি চুল। আমি ক্যামেরা হাতে একটা টিলা থেকে এই ছবিটা তোলবার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এক ভ্রমণকাহিনী লেখকের এই সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বেশ মজার। কোনও একটা পত্রিকার জন্য সুন্দরবনের ওপর ভ্রমণকাহিনী লিখতে হবে এটা ভাবতে ভাবতে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েন এক রাতে। স্বপ্নে মাস ছয়েক আগে ঘুরে আসা সুন্দরবনে সারারাত লঞ্চ আর ভটভটিতে ঘুরে বেড়ান স্বপ্নের দর্শক। চলে যান নেতিধোপানির ঘাটে। নিজেকে আবিষ্কার করেন সুধন্যখালির নজরমিনারে। পর দিন ওই লেখা লিখতে এই স্বপ্ন তাকে অনেকটাই সাহায্য করেছে বলে ভদ্রলোক জানান। এই স্বপ্নকে 'প্রয়োজনীয় স্বপ্ন' বলে চিহ্নিত করলে আপত্তি ওঠার কথা নয়।

আমি নিজে দীর্ঘ বছর তিনেক ধরে স্বপ্ন নিয়ে কাজ করতে এরকম বহু প্রয়োজনীয় স্বপ্ন দেখেছি। বিশেষ করে 'সংখ্যার স্বপ্ন' অধ্যায় লেখার আগের দিন সাতেক সংখ্যা সংক্রান্ত প্রায় চারটি 'প্রয়োজনীয় স্বপ্ন' আমি দেখি। এই স্বপ্নগুলো স্বপ্নে সংখ্যার রহস্যভেদে আমাকে সাহায্য করেছে।

স্বপ্নে উৎসাহী যে কোনও মানুষ তাঁর স্বপ্নের বিবরণ নিয়মিত লিখে রাখতে শুরু করলে 'সমাধানের স্বপ্ন'র পাশাপাশি এরকম 'প্রয়োজনীয় স্বপ্ন' অবশ্যই খুঁজে পাবেন।

আরও কিছু অনেকের দেখা স্বপ্ন

মানুষের স্বপ্নের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, আরও বেশ কিছু স্বপ্ন রয়েছে যেগুলো বহু মানুষ না হলেও অনেকে দেখেন। এই স্বপ্নগুলো হল:

(১) নিজে মারা যাবার স্বপ্ন
(২) স্বপ্নে মৃত প্রিয়জন
(৩) ট্রেন বা প্লেন ধরতে না পারার স্বপ্ন
(৪) মুদ্রা বা টাকা কুড়ানোর স্বপ্ন
(৫) বিবাহিত মানুষের বিয়ে না হবার স্বপ্ন
(৬) স্বপ্নে ভূতের ভয়
(৭) গাড়ি চাপা পড়ার স্বপ্ন
(৮) দেরি হয়ে যাবার স্বপ্ন
(৯) স্বপ্নে নিরীহ জীবের ভয়

নিজে মারা যাবার স্বপ্ন

স্বপ্ন ১: একটা ফাঁকা মাঠে ঘুরছি। শনশন হাওয়া। আশেপাশে সাদা চাদর ঢাকা অনেক মৃতদেহ। সবগুলোই আমার।

—গোপা চট্টোপাধ্যায়, গৃহবধূ, ভুবনেশ্বর (৩১)।

স্বপ্ন ২: আমার মৃতদেহ একটা কফিনে শোয়ানো রয়েছে, চারপাশে মানুষের ভিড়।

—অ্যালিস্ স্মিথ্, টেলিফোন অপারেটার, আনন্দবাজার (৩০)।

স্বপ্ন ৩: একবার দেখলাম আমি মৃতুশয্যায়, আমার স্ত্রী, কন্যা ও নিকট আত্মীয়রা কাঁদছে। আমি চেঁচিয়ে বলতে চেষ্টা করছি, 'আমি মরিনি, তোমাদের ফেলে আমি যাইনি—' ঘুম ভেঙে যায় স্ত্রীর ধাক্কায়, মুখ থেকে নাকি অস্ফুট গোঙানি বার হচ্ছিল।

—মুকুলভূষণ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী (৭১)।

স্বপ্ন ৪: রাতে টিভির 'চিত্রহার' অনুষ্ঠানে পরিক্ষীৎ সাহানির ফাঁসির দৃশ্য দেখেছিলাম। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম। আমার নিজের ফাঁসি হচ্ছে। অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে করতে আমি আমার মৃত্যুকে অনুভব করছি।

—সৌম্য ব্রহ্মচারী, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ (৩০)।

স্বপ্ন ৫: ব্রিজ থেকে পড়ে গিয়ে আমি মারা গেছি, নদীর ধারে আমার শবদেহ টাকা দিয়ে পোড়ানো হচ্ছে—বাড়ির লোকেরা আগুনে খুচরো টাকা ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে।

—সংগ্রাম মল্লিক, গণবিজ্ঞান কর্মী (২৭)।

স্বপ্ন ৬: দেখলাম আমি লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছি—আমার শেষশয্যার পাশে অশ্রুসজল চোখে পরিবারের লোকেরা আমাকে বিদায় জানাচ্ছেন।

—দেবিকা বসু, ছাত্রী (১৯)।

স্বপ্ন ৭: আমার মৃত্যু হচ্ছে দেখেছি—একটা নদীর পারে সবাই দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে, উলুধ্বনি দিচ্ছে। একটা ছোট ডিঙি এল, আমি তাতে চড়ে বসলাম। ডিঙি এগিয়ে চলেছে এক জলপ্রপাতের দিকে—জলপ্রপাতের ওপারে আমার জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে।

—অমলমোহন ভট্টাচার্য, এঞ্জিনিয়ার (৫৭)।

স্বপ্ন ৮: স্বপ্নে বেশ কয়েকবার মরেছি—জলে ডুবে বা সাপের কামড় খেয়ে—স্বপ্নে মরে সত্যিই আনন্দ আছে! এক ধরনের কষ্টের আনন্দ!

—বিমলকুমার দাস, চাকরিজীবী (৩০)।

স্বপ্ন ৯: কুড়ি বছর বয়সে আমার পক্স হয়েছিল, সেই সময় দুবার দেখেছি, আমি আত্মহত্যা করে মারা গেছি। আমাকে নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়েছে, আমার আত্মীয়স্বজনরা সবাই কান্নাকাটি করছে।

—সুদর্শনা মুখোপাধ্যায়, আইনের ছাত্রী (২২)।

স্বপ্ন ১০: আমি মরে গেছি, আমাকে নিয়ে সবাই খুব কান্নাকাটি করছে—আমার মা, বাবা, দাদা, দিদি, স্বামী, ছেলেমেয়ে, জায়েরা চারপাশে রয়েছে—সবার চোখে জল—হঠাৎ ঘুম ভেঙে বুঝতে পারি আমি খুব হাঁপাচ্ছি আর আমার চোখে জল—চোখ খুলে হাত পা নাড়িয়ে চেষ্টা করলাম, সত্যিই কি আমি বেঁচে আছি!

--রেজিনা বেগম, গৃহবধূ (২৭)।

স্বপ্ন ১১: বছর ৪৫ থেকে বেশ কয়েকবার স্বপ্নে আমার মৃত্যু দেখেছি—আমি মরে গেছি লোকজন এসেছেন—কান্নাকাটি হচ্ছে—আমি কিন্তু সব শুনতে পাচ্ছি।

—দিব্যেন্দু পালিত (৫৫)।

স্বপ্ন ১২: আমি মরে যাচ্ছি বা আমার মৃত্যু ঘটছে এরকম স্বপ্ন প্রায়শই দেখি—মজার ব্যাপার, মরে গিয়েও আমি আশেপাশের সবকিছু দেখতে পাই—মাঝেমধ্যে নিজেকেও দেখতে পাই—নিজের মৃত্যুর জন্য নিজেই কাঁদছি, মনে আছে।

—লক্ষ্মীশ্রী ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা (৪০)।

স্বপ্ন ১৩: একদিন দেখলাম আমি মরে গেছি—আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কবরখানায়। আমি সব দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, মানুষের জীবন কত ছোট—।

—ঝন্টু শেখ, ছাত্র (২৪)।

স্বপ্ন ১৪: আমি মরে গেছি এরকম স্বপ্ন বেশ কয়েকবার দেখেছি—মরে গিয়েও সব কিছু দেখতে পাই, বুঝতে পারি।

—চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত অফিসার (৬৫)।

স্বপ্ন ১৫: আমি মরে গেছি ভেবে আমাকে শবযাত্রার খাটে তোলা হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি, আমি মরিনি। প্রিয়জনদের এক এক জনকে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি কথাটা। কেউ পাত্তা দিচ্ছে না আমার কথায়। শবযাত্রা শুরু হল। যেতে যেতে বারবার স্বামী, ভাই ও অন্য আত্মীয়দের বলছি, 'তোমরা

কেন বুঝতে পারছ না, আমি বেঁচে আছি!'—শ্মশানঘাটে শুয়ে স্বামীকে আবার বললাম কথাটা! উনি বললেন, 'তুমি যে বেঁচে আছো তার প্রমাণ কি?' আমি বললাম, 'বাড়ি থেকে আমার চশমাটা এনে দাও। ওটা পরলেই আমি হাঁটতে পারব'। স্বামী কাকে একজন ডেকে বললেন, 'ও যখন এতবার করে বলছে তখন চশমাটা এনে দাও'। চশমা এল। ওটা চোখে লাগাতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম!

—সুচিত্রা ভট্টাচার্য (৪৭)।

নিজে মারা যাবার স্বপ্নগুলোর মূল ভাব মোটামুটি এক। স্বপ্নের দর্শক নিজে মারা গেছেন এটা দেখতে পাচ্ছেন। আর তাতে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। নিজের মৃত্যুকে ভালোবাসার এরকম ধারণা পাঠক পাবেন রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতায় বা গানে। যেমন 'মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান'। মৃত্যুকে ভালোবাসার মানুষের জায়গা দেওয়া আর মৃত্যুকে ভালোবাসা যে একই ব্যাপার।

অথচ বাস্তবে মৃত্যুকে আমরা সেভাবে দেখি না। খুব বড় বিপদে পড়লে তা থেকে ত্রাণ পাবার জন্য হয়তো এক জন মানুষ মৃত্যু চাইতে পারেন। তা নইলে মৃত্যু চান না কেউই। মৃত্যুর পর আমি থাকব না—এটা ভাবতে আমাদের খুব কষ্ট হয়। মৃত্যু বাস্তবে খুব কষ্টের। অথচ মৃত্যুর কথা ভেবে খুব আনন্দ। এর কারণ কী? কারণ আমাদের মনের অচেতনে চাপা পড়ে আছে মৃত্যুভয়। আর নানা ভাবে মন সেই মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে চাইছে। মৃত্যুভয় থেকে রেহাই পাবার এই অচেতন মনের চেষ্টা এক ধরনের 'রক্ষণাত্মক কাজ' বা 'ডিফেন্স'। স্বপ্নে এক জন মানুষ এই মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করবার জন্য এই ডিফেন্সের সাহায্য নিতে পারেন।

মৃত্যুর পর কী আমরা কেউই জানি না। মৃত্যুর পর আমাদের সবচাইতে প্রিয় 'আমি' বিলীন হয়ে যায় কতগুলো বস্তুকণার সঙ্গে। হিন্দুশাস্ত্র যাকে বলে 'পঞ্চভূতে বিলীন হওয়া' বা 'ব্রহ্মে লয় পাওয়া'।

স্বপ্নে মৃত্যুভয় কাটাতে হলে মৃত্যুর পর শাস্ত্রীয় 'পরলোক' বা 'আত্মা'র ধারণায় বিশ্বাস করতে হয়। একমাত্র তাহলেই মৃত্যুর পর 'আমার থাকা' নিশ্চিত হয়। কেন না 'অজর, আত্মা অমর, অক্ষয়।' বাস্তবে এক জন মানুষ হয়তো আত্মার অস্তিত্বে বা পরলোকে বিশ্বাস করেন না। তবু তিনি মৃত্যুভয় কাটাতে স্বপ্নে 'আত্মা'র ধারণায় আস্থাশীল হয়ে পড়েন। পাঠক লক্ষ করবেন, নিজের মৃত্যুর স্বপ্নগুলোতে মৃত্যুর পরও স্বপ্নের দর্শক সব কিছু দেখতে, বুঝতে বা শুনতে পাচ্ছেন। এর অর্থ মারা যাবার পরও মানুষটার প্রাণের অস্তিত্ব বিলোপ হয়নি। তাঁর সব ইন্দ্রিয় পুরোপুরি সজাগ রয়েছে। অর্থাৎ, মারা যাবার পরও তিনি 'আছেন', আছে তাঁর ইন্দ্রিয়, আছে চেতনা। পরলোকে বিশ্বাস না করলে এরকম ভাবা সম্ভব নয়। একজন ঘোর নাস্তিকও যদি স্বপ্নে নিজের এরকম মৃত্যুদৃশ্য দেখেন, বুঝতে হবে, তিনি অচেতনের রুদ্ধ মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে ঘুমন্ত চেতনায় 'পরলোক'-এর ধারণাকে মেনে নিচ্ছেন।

এরকম স্বপ্নের দর্শকরা আসলে স্বপ্নে মৃত্যুর পরও নিজের অস্তিত্ব অনুভব করে আনন্দ পাচ্ছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, অচেতনের মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে পেরে চরম সুখ পাচ্ছেন। একবার মৃত্যু এসে গেলে আর কোনও কষ্ট নেই। কষ্ট মৃত্যুর ঠিক আগের যন্ত্রণায়। এই যন্ত্রণার কোনও অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। কতগুলো কষ্ট বা যন্ত্রণাকে 'মৃত্যুতুল্য' ভেবে আমরা সেগুলোকে মৃত্যুযন্ত্রণা বলে ভেবে নিই। আর এই যন্ত্রণার ভাবনা আমাদের মধ্যে অচেতন মৃত্যুভয়ের জন্ম দেয়। মনোবিজ্ঞান বলে, মৃত্যুভয় ছাড়াও আমাদের অচেতন মনে আরও এরকম কিছু ভয় রয়েছে। এগুলো অবদমিত বলে এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। যেমন অঙ্গহানি বা লিঙ্গহানির ভয় (কাসট্রেশন ফিয়ার)। এ সব ভয়ের পরে আছে মৃত্যুভয়। অঙ্গহানির ভয় বা লিঙ্গহানির ভয় কোনওভাবে প্রকাশ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে মৃত্যুভয়ও কমে আসে।

স্বপ্নের দর্শকের বয়সের কথা ভাবা যাক। তিরিশ বছর বয়সের নীচে চার জন এই স্বপ্ন দেখছেন। একটা বয়সের পর জীবনে আনন্দ কমে এলে মৃত্যুভয় বাড়তে থাকে। এই বয়সটা ৩০, ৩৫, ৪০ বা ৫০—এক একজনের এক একরকম হতে পারে। তবে কেন ১৯ বছরের ছাত্রীর মনে মৃত্যুভয় আসছে? লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কম বয়সে কাউকে মারা যাওয়ার ঘটনা দেখে বা শুনে তাঁর মনে মৃত্যুভয় দেখা দিয়েছে। যে মৃত্যুভয়কে, 'ভয় কি, মৃত্যুর পরেও আর একটা জীবন আছে'—এরকম ধারণা দিয়ে

চাপা দিতে এই স্বপ্নের উৎপত্তি। উদ্দেশ্য মৃত্যুভয়কে কমিয়ে আনা। লক্ষ করবেন, চারপাশের সবাই শোকে বিহ্বল। আর স্বপ্নের দর্শক মারা যাওয়া সত্ত্বেও তা বুঝতে পারছেন। অর্থাৎ তিনি 'চলে যাননি'। তিনি 'রয়েছেন'।

একটু বেশি বয়সে এরকম স্বপ্ন আসা খুব স্বাভাবিক। '৩৫ এর পর যে মানুষের মৃত্যু চেতনা আসে না, সে অতি মূর্খ'। আসলে একটা বয়সের পর জীবনের নানা উপকরণের সঙ্গে জীবনবোধ (লিবিডো) আর সেভাবে লিপ্ত হতে পারে না। এক উপকরণ থেকে অন্য উপকরণে জীবনবোধের লিপ্ততার প্রবাহ (Flow of Libido)ই আমাদের বেঁচে থাকবার মূল রসদ। এই লিপ্ততায় কোনও অভাব দেখা দিলে একটা বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়। জীবনের আনন্দও কমে আসে। এই শূন্যতা বা 'ভ্যাকুয়াম' মৃত্যুর সমান। এই শূন্যতা যত বাড়ে, অচেতন মনের মৃত্যুভয়ও তত বাড়তে থাকে। একটা বয়সে এরকম মৃত্যুভয় অতিক্রম করতে মানুষ তাই এইরকম স্বপ্ন দেখতেই পারেন।

এই স্বপ্নগুলোতে আর একটা ব্যাপার লক্ষ করবার। তা হল, স্বপ্নের দর্শক মারা যাওয়ায় আত্মীয়স্বজন বা পরিচিতরা সবাই কাঁদছেন। অর্থাৎ সবাই তাঁর অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে শোকপ্রকাশ করছেন। এর মধ্যে স্বপ্নের দর্শকের 'আমিত্ব'র এক ধরনের তৃপ্তি খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত বছর ৪৫ বয়স থেকে এরকম স্বপ্ন দেখেছেন বেশ কয়েকবার। আর প্রত্যেকবারই মৃত্যুর পর লোকজন এসেছেন, কান্নাকাটি করছেন, এটা তিনি 'শুনতে পাচ্ছেন'। অর্থাৎ তাঁর চেতনা (বা অস্তিত্ব) লোপ পায়নি। ১২ নম্বর স্বপ্নে অধ্যাপিকা নিজের মৃত্যুর স্বপ্নে নিজেই কাঁদছেন। ১০ নম্বর স্বপ্নে গৃহবধূ রেজিনা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে বুঝতে পারছেন, তিনি কাঁদছিলেন। এখানে, তাঁর অভাববোধে অন্যদের মনের ভাবের সঙ্গে একাত্মতা নিজের কান্নার কারণ।

এক কথায়, এরকম স্বপ্নের দর্শক মৃত্যুর পর নিজের অস্তিত্বের অনুভূতির ভেতর দিয়ে মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে চান। 'আমি মরেও বেঁচে থাকব'—অচেতনের এরকম ইচ্ছা এ ধরনের স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হয়।

স্বপ্নে মৃত প্রিয়জন

স্বপ্ন ১: আগে মাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম, এখনও মাঝেমধ্যে দেখি—সবই ছেলেবেলার স্মৃতির স্বপ্ন—মাও সেই সময়কার— মা বকছেন, কি কিছু বলছেন বা হয়তো মার কাছে বসে গল্প শুনছি।

—অরুণ মিত্র।

স্বপ্ন ২: বাবা মারা গেছেন ১৯১৬ সালে, বাবাকে এখনও প্রায়ই স্বপ্ন দেখি, আমার বিয়ে একটা উদ্ভট স্বপ্ন এর মধ্যে (১৯৬১) দেখলাম বাবাকে নিয়ে—অচেনা কোনও একটা জায়গায় স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে গেছি, একটা গেস্টহাউসে উঠেছি— খুব খিদে পেয়েছে, ডাইনিং হলটা কোনদিকে তা নিয়ে আমি আর স্বাতী (স্ত্রী) সংশয়ে রয়েছি—দেখলাম বাবা এঁটো হাতে একটা প্যাসেজ ধরে এদিকে আসছেন। বললেন, 'আমার খাওয়া হয়ে গেল, তোরা খেয়ে আয়', বলে ডাইনিং হলটা দেখিয়ে দিলেন—আমার ছেলে পাপলু (বছর আড়াইর বাচ্চা) জানালায় দাঁড়িয়ে পাখি দেখছিল, সে কিছুতেই আসবে না, জোর করে ধরে বেসিনে এনে হাত ধোয়াচ্ছি। পেছনে বাবা দাঁড়িয়ে, আমাদের হয়ে গেলে হাত ধোবেন।

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বপ্নে মৃত শক্তি চট্টোপাধ্যায়: 'স্বপ্নে বিখ্যাত চরিত্র' অধ্যায় দেখুন।

স্বপ্ন ৩: মায়ের যখন কাজ হয়েছিল তখন আমাদের হাতে কোনও পয়সা নেই, ভাই সব টাকা খরচ করে ফেলেছে—কিছুদিন বাদে স্বপ্ন দেখলাম, মায়ের কাজ হচ্ছে, আমাদের দু ভাইয়ের মাথা ন্যাড়া, কাছাপরা। আমি যা করছি সবই মাকে জিজ্ঞাসা করে—মা, এটা কি করব, মা বলছেন, এই কর, এটা

ওখানে নিয়ে যাও—সব কাজই হচ্ছে মায়ের নির্দেশে।

—জয় গোস্বামী।

স্বপ্ন ৪: বাবা মারা যান ১৯৬২ সালে—বাবা মারা যাবার পর থেকে বাবাকে বেশ কয়েকবার স্বপ্নে দেখেছি—কিছু দিন আগেও দেখলাম, প্রথমে মনে হলে, বাবা জীবিত, একটুবাদে মনে হল, আরে বাবা তো মারা গেছেন—শেষ দিকে আবার বাবাকে জীবিত ভাবলাম।

—হোসিয়ার রহমান।

স্বপ্ন ৫: ছোট এক ভাই মানসিক প্রতিবন্ধী ছিল—১৯৬২ সালে আত্মহত্যা করে—পরে ওকে স্বপ্নে বেশ কয়েকবার দেখেছি—রাস্তা দিয়ে আমরা দু'জনে হেঁটে যাচ্ছি, কথা বলতে বলতে, গল্প করতে করতে—ঠিক যেরকম আগে হাঁটতাম (ওর অকাল মৃত্যুতে খুব আঘাত পেয়েছিলাম—ওর স্মৃতি আজও খুব 'হন্ট' করে)।

—ডা. তন্ময় দত্ত। চিকিৎসক

স্বপ্ন ৬: বাবা মারা যান আমার ৮ বছর বয়সে—এখনও বাবাকে স্বপ্নে দেখি—আমার ছোটবেলার বাবাকে ফিরে পেয়ে খুব আনন্দ হয়, ঘুম ভেঙে কষ্ট পাই, ফিরে পাওয়া বাবাকে হারিয়ে ফেলতে হয় বলে। একটা স্বপ্ন খুব মনে পড়ে। সেটা কাকা মারা যাবার পর। কাকা আমার বাড়িতে এসেছেন। বলছেন, শঙ্কর আমাকে দশটা টাকা দে তো, আমাকে একবার নিমতলা ঘাটের দিকে যেতে হবে। বারো নম্বর ট্রামটা নিমতলা যায় না? আমি টাকা দিয়ে বললাম, কেন? নিমতলা যাবে কেন? কাকা বললেন, আমাকে যেতেই হবে।—ঘুম ভেঙে মনটা খুব খারাপ লেগেছিল।

—শঙ্করলাল ভট্টাচার্য।

স্বপ্ন ৭: বাবা মারা গেছেন স্ট্রোক হয়ে। বাবাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখি, বাবা ক্লান্ত শরীবে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছেন—আমি ঘুমের মধ্যেই কাঁদতে থাকি—ঘুম ভেঙে যায়।

—সুকুমার নায়েক, রেলকর্মী।

স্বপ্ন ৮: বাবা মারা যাবার বহুদিন পর এই স্বপ্নটা দেখি। আমি যেন ট্রেনে দিল্লি থেকে কলকাতা যাচ্ছি—হঠাৎ দরজার কাছে যেতেই দেখি চাদর মুড়ি দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে এক জন বসে আছেন, উনি যেন আমার বাবা—কাছে যেতেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

—শিপ্রা চৌধুরী।

স্বপ্ন ৯: বাবা ১৯৬২র জুলাইতে মারা যান—তারপর দুবার বাবাকে স্বপ্নে দেখেছি—একবার দেখলাম তিনি আমার মাথার কাছে বসে আছেন—আরেকবার দেখি, বাবা আমাকে 'শ্রীকান্ত' পড়ে শোনাচ্ছেন, ঠিক যেমন আগে শোনাতেন।

— ঝুম্পা পাল, ছাত্রী।

স্বপ্ন ১০: ৬-৭ বছর আগে বাবা মারা গেছে—বাবাকে দেখি—বাবা আগের মতো আসে, কথা বলে, আমাদের বাড়িতে থাকে।

—জ্যোৎস্না নন্দী, ঠিকে ঝি।

স্বপ্ন ১১: কিছুদিন আগে মা মারা গেছেন, প্রায়ই মাকে স্বপ্নে পাই—একেবারে আগের মা, প্রথমে খুব ভাল লাগে, তারপরই মনে হয়, আরে মা তো বেঁচে নেই—মা কি করে এল? ঘুমটা ভেঙে যায়।

—অমিতাভ গোস্বামী, মেরিন এঞ্জিনিয়ার।

স্বপ্ন ১২: প্রায়ই দেখি বাবা আমাকে বাজাতে শেখাচ্ছেন—অনেকসময় দেখি, বাড়িতে অনেক শিল্পীরা এসেছেন—বাবা তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন—সেই জীবিত বাবা (বাবা মারা যান ১৫ বছর আগে)।

—মণিমালা নাগ, সেতার শিল্পী।

স্বপ্ন ১৩: মাঠে একজন আমাদের খেলা শেখাতো—দেখলাম সে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে—অসুস্থ। তারপরই দেখলাম সবাই শ্মশানে, শোকপালন হচ্ছে। একটু বাদেই সে আবার জীবন্ত ফিরে এল—অথচ তাঁকে দেখে কেউ অবাক হল না।

—তন্ময় চক্রবর্তী।

স্বপ্ন১৪: দিদিমা মারা যাবার পর স্বপ্নে জীবিত দিদিমাকে বেশ কয়েকবার দেখেছি—একটা মনে পড়ে—দিদিমা সামনে—আমি অনেক পিছনে—খুব জোরে হেঁটেও ধরতে পারছি না।

—হর্ষ দত্ত, গল্পকার।

স্বপ্ন ১৫: মা মারা যান ৫৭ সালে। মার মৃত্যু আমার জীবনে বিরাট বিপর্যয় ডেকে আনে। কলকাতায় থাকতে ভালো লাগত না। হরিদ্বার চলে যেতাম। বম্বেতে অ্যাসাইনমেন্ট নিলাম। মৃত্যুর পর মাকে বারবার স্বপ্নে পেয়েছি—মায়ের উপস্থিতি—মুখটা অবশ্যই বিকৃত, তবু এই স্বপ্ন দেখলে খুব আনন্দ হত, সুখের অনুভূতি হত।

—তপন সিংহ, চিত্র পরিচালক।

স্বপ্ন ১৬: এর ভেতর (জুলাই '৫৬) একটা স্বপ্ন দেখলাম ভাই অনীশকে নিয়ে। মফস্বল শহর, বাবা-মা-ভাই বোনেরা বসে আছি, ভাই অনীশ (৫৮ সালে মৃত) আসছে না অনেকদিন, মা (মৃত) আমাকে বলছেন, খুকু, আর তো অপেক্ষা করা চলে না। ছবিসহ কাগজে বিজ্ঞাপন দে একটা—আমি অবুকে (আর এক মৃত ভাই) বলছি, অবু, তাহলে কাগজেই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক। তাহলেই অনীশ আসবে।

—মহাশ্বেতা দেবী।

মৃত মা, বাবা বা অন্য প্রিয়জন স্বপ্নে ফিরে এসেছেন, কথা বলছেন, এরকম স্বপ্ন দেখেন অনেকেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নেও মা সারদাদেবী ফিরে এসেছিলেন জীবিত অবস্থায় (৫ পাতায় দেখুন)। এরকম স্বপ্ন দেখলে আপাতদৃষ্টিতে 'মা বাবা বেঁচে থাকলে কী ভালই না হত', স্বপ্নের দর্শকের মনের এরকম ইচ্ছা পূর্ণ হয়। স্বপ্ন-গবেষকরা এরকম স্বপ্নকে এত সহজ বলে মেনে নিতে নারাজ। স্বয়ং ফ্রয়েড এরকম স্বপ্নের অর্থকে 'জটিল' বলে চিহ্নিত করেছেন।

ধরা যাক, স্বপ্নে মৃত প্রিয়জন ফিরে এলেন। আর জীবিত অবস্থার মতোই কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। এরকম হলে স্বপ্নদ্রষ্টা শুধু আনন্দ পান না, আশ্চর্যও হয়ে যান। আর এরকম স্বপ্নের অর্থ না জানার জন্য এক ধরনের 'রিলিফ' অনুভব করেন। এরকম স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি? 'যদি বাবা বা মা বেঁচে থাকতেন, তবে এই ঘটনা দেখে কি বলতেন?' অনেক সময় এরকম চিন্তা আমাদের মনে আসে। অনেককে বাড়িতে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটলে বা জটিল পরিস্থিতি এলে এ ধরনের কথা বলতে শোনা যায়। এরকম ভাবনার উদ্দীপনা থেকে এই ধরনের স্বপ্ন আসতে পারে।

'যদি'কে প্রকাশ করবার ক্ষমতা স্বপ্নের নেই। তাই এই ভাবনা স্বপ্নে চলে আসে বাবা বা মা বেঁচে রয়েছেন—এরকম অবাস্তব অবস্থাকে বাস্তব ধরে নিয়ে। এরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্নদ্রষ্টার অনেক সময় মনে হয়, 'তা কি করে সম্ভব, উনি তো মারা গেছেন অনেকদিন!' এর অর্থ, স্বপ্নদ্রষ্টা এটা ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছেন যে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা মৃত মা বা বাবার নেই। হয়তো তিনি কিছুটা স্বস্তিও পাচ্ছেন এই ভেবে যে, আর যাই হোক এ ব্যাপারে উনি (মা/বাবা) আর নাক

গলাতে পারবেন না।

অনেক সময় এরকম স্বপ্নে মৃত প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্বপ্নের দর্শকের মনে হয়, 'তিনি (প্রিয়জন) সত্যিই মারা গেছেন। আসলে তিনি নিজের মৃত্যুর কথা জানেন না।' ফ্রয়েডের মতে, 'তিনি সত্যিই মারা গেছেন' এর অর্থ, 'তিনি সত্যিই মারা গেছেন তাঁর মৃত্যু চাইছিলাম বলে।' আর 'নিজের মৃত্যুর কথা প্রিয়জন জানেন না' আসলে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের এককালের গোপন ইচ্ছা। এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। ধরা যাক, একজন মানুষ শেষ বয়সে মৃত্যুর আগে অসুস্থ মা বা বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ সেবাযত্ন করলেন। এইসময় বারবার তাঁর মনে হয়, 'এভাবে কষ্ট পেয়ে লাভ কি! এর চেয়ে মরে গেলে এই কষ্টের হাত থেকে ইনি রেহাই পাবেন।' এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে শৈশবে মনে তৈরি হওয়া মা বা বাবার মৃত্যুকামনা। মা, বাবা বা অন্য প্রিয়জনের মৃত্যুর আগে এরকম চিন্তাকে অন্য ভাবে দেখলে, 'আসলে তো ইনি মারাই গেছেন, শুধু নিজেই নিজের মৃত্যুর কথা জানেন না।'

বেশিবয়সে প্রিয়জনের মৃত্যুর পর শোকপালনের সময় মানুষের অচেতনে এক ধরনের আত্মতুষ্টির ভাবে আসে। 'আমি চেয়েছিলাম বলেই ইনি মরে গিয়ে দুঃখযন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেলেন।' এরকম ইচ্ছার কথা সচেতনে আমরা জানি না। বরং সচেতনে মনে হয়, 'ইনি আরও অনেক দিন বেঁচে থাকলে বড় ভালো হত'। বিশিষ্ট মনোবিদ প্রণব বসুর মতে, এরকম স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের দুটো বিপরীতমুখী ইচ্ছা কাজ করে। 'বেঁচে থাকলে বেশ হত' আর 'মরেছে ল্যাঠা চুকে গেছে'। এই সম্পূর্ণ বিপরীত ইচ্ছা (Ambivalence) একই স্বপ্নে চলে আসায় এই স্বপ্নগুলো ব্যতিক্রমী। মৃত প্রিয়জনের স্বপ্নে বেশির ভাগ সময় অচেতন মনের বিপরীতমুখী দুই ইচ্ছার উপস্থিতি এই স্বপ্নগুলোর অর্থকে জটিল করে তোলে।

স্বপ্ন ৪ দেখুন। স্বপ্ন দেখতে স্বপ্নের দর্শকের মনের ভাব ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে এই স্বপ্নে। 'প্রথমে মনে হচ্ছে বাবা জীবিত একটু বাদে মনে হল, আরে বাবা তো মারা গেছেন। শেষদিকে আবার বাবাকে জীবিত ভাবলাম।' স্বপ্ন ১৩তেও এই ব্যাপারটা রয়েছে। প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্নে ভাবের এরকম বিচিত্র পরিবর্তন অনেক সময় দেখা দেয়। ভাবের এই রূপান্তর স্বপ্নে আসে মৃত প্রিয়জনের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্বপ্নের দর্শকের অচেতন মনের উদাসীনতা বোঝাতে। 'বাঁচল কি মরল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না!'—প্রচলিত এরকম প্রবাদ এখানে স্বপ্নের দর্শকের মনের গোপন কথা। স্বপ্নে প্রিয়জনের অস্তিত্ব সম্পর্কে এরকম উদাসীন থাকা আসলে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের গোপন ইচ্ছা। সচেতনের ইচ্ছা বা বাস্তব নয়। এই ইচ্ছার জোরে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখতে দেখতে মৃত প্রিয়জন সম্পর্কে তাঁর মনের দ্বন্দ্ব (Ambivalence) থেকে মুক্ত হতে চান।

মৃত প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় মনোবিদদের ব্যাখ্যা এভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়:

(১) যেখানে স্বপ্নে কখনও মনে হয় না যে মৃত প্রিয়জন মৃত, সেখানে স্বপ্নদ্রষ্টা আসলে নিজের মৃত্যু দেখছেন। নিজের জায়গায় তিনি স্বপ্নে মৃত মা বা বাবাকে বসিয়ে ফেলছেন।

(২) স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ করে অনেক সময় মনে হয়ে 'আরে, ইনি তো অনেকদিন মারা গেছেন।' এরকম ভাব স্বপ্নে এলে বুঝতে হবে, স্বপ্নদ্রষ্টা এতক্ষণ নিজের মৃত্যু দেখছিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, তিনি স্বপ্নের মধ্যেই ব্যাপারটাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন। ভাবতে চাইছেন, আমার নয় মৃত্যু হয়েছে ওঁর (প্রিয়জনের)।

এখানে যেসব স্বপ্নের উল্লেখ করেছি তার অনেকগুলোতে পাঠক স্বপ্নদ্রষ্টার মনে মৃত প্রিয়জনকে নিয়ে আবেগের দ্বন্দ্ব লক্ষ করবেন। অনেক পাঠক এরকম স্বপ্নের এই জটিল ব্যাখ্যা মানতে চাইবেন না। এর মধ্যে বেশ কিছু স্বপ্নে মৃত প্রিয়জনকে ফিরে পাবার সহজ ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে বলে ভাবতে পারেন অনেকে। বিশেষ করে স্বপ্ন ১০ (ঠিকে ঝির স্বপ্ন), স্বপ্ন ৯, স্বপ্ন ১২ (সেতারশিল্পীর স্বপ্ন)তে। স্বপ্ন ১৪ আর ১৬কে সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন বলে না ভাবতে পারা সত্যি কঠিন। এই স্বপ্নগুলোকে মৃত মা, বাবা বা আত্মীয় পরিজনকে ফিরে পাবার স্বপ্ন হিসেবে একজন মানুষ ব্যাখ্যা করতেই পারেন। যদি এরকম স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব না হয়।

ট্রেন বা প্লেন ধরতে না পারা স্বপ্ন

স্বপ্নে রেলস্টেশনে, বিমানবন্দরে পৌঁছে অনেকে দেখতে পান তার ট্রেন বা প্লেন ছেড়ে চলে গেছে। এরকম স্বপ্ন অনেকে না হলেও কেউ কেউ দেখেন। এরকম কিছু স্বপ্ন এখানে উল্লেখ করব।

স্বপ্ন ১: স্বপ্নে প্রায়ই ট্রেন মিস করি—বহুবার এটা দেখেছি—এখনও দেখি।

— বিকাশ ভট্টাচার্য।

স্বপ্ন ২: স্বপ্নে প্রায়ই ট্রেন বা বাস 'ফেল' করি—খুব দুশ্চিন্তা হয় এই স্বপ্ন দেখলে।

—মহঃ ইউনুস, ব্যাঙ্ককর্মী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

স্বপ্ন ৩: মাঝেমধ্যে স্বপ্ন দেখি,—আমি স্টেশনে পৌঁছোলাম, ট্রেনটা তখনই ছাড়ল—দৌড়েও ট্রেনটা ধরতে পারি না—খুব টেনশান হয়।

—রীতা চট্টোপাধ্যায়, গৃহবধূ, বহরমপুর।

স্বপ্ন ৪: ট্রেনটা পেলাম না, কি বাসটা চলে গেল, এরকম স্বপ্ন মাঝেমধ্যেই দেখি।

—মল্লিকা সেনগুপ্ত, কবি, কলকাতা।

স্বপ্ন ৫: প্রায়ই প্লেন মিস করি—ট্যাক্সি আটকে গেছে ট্রাফিক জ্যামে, এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল—প্লেন ছেড়ে চলে গেছে।

—ডা. স্মরজিৎ জানা, বিশেষজ্ঞ, কলকাতা।

স্বপ্ন ৬: ট্রেনে চড়ে কোথাও যাব—টিকিট পাচ্ছি না—কাউন্টারে কেউ নেই। ট্রেন চলে গেল।

—সুকুমার দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত, হিন্দমোটর।

এরকম স্বপ্নকে ফ্রয়েড ব্যাখ্যা করেছেন 'আশ্বাসের স্বপ্ন' বা 'কনসোলেসান ড্রিম' হিসেবে। ফ্রয়েডের মতে, আমাদের প্রত্যেকের মনের ভেতর রয়েছে মারা যাবার ভয়। স্বপ্নে ট্রেনে বা প্লেনে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া (Departure) দেখা দিতে পারে জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে চলে যাবার প্রতীক হয়ে। কেউ মারা গেলে, আমরা হামেশাই বলি, 'তিনি চলে গেছেন'। শক্তি চট্টোপাধ্যায় মারা যাবার পর একটা কাগজে লেখা হয়েছিল, 'শক্তি চলে গেলেন'। স্বপ্নে এই 'যাত্রা'র বাহন হয়তো ট্রেন বা প্লেন। ট্রেন বা প্লেনের ক্ষেত্রে 'যাত্রা' (Journey), 'ছেড়ে যাওয়া' (Departure) এ সব শব্দ ব্যবহার হয় খুব বেশি। কারও মৃত্যু হলেও আমরা এ সব শব্দ ব্যবহার করি। যেমন 'মাদার টেরিজা অমৃতলোকে যাত্রা করলেন' বা 'হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অগণিত সংগীতপ্রেমীকে ছেড়ে চলে গেলেন'।

ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্নে মানুষ এরকম 'যাত্রা'র হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায় 'ট্রেন ফেল' বা 'প্লেন মিস' করবার জন্য। এরকম স্বপ্ন তাই এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ। মরে যাবার হাত থেকে রেহাই পাবার ইচ্ছা স্বপ্নে পূর্ণ হয় 'যাত্রার বাহন' স্বপ্নদ্রষ্টাকে না নিয়ে ছেড়ে চলে যাবার জন্য। এরকম স্বপ্ন মনকে আশ্বাস দেয়। 'তুমি মারা যাবে না, বেঁচে থাকবে, এ নিয়ে অযথা চিন্তা কোরো না'। যেমন পরীক্ষার স্বপ্ন জানিয়ে দেয়, 'আগের মতো এবারও তুমি সফল হবে। নিশ্চিন্তে থাকো'।

বিকাশবাবুর স্বপ্নের প্রেক্ষিত বিবেচনা করা যাক। বাস্তবে বেশ কয়েকবার ট্রেন মিস করেছেন এই চিত্রকর। ওঁর কথায়, 'একবার শান্তিনিকেতন যাব। রাস্তায় জ্যামে পড়ে যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছোলাম, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস তখন সবে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে আউটার সিগন্যাল পেরোচ্ছে'। বিকাশবাবুর জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা 'অ্যাসাইনমেন্ট' বা পড়তে যাবার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে ট্রেন বা প্লেন 'মিস' হবার জন্য। কম বয়স থেকে এই স্বপ্নটা তিনি বারবার দেখেন। ওঁর মনে হয় এই বারবার দেখা স্বপ্নটা হয়তো আসে এক ধরনের নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে। কয়েকবছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছেন। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ছিল অনেক দিন পর্যন্ত। সত্তরের দশকের প্রথমদিকেও

ওঁর সমসাময়িক অনেক শিল্পীর মতো বিকাশকে একটানা চালিয়ে যেতে হয়েছে টিঁকে থাকবার লড়াই। 'ছবি বিক্রি হত না, তেমন কেউ চিনতওও না'। বিকাশ মনে করেন, 'সেই চূড়ান্ত অনিশ্চিত দিনগুলোর নিরাপত্তার অভাববোধ হয়তো বারবার ট্রেন মিস করবার স্বপ্নে চলে আসে।'

ডা. জানা কলকাতায় পাবলিক হেলথ ও হাইজিন সংস্থার এইডস্ সংক্রান্ত কাজকর্মের মূল দায়িত্বে রয়েছেন। এইডস নিয়ে নানা আলোচনাচক্র বা সম্মলনে হাজির থাকতে গত কয়েকবছরে এই চিকিৎসককে বেশ কয়েকবার প্লেন ধরে যেতে হয়েছে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে। সেই সময় থেকেই প্লেন মিস করবার স্বপ্নটা দেখছেন ভদ্রলোক। এই চিকিৎসকের সঙ্গে বর্তমান লেখকের ঘনিষ্ঠতা বহু বছরের। কোনও ধরনের আর্থিক নিরাপত্তার অভাববোধ নেই ওঁর। আগেও ছিল না, এখনও নেই।

বৃদ্ধ সুকুমারবাবু, গৃহবধূ রীতা আর ব্যাঙ্ককর্মী ইউনুসের স্বপ্নের অর্থ একই। অচেতনের মৃত্যুভয় থেকে আসা এই স্বপ্ন এঁদের সান্ত্বনা দিতে চায়। 'ভয় নেই, তুমি মরবে না।' মল্লিকার স্বপ্নের ব্যাখ্যাও তাই। লক্ষ্য করবেন, মল্লিকা শুধু ট্রেন নয় বাস মিস করবার স্বপ্নও দেখেন। সকালের কলেজে পড়ান মল্লিকা। বাড়ি লেকগার্ডেন্স থেকে ভোর ভোর বেরিয়ে পৌঁছোতে হয় উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারের কলেজে। বাস ধরবার তাড়া থাকে। দু-চারবার বাস মিস করে কলেজে পৌঁছাতে দেরি হয়েছে। বাস্তবের এই উদ্বেগকে কেন্দ্র করে শুধু ট্রেন নয় বাস মিস করবার স্বপ্নও চলে আসে এই কবির ঘুমন্ত চেতনায়।

পাঠক হয়তো খেয়াল করেছেন, ট্রেন বা প্লেন মিস করবার স্বপ্ন দেখেন ৩৫-এর গৃহবধূ থেকে শুরু করে ৭৫ বছরের বৃদ্ধ সবাই। প্রত্যেক মানুষের ভেতরই অচেতনে কোনও না কোনও মাত্রায় মৃত্যুভয় থাকে। বছর ৩৫ থেকে এই মৃত্যুভয় বাড়তে থাকে। একমাত্র ব্যতিক্রম চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্য। বিকাশ এই স্বপ্ন দেখছেন তাঁর ১৮-১৯ বছর বয়স থেকে। এর একটা সম্ভাব্য কারণও রয়েছে। খুব কম বয়সে বাবা মারা যাবার পর থেকে অনেক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে বড় হতে হয়েছে ওঁকে। 'বেঁচে যে আছি, সেটাই বুঝতে পারতাম না সবসময়'—জানিয়েছেন বিকাশ। এই যন্ত্রণা যে শুধু অর্থনৈতিক তা নয়, প্রায়শই 'তীব্র মানসিক কষ্ট, যন্ত্রণা পেতে হয়েছে ছোটবেলায়, কৈশোরে।' হয়তো এ সব কারণে খুব কম বয়েস থেকেই জীবনের বৃত্ত থেকে ছিটকে যাবার ভয় কাজ করত বিকাশের চেতনে-অবচেতনে। এই ভয় বা অনিশ্চয়তা খুব কম বয়েস থেকে এই বিখ্যাত চিত্রকরের ট্রেন মিস করবার স্বপ্ন দেখার কারণ বলে আমার মনে হয়। বারবার দেখা এই স্বপ্ন বিকাশকে ভয়মুক্ত করতে চেয়েছে। বলতে চেয়েছে 'ভয় নেই! তুমি মরবে না।' বিকাশ তাঁর দেখা এরকম স্বপ্নগুলোর এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন।

মুদ্রা বা টাকা কুড়ানোর স্বপ্ন

অনেকে না হলেও কেউ কেউ এরকম স্বপ্ন দেখেন। গত পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় অজস্রবার দেখেছেন এই ধরনের স্বপ্ন। স্বপ্নটা এরকম:

স্বপ্ন: ঘরের জানালায় বাইরে মাটিতে ঘাসের ওপর অজস্র সিকি, আধুলি, দুআনি (আগেকার দিনের মুদ্রা; প্রত্যেকটাতে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের প্রতিকৃতি খোদাই করা) পড়ে আছে। আমি দু হাতে সেই মুদ্রাগুলো কুড়োচ্ছি। আরও মাটি খুবলাতে গিয়ে নখে মাটি ঢুকে যাচ্ছে। খুব লজ্জাও লাগছে।

এরকম স্বপ্নে ধাতুমুদ্রা বদলে যেতে পারে টাকায়। মুর্শিদাবাদের কাকুড়িয়া গ্রামের বিশু নামের এক খিলিপানের দোকানদার এই ধরনের স্বপ্ন দেখেছে বেশ কয়েকবার। মাটিতে অনেক টাকা পড়ে আছে, আর সে তাড়াহুড়ো করে সেই টাকা কুড়োচ্ছে। কলকাতার এর সাংবাদিক, দুর্গাপুরের এক গৃহবধূ, মুম্বইয়ের এক বৃদ্ধ আর ভদ্রকালীর এক যুবতী একই স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন।

এরকম স্বপ্ন আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভট। কেউ কেউ এই ধরনের স্বপ্নের মধ্যে টাকা পাবার ইচ্ছাপূরণ খুঁজে পেতে পারেন। এরকম স্বপ্নের মনো-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আলাদা। মুদ্রা বা টাকা কুড়ানোর স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শক একেবার শৈশবের এক আনন্দ ফিরে পান। আর এই আনন্দ নিজের মলকে ঘাঁটাঘাঁটি করবার আনন্দ। কাগজের নোট বা ধাতুমুদ্রা এই স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শকের মলের প্রতীক। আর তার অতিশৈশবের 'মলপ্রীতি' এরকম স্বপ্নের স্মৃতিতে জেগে উঠে মুদ্রা বা টাকা কুড়ানোর মধ্যে দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে

তৃপ্ত হয়। এরকম স্বপ্ন সেদিক থেকে অতিশৈশবে ফিরে যাবার স্বপ্ন।

এরকম স্বপ্নের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাথমিকভাবে অনেক পাঠকের কাছে উদ্ভট বলে মনে হতে পারে। পাঠক খেয়াল করবেন, মলের বা বিষ্ঠার প্রতি আমাদের যে ঘৃণাবোধ তা একেবারে ছোটবেলায় থাকে না। ছোট বাচ্চারা মল নিয়ে খেলতে বা ঘাঁটতে ভালোবাসে। বড়দের চোখের অগোচরে নিজের মল মুখে তুলেছে কোনও খুব ছোট বাচ্চা, এমন ঘটনাও বিরল নয়। মল খুব ছোট বাচ্চাদের কাছে আকর্ষণের বস্তু, বিকর্ষণের নয়। এরা মলের গন্ধ ভালোবাসে। ভালোবাসে মলের স্পর্শ।

একটু বড় হয়ে যাবার পর অতিশৈশবের এই মলপ্রীতি আস্তে আস্তে চলে যায়। এটা হয় সামাজিক আর পারিবারিক শিক্ষার প্রভাবে। বাচ্চাকে শেখানো হয়, মলমূত্র ঘৃণার বস্তু, নোংরা বস্তু। বাচ্চার মলমূত্র নিয়ে খেলা করবার অভ্যাস বা ইচ্ছা এই শিক্ষার প্রভাবে সচেতন মন থেকে চলে যায় অচেতনে। এরপর বাচ্চা বাস্তবে আর মলমূত্র নিয়ে খেলে না, বরং এড়িয়ে চলে। মলের গন্ধ আর তাকে টানে না। বরং এই গন্ধে তার ঘেন্না লাগে।

বড় হয়ে যাওয়া মানুষের অচেতন মনে লুকিয়ে থাকা মলের প্রতি ভালোবাসা অনেক সময় জেগে থাকা অবস্থাতেও নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ঘামের গন্ধ উৎকট। তবু প্রিয়পুরুষের ঘামের গন্ধ অনেক সময় মেয়েদের আকৃষ্ট করে, আবেশ জাগায়। ভিনিগারের গন্ধ আর যাই হোক আকর্ষক নয়। তবু ভিনিগারের গন্ধ বা হিং-পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ অনেক মানুষকে আকৃষ্ট করে। এরকম উগ্র বা অপ্রীতিকর গন্ধের প্রতি কিছু মানুষের তীব্র আকর্ষণের মধ্যে মনোবিদরা অতিশৈশবের মলের গন্ধের প্রতি ভালবাসার সুপ্ত আত্মপ্রকাশ খুঁজে পান। সুগন্ধী পারফিউমের ভেতরকার উগ্র গন্ধের প্রতি বহু মানুষের আকৃষ্ট হওয়ার কারণও একই।

বয়স্ক মানুষের অচেতনে থাকা মলের প্রতি টান বা আকর্ষণ স্বপ্নে মুদ্রার বা টাকার আকর্ষণে রূপ নেয়। এই পর্যায়ে প্রশ্ন উঠবে, টাকাপয়সা কিভাবে মলের প্রতীক হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ভাষায় চালু কিছু প্রবাদ বা কথাবার্তা থেকে এরকম প্রতীকের অর্থ বার করে ফেলা খুব একটা কঠিন নয়। অনেক সময় টাকাকে 'হাতের ময়লা' বা 'হাতকা ময়লা' বলা হয় বাংলায় বা হিন্দীতে। ইংরেজিতে Filthy Lucre' শব্দের অর্থ 'নোংরা অর্থচিন্তা'। এ সব শব্দের মধ্যে টাকাপয়সার সঙ্গে নোংরা বা ময়লার একটা যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। মুদ্রা বা কাগজের টাকা কুড়ানোর স্বপ্নে তাই টাকা বা মুদ্রা নোংরা, ময়লা মলের প্রতীক।

অচেতনে অতিশৈশবের মলের প্রতি ভালবাসা কেন ময়লাঘাঁটার স্বপ্ন হিসেবে না এসে টাকাপয়সা কুড়ানোর স্বপ্ন হিসেবে আসে? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ। মনের প্রহরী সজাগ থাকায় মল ঘাঁটার বাসনা সরাসরি স্বপ্নে চলে আসতে পারে না। ঐ ইচ্ছাকে অচেতন থেকে চেতনায় আসতে হয় ছদ্মবেশে, প্রতীকের সাহায্য নিয়ে। তা নইলে মনের প্রহরী কখনই অবিকৃত অবস্থায় ঐ ইচ্ছাকে সরাসরি স্বপ্নে আসতে দিত না। মুদ্রা কুড়ানোর স্বপ্নে হারিয়ে যাওয়া অতিশৈশবকে ফিরে পেয়ে খুব আনন্দ পান স্বপ্নের দর্শক। পরের দিকে অনেক সময় দর্শকের মনে দেখা দেয় লজ্জাবোধ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মুদ্রা কুড়ানোর স্বপ্নে আরও বেশি মুদ্রা হাতে পেতে, আরও বেশি মাটি খুবলাতে গিয়ে, নখের নীচে মাটি ঢুকে লজ্জা হতে থাকে তাঁর। নখের নীচে মাটি ঢোকা আর ময়লা ঢোকা প্রায় সমার্থক। হাত নোংরা হতেই মনের প্রহরী স্বপ্নের মধ্যেকার মলঘাঁটার ইচ্ছার একটা আভাস পেয়ে যায়। পরোক্ষভাবে তা বুঝতে পারেন স্বপ্নদ্রষ্টা। মনের প্রহরী আরও কড়া হওয়ায় একটা পর্যায়ে মুদ্রা কুড়ানোর স্বপ্ন যায় ফুরিয়ে। স্বপ্নদ্রষ্টা 'মুদ্রা কুড়ানোর নামে 'নোংরা ঘাটার' জন্য মনে মনে লজ্জিত হতে পারেন। টাকা কুড়ানোর অনেক স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শক শৈশবের মলঘাঁটার মতো অনাবিল আনন্দ পান। যদিও তাঁর মনে হয় তাঁর এই আনন্দ কুড়িয়ে টাকার মতো দুর্মূল্য জিনিস পাবার জন্য।

এরকম স্বপ্নের বিস্তারিত বিশ্লেষণ জেনে স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যা মেনে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয়। এরকম কোনও স্বপ্নের আপাতঅর্থ (Manifest Content) আর স্বপ্নের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যিকারের অর্থের (Latent Content) মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। স্বপ্নের প্রতীকের অর্থকে ঠিক ভাবে বুঝতে না পারলে যে কোনও স্বপ্নের ভেতরকার গভীর অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। এই কারণে স্বপ্নকে বুঝতে গেলে স্বপ্নটাকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করে তার আনুষঙ্গিক তথ্যগুলোকে মাথায় রেখে ধাপে ধাপে

স্বপ্নের গভীর অর্থ বার করতে হবে। তা নইলে 'অমুক দেখিলে তমুক হইবে' ধরনের চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক 'স্বপ্ন অভিধান' মার্কা ব্যাখ্যাতে বিশ্বাস জন্মাবার সম্ভাবনা থাকবে।

বিবাহিত মানুষের বিয়ে না হবার স্বপ্ন

স্বপ্ন ১: মা একজনকে বলছেন, 'এতটা বয়স হয়ে গেল, এখনও তো মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলাম না।'

—গৃহবধূ, ৩২ বছর।

স্বপ্ন ২: আমাকে দেখতে এসেছে পাত্রপক্ষ। মনে হচ্ছে এখানেও বিয়ে না হলে আর কবে বিয়ে হবে?

—গৃহবধূ, ৪০ বছর।

স্বপ্ন ৩: মেডিকেল কলেজে রি-ইউনিয়ন। সব বন্ধুরা এসেছে। সবার বিয়ে হয়ে গেছে, শুধু আমারই বিয়ে হয় নি।

—চিকিৎসক, ৪২ বছর।

বিবাহিত মানুষ স্বপ্নে নিজেকে অবিবাহিত ভাবছেন বা দেখছেন এরকম আরও অনেক স্বপ্নের কথা অনেকে আমাকে বলেছেন। এরকম স্বপ্নের অর্থ কি? খুব সরলভাবে ভাবতে গেলে, নিজেকে অবিবাহিত দেখার মধ্যে স্বপ্নের দর্শক এরকম স্বপ্নে বিয়ের আগেকার 'স্বাধীন জীবন'-এ ফিরে যেতে চাইছেন। হতে পারে, যে তিনি বিবাহিত জীবনের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে দায়হীন প্রাকবৈবাহিক জীবনের স্বাধীনতা ভোগ করতে চাইছেন বলেই এরকম স্বপ্ন দেখছেন।

এরকম স্বপ্নের অর্থ সবার ক্ষেত্রে একই হবে তার কোনও মানে নেই। প্রত্যেক স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে তাঁর বিয়ের আগেকার আর বিবাহ-পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার ফারাক কতটা, কীরকম তা দেখা দরকার। জানা দরকার এই দুটো আলাদা জীবনের সুখ-দুঃখ তার মনে কি প্রভাব ফেলছে। অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে এই স্বপ্নগুলোকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ না করতে পারলে এরকম স্বপ্নের সঠিক অর্থ জানা সম্ভব নয়। 'বিয়ে' এরকম স্বপ্নদ্রষ্টার মনে কি অর্থ নিয়ে আসে, স্বপ্নদ্রষ্টার সাহায্যে তা বার করে ফেলতে পারলে এরকম স্বপ্নের অর্থ বার করা যায় সহজেই।

এরকম দুটো স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের অন্যরকম ইচ্ছা খুঁজে পাওয়া গেছে। ইচ্ছে করেই এই স্বপ্নদুটোর বিবরণ এখানে উল্লেখ করি নি। একজন শিক্ষকের এই ধরনের স্বপ্নের মধ্যে অন্য এক জন মহিলাকে বিয়ে করবার গোপন ইচ্ছা খুঁজে পেয়েছি। আর এক জন মহিলা স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নে তাঁর বিদেশ যাবার ইচ্ছা রয়েছে। হঠাৎ করে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় মহিলার আরও পড়াশোনায় ছেদ পড়ে। আর আরও পড়াশোনা তাঁর মনে কোনও একভাবে বিদেশযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত।

এরকম স্বপ্ন সম্পর্কে আনুষঙ্গিক তথ্যগুলো না জেনে কোনও সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। এই স্বপ্নে গোপন কোনও ইচ্ছাকে চাপা দিতে অনেক সময় প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার ভাব দেখা দেয়। 'এতটা বয়স হয়ে গেল, এখনও বিয়ে হল না'—স্বপ্নদ্রষ্টার মনে এরকম উদ্বেগ তৈরি হবার উদ্দেশ্য, স্বপ্নের মধ্যেকার গোপন ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁকে অন্ধকারে রাখা।

স্বপ্নে ভূতের ভয়

বাচ্চাদের ঘুমে ভূতের স্বপ্ন আসে প্রায়ই। তার কারণ ঐ বয়সে ভূতের অলীক অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকে প্রায় সবারই। বেশি বয়সেও ভূতের স্বপ্ন দেখে ভয় পেতে পারেন একজন মানুষ। যদি তিনি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন বা ভূতকে ভয় পান। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, কিছু পূর্ণবয়স্ক মানুষ ভূতের অস্তিত্বে ঘোর অবিশ্বাসী হলেও ভূতের স্বপ্ন দেখেন। আর স্বপ্নের মধ্যে যুক্তির সঙ্গে ধাক্কা লাগে অন্ধবিশ্বাসের। ব্যাপারটা বেশ মজার। এরকম কিছু স্বপ্নের কথা বলা যাক।

স্বপ্ন ১: ভূতে বিশ্বাস করি না, দেবদেবীতেও না—তবে ভূতঘটিত স্বপ্নের মধ্যে একটার কথা বলি।

একদিন দেখলাম একটা ঘর, তার মধ্যে একটা টেবিল, টেবিলটা অকারণে উঠছে, নামছে—বারবার—আমি আপ্রাণ নিজেকে স্বপ্নের ভেতরই বোঝাতে চেষ্টা করছি, না এটা হয় না, ভূত বলে কিছু হয় না—তবু কিছুটা ভয় পাচ্ছি—অথচ বাস্তবে ভূতের ভয় নেই, থাকবার কোনও কারণও ঘটেনি।

— —, ভাস্কর, ৭৬ বছর।

স্বপ্ন ২: তখন বয়েস ২৪/২৫ হবে—একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি—রাতে স্বপ্নে দেখছি, একটা গাছ থেকে একটা ভূত পা দোলাচ্ছে আর ভয় দেখাচ্ছে (আমার তখনও ভূতের ভয় ছিল না, আজও নেই)—আমি ওকে বলছি, আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, ও সব ভয় আমি পাই না—বলছি বটে, ভেতর থেকে ভয় লাগছে খুব—স্বপ্নেই খুব অবাক লাগছে—আমি কেন ভয় পাচ্ছি, মনে হচ্ছে, যুক্তি কত অসাড়।

— —, লেখক-সম্পাদক, ৫৫ বছর।

স্বপ্ন ৩: ভূতে বিশ্বাস নেই একটুও, তবু ভূতে তাড়া করে স্বপ্নে,—ছুটতে ছুটতে ভাবি, আমি তো ভূতে বিশ্বাস করি না, তবে ছুটছি কেন—তারপরই ভয়টা আবার ফিরে আসে—এই স্বপ্নটা বড় অদ্ভুত।

—সংগ্রাম মল্লিক, বিজ্ঞানকর্মী, ২৯ বছর।

ভূতের ভয়ের এই স্বপ্নগুলোর মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কিছুটা জটিল। তাই ভূত আর মনে ভূতের ভয় সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। 'মানুষের কাছে ভূত মানেই ভয়ঙ্কর কোনও বস্তু, ছাপোষা কোনও ভূতের অস্তিত্ব মানুষের মনে থাকতে পারে না।' আমাদের মনে ভূত আসলে অচেতন মনে চাপা পড়ে থাকা আক্রমণাত্মক মনোভাব বা হিংস্রতার প্রতীক। একজন সামাজিক মানুষের জীবনে মনের এই হিংস্রতা ও অন্য নিষিদ্ধ অবদমিত প্রবণতা নানা ভাবে নানা ভালো কাজ বা সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মধ্যে অথবা শিল্পীর ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়।

গিরীন্দ্রশেখর বসু লিখছেন, "অবদমিত ইচ্ছা যখন প্রতীকের সাহায্যে বা অপর কোনওভাবে সামাজিক রীতিনীতির আবেষ্টনে গৌণরূপে প্রকাশ পায় তখন তাহার Sublimation বা 'উদ্‌গতি' হইয়াছে বলা যায়"। আমাদের মনের হিংস্রতা বা আক্রমণের রুদ্ধ প্রবণতার Sublimation সাধারণত সভ্য মানুষ করেন সমাজের চোখে সৃষ্টিশীল বা ভালো এমন নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। সফল খেলোয়াড়, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, চিত্রকর, ভাস্কর—সবার নিজের কাজে চূড়ান্ত দক্ষতার পেছনে কাজ করে এরকম রুদ্ধ প্রবণতার উদ্‌গতি।

স্বপ্নদ্রষ্টারা জানাচ্ছেন, তাঁরা বাস্তবে ভূতের ভয় পান না। বাস্তবে কোনও শিক্ষিত মানুষই ভূতের ভয় পান না। ভূতের ভয়ের বদলে একটু গা ছমছম করে মাত্র। নিজের মধ্যে রুদ্ধ নিষিদ্ধ আবেগের উপস্থিতি সম্পর্কে সামান্য সচেতন হয়ে ওঠার জন্য এই গা ছমছমে ভাবটা আসে। স্বপ্নদ্রষ্টাদের প্রথম দু জন বিখ্যাত মানুষ। যথাক্রমে ভাস্কর ও লেখক। শিক্ষিত ও শিল্পী মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের আবেগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না। নানা ধরনের আবেগকে নানাভাবে চাপা দিতে চান। এই সব আবেগ অচেতন মনে চাপা পড়ে থাকে। অচেতনের নিষিদ্ধ ইচ্ছা এঁদের সৃজনশীলতায় প্রকাশ পায়। তেমনি বাস্তবের চাপা পড়া আবেগেও ভাস্করের ভাস্কর্যে বা লেখকের লেখার মধ্যে নানা ভাব (Form) এর মধ্য দিয়ে চালিত হয় বা উদ্‌গতি হয়।

এই রুদ্ধ প্রবণতা বা চাপা পড়া ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্পর্কে মনের দিক থেকে পরিষ্কার না থাকলে একজন মানুষ হয় ভূতে তীব্র ভয় পাবেন বা ভূতের ভয়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবেন। তিনজন স্বপ্নদ্রষ্টার মতো আমরা অনেকেই বলি, 'আমি ভূতটুতে বিশ্বাস করি না। ও সব ভয় আমার নেই।' সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মেয়ে আনা ফ্রয়েডের বই থেকে এ সংক্রান্ত লেখার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করব। অচেতন মনের হিংস্রতা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলে তাকে আটকাতে আমাদের মন নানা ধরনের 'রক্ষণাত্মক পদ্ধতি'র (Defence) সাহায্য নেয়। এরকম পদ্ধতিতে মানুষ অনেকসময় ভূতের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম (Identification) করে নেয়। এক্ষেত্রে 'নিজের অচেতন ইচ্ছাকে ভয়' দেখা দেয় ভূতের ভয় হিসেবে। 'We fear our own impulses.'

আনা একটি মেয়ের কথা লিখছেন, যার ভূতের ভয় ছিল মারাত্মক। দেখা গেল এই ভয় কাটাতে মেয়েটি নিয়মিত নানা ভুতুড়ে অঙ্গভঙ্গি করতে শুরু করল। আর তার ভূতের ভয়ও কমতে শুরু করল।

এক্ষেত্রে ভূতের সঙ্গে একাত্মতা (ভূতের ভয় আসলে নিজেকে ভয়) তার ভয় দূর করল। আনা ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত, 'ভূত আসলে একাত্মতা' (Identification is the Ghost).

ভাস্করের স্বপ্নে আসা যাক। ইনটেলেকচুয়াল এই স্বপ্নদ্রষ্টা নিজের ভেতরকার ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তিকে ভাস্কর্যের নানারূপে চালিত করেছেন সারা জীবন ধরে। চাপা দিয়েছেন নিজের আবেগকে। কাজের ফাঁকে বা অসুস্থ শরীরে এই রুদ্ধ আবেগগুলো বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। স্বপ্নে টেবিলের ভুতুড়ে ওঠানামা আসলে তাঁর ভেতরকার চাপা শোক, উচ্ছ্বাস বা আনন্দের অচেতন থেকে সচেতনে চলে আসার ইঙ্গিত। বিশিষ্ট মনোবিদ প্রণব বসুর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি এক মত। স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্নদ্রষ্টার বাস্তবের মানসিকতা মাথাচাড়া দেয়। 'আপ্রাণ নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি, না এটা হয় না'—এর অর্থ কি? এর অর্থ, স্বপ্নদ্রষ্টা নিজের চাপা পড়া আবেগ বা রুদ্ধ ইচ্ছা এভাবে বাইরে বেরিয়ে আসাকে আটকাতে চেষ্টা করছেন প্রাণপণে। যেভাবে একজন ইনটেলেকচুয়াল শিল্পী তার অনেক আবেগকে আমল না দিয়ে মনের গভীরে সুপ্ত অবস্থায় পাঠিয়ে দেন। ভাস্করের স্বপ্নের ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা সম্ভবত মনের গভীরে চাপা পড়ে থাকা সুপ্ত আবেগগুলোর সচেতনে চলে আসা। হতে পারে যে টেবিলের ওঠানামা ব্যাপারটা প্রতীকী। জীবনের ওঠানামাজড়িত আবেগের, সচেতনে ওঠানামার সঙ্গে স্বপ্নে এরকম ভুতুড়ে কাণ্ডের গোপন অর্থ।

লেখকের ছাত্রজীবনের শেষে দেখা ভূতের পা দোলানোর স্বপ্নের কথা ভাবা যাক। গাছ থেকে যে ভূতটা স্বপ্নের দর্শককে ভয় দেখাচ্ছে, সেই ভূত আসলে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে। আরও সরাসরি বলতে গেলে তাঁর অচেতন মনের ভয়ঙ্কর নানা ভাব। যা বাইরে বেরিয়ে আসায় 'এ সব ভয় আমি পাই না' বলা সত্ত্বেও নিজের ভেতরকার আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির চিত্ররূপ। ভূতকে দেখে তাঁর ভেতর থেকে ভয় লাগছে খুব। এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার মতো। প্রতিযোগিতামূলক একটা পরীক্ষার আগেই একজন মেধাবী ছাত্র এরকম স্বপ্ন দেখছেন। এর একটা সম্ভাব্য কারণ রয়েছে। যে কোনও এরকম প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত সফল হবার জন্য প্রয়োজন এক ধরনের 'কিলার ইনস্‌টিংকট'। স্বপ্নদ্রষ্টার অচেতন মনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সসম্মানে সফল হবার ইচ্ছা থেকে ঐ রুদ্ধ প্রবৃত্তি স্বপ্নে চলে এসেছে ভূতের বেশে। আর ঐ প্রবৃত্তিকে সশরীরে ভূতের ছদ্মবেশে হাজির হতে দেখেই মনে-মনে ভয় পাচ্ছেন স্বপ্নের দর্শক। স্বপ্নে এই ভয় আর 'আমি কেন ভয় পাচ্ছি' এই ভাবনা আসলে নিজের ভেতরকার ঐ প্রবৃত্তির সঙ্গে একাত্মতা আর পরক্ষণেই তা চাপা দেবার ইচ্ছা—এই বিপরীতমুখী দুই ভাবের সংঘর্ষের পরিণতি।

বিজ্ঞানকর্মীর স্বপ্নের আলাদা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গত বলি, ভূতের গল্প শুনতে বা ভূতের সিনেমা দেখতে ভালবাসেন অনেকেই। এর মধ্যে কাজ করে অচেতন মনের হিংস্র বা ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তি অনুভব কবাব আনন্দ। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'ইনস্‌টিংকটিভ্ প্লেজার'।

গাড়ি চাপা পড়ার স্বপ্ন

স্বপ্ন ১: একটা ট্রেন আমাকে চাপা দিয়েছে। আমার খণ্ডবিখণ্ড দেহটা লাইনের ধারে পড়ে আছে। আর আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। খুব মজা লেগেছিল স্বপ্নটা দেখে।

—, শিক্ষক, হাওড়া।

স্বপ্ন ২: রেলে কাটা পড়েছি—অথচ আমি জীবিত—এরকম স্বপ্ন বহুবার দেখেছি। কোনও অনুভূতি হয় নি।

—কালিপদ সেন, চাকরিজীবী, মেদিনীপুর।

স্বপ্ন ৩: একবার দুপুরে কাজ করতে করতে এক জন লোকের পায়ের ওপর দিয়ে ট্রেনের চাকা চলে যেতে দেখেছিলাম—রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমার পায়ের ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে—ঘেমেনেয়ে, চিৎকার করে ঘুম ভেঙে যায়।

—বাবলু দাস, রেলের হকার, চন্দনপুর।

স্বপ্ন ৪: দেখলাম আমি বাসে করে যাচ্ছি—হঠাৎ বাসটা একজায়গায় থেমে গেল—সামনে খুব

ভিড়—কেউ একজন আগে লরিতে চাপা পড়েছে—দেখলাম আমিই চাপা পড়েছি—আমার থ্যাঁতলানো দেহ রাস্তার ওপর শোয়ানো—রক্ত ঝরছে। খুব ভয়ে ঘুম ভেঙে গেছে।

—প্রহ্লাদ ঘোষ, রিক্সাচালক, বনগাঁ

স্বপ্ন ৫: বাসে চাপা পড়েছি—আমার দেহটা পড়ে আছে—এরকম স্বপ্ন দু'বার দেখেছি। ভয়ে ঘুম ভেঙে গেছে।

—পরীক্ষিৎ জানা, বিড়িশ্রমিক, কোন্নগর

স্বপ্ন ৬: একবার বর্ধমান স্টেশনে চোখের সামনে এক জনকে চাপা পড়তে দেখি—রাতে স্বপ্ন দেখলাম একটা এক্সপ্রেস ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছি, হঠাৎ পা স্লিপ করে ট্রেনের তলায় চলে গেলাম—প্রচণ্ড আতঙ্কে গোঁ গোঁ আওয়াজ করে ঘুম ভেঙে যায়—প্রচণ্ড বুক ধড়ফড় করছিল।

— —, টিকিট পরীক্ষক, বেলমুড়ি।

স্বপ্ন ৭: আমি বাসের জানালা ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছি—ভিতর থেকে কেউ একটা খোঁচা দিল—আমি বাসের নিচে চলে গেলাম—তেমন কিছু মনে হয়নি।

—মইদুল ইসলাম, শিক্ষক, মৈমনসিংহ।

স্বপ্ন ৮: একবার মিনিবাস অ্যাকসিডেন্ট এর স্বপ্ন দেখি, ক্র্যাশ করে আমি প্রায় মরতে বসেছি। সকালে উঠে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

—গৌতম ভট্টাচার্য, সাংবাদিক, কলকাতা।

যাঁরা এরকম স্বপ্ন দেখছেন তাঁদের প্রত্যেকের মানসিকতা তাঁদের একান্ত নিজস্ব। স্বপ্নগুলোতে প্রত্যেকে নিজের মৃত্যু দেখছেন। এক্ষেত্রে, স্বপ্নের প্রত্যেকটা শব্দ ধরে ধরে স্বপ্নদ্রষ্টাব আনুষঙ্গিক অনুভূতি (Association) বার করে আনতে পারলে, প্রত্যেক স্বপ্নের অর্থ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইয়ুন এই পদ্ধতিতে ('ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশান টেস্ট') বহু মানুষের বহু জটিল স্বপ্নের অর্থ বার করেছিলেন। বাসের জানালা ধরে ঝুলতে ঝুলতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর ক্ষেত্রে (স্বপ্ন ৭) ঐ জানালা স্বপ্নদ্রষ্টার মনে কি অর্থ বহন করে তা জানতে না পারলে এই স্বপ্নের সঠিক অর্থ বলা যাবে না। কারণ একই বস্তু এক-একজন মানুষের মনে এক-একরকম অর্থ নিয়ে আসতে পারে। তবে এই স্বপ্নগুলো সম্পর্কে কিছু সাধারণ কথা বলা যায়।

এই স্বপ্নগুলোতে মৃত্যুচিন্তা থাকবার সম্ভাবনা খুব বেশি। এমনও হতে পারে যে সেটা মৃত্যুভয়। আমাদের মনে যখনই কোনও ভয় আসে, বুঝতে হবে তার পিছনে ভয় পাবার একটা ইচ্ছা বা 'উইশ' কাজ করছে। ব্যাপারটা পাঠকের কাছে আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর বলে মনে হতে পারে । একটু বিশদে যাওয়া যাক। ধরা যাক, এক জন মানুষের মনে হঠাৎ করে অকারণে সাপের ভয় দেখা দিল। এরকম ভয়ের জন্য দায়ী ঐ মানুষের অচেতন মনের সাপের চিন্তা নিয়ে আসবার প্রবণতা বা ইচ্ছা। আসলে, এই ইচ্ছা বা 'উইশ'কেই মানুষটা ভয় পাচ্ছেন। অনেক সময় আমরা আমাদের মনের ভেতরের আবেগকে ভয় পাই। এরকম আবেগের মধ্যে মৃত্যু ইচ্ছা চলে আসলে আমরা ভয় পাই তাকেও। ব্যাপারটা তাই এরকম হতে পারে যে 'আমার মৃত্যু ভয় আসলে আমার মৃত্যু ইচ্ছা'।

গাড়ি চাপা পড়ার স্বপ্নের মধ্যে বেশির ভাগ সময় একধরনের মৃত্যু ইচ্ছা কাজ করে, এটা সাধারণভাবে বলা যায়। স্বপ্নগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) যেখানে চাপা পড়া সত্ত্বেও স্বপ্নদ্রষ্টার মনে আনন্দ বা মজার ভাব দেখা দিচ্ছে।

(খ) যেখানে নিজের মৃত্যু হচ্ছে দেখে স্বপ্নদ্রষ্টা প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন।

(গ) যেখানে নিজের মৃত্যুর দৃশ্যের প্রতি স্বপ্নদ্রষ্টা ভাবাবেগহীন।

যে কোনও অ্যাকসিডেন্ট মানেই একটা বিপর্যয়। আর বিপর্যয় মানেই দুঃখ, যন্ত্রণা। তা সত্ত্বেও নিজের অ্যাকসিডেন্টের স্বপ্নে দর্শক আনন্দ পাচ্ছেন (স্বপ্ন ১)। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এর অর্থ কি? এরকম স্বপ্নে নিজের খণ্ডবিখণ্ড দেহ দেখে আনন্দ পাচ্ছেন স্বপ্নদ্রষ্টা। দুঃখ-যন্ত্রণার বিপরীত এই আনন্দের কারণ হল স্বপ্নদ্রষ্টার দেহটা আসলে তাঁর নয়, দেহটা অন্য কোনও মানুষের। যাঁর মৃত্যু চিন্তা থেকে এরকম স্বপ্নের জন্ম। মনের প্রহরীকে ফাঁকি দিতে অন্যের মৃতদেহ স্বপ্নে আসছে স্বপ্নের দর্শকের

নিজের মৃতদেহের ছদ্মবেশে। গাড়ি চাপা পড়ার স্বপ্নে খুব আনন্দ হলে এটা বলা যায় যে, আসলে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে চাপা পড়ছেন না। চাপা পড়ছেন, তিনি অচেতন মনে যাঁর মৃত্যু চাইছেন, এমন কোনও মানুষ। এই মানুষটা কে, তা 'অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি'তে স্বপ্নটাকে বিশ্লেষণ করলেই বার করে ফেলা সম্ভব।

যেখানে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজের মৃত্যু দেখে ভয় পাচ্ছেন সেখানেও মৃত্যুর চিন্তা আসতে পারে। এটা হতে পারে বারবার একই দৃশ্য দেখে ভয়ঙ্কর কোনও দৃশ্যের ভয় কাটাবার জন্য। লাইন পার হতে যাওয়া মানুষকে কাটা পড়ার দৃশ্য দেখা হকারের স্বপ্নে (স্বপ্ন ৩) ভয় আসছে এই কারণে। এটা অনেকটা শরীরের কোনও ব্যথার জায়গা বারবার টিপে ব্যথাকে 'সহনীয়' করে তোলার ইচ্ছার মতো ব্যাপার। হয়তো তাঁর পেশা বা বর্তমান অবস্থাকে মেনে নিতে পারছে না একজন মানুষের মন। ভেতর থেকে আসা বা বাইরের কষ্ট যন্ত্রণাতে হয়তো ঐ মানুষের মন জর্জরিত। এরকম হলে অনেক সময় অনেককে বলতে শোনা যায়, 'এর থেকে মরে গেলে বাঁচি'। মৃত্যু এখানে মৃত্যু নয়, বর্তমান অবস্থা থেকে রেহাই পাবার ইচ্ছা। স্বপ্নে যা অ্যাকসিডেন্টে নিজের মৃত্যুর রূপক হিসেবে চলে আসতে পারে।

অ্যাকসিডেন্টের স্বপ্নে ভয় আসতে পারে অন্য কারণেও। 'এরকম হলে তুমি এরকম যন্ত্রণা পাবে, সাবধান'—অনেক সময় স্বপ্নদ্রষ্টাকে এভাবে সাবধান করতেও এরকম স্বপ্নে চূড়ান্ত ভয় বা যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে। সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্যের মিনিবাস 'ক্র্যাশ' করবার স্বপ্ন (স্বপ্ন ৮) যেমন। গৌতম জানিয়েছেন, স্বপ্নটা দেখার পর ক-দিন রাস্তায় যাতায়াতের সময় তাঁর প্রায়ই মনে হয়েছে, রাস্তা চলাচলে তাঁর আরও সাবধান হওয়া উচিত। অ্যাকসিডেন্ট সংক্রান্ত এই স্বপ্ন আসলে স্বপ্নের দর্শককে 'সাবধান করে দেবার স্বপ্ন' বা 'ওয়ার্নিং ড্রিম'।

টিকিট পরীক্ষকের ট্রেনের তলায় চলে যাবার স্বপ্নকে (স্বপ্ন ৬) আপাতদৃষ্টিতে এরকম 'ওয়ার্নিং ড্রিম' বলে মনে হলেও এই স্বপ্ন আসলে 'শাস্তি পাবার স্বপ্ন' বা পানিশমেন্ট ড্রিম। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে আমার তাই মনে হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের কিছু পাপবোধ থেকে নিজেকে নিজে শাস্তি দেওয়া এই স্বপ্নের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছি 'ভয়ের স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন' অধ্যায়ে।

যেখানে অ্যাকসিডেন্টে নিজের মৃত্যু দেখেও স্বপ্নের দর্শক উদাসীন, সেখানে অবশ্যই স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যু ইচ্ছা কাজ করছে স্বপ্নটার মধ্যে। অচেতন মনে একজন মানুষ বাস্তবকে মেনে নিতে না পেরে এভাবে অস্বীকার করতে চাইতে পারেন, তা আগে বলেছি। দুর্ঘটনায় নিজের মৃত্যুর ভয়কে ছাপিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা এখানে নিজের মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন। কারণ মনের গভীরে থাকা মৃত্যু ইচ্ছার সঙ্গে স্বপ্নে নিজের মৃত্যু দৃশ্যের অনুভূতির একাত্মতা (Unity) বোধ করছেন স্বপ্নের দর্শক। স্বপ্ন ২ আর স্বপ্ন ৭ এই ধরনের। অনেক সময় মৃত্যু ইচ্ছার এরকম চিত্রায়ন স্বপ্নে দেখে ভয় পেয়ে যেতে পারেন স্বপ্নের দর্শক। এরকম হয় স্বপ্ন দেখতে দেখতে মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করতে না পারলে। স্বপ্ন ৪ আর স্বপ্ন ৫-এ স্বপ্নের দর্শক গাড়ি চাপা পড়ে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন এই কারণে। এরকম মৃত্যু ইচ্ছার কথা কিন্তু স্বপ্ন দেখা মানুষ সজ্ঞানে জানেন না।

এই আটটা স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে পাঠক একটা ব্যাপার বুঝতে পারবেন। একই ধরনের স্বপ্ন দেখবার সময় বা পরে স্বপ্নের দর্শকের অনুভূতি স্বপ্নের গোপন অর্থ বার করবার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটা যে কোনও মানুষের যে কোনও স্বপ্ন সম্পর্কেই বলা যায়। আবার একই ধরনের স্বপ্ন একই অনুভূতি নিয়ে এলেও তার অর্থ আলাদা হতে পারে। এ ব্যাপারে স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিকতা, জীবন, পেশা সংক্রান্ত নানা তথ্য আর কোনও একটা ঘটনার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি—এসবই বিবেচনা করা দরকার। তা না হলে অতিসরলীকরণের জন্য স্বপ্নের অর্থ বুঝতে ভুল হতে পারে। এখানে ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ নম্বর স্বপ্নের মূল ভাব মোটামুটি এক হলেও আনুষঙ্গিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে স্বপ্নের অর্থ তিন ধরনের বলে বোঝা যায়।

দেরি হয়ে যাবার স্বপ্ন

স্বপ্ন ১: একটা টেনশনের স্বপ্ন দেখি মাঝেমধ্যে—কোথাও যাব—গোছগাছ করছি, অন্য সব প্রস্তুতি চলছে—কিছুতেই গোছানো শেষ হচ্ছে না—সবাই তাড়া দিচ্ছে—শেষে আমি পৌঁছোবার আগেই ট্রেন বা বাসটা ছেড়ে চলে গেল।

—মল্লিকা সেনগুপ্ত।

স্বপ্ন ২: এরকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখি। কোথাও আমার অনুষ্ঠান আছে। আমার সেখানে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি তাড়াহুড়ো করছি। তাড়াতাড়ি যেতে চাইছি। কিন্তু গাড়ি বিভ্রাট, জ্যাম বা অন্য কোনও কারণে আরও দেরি হয়ে যাচ্ছে।

--পল্লব কীর্তনীয়া, সঙ্গীতশিল্পী।

স্বপ্ন ৩: স্কুল যাবার তাড়া, হাতে সময় খুব কম। তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছি। কিছুতেই খাওয়া শেষ হচ্ছে না। এদিকে হাতে আর একটুও সময় নেই। খুব টেনশনের মধ্যে ঘুমটা ভেঙে যায়।

—বীথি চৌধুরী, শিক্ষিকা।

স্বপ্ন ৪: কাল পরীক্ষা। আমি স্বপ্নে বইখাতা নিয়ে বসেছি—কিছুতেই পড়া শেষ হচ্ছে না—রাত হয়ে যাচ্ছে। ঘুম পাচ্ছে—কাল সকালে উঠেই পরীক্ষা দিতে ছুটতে হবে। কি করে সব পড়া শেষ হবে—খুব টেনশন হচ্ছে।

—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নাতোকোত্তর ছাত্র।

স্বপ্ন ৫: হাসপাতাল যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে—খুব তাড়াহুড়ো—হয়তো ব্রিফকেসটাই খুঁজে পাচ্ছি না, কিম্বা জুতো—এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে—এরকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখি।

—ডা. তুষারকান্তি ঘোষ, চিকিৎসক।

স্বপ্ন ৬: কোথাও যাবার কথা আছে—অথচ গোছগাছ শেষ করতে পারছি না—এদিকে সময় চলে যাচ্ছে—অনেক চেষ্টা করেও তাড়াতাড়ি তৈরি হতে পারছি না—দেরি হয়ে যাচ্ছে—এটা প্রায়ই দেখি।

—শিপ্রা চৌধুরী, গৃহবধূ।

এরকম তাড়াহুড়ো আর তা থেকে তৈরি হওয়া টেনশানের স্বপ্ন আরও পেয়েছি।এই স্বপ্নগুলোর মূল উপাদান এক। তাড়াহুড়ো করেও স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁর প্রস্তুতি শেষ করতে পারছেন না। বাস্তবে এরকম অভিজ্ঞতা রয়েছে অনেকের। আর তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বাস্তবের এরকম টেনশন এই ধরনের স্বপ্নে চলে আসে। এরকম স্বপ্নের মনোবৈজ্ঞানিক অর্থ কিন্তু এরকম নয়।

এরকম স্বপ্নে মূল ভাবটা এরকম। 'আমি যেতে চাইছি, আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না।' কিম্বা 'আমি পড়তে চাইছি কিন্তু পারছি না'। এরকম ভাবনার মধ্যে অন্য একটা ইচ্ছার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তা হল 'আমি যেতে চাইছি না' বা 'আমি পড়তে চাইছি না'। আর এরকম স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের এই গোপন ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হচ্ছে।

পল্লবের স্বপ্নের অর্থ এরকম হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখা যাক। পল্লব আসলে গানের অনুষ্ঠানে যেতে চাইছেন না। একজন সংগীতশিল্পী, গান গাওয়া যাঁর পেশা, গানের অনুষ্ঠানে যেতে চাইবেন না কেন? পল্লবের স্বপ্নের অর্থ তা হলে কি এরকম, যে, গান গাইতে তাঁর ভাল লাগে না? একজন সংগীতশিল্পীর পক্ষে এরকম ব্যাপার প্রায় অসম্ভব। গান গাইতে ভালো লাগে বলেই তো তিনি অন্য সম্ভাবনাময় পেশা ছেড়ে এরকম একটা ঝুঁকির পেশা বেছে নিয়েছেন। আসলে গান গাওয়া প্রিয় শখ আর পেশা হলেও পল্লব অবচেতন মনে মুখোমুখি শ্রোতাদের হাত থেকে রেহাই পেতে চান। তাই গাড়ি বিভ্রাট বা জ্যামে তিনি কিছুতেই অনুষ্ঠানে ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারছেন না। আর এই স্বপ্নে তাঁর গানের শ্রোতাদের মুখোমুখি না হবার ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে।

পাঠক প্রশ্ন করবেন, এরকম স্বপ্নের অর্থ যদি তাই হয়, তবে স্বপ্নগুলোতে এত টেনশন আসছে কেন? স্বপ্নে যে কোনও অলীক ব্যাপার বা ঘটনা 'বাস্তব' হয়ে আসে। আসে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে। বাস্তবে তাড়াহুড়োতে যে টেনশন দেখা দেয়, এক্ষেত্রে তা চলে আসছে স্বপ্নে। স্বপ্নগুলোতে স্বপ্নের দর্শকের টেনশনের কারণ এটাই।

সুব্রতর পরীক্ষার প্রস্তুতি কিছুতেই শেষ না হবার অর্থ, তাঁর মন চাইছে, কাল সকালে উঠে পরীক্ষা দিতে না যেতে। ছাত্রজীবনের ভয়ঙ্করতম অভিজ্ঞতা পরীক্ষা। এই অভিজ্ঞতার হাত থেকে যে কোনও ছাত্রছাত্রী রেহাই পেতে চাইতেই পারেন! যেমন চেয়েছেন সুব্রত। এটা কোনও অস্বাভাবিক ইচ্ছা নয়। কিন্তু শিক্ষিকা বীথি কেন স্কুলে যেতে চাইবেন না? বীথি জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক কারণে তাকে স্কুলের চাকরি করতে হয়। কিন্তু স্কুলের পরিবেশ বা রাজনীতি তাঁর একেবারেই ভাল লাগে না। আর উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পড়াশোনা সম্পূর্ণ করা এই মহিলার ইচ্ছা ছিল গবেষণা করবার। পড়ানো বা স্কুলে যাওয়া বীথিকে করতে হয় তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এ সব তথ্য জানবার পর বীথির স্বপ্নের গোপন অর্থ নিয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

তুষার চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তবু মন থেকে এই পেশাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি কোনওদিন। তার ঝোঁক ছিল সাহিত্যের দিকে। বাবার নির্দেশে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তার হতে হয়েছিল তাকে। তাঁর এরকম স্বপ্নের অর্থ ডাক্তারি করতে না চাওয়ায় ইচ্ছা—এটা তুষার মেনে নিয়েছেন। তাঁর স্বপ্নের এরকম অর্থ মেনে নিয়েছেন বীথিও।

শুধু স্বপ্নের এই অর্থের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি মল্লিকা। সাধারণত বাইরে কোথাও যাবার আগে তাড়াহুড়ো থাকে ওঁর। মল্লিকার মনে হয়, সেই জায়গাটায় যেতে মন চায় না বলে স্বপ্নটা আসে, তা নয়। বাইরে বেরোবার আগে গোছগাছ করবার টেনশনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়তো ওঁর এরকম স্বপ্নে চলে আসে। একা একা প্রায় সবকিছু গোছাতে হয়। স্বামী শুধু তাড়া দেন। সাহায্য করেন ছিটেফোঁটা। মল্লিকার এরকম স্বপ্নের অর্থ গোটা গোছগাছ পর্ব থেকে রেহাই পাবার ইচ্ছা। মনোবিজ্ঞানসম্মত স্বপ্নবিশ্লেষণে এই স্বপ্নের এছাড়া অন্য কোনও ইচ্ছা খুঁজে পাওয়া যায় নি।

স্বপ্নে নিরীহ জীবের ভয়

স্বপ্ন ১: স্বপ্নে মাকড়সা দেখে খুব আতঙ্ক হয়—ভয়ে ঘুম ভেঙে যায়—ছেলেবেলা থেকেই মাকড়সা আমার কাছে বড় ভয়ের বস্তু।

—পার্বতী ভট্টাচার্য, গৃহবধূ, কলকাতা।

স্বপ্ন ২: মাঝেমধ্যে বেড়ালের স্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠি। ভয় পাই। মনে হয় আমার শিয়রে বেড়াল বসে আছে। বাস্তবেও বেড়াল দেখলে বড় অস্বস্তি হয়। খুব ভয় করে।

—নির্মল হালদার, কবি, পুরুলিয়া।

স্বপ্ন ৩: খুব কম হলেও এরকম স্বপ্ন চার পাঁচবার দেখেছি। একটা বা অনেক আরশোলা ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমার ওপর। প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করে ঘুম ভেঙে যায়। দিনেরবেলায় একই ব্যাপার। আরশোলাকে খুব ভয় পাই।

—তৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, গৃহবধূ, বাঁকুড়া।

স্বপ্ন ৪: ছোটবেলায় টিকটিকির স্বপ্ন দেখতাম বারবার। ভয়, আতঙ্ক হত। কিছু দিন আগে ঐ স্বপ্ন আবার আমাকে বিব্রত করতে শুরু করেছিল। একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলাম, আমাদের রানাঘাটের বাড়ি। বাইরে লম্বা বারান্দা পেরিয়ে উঠোন—ঘরে হাজার হাজার সাদা টিকটিকি—কিছু মৃত, তাঁদের গায়ে লাল পিঁপড়ের সারি—ঐ অবস্থাতেও ওরা নড়ছে—আমার ভাই দৌড়ে বেশ কয়েকটা টিকটিকি মাড়িয়ে চলে গেল—আমি পারলাম না—ভয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল।

একটা সময় এরকম স্বপ্ন দেখতাম খুব বেশি। স্বপ্ন দেখে পর দিন ভয় আর আতঙ্কের ভাবটা থেকে যায় সকালে, এমনকি দুপুর পর্যন্ত।

—জয় গোস্বামী।

ইঁদুর, আরশোলা, কুকুর, বিড়াল বা টিকটিকি—এসব জীব আদৌ ভয়ঙ্কর কিছু নয়। তবু, অনেক সময় দেখা যায় এরকম কোনও একটা জীব বা নির্দিষ্ট কোনও কীটপতঙ্গ দেখে অতিরিক্ত ভয় পাচ্ছেন কোনও একজন মানুষ। পুরুষ কিম্বা মহিলা। কম লেখাপড়া জানা গ্রাম্য পুরুষ বা মহিলা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত শহুরে লোকজন—সব শ্রেণীর মধ্যে কিছু মানুষের এরকম অকারণে কোনও জড়বস্তু বা নিরীহজীবকে ভয় পাবার ব্যাপারটা লক্ষ করা যায়। এক মহিলাকে জানি, যিনি আরশোলা দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে বেশ কয়েকবার বিপদে পড়েছেন। টিকটিকি দেখলে কিছুক্ষণের জন্য কেমন যেন কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় কবি জয় গোস্বামীর। ছোটবেলায় রাণাঘাটের বাড়িতে টিকটিকি দেখলে বাড়ির উঠোন পেরিয়ে, পাঁচিল টপকে জঙ্গলে চলে যেত বালক জয়। ওখানে যে সাপে কাটতে পারে, সেই জ্ঞানটাও লোপ পেত।

বাস্তবে নিরীহ জীব বা জড়বস্তুকে দেখে দর্শকের মনে এরকম অস্বাভাবিক ভয় দেখা দেয় কেন? অনেক সময় দেখা যায়, এরকম বস্তু দেখে ভয়ের বদলে ঘেন্না বা ভালবাসা দেখা দিচ্ছে। মনোবিজ্ঞান বলে, কোনও বস্তু বা জীবকে দেখে এরকম অস্বাভাবিক মনোভাবের কারণ, দর্শকের মনে ঐ বস্তু বা জীব কোনও একটা নিষিদ্ধ ভাবের প্রতীক। আর এই ভাব রয়েছে দর্শকের অচেতন মনে।

নির্দিষ্ট একটা নিষিদ্ধ ভাব টিকটিকি, আরশোলা, কুকুর, বিড়াল মাকড়সাকে আশ্রয় করে ছদ্মবেশে অচেতন মন থেকে সচেতনে চলে আসে। অচেতন মনে আশ্রিত কোনও নিষিদ্ধ ভয় আরশোলার মতো নিরীহ জীবকে প্রতীক করে সচেতনে চলে এলে আরশোলা দেখে ভয় লাগে। কিন্তু কেন এই ভয় তা আরশোলা বা টিকটিকি দেখে ভয় পাওয়া মানুষ বলতে পারবেন না। কেন না তার অচেতন মনে এরকম জীব কোন ভাবের বা ইচ্ছার প্রতীক তা তিনি সচেতনে জানেন না। একই কারণে অচেতনের নিষিদ্ধ আনন্দ কোনও জীবকে প্রতীক করে সচেতনে চলে এলে ঐ জীবকে দেখে অস্বাভাবিক আনন্দ হবে।

বাস্তবে যাঁরা এরকম ভয় পান, তাঁদের অচেতন মনের গোপন ভাব বা ইচ্ছা স্বপ্নেও আসতে পারে একই প্রতীকের ছদ্মবেশে। স্বভাবতই ওইরকম স্বপ্ন দেখে স্বপ্নের দর্শক ভয় পান, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই স্বপ্নগুলো বাস্তবের মতোই তার মনে ভয় বা আতঙ্কের জন্ম দেয়। যার রেশ থেকে যেতে পারে ঘুম ভাঙবার পরও। প্রশ্ন উঠবে, এরকম স্বপ্নে মাকড়সা, বিড়াল, আরশোলা বা টিকটিকি কিসের প্রতীক? স্বপ্নের দর্শকের কাছ থেকে এর উত্তর পাওয়া যাবে না। জয়ের মনে টিকটিকি বা নির্মলের মনে বিড়াল কিসের প্রতীক তা বার করার জন্য মনোসমীক্ষণ বা সাইকোঅ্যানালিসিস পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। তা নইলে এরকম প্রতীকের অর্থ জানা যাবে না। পাঠক লক্ষ করবেন, এরকম ক্ষেত্রে প্রতীক দেখে বাস্তবে আর স্বপ্নে একই ভয় দেখা দেওয়ায় এরকম স্বপ্নগুলো ব্যতিক্রমী।

এরকম স্বপ্ন মাঝেমধ্যে এক-আধবার দেখলে তেমন একটা গুরুতর প্রভাব পড়ে না স্বপ্নদ্রষ্টার মনের ওপর। কিন্তু ঘন ঘন এরকম স্বপ্ন দেখতে থাকলে এক জন মানুষের মনের স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হতে পারে। স্বপ্নের দর্শক আক্রান্ত হতে পারেন মানসিক সমস্যায়। এরকম হলে দ্রুত মনোবিদ বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া দরকার। তা নইলে, গুরুতর মানসিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নদ্রষ্টার বাস্তব জীবন।

স্বপ্নের কিছু বিশেষ দিক

একজন মানুষের জেগে থাকা অবস্থার সঙ্গে তার দেখা স্বপ্নের যোগাযোগ ঠিক কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যাক। ব্যাপারটা জরুরি। কেন না এক জন মানুষের স্বপ্নে তার জেগে থাকা অবস্থার অভিজ্ঞতা কীভাবে ঢুকে পড়ে, কীভাবে দিনের বেলার কোনও অভিজ্ঞতা স্বপ্নে চলে আসে পরিবর্তিত হয়ে তা বুঝে নেওয়া দরকার।

যে কোনও স্বপ্ন দিনের বেলার কোনও একটা ভাবা, দেখা, বলা বা শোনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়। মনোবিদ উইলহেম্ ফ্লিস্ (Wilhelm Fliess, 1906) জেগে থাকা অবস্থার কোনও অভিজ্ঞতা থেকে স্বপ্ন তৈরি হতে প্রায় এক মাস সময় লাগে বলে তাঁর গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন। ফ্লিসের এই সময়কাল ছিল ২৩ দিন (মেল পিরিয়ড) থেকে ২৮ দিন ('ফিমেল পিরিয়ড')। তারও দু বছর আগে ১৯০৪ সালে গবেষক হারম্যান সোবোদা (Herman Swoboda) জানান, জেগে থাকা অবস্থার কোনও সূত্র (source) থেকে নির্দিষ্ট স্বপ্ন তৈরি হতে ১৮ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। ফ্রয়েড তাঁর নিজের ও অন্যদের বহু স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে সোবোদা ও ফ্লিসের তত্ত্বকে বাতিল করে দেন। ফ্রয়েড বলেন, জেগে থাকা অবস্থার কোনও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেই রাতে দেখা স্বপ্নের একটা না একটা যোগাযোগ অবশ্যই থাকে। আর এই অভিজ্ঞতার সময় থেকে স্বপ্ন দেখবার সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনও সময়ের ব্যবধান থাকতেই হবে, সোবোদার এরকম তত্ত্ব ভুল। নিজের দেখা কয়েকশো স্বপ্নের ক্ষেত্রে দিনের বেলাকার সূত্র আর স্বপ্নের সময়ের ব্যবধান দেখে, আমার ফ্রয়েডের এই ধারণাকে সঠিক বলে মনে হয়েছে।

যে রাতে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখছেন, তার আগের জেগে থাকা অবস্থার দিনটাকে ফ্রয়েড স্বপ্নের নিরিখে 'ড্রিম-ডে' বলে নির্দিষ্ট করেছেন। যে কোনও স্বপ্ন ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সেই দিনের কোনও না কোনও সূত্র থেকে স্বপ্নটার জন্ম। অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, অনেক আগেকার কোনও অভিজ্ঞতা থেকে কোনও স্বপ্ন তৈরি হয়েছে। 'ড্রিম-ডে'র অভিজ্ঞতাগুলোকে স্বপ্নের দর্শক বিস্তারিতভাবে মনে করবার চেষ্টা করলে দেখা যাবে, এরকম একটা অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্বপ্নটা অবশ্যই যুক্ত। যে অভিজ্ঞতার সূত্রে স্বপ্নে চলে এসেছে আরও আগেকার কোনও স্মৃতি। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক:

প্রথম পর্যায়

স্বপ্ন ১: দেখলাম, ল্যাম্পপোস্টের নিচে 'দু-টাকায় চারটে' পেল্লায় সাইজের রসগোল্লা বিক্রি হচ্ছে। আমি আর আমার ছেলে গপাগপ্ রসগোল্লা খাচ্ছি।

সূত্র: স্বপ্নের দর্শক আগের দিন বিকেলে বাসে যেতে যেতে এক লজেন্স বিক্রেতাকে 'দু-টাকায় চারটে, টকমিষ্টি লেবু লজেন্স!' বারবার এই কথাগুলো বলতে শুনেছিলেন।

স্বপ্ন ২: দেখলাম পি. সি. সরকার ম্যাজিক দেখাচ্ছেন, আমি মঞ্চে। আমাকে তিন টুকরো করে ফেললেন জাদু দিয়ে। গলাটা বাদ দিয়ে জুড়ে দিলেন।

সূত্র: (ক) আগের দিন ক্লাসে বন্ধু পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখে এসে গল্প বলেছিল।

(খ) রাতে গলা ব্যথায় কষ্ট হচ্ছিল।

স্বপ্ন ৩: একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম; গোটা বগিতে এক

জন মাত্র মানুষ, সাদাকোট পরা।

সূত্র: আগের দিন সকালে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পুরোপুরি থামবার আগেই অনেকে লাফ মেরে ফাঁকা বগিতে উঠে বসে পড়ছিল।

স্বপ্ন ৪: স্ত্রী ওঁর মায়ের কাছে গেছেন তিন দিনের জন্য। রাতে শুতে যাবার আগে মশারি টাঙাতে গিয়ে মনে হল আরও দু দিন—।

সূত্র: আগের দিন বিকেলে এক সহকর্মী ক্যান্টিনে দুপুরের খাবার খেতে খেতে জানান, এখন তাঁর স্ত্রী ওঁদের বাড়িতে গেছেন—বাইরে খেতে হচ্ছে।

স্বপ্ন ৫: দেখলাম, একটা দূরপাল্লার ট্রেন থেকে একটা স্টেশনে নামলাম, রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, মনে হচ্ছে জায়গাটা যেন গোপালপুর।

সূত্র: 'দেশ' পত্রিকায় গোপালপুরের পটভূমিকায় লেখা একটা ছোটগল্প পড়তে পড়তে ঘুম এসে গিয়েছিল।

স্বপ্ন ৬: আমি আর আমার ছেলে একট স্টেশনের ওভারব্রিজ দিয়ে নামছি—ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেল।

সূত্র: আগের দিন সন্ধ্যায় এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে হচ্ছিল, রাতে তাড়াতাড়ি শুতে হবে। ঘুম ভাঙতে দেরি হলে ট্রেন মিস্ হবে।

স্বপ্ন ৭: প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি—হাতে একটুও সময় নেই, খুব তাড়া।

সূত্র: আগের দিন দুপুরে এক বন্ধুর দিল্লী এয়ারপোর্টে প্লেন মিস করে কি ভোগান্তি হয়েছে, টেলিফোনে তা জানিয়েছিলেন।

এই স্বপ্নগুলো দেখেছেন যাঁরা, তাঁরা নিজেরাই সূত্রগুলো জানিয়েছেন। 'ড্রিম-ডে'র কোনও দেখা, শোনা, ভাবা বা বলা রাতে দেখা স্বপ্নের সূত্র হিসেবে কাজ করেছে। স্বপ্নগুলোর মূল ভাবের সঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টার 'ড্রিম-ডে'র জাগ্রত চেতনার যোগাযোগ রয়েছে কোনও না কোনও একটা জায়গাতে। পাঠক তাঁর কোনও এক রাতে দেখা স্বপ্নকে আগের দিনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে এরকম যোগাযোগের একটা সূত্র অবশ্যই খুঁজে পাবেন। এ সংক্রান্ত আরও কিছু দৃষ্টান্ত পাঠক পাবেন 'স্বপ্নের বিচ্যুতি' (Displacement of Dream) নিয়ে আলোচনায়।

এবার সিগমুন্ড ফ্রয়েডের নিজের দেখা কিছু স্বপ্ন আর তার সূত্রের কথা বলব:

দ্বিতীয় পর্যায়

স্বপ্ন ১: রাস্তায় দুজন মহিলাকে দেখলাম, মা আর মেয়ে, দ্বিতীয়জন আমার রোগী।

সূত্র: আগের দিন সন্ধ্যায় চেম্বারে ফ্রয়েডের একজন রোগিণী তাঁকে বলছিলেন, তাঁর কাছে চিকিৎসা চালানোর ব্যাপারে মা কিভাবে তাঁকে বাধা দিচ্ছেন।

স্বপ্ন ২: একটা বাড়িতে গিয়েছি, বাড়িটায় ঢুকতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। একজন মহিলাকে আমি বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করতে বলেছি—তিনি অপেক্ষা করছেন।

সূত্র: গত সন্ধ্যায় একজন আত্মীয়ার সঙ্গে কোনও একটা ব্যাপারে কথাবার্তা হচ্ছিল। তাকে বলেছিলাম ওটা কিনতে হলে তাঁকে...পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

স্বপ্ন ৩: একটা বইয়ের দোকানে আমি একটা ম্যাগাজিনের জন্য ২০ ফ্লোরিন গ্রাহকমূল্য দিচ্ছি।

সূত্র: আগের দিন আমার স্ত্রী আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে সেই সপ্তাহের সংসারের খরচ বাবদ ২০ ফ্লোরিন তখনও তিনি আমার কাছ থেকে পান নি।

স্বপ্নে 'ড্রিম-ডে'র কোনও একটা সূত্র ধরে অনেক পুরনো স্মৃতি চলে আসে নানাভাবে। একজন বয়স্ক মানুষ হয়তো দেখলেন, বহুবছর আগে যে বাড়িটাতে থাকতেন, ছেলেবেলার সেই বাড়িটার বারান্দায় বসে আছেন। একেবারে ছোট্টবেলাকার স্মৃতি থেকে শুরু করে অতীতের যে কোনও সময়ের স্মৃতি স্বপ্নে এমনভাবে চলে আসে যে স্বপ্নের দর্শকের কাছে স্বপ্নের সঙ্গে 'ড্রিম-ডে'র কোনও অভিজ্ঞতার সূত্র আপাতদৃষ্টিতে নেই বলে মনে হতে পারে। একটু গভীরভাবে আগের দিনের ভাবা, বলা, দেখা বা শোনা অভিজ্ঞতাগুলোকে ভেবে নিতে পারলে এরকম সূত্র অবশ্যই পাওয়া যাবে।

এখানে আমার দেখা একটা স্বপ্নের উল্লেখ করব। স্বপ্নে বিভিন্ন সময়ের স্মৃতি কিভাবে আগের দিনের একটা অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে ঢুকে পড়ে, তা এই স্বপ্নে চলে আসা স্মৃতিগুলো থেকে পরিষ্কার হবে।

স্বপ্ন ৪: আমি,—,—,— ভীমবাঁধ বেড়াতে গিয়েছি। জায়গাটা আমার চেনা ভীমবাঁধ নয়, সার্কিট হাউসটা অন্যরকম, রাস্তাগুলোও। এ যেন আমার অচেনা কোনও অভয়ারণ্য। একটা পিচবাঁধানো কালো রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি। একটা খরস্রোতা নদী অনেক দূর থেকে এসে রাস্তার নীচ দিয়ে (রাস্তাটা যেন একটা ব্রিজের ওপর) চলে যাচ্ছে—একটা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দুপুরের খাবারের কুপন বিলি করছেন একজন মহারাজ—এতক্ষণ বৃষ্টি পড়ছিল, এখন রোদ উঠেছে—মনে হল আগের বার এসে ভাল ছবি পাই নি, এবার ভাল ছবি তুলতেই হবে—হঠাৎ মনে হল, ফিল্ম আনা হয় নি।

আগের দিনের সূত্র: আগের দিন সন্ধ্যেয় একবার মনে হয়েছিল, মাসকয়েক বেড়াতে যাইনি কোথাও, এবার কোথাও একটা বোঝা যাবে:

পুরনো সূত্র:

(ক) অচেনা ভীমবাঁধ, রাস্তাগুলো অচেনা—১৫ বছর আগে দেখা উত্তর প্রদেশের করবেট ন্যাশনাল পার্কের স্মৃতি।

(খ) পিচবাঁধানো রাস্তা, নীচে খরস্রোতা নদী—বহু বছর আগে দেখা এক ফরাসি সিনেমার স্মৃতি (কম করে ২০ বছর আগের)।

(গ) রামকৃষ্ণ আশ্রম, কুপন বিলি—ছেলেবেলার এক রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্মৃতি।

(ঘ) বৃষ্টি পড়ছিল, এখন রোদ—৫ বছর আগেকার ভীমবাঁধ অভয়ারণ্যের স্মৃতি। সেবার সত্যিই বর্ষার জঙ্গলে ভাল ছবি পাওয়া যায় নি।

(ঙ) ফিল্ম আনতে ভুলে গেছি—তিন বছর আগেকার কাকড়াঝোড়ের জঙ্গলের বেড়াতে যাবার স্মৃতি। ফিল্ম ক্যামেরায় না ভরে শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়োয় ভুল করে বন্ধু গৌতমের বাড়িতে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলাম।

হ্যাভলক এলিস তাঁর নিজের স্বপ্ন পর্যবেক্ষণ করতেন নিয়মিত। ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয় এলিসের এই সংক্রান্ত বই 'দ্য ড্রিম ওয়র্ল্ড'। এই বইতে এলিসও ফ্লিসের তত্ত্বকে নাকচ করে দেন। তাঁর বইতে এই প্রসঙ্গে এলিস নিজের একটা স্বপ্নের কথা লিখেছেন। স্বপ্নে তিনি যেন স্পেনে রয়েছেন। একটা শহরে যেতে চাইছেন। যে শহরটার নাম দারাউস বা ভারাউস অথবা জারায়ুস। জেগে উঠে এরকম কোনও শহরের নাম এলিস মনে করতে পারেন নি। বহু দিন বাদে হঠাৎ করে তিনি জানতে পারেন, স্পেনে জারাউস নামের একটা অখ্যাত রেলস্টেশন রয়েছে। স্পেনে থাকবার সময়ে সেই স্টেশনটার ওপর দিয়ে এলিস গিয়েছেন স্বপ্ন দেখবার ঠিক ২৫০ দিন আগে। আর স্বপ্ন দেখবার আগের দিন একটা ভাবনার সূত্র ঐ দিনের স্মৃতিকে নিয়ে এসেছে তাঁর স্বপ্নে।

এই দৃষ্টান্তগুলো থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। তা হল, যে কোনও স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার অতীতের যে কোনও সময়কার স্মৃতি চলে আসতে পারে। যদি এরকম স্মৃতির 'ড্রিম-ডে'র সূত্রের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে সামান্য যোগাযোগ থাকে। স্বপ্নে যে অতীতস্মৃতি সাধারণত বিস্তারিতভাবে আসে না, তা হল স্বপ্ন দেখবার আগের জেগে থাকা অবস্থার দিনটা। যে দিনটাকে 'ড্রিম-ডে' বলছি।

'ড্রিম-ডে'র হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে কোন অভিজ্ঞতা (এক বা একাধিক) স্বপ্ন তৈরি

হবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। কোনও একটা ছবি দেখতে গিয়ে বা কথা বলতে গিয়ে বা শুনে একজন মানুষ কখনও বলতে পারবেন না যে এই অভিজ্ঞতাকে যোগাযোগবিন্দু (Point of Contact) হিসেবে নিয়ে রাতে তিনি কোনও স্বপ্ন দেখবেন কিনা। এটা সম্ভব হলে আমরা আমাদের ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখতে পারতাম। বাস্তবে, রাতের স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে 'প্রায়' অসম্ভব। জেগে থাকা অবস্থায় কোন অভিজ্ঞতা স্বপ্নে আসবে সে ব্যাপারে মনোবিদরা কিছু নির্দিষ্ট ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। সাধারণত দেখা যায়, 'জেগে থাকা অবস্থার তেমন প্রয়োজনীয় নয় এমন তুচ্ছ অভিজ্ঞতাকে সূত্র হিসেবে টেনে নিতে স্বপ্নের বিশেষ প্রবণতা রয়েছে।' দিনের বেলা যে সব তুচ্ছ দেখা, শোনা, ভাবা বা বলার দিকে তেমন ভাবে মন দেওয়া যায় না; আলতো ভাবে ছুঁয়ে যাওয়া এরকম অভিজ্ঞতাই স্বপ্নে চলে আসে।

জেগে থাকা অবস্থার হাজারটা মামুলি অভিজ্ঞতার মধ্যে ঠিক কোনটা বা কোনগুলো থেকে স্বপ্ন তৈরি হবে তা বলা কঠিন। তবে এ ব্যাপারে ফ্রয়েডের একটা মৌলিক তত্ত্বের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় থাকা দরকার। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সেই অভিজ্ঞতাই স্বপ্নে আসবে যা সচেতনের কোনও ইচ্ছাকে খুঁচিয়ে দিয়ে তার মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে পারে অচেতন মনের লুকিয়ে থাকা কোনও রুদ্ধ ইচ্ছাকে। সচেতন মনে জেগে ওঠা ইচ্ছা অচেতন মনের দিক থেকে মদত না পেলে তা সাধারণত যথেষ্ট শক্তিশালী হয় না। তাই জেগে থাকা অবস্থার অভিজ্ঞতা তাড়িত সব ইচ্ছাই স্বপ্নে আসে না। খুব ছোট বাচ্চাদের ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন বা বড়দের সহজ সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব খাটে না।

স্বপ্নে জেগে থাকা অবস্থার একাধিক সূত্র অনেক সময় একসঙ্গে পরস্পরনির্ভর হয়ে কাজ করে। আর এই সূত্রগুলোকে কেন্দ্র করে একটা স্বপ্ন তৈরি হয় যা অচেতনের কোনও ইচ্ছাকে সরাসরি বা ছদ্মবেশে চেতনায় নিয়ে আসে। এখানে দুটো ব্যাপার মনে রাখতে হবে। (১) স্বপ্নের সূত্র একের বেশি হলেও তা স্বপ্নের 'আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে' মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়। [দ্বিতীয় স্বপ্ন 'পি. সি. সরকারের ম্যাজিকের স্বপ্ন']।

(২) তুচ্ছ, নগণ্য বা অপ্রয়োজনীয় কোনও অভিজ্ঞতা সূত্র হিসেবে অবশ্যই দুর্বল। তবু অনেক শক্তপোক্ত অভিজ্ঞতা (Potent Impersssion)-র বদলে এই দুর্বল অভিজ্ঞতাকেই স্বপ্ন সূত্র হিসেবে বেছে নেয়।

জেগে থাকা অবস্থার কোনও দুর্বল অভিজ্ঞতা কিভাবে স্বপ্নের জটিল পদ্ধতিকে প্ররোচনা দেয়, তা নিয়ে পাঠকের মনে সংশয় দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। ভীমবাঁধের স্বপ্নের কথাই ধরা যাক। স্বপ্ন দেখবার আগের সন্ধ্যায় 'অনেক দিন কোথাও যাওয়া হয়নি', এক ঝলক এরকম ভাবনার অভিজ্ঞতা এই স্বপ্নের সূত্র। এই সূত্র অতীতের অন্তত পাঁচটা বিভিন্ন সময়ের স্মৃতিকে স্বপ্নে টেনে এনেছে। দুর্বল, তুচ্ছ সচেতনের ভাবনার সূত্র নানা ধরনের স্মৃতিকে তুলে ধরবার সূত্রে ঢুকে পড়েছে মনের অচেতনে। দুর্বল বা সামান্য সূত্র এভাবেই শক্তিশালী (charged) হয়, স্বপ্নের নিয়মে চলে যায় মনের অচেতনে। যেখানে তা কোনও একটা চাপা পড়ে থাকা ইচ্ছাকে প্রচুর আবেগের রসে নানা ভাবে জারিত করে। তৈরি হয় একটা স্বপ্ন।

ভীমবাঁধের স্বপ্নের একটা গভীর অর্থ রয়েছে। যা জঙ্গলে বেড়াতে যাবার মতো সাধারণ ইচ্ছা নয়। স্বপ্ন বিশ্লেষণে এই অর্থ বোধগম্য হয়। ভীমবাঁধের স্বপ্নের এই অর্থ অপ্রাসঙ্গিক বলে এখানে উল্লেখ করছি না। কোনও স্বপ্নের বিবরণ আর স্বপ্নের ভেতরকার গভীর অর্থ (Latent Content)-র মধ্যে ফারাক অনেকটাই ব্যতিক্রম, বাচ্চাদের বা বড়দের সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন। আলোচনার এই পর্যায়ে পৌঁছে, এটা অবশ্যই বলা যায় যে মানুষ মামুলি কোনও অর্থহীন স্বপ্ন দেখে না। তার দেখা প্রত্যেকটা স্বপ্নের রয়েছে নির্দিষ্ট তাৎপর্য।

স্বপ্ন কোন তুচ্ছ মানসিক ব্যাপারের সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত নয়। 'আমরা ঘুমের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কোনও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে আদৌ ভালবাসি না।' এই কথাগুলো অনেকেই মেনে নিতে পারেন না। অনেক মানুষ মনে করেন, স্বপ্ন অনেক সময় মামুলি, অর্থহীন, উদ্ভট কিছু ঘটনা। স্বপ্নের পরিস্ফুট অংশ (Manifest Content) আর গূঢ় অংশ (Latent Content)-কে আলাদা করবার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে আয়ত্ব না করতে পারলে এরকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর এই পদ্ধতি বেশ

পরিশ্রমসাধ্য।

'দৈনিক রাশিফল' বা 'এটা দেখলে এটা হয়' ধরনের 'স্বপ্নব্যাখ্যা'র মতো চটজলদি উত্তর খুঁজতে অভ্যস্ত হলে, এরকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নিতে না চাওয়া স্বাভাবিক। কারণ এতে খাটতে হয় অনেক। ভাবনাচিন্তা করতে হয় বিস্তর। শুধু সাধারণ মানুষ নন, হ্যাভলক এলিসের মতো পণ্ডিতও ফ্রয়েডের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। স্বপ্নের পরিস্ফুট অংশের ওপর নির্ভর করে এলিসের মন্তব্য, 'এই জায়গা থেকে আর ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত হওয়া যাচ্ছে না।'

অনেকেই আমাকে তাঁদের নানা স্বপ্নের প্রেক্ষিতে জানিয়েছেন যে, জেগে থাকা অবস্থায় কোনও অভিজ্ঞতা এরকম স্বপ্নে হুবহু চলে এসেছে। বাস্তব ঘটনার এরকম অবিকল প্রতিচ্ছবি স্বপ্নে চলে আসা অসম্ভব নয়। তবে এরকম হয় খুব সামান্য কিছু স্বপ্নে। স্বপ্নের সূত্র থেকে নির্দিষ্ট কিছু চিন্তাপ্রবাহ (Train of thought) জন্ম নেয়। যা অচেতন মনে গিয়ে স্বপ্নের দেশের নিয়মকানুন অনুযায়ী নানা ধরনের স্বপ্ন দেখায় এক জন মানুষকে। এরকম চিন্তাপ্রবাহ অবশ্যই মানসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ (Psychically Significant)।

ভীমবাঁধের স্বপ্নে ফিরে যাওয়া যাক। 'কোথাও বেড়াতে যেতে হবে'র মতো কয়েক মুহূর্তের ভাবনা এই স্বপ্নের মূল সূত্র। এই সূত্র থেকে অন্তত পাঁচটা পুরনো অভিজ্ঞতা স্বপ্নে চলে এসেছে। আর এই অভিজ্ঞতাগুলো যেন এক-একটা চিন্তার বৃত্ত। একটা বিন্দুতে এক-একটা বৃত্ত অন্যটার সঙ্গে যুক্ত। মানসিকভাবে এই চিন্তাপ্রবাহের বৃত্তগুলো একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি তা না হত তবে স্বপ্নের মধ্যে অচেতন মনের কোনও বিশেষ ইচ্ছা এত জটিলভাবে চলে আসত না। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশের আড়ালে কোনও অব্যক্ত অংশ থাকত না। সব স্বপ্নের অর্থই হত বাচ্চাদের দেখা ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নের মতো সহজ সরল।

স্বপ্ন কেন 'ড্রিম-ডে'র তুচ্ছ একটা অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে? এই প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগা স্বাভাবিক। জাগ্রত চেতনার জরুরি বা গুরুত্বপূর্ণ কোনও সূত্রকে ধরে একটা স্বপ্ন তৈরি হবার অসুবিধে নিশ্চয়ই আছে। তা নইলে হাজারটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্রকে ছেড়ে মামুলি একটা অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে স্বপ্নে একের পর এক চিন্তার বৃত্ত তৈরি হবে কেন? এখানে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। স্বপ্নের কাজ অচেতন বা অবচেতন মন নিয়ে। মনের অন্ধকার অংশে জমে থাকা হাজারটা অপূর্ণ কামনা বা বাসনা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেতে চায়। আর এর জন্য প্রয়োজন অচেতন মনে জমে থাকা কোনও মানসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে কেন্দ্র করে একটা চিন্তাপ্রবাহ বা চিন্তাস্রোত তৈরি হওয়া। জাগ্রত চেতনার মামুলি কোনও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন তৈরির রহস্য লুকিয়ে আছে এই জায়গায়। ধরা যাক, 'ড্রিম-ডে'র কোনও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা (Important Impression)-কে সূত্র হিসেবে নিয়ে একটা স্বপ্ন তৈরি করা হল। এক্ষেত্রে ঐ সূত্রকে কেন্দ্র করে অচেতন মনের এমন অনেক সাধারণ চিন্তাপ্রবাহ স্বপ্ন টেনে আনবে, যেগুলো চিত্রায়িত করা আদৌ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এরকম মামুলি চিন্তাপ্রবাহকে চিত্রায়িত করা আদৌ স্বপ্নের উদ্দেশ্য নয়। স্বপ্নের উদ্দেশ্য অচেতন মনের গভীর কোনও ভাবনাচিন্তাকে সচেতন মনে তুলে এনে তার চলচ্চিত্রায়ন।

পাঠক একটা মৌলিক প্রশ্ন তুলতে পারেন। বোঝা গেল যে স্বপ্নর কাজ জটিল কোনও অচেতন চিন্তাপ্রবাহকে সচেতনে তুলে আনা। এই ব্যাপারটা করা যেত আরও অনেক সহজ ভাবে। একজন মহিলা অচেতন মনে চাইছেন তার গর্ভের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাক। তিনি তো দেখতেই পারতেন যে স্বপ্নে তাঁর গর্ভ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা না দেখে তিনি কেন দেখবেন, তার বিবাহিতা ছোটবোনের গর্ভনাশের স্বপ্ন। এর উত্তর খুব সহজ। স্বপ্নের দেশ চলে সেই দেশের নিয়মকানুন মেনে। যা বাস্তবের নিয়মকানুন থেকে পুরোপুরি আলাদা।

বাস্তব আর স্বপ্নের ভাষার এই পার্থক্যর জন্য দায়ী আমাদের মন। বাস্তবে আমরা যখন ভাবনাচিন্তা করি, তখন ভাবনাচিন্তার ওপর মনের কোনও পাহারাদারি কাজ করে না। সামাজিকভাবে চূড়ান্ত অনৈতিক বা অশালীন চিন্তাও আমরা জেগে কল্পনা করতে পারি অবলীলায়। জেগে থাকা অবস্থায় চিন্তাভাবনা যেন কোনও মুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো। যেখানে কোনও মতপ্রকাশ করা যায় অবাধে।

আর স্বপ্নের দেশের ভাবনাচিন্তা স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের অধীন কোনও দেশের একজন নাগরিকের মতপ্রকাশের ব্যবস্থার মতো। যেখানে কোনও লিখিত ভাবনাচিন্তা আগে সেন্সর কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না পেলে ছাপার অক্ষরের মুখ দেখতে পারে না। সামান্যতম বিরোধিতার ইঙ্গিত পেলে এরকম মতামতের অংশবিশেষকে কালো কালি বুলিয়ে মুছে দেওয়া হয়। অগত্যা সেন্সরের কাঁচি এড়াতে, কোনও মানুষকে জটিলতার আশ্রয় নিতে হয়। নানা ধরনের রূপকের আশ্রয় নিয়ে, এর জায়গায় তাকে বসিয়ে, কোনও চিন্তাকে বিকৃত করে ছদ্মবেশে হাজির করতে হয় এই ব্যবস্থায়।

এরকম কোনও লিখিত মতামত পড়ে বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই লেখকের মনের ভাব বুঝে নিতে পারেন। অথচ লেখকের লেখায় কোনও বিরোধিতার আঁচ না পেয়ে তা সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়ে যায়। এই 'বুদ্ধিমান পাঠকের' সঙ্গে স্বপ্ন বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রপ্ত স্বপ্নোৎসাহী এক জন মানুষকে তুলনা করা যায়। যিনি স্বপ্নে বিচ্যুতি, একত্রীকরণ, সংক্ষিপ্তকরণ, অতিলক্ষ্য—এরকম পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে পরিচিত। কোনও স্বপ্নের মূল অর্থ তাই সহজেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধরা পড়ে যায় এরকম স্বপ্নবিশারদের কাছে।

মনের পাহারাদার বা 'সেন্সর অব মাইন্ড' ব্যাপারটা ঠিক কিরকম? এটা বুঝতে গেলে স্বপ্ন দেখবার সময় দু ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারটা জানা দরকার। মানসিক প্রক্রিয়াকে এখানে আলোচনায় অকারণ জটিলতা এড়াতে চিন্তাসংস্থা (Psychical Agency) বলে ধরা যাক। আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন প্রথম চিন্তাসংস্থা অচেতনের নানা ইচ্ছাকে সরাসরি সচেতনে নিয়ে আসতে চায় 'চলমান সবাক ছবি' হিসেবে। এতে বাধা দেয় দ্বিতীয় চিন্তাসংস্থা। যার সঙ্গে গোয়েন্দা-দপ্তর বা সেন্সর কর্তৃপক্ষের তুলনা করা চলে। সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, এ-সবের প্রভাবে যা কিছু অনৈতিক, অশালীন—স্বপ্নের সেই অংশে নির্মমভাবে কাঁচি চালায় এই চিন্তাসংস্থা।

এই সংস্থার হাত থেকে স্বপ্নের মূল ভাবকে বাঁচাতে প্রথম চিন্তাসংস্থাকে নানারকম গোপন কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। অচেতনের ইচ্ছাগুলো স্বপ্নে যে বেশির ভাগ সময় বিকৃত (Distorted) অবস্থায় দেখা দেয় তার জন্য এই গোপনীয়তার নানা ধরনের ছদ্মবেশ দায়ী। এ যেন দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রীর ছদ্মবেশে বসে থাকা ডাকাত। আপাতদৃষ্টিতে যাত্রী বলে মনে হলেও, পুলিশের নজরদারি চোখ যাকে ডাকাত বলে চিনে নেয় সহজেই। এখানে পুলিশের সঙ্গে স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে রপ্ত কোনও এক জন মানুষের তুলনা করা যেতে পারে। যিনি সহজেই স্বপ্নের সুপ্ত অর্থ বুঝতে পারেন।

স্বপ্নে এই দ্বিতীয় চিন্তাসংস্থা মনোবিদের ভাষায় 'সেন্সর অব মাইন্ড'। বা মনের পাহারাদার। এই পাহারাদারের নজরদারি চলে ঘুমন্ত চেতনায়। আর এই নজরদারি আছে বলেই স্বপ্ন এত জটিল। স্বপ্নের মূল ভাব আর আপাত ভাবের মধ্যে বেশির ভাগ সময় এত পার্থক্য। স্বপ্ন আর চলচ্চিত্র অধ্যায়ে এবিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেছি। স্বপ্নের বিচ্যুতি, সংক্ষিপ্তকরণ, নাট্যায়ন আর অতিলক্ষ্যর দৃষ্টান্তগুলো থেকে স্বপ্নে নজরদারির প্রভাবে ও অন্য কারণে কিভাবে মূলভাব বিকৃত হয়, তা বুঝতে আশা করি পাঠকের অসুবিধে হবে না।

স্বপ্নে বিচ্যুতি (Displacement) ঘটেছে কি ঘটেনি, ঘটলে কিভাবে ঘটছে তার ওপর স্বপ্নের মূল ভাব কতটা জটিল হয়ে স্বপ্নে দেখা দেবে তা নির্ভর করে। এই বিচ্যুতি শুধু যে একজন মানুষের জায়গায় আরেকজনকে নিয়ে আসে তা তো নয়। একটা জটিল ভাব অনেকসময় লুকিয়ে থাকে আপাতদৃষ্টিতে 'মামুলি' কোনও ভাবের আড়ালে।

প্রথম পর্যায়ের এক নম্বর স্বপ্নে বয়স্ক এক জন মানুষের মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা সরাসরি পূর্ণ হচ্ছে স্বপ্নে। স্বপ্নের ঐ অংশে জটিলতা নেই এতটুকু। কারণ এই অংশে স্বপ্নে কোথাও কোনও বিচ্যুতি ঘটে নি। পাশাপাশি দ্বিতীয় পর্যায়ের দু নম্বর স্বপ্নে ফ্রয়েডের 'বাড়িতে ঢুকতে অসুবিধে হবার স্বপ্ন'র মূল ভাব বাড়ি প্রতীকের ব্যবহারে জটিল হয়েছে অনেকটাই। বাড়ি স্বপ্নে কিসের প্রতীক তা না জানলে এই স্বপ্নে বিচ্যুতির আড়ালে মূল অর্থকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রথম পর্যায়ের ছ-নম্বর স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শক তাঁর ছেলের সঙ্গে ওভারব্রিজ দিয়ে নামতে নামতে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ট্রেন মিস করবার এই স্বপ্ন আপাতদৃষ্টিতে ঠিক সময়ে ট্রেন ধরতে না পারার দুশ্চিন্তার স্বপ্ন। ট্রেনযাত্রা বা যে কোনও যাত্রা যে

স্বপ্নে মৃত্যুর দিকে যাত্রার প্রতীক, তা না জানলে এই স্বপ্নের গুপ্ত অর্থ জানা যাবে না। বোঝা যাবে না এই স্বপ্ন আসলে আশ্বাসের স্বপ্ন। যা স্বপ্নদ্রষ্টাকে বলতে চাইছে, 'আর যাই হোক, তুমি মরবে না।'

এখন স্বপ্ন জটিল হয় কেন, এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক। স্বপ্নে দুটো চিন্তাসংস্থার কাজকর্ম আর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটা পরিষ্কার হলে স্বপ্ন বিকৃত হবার কারণগুলো বুঝে নেওয়া যায় এভাবে:

(১) আমাদের চেতনায় কোনও চিন্তা ঢুকবে কি ঢুকবে না, ঢুকলে কিভাবে ঢুকবে তা ঠিক করে দেয় মনের পাহারাদার।

(২) স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ ভুলে না গেলে আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি। গুপ্ত অর্থ বিশ্লেষণ না করলে আমরা অনুভব করতে বা বুঝতে পারি না। কারণ তা চেতনায় আসে স্বপ্নবিশ্লেষণের পর।

(৩) কোনও চিন্তা চেতনায় ঢুকবার আগে মনের পাহারাদারের সেন্সরের কবলে পড়ে। এই অবস্থায় অনেক-সময় ঐ চিন্তা চেতনায় ঢোকে অনেকটা বিকৃত (Distorted) হয়ে। ঠিক যেভাবে একজন রাজনৈতিক লেখক সামরিক শাসনে থাকা দেশে সেন্সর এড়াতে, আপাত-নিরীহ প্রবন্ধের মধ্যে নানা রূপকের সাহায্যে গভীর ভাবনাচিন্তা গোপনে ঢুকিয়ে দেন, স্বপ্নেও তাই হয়। দুজন সামরিক কর্তার দ্বন্দ্ব বোঝাতে লেখক হয়তো কোনও রূপকথার বাঘ-সিংহের গল্প ফেঁদে বসলেন!

(৪) প্রথম চিন্তাসংস্থা থেকে দ্বিতীয় চিন্তাসংস্থা বা পাহারাদারকে এড়িয়ে কোনও ভাবনা বা চিন্তা আমাদের চেতনায় ঢুকতে পারে না। বেশিরভাগ সময় প্রথম চিন্তাসংস্থা থেকে আসা ভাবকে দ্বিতীয় সংস্থা নানা ভাবে পরিবর্তিত করে চেতনায় ঢোকার 'গেটপাস' দেয়। স্বপ্নে যা কোনওভাবে বিকৃত হয়ে চলে আসে।

(৫) আমাদের চেতনা আমাদের মনের মৌলিক একটা ব্যবস্থা। আমাদের ভাবনা বা চিন্তা করবার ক্ষমতা আর চেতনা পুরোপুরি আলাদা। কোনও একটা ভাব মনের পাহারাদারের প্রভাবে অদলবদল হয়ে চেতনায় জায়গা পেতে পারে। ভাবনা বা চিন্তা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু চেতনায় কোনও ভাবকে ঢুকিয়ে দেওয়ার ওপর আমাদের কোনও হাত নেই। চেতনা আমাদের অনুভূতিকেন্দ্র। যা থাকবার জন্য মনের মধ্যে কোনও চিন্তা এলে আমরা তা বুঝতে পারি বা অনুভব করতে পারি।

(৬) চেতনার গভীরে থাকা কোনও গোপন ইচ্ছা স্বপ্নে আসতে পারে নানাভাবে বিকৃত হয়ে। হয়তো ব্যাপারটা এরকম যে ঐ ইচ্ছা আমাদের সচেতন মনের কাছে অনৈতিক। বিকৃতভাবে স্বপ্নে ঐ ইচ্ছা চলে আসবার পরও আমাদের অচেতন মন ঐ ইচ্ছা যাতে গোপন থেকে যায় তার জন্য এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অনেক মানুষ তাঁদের স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করতে দিতে চান না অচেতন মনের এই প্রতিরোধের প্রভাবে। অনেক স্বপ্ন ভুলে যাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা। স্বপ্নকে বেশির ভাগ সময় যে 'আজগুবি' বা 'অর্থহীন' মনে হয় তার পেছনেও এর প্রভাব আছে বলে আমার মনে হয়।

(৭) ফ্রয়েড অনেক ভয়ের বা যন্ত্রণার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে ইচ্ছাপূরণের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নে মনে আনন্দের বদলে কেন দুঃখযন্ত্রণা আসে? এই প্রশ্নের উত্তর এই পর্যায়ে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। এরকম স্বপ্নে যে দুঃখযন্ত্রণা তা আসলে দ্বিতীয় চিন্তাসংস্থাকে ফাঁকি দেবার জন্য ভাবের অভিনয়। প্রথম চিন্তাসংস্থা অচেতন মনে যে ইচ্ছাপূরণের আনন্দের ভাব এনে দেয়, সচেতন মনে সেই আনন্দের ভাব আসে না। আসে ছদ্মবেশী দুঃখ-যন্ত্রণা।

দুঃখ-যন্ত্রণার স্বপ্নে ভয় যে অনেক সময় ভাবের ছদ্মবেশ—এই গূঢ় তত্ত্ব বিরলপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মার জানা ছিল। বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য লিখছেন, 'স্বপ্ন তাকে কিঞ্চিৎ বিমূঢ় করলেও বিভ্রান্ত করতে পারে না।' 'ভয়ের মুখোশ' এর কাছে 'অনর্থ পরাজয়' কবি কিছুতেই স্বীকার করতে পারেন না। স্বপ্নের মনোবিজ্ঞানে বিশ্বকবির উপলব্ধির গভীরতা বোঝা যায় মৃত্যুর তিনদিন আগে লেখা এই কবিতার কিছু কথায়:

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে

একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তার।

ভাবের এরকম বিকৃতি আসলে স্বপ্নের মূল ভাব যাতে ধরা না পড়ে তার বিরুদ্ধে জোরদার এক প্রতিরোধ।

ভয়ের বা দুঃখ-যন্ত্রণার স্বপ্নে ভাবের বিকৃতির এই তত্ত্ব অনেকেই মেনে নিতে পারেন না। অনেকেই মনে করেন, এরকম স্বপ্ন আসে বাস্তবের কষ্ট বা ভয়ের পরিপূরক হয়ে। এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করব না। তবে ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব বহু বছর ধরে হাজার হাজার স্বপ্নের বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফ্রয়েড পরবর্তী বহু মনোবিদ ভয়ের স্বপ্নের এরকম ব্যাখ্যাকে মেনে নিয়েছেন। ভারতীয় স্বপ্নগবেষক গিরীন্দ্রশেখর বসুও ভয়ের বা উদ্বেগের স্বপ্ন নিয়ে ফ্রয়েডের মতকে সমর্থন করেন। ভয়ের বা যন্ত্রণার স্বপ্নকে 'জীববৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' বা অন্য কোনও তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করলে আর তা বহু মানুষের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠা করা গেলে, যে কেউ ফ্রয়েডের তত্ত্বকে অস্বীকার করতেই পারেন।

তৃতীয় পর্যায়

স্বপ্নের অন্য কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছুটা গভীরে যাওয়া দরকার। কেননা এগুলো নিয়ে অনেকের মনে বেশ কিছু সাধারণ প্রশ্ন রয়েছে। স্বপ্ন নিয়ে কাজ করার সময়, অনেকেই এরকম নানা প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন। এরকম প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত সমাধান খুব সহজ নয়। তবু এ পর্যন্ত স্বপ্ন নিয়ে কাজ করা গবেষকদের কাজকর্ম আর আমার অভিজ্ঞতার আলোয় কিছু সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

স্বপ্নের মধ্যে হাত পা না চলা

স্বপ্নের মধ্যে হাত পা নাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও শরীর চলতে চায় না। এরকম ঘটনা স্বপ্নের মধ্যে ঘটবার অভিজ্ঞতা সবারই রয়েছে। কেউ তাড়া করেছে, ছুটতে চাইছি। অথচ পা দুটো কিছুতেই চলতে চাইছে না। বা পরীক্ষার হলে কিছুতেই হাত চলছে না। ঘরে চোর ঢুকেছে, দেখতে পাচ্ছি। 'চোর, চোর' বলে চিৎকার করতে চাইছি। মুখ দিয়ে কিছুতেই আওয়াজ বার হচ্ছে না। এরকম অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্নের দর্শকের মনে চূড়ান্ত দুশ্চিন্তা (anxiety) দেখা দেয়।

স্বপ্নে এরকম হাত-পা না নাড়তে পারার জন্য দায়ী আমাদের মনের পাহারাদার। ঘুমন্ত অবস্থায় অচেতন মন থেকে কোনও ইচ্ছাকে অবচেতনের মধ্য দিয়ে সচেতনে নিয়ে আসবার পথে মূল বাধা এই পাহারাদার। পাহারাদারের নজরদারি শিথিল হলে অবদমিত ইচ্ছা স্বপ্নে চলে আসতে পারে। সব পাহারাদারের মতো মনের পাহারাদারও মাঝেমধ্যে 'তন্দ্রাচ্ছন্ন' হয়ে পড়ে। সেই সময় অবদমিত মনের ইচ্ছার বশে মানুষ যাতে কোনও কাজকর্ম না করে ফেলতে পারে সে ব্যাপারে পাহারাদারের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। তা হল, ঘুমন্ত অবস্থায় শরীরের সব মাংসপেশীর জোর কমিয়ে (Hypotonia) শারীরিক অক্ষমতা বা সাময়িক পক্ষাঘাত (Motor Paralysis) তৈরি করা।

এই কারণেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে বেশির ভাগ সময় হাত বা পা চলতে চায় না। গলা দিয়ে আওয়াজ বার হয় না। এই অবস্থায় স্বপ্নদ্রষ্টার উদ্বেগের কারণ অচেতনের ইচ্ছা সচেতনে চলে আসার সময় তৈরি হওয়া ইচ্ছার দ্বন্দ্ব (Conflict of Will) ফ্রয়েডীয় মনোবিদের মত এরকম। চোরের তাড়া খেয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা চান দৌড়তে। তাঁকে দৌড়তে বাধা দেয় সাময়িকভাবে চলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা হাত-পায়ের অক্ষমতা। আর তা থেকে স্বপ্নের মধ্যেই জন্ম নেয় উদ্বেগ। মনের প্রহরীর প্রভাবে এভাবে চলাফেরার বা কথা বলার ক্ষমতা সাময়িকভাবে চলে না গেলে, স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা দৌড়তাম, চিৎকার করতাম, কাউকে মারতাম, করতাম স্বপ্নের দৃশ্য অনুযায়ী সবরকম কাজ।

ঠিক এই ব্যাপারটা জেগে থাকা অবস্থায় ঘটে সাইকোসিসে আক্রান্ত মনোরোগীদের। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলাফেরা করার অভ্যাস (Somnambulist) আছে এমন স্বপ্নচারী মানুষের। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে

চলাফেরা আর কাজকর্মের অভ্যাস চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় সোমনামবুলিসম্ বা 'স্বপ্নচারিতা'। এরকম এক জন সাংবাদিক মহিলার বেশ কিছু স্বপ্ন আমি পেয়েছি। একটা স্বপ্নে বাইরে থেকে কেউ এক জন ঘরে আসতে চাইছেন। মহিলা 'এদিক দিয়ে আসুন' বলে খাট থেকে উঠে দরজার 'লক' খুলে দিলেন। দরজা খোলার আওয়াজে তাঁর ঘুম যায় ভেঙে। এক্ষেত্রে বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে দরজা খোলা—গোটা ব্যাপারটা স্বপ্নদ্রষ্টা করছেন স্বপ্নচালিত অবস্থায়। সাধারণত যা হয় না। এই মহিলা আমাকে জানান, মাঝেমাঝে স্বপ্ন দেখতে দেখতে তিনি খাট থেকে উঠে ঘরের খোলা জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ বাদে ঘুম ভেঙে বুঝতে পারেন যে তিনি স্বপ্নের ঘোরে ছিলেন। হালের শারীরবিদরা একে Dream Disorder Syndrome বলেন।

হালআমলের কিছু চিকিৎসাবিজ্ঞানী স্বপ্নচালিত অবস্থায় কাজকর্ম করাকে এক ধরনের 'স্বভাবী অস্বাভাবিকতা' (Behaviour Disorder) বলে চিহ্নিত করেছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় এক জন মানুষের মাংসপেশীগুলো যে কাজকর্মে অক্ষম হয়ে পড়ে, তা স্বপ্নচালিত হয়ে কাজ করা মানুষের ক্ষেত্রে হয় না। যে কারণে কারও সঙ্গে মারপিটের স্বপ্নে এরকম এক জন মানুষ সত্যিসত্যিই স্বপ্নের অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে মারপিট শুরু করেন। স্বপ্নের মধ্যে দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে দরজা খুলে দিতে ঘুমের মধ্যে বিছানা থেকে উঠে এগিয়ে যান দরজার দিকে। শারীরবিদরা এখন এরকম অবস্থাকে 'রেম্ বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার' (Rem Behaviour Disorder) বলছেন। নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ ব্যবহার করলে এরকম অস্বাভাবিকতা বেশিরভাগ সময় সেরে যায়।

স্বপ্নে কথা বলা

অনেক সময় দেখা যায় স্বপ্ন দেখতে দেখতে একজন মানুষ কথা বলতে থাকেন। সাতাত্তর বছরের একজন বৃদ্ধ স্বপ্নে মাঝেমাঝে অদৃশ্য কোনও মানুষের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে গালাগাল করতে থাকেন। স্বপ্ন দেখতে দেখতে কথা বলার আরও অনেক ঘটনার কথা অনেকে আমাকে জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে শরীরের সব মাংসপেশী অক্ষম হয়ে পড়লেও স্বরযন্ত্রের ক্ষমতা কিছুক্ষণের জন্য ঘুমের মধ্যেও স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। আর তাই স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্নের দর্শক কথা বলতে থাকেন।

পাঠক লক্ষ করবেন, স্বপ্নে চিৎকার করে উঠে বা কথা বলে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, এরকম ঘটনা কদাচিৎ হলেও অনেকের ঘটে। এক্ষেত্রে অক্ষম স্বরযন্ত্র কর্মক্ষম হয়ে ওঠে সম্ভবত ঘুম ভেঙে। ঘুমের মধ্যে চোর ঘরে ঢুকে সব কিছু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে এক ভদ্রলোক প্রায়ই 'চোর। চোর। ধর! ধর!'—বলে চিৎকার করতে থাকেন। এই স্বপ্নের দর্শকের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, স্বপ্ন দেখতে দেখতে 'চোর, চোর' বলে চিৎকার করতে চাইলেও গলা দিয়ে আওয়াজ বার না হবার আতঙ্কে তাঁর ঘুম ভেঙে তিনি চিৎকার করতে থাকেন। এরকম বহু ঘটনা বিশ্লেষণ করে আমার মনে হয়েছে, একে 'বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার' বলে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। কেননা ঘুমের মধ্যে 'স্বভাবী অস্বাভাবিকতা' দেখা দিলে মাংসপেশীগুলোও সক্ষম হয়ে উঠবে। সেক্ষেত্রে স্বপ্নের দর্শক শুধু চিৎকার করবেন না, চোরের পিছু নেবেন। হয়তো খুব সামান্য সময়ের জন্য ঘুম ভেঙে কথা বলে বা চিৎকার করে স্বপ্নদ্রষ্টা আবার ঘুমিয়ে পড়েন। অনেক সময় তাই মনে হয়, তিনি কথা বলছিলেন স্বপ্নের মধ্যে।

অনেক সময় স্বপ্নে এরকম কোথাও না যেতে পারা স্বপ্নচিন্তার অংশ হয়ে (Form of Dream) দেখা দেয়। স্বপ্নের গূঢ় ইচ্ছা পূর্ণ করতে যা অনেক সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আপনি হয়তো বাইরে বেরোতেন। জুতো খুঁজে না পাওয়ায় বেরোতে পারছেন না। এক্ষেত্রে এভাবে যেতে না পারা স্বপ্নেরই একটা অংশ। স্বপ্নের মূল ভাবের পেছনে যার একটা ভূমিকা রয়েছে।

স্বপ্নে চলা, কথা বলা

ঠিক এর বিপরীত ঘটনাও স্বপ্নে ঘটে। স্বপ্নে দৌড়োবার, ছুটবার, নানা কাজকর্মের বা কথা বলবার ছবি আসে হরদম। স্বপ্নে শারীরিক কাজকর্মের ছবি বা কথা আসলে স্বপ্নচিন্তার অংশ বা ঘুমন্ত চেতনার ভাবনা। এর সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থার শারীরিক ক্ষমতা চলে যাবার কোনও সম্পর্ক নেই।

'বোবায় ধরা'

স্বপ্নে চিৎকার করতে চাইলেও স্বরযন্ত্রের অক্ষমতার জন্য মুখ দিয়ে কথা বার হতে চায় না। জোরে চিৎকার করতে চাইলে অনেক সময় মুখ দিয়ে গোঙানি ধরনের আওয়াজ বার হতে থাকে। বোবাদের মুখের আওয়াজের সঙ্গে এর কিছু মিল আছে। তাই হয়তো সাধারণ মানুষ একে 'বোবায় ধরা' বলেন। শুয়ে চিৎ হয়ে নয়, যে কোনও ভাবে শুলেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে যে কোনও মানুষের এরকম হতে পারে। একটু নাড়িয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলেই এরকম গোঙানি বন্ধ হয়ে যায়।

'আমি তো স্বপ্ন দেখছি'!

স্বপ্ন দেখতে দেখতে অনেক সময় 'আমি তো স্বপ্ন দেখছি' এরকম একটা অনুভূতি হয়। এরকম কেন হয়? এটা আসলে স্বপ্নের অনুভূতির ছদ্মবেশ। 'এটা তো স্বপ্ন' এরকম ভাবলে স্বপ্নের উঠে আসা ইচ্ছা নিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা মাথা ঘামাবেন না—স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখবার অনুভূতি তৈরি হবার মূল উদ্দেশ্য এটাই। স্বপ্নে এরকম ভাব দেখা দিলে বুঝতে হবে, স্বপ্নের ইচ্ছাকে লুকোতে এই ছদ্মবেশী অনুভূতি আসছে। ফ্রয়েড ও স্টেকেল 'স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন' দেখার ভেতরও একই উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। ফ্রয়েডের মতে, 'স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন পদ্ধতি যখন কোনও ঘটনাকে স্বপ্ন বলে মনে করিয়ে দেয়, তখন আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে ব্যাপারটা বাস্তব'। স্বপ্নের মধ্যে এভাবে কোনও ইচ্ছাকে অস্বীকার করার গোপন চেষ্টা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে যে স্বপ্ন আসলে ইচ্ছাপূরণ।

স্বপ্নের বাড়ি

প্রত্যেক মানুষের স্বপ্নে নানা ধরনের বাড়ি আসে। হয়তো বোঝা যাচ্ছে বাড়িটা আপনার। তবু বাড়ির ভেতর বা বাইরের খুঁটিনাটি আপনার বাড়ির মতো একেবারেই নয়। স্বপ্নে বাড়ি আসতে পারে প্রতীক হয়ে। বিভিন্ন স্বপ্নে একই বাড়ি প্রায় কখনই আসে না। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্বপ্নে দেখা এরকম বাড়ির বিপুল বৈচিত্র্যের কথা বহুবার আমাকে বলেছেন। তাঁর কথায়, 'কত হাজার বাড়ি যে স্বপ্নে দেখেছি। এক-এক সময় মনে হয় স্বপ্নে আমি পৃথিবীর সবচাইতে বড় স্থপতি।' স্বপ্নে বাড়ির এই বৈচিত্র্য থেকে স্বপ্নচিন্তায় বাড়ি কত বিচিত্র ধরনের ভাবকে প্রকাশ করতে পারে তা বোঝা যায়।

'স্বপ্নে নিজের বাড়িটা সব সময় অন্যরকম দেখি কেন?' বর্ষীয়ান সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর এই প্রশ্নের উত্তর কঠিন নয়। স্বপ্নের নানা ধরনের বাড়ি আসে স্বপ্নের বিভিন্ন ভাব প্রকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে। আর বাস্তবের কোনও একটা ছবিকে হুবহু তুলে ধরা স্বপ্নের কাজ নয়। বেশ কিছু বাস্তবের বাড়ির ছবির টুকরো মিলেমিশে স্বপ্নকল্পনার রসে জারিত হয়ে তৈরি হয় স্বপ্নের বাড়ি। 'এই বাড়িটা আমার,' এই অনুভূতি হলেও স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার নিজের বাড়ি বদলে যায় স্বপ্নের স্থপতির কারিগরির জাদুতে!

স্বপ্নে গন্ধ আর স্বাদ

স্বপ্নে গন্ধ আর স্বাদ পান খুব কম মানুষ। সবচাইতে বেশি আসে ছবি। ছবির ভাবকে প্রকাশ করতে কিছু কথা। ছবির স্বল্পতা বা অভাব দৃষ্টিহীনদের স্বপ্নে কথা আনে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। স্বপ্নে গন্ধ কম আসবার পেছনে 'স্বপ্নচিন্তার প্রকাশে গন্ধের গুরুত্ব নেই'—এরকম কারণ দায়ী বলে আমার মনে হয়। একই কথা স্বাদের বেলায়। আমার স্বপ্নসন্ধানে আড়াই হাজার বিভিন্ন পেশা আর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মানুষের মধ্যে মাত্র পনেরো জন স্বপ্নে গন্ধ পান। ন-জন পান খাবারের স্বাদ। স্বপ্নের কাজ ইচ্ছাপূরণ। ঘুমন্ত মানুষকে স্বাদে, গন্ধে ভরিয়ে দেওয়া নয়। ছবি আর কথা ইচ্ছাপূরণের মূল মাধ্যম। গন্ধ বা স্বাদের ভূমিকা তাই স্বপ্নে নগণ্য হওয়াই স্বাভাবিক।

সময় এগোনো, পেছোনো

স্বপ্নে সময়ের হেরফের একটা সাধারণ ব্যাপার। এর সঠিক কারণ বলা কঠিন। স্বপ্নের ভাষা বাস্তবের ভাষার চাইতে আলাদা। স্বপ্নে সময় জ্ঞানের ব্যাপারটাও তাই। স্বপ্নচিন্তায় কোনও গভীর ভাব প্রকাশের

জন্য স্বপ্নের দর্শকের অতীতের নানাসময়ের টুকরোটুকরো নানা অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরি হয় একটা গোটা স্বপ্ন। হয়তো তাই, স্বপ্নে সময়ের ব্যাপারটা কদাচিৎ ঠিক থাকে। স্বপ্নে বয়েস আর সময়ের সাদৃশ্যর চাইতে অভাব থাকে বেশি। তিনটে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

ক) আনন্দবাজার পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্নের অভিজ্ঞতা। 'এখনকার চেহারা, এখনকার বয়স। আমি স্বপ্নে চলে গেলাম ছেলেবেলার এক টুকরো দৃশ্যে'।

খ) কবি জয় গোস্বামীর স্বপ্ন। জয় ছেলেবেলার বাড়িতে রয়েছেন অথচ 'দেশ' পত্রিকায় কাজ করেন। কাবেরী (স্ত্রী) রয়েছে, মেয়ে রয়েছে, মা রান্নাঘর থেকে বেরোলেন। অথচ মা মারা গেছেন বিয়ের বহুদিন আগে।

গ) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা স্বপ্নে সময় এগোনো-পেছোনোর ব্যাপারটা অদ্ভুতভাবে এসেছে। সুনীলের বাবা মারা গেছেন ১৯৫১-তে। বিয়ে করেন '৫৭তে। অর্থাৎ বাবার মৃত্যুর ছ-বছর পর বিয়ে। '৬২ সালে দেখা এই স্বপ্নে বাবা রয়েছেন, রয়েছেন স্ত্রী আর কম বয়সের ছেলে। সুনীলের বাবা শেষদিকে খুব ভুগে মাত্র ৫১ বছর বয়সে মারা যান। অথচ স্বপ্নের বাবা 'মধ্যবয়সের সুন্দর স্বাস্থ্যের বাবা'। এই স্বপ্নের কথা বলেছি 'স্বপ্নে মৃত প্রিয়জন' অধ্যায়ে।

স্বপ্নের রং

স্বপ্নে রঙ থাকে কি থাকে না এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কিছু গবেষকের ধারণা, স্বপ্নমাত্রই সাদাকালো। স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা কোনও রঙ দেখি না। পরে যখন স্বপ্নটার কথা মনে করি তখন আমাদের চেতনার রঙে স্বপ্ন হয়ে ওঠে রঙিন। অনেকেই সাদাকালো স্বপ্নের এই তত্ত্ব মানেন না। স্বপ্ন সাদাকালো বা রঙিন যাই হোক, স্বপ্ন ভাবার সময় বিচিত্র নানা রঙের কথা আমাদের মনে হয়। সম্ভবত ব্যতিক্রমী রঙের উপস্থিতি বেশি থাকে সৃষ্টিশীল আর তীব্র অনুভূতিপ্রবণ মানুষের স্বপ্নে। স্বপ্নের ভ্রমণে একবার চিত্রকর বিকাশ ভট্টাচার্য চলে গিয়েছিলেন এক সমুদ্রের কাছে। সেই সমুদ্রের রঙ ছিল 'গা-সিরসিরে নীল'। যে নীল আজও তাঁর তুলির আঁচড়ে ফোটাতে পারেন নি রঙের জাদুকর এই প্রখ্যাত চিত্রকর। সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের স্বপ্নে বারবার ঘুরেফিরে আসে 'সোনালী হলুদ' রঙ। এক কবির স্বপ্নে আকাশ বারবার হয়ে যায় 'অদ্ভুত কালচে, অনেকটা স্লেট পাথরের রঙের মতো'। স্বপ্নে 'দেখা' এমন অনেক রঙের কথা অনেকে বলেন বাস্তবে যেগুলোর অস্তিত্ব নেই। এক ফরাসি স্বপ্ন-গবেষক স্বপ্নে অপার্থিব রঙের এ ধরনের উপস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছেন একটা সময়।

স্বপ্নে রং (যদি থাকে) এর উপস্থিতি আর তার বৈচিত্র্য স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিকতা, বিভিন্ন রঙের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি, ভালোলাগা, পছন্দ অপছন্দ বর্ণবোধ আরও অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল বলে আমার মনে হয়েছে।

অল্প সময়, দীর্ঘ স্বপ্ন

খুব সামান্য সময়ে দীর্ঘ কোনও স্বপ্ন কি করে এক জন মানুষ দেখেন, এ নিয়ে ঔৎসুক্য জাগা স্বাভাবিক। এই বইতে এরকম বেশ কিছু স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এরকম স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিদ্রিত চেতনার ভাবনাচিন্তা চলতে থাকে দ্রুতলয়ে। কিভাবে দীর্ঘ এক স্বপ্ন অতি অল্প সময়ে এক জন মানুষ দেখতে পারেন—তার সঠিক কারণ বলা কঠিন। কিছু মনোবিদের মতে, এরকম দীর্ঘস্বপ্ন আগে থাকতেই তৈরি হয়ে থাকে মনের গভীরে। স্বপ্ন দেখার বাধা দূর হয়ে গেলেই স্বপ্নের দর্শক জেটবেগে দেখে ফেলেন আগে-থাকতে-তৈরি-হওয়া স্বপ্ন।

এক রাতে অনেক স্বপ্ন।

এক রাতে একের বেশি স্বপ্ন আমরা দেখি বেশির ভাগ সময়ে। এরকম স্বপ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে স্বপ্ন-গবেষকরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

ক) একরাতে সব কটা স্বপ্নের মধ্যে অচেতন মনের এক ধরনের ইচ্ছা পূর্ণতা পেতে চায়। পাঠক তাঁর নিজের দেখা স্বপ্নগুলোকে নিয়মিত লিখে রাখতে শুরু করে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে পারেন।

স্বপ্নের ভাষায় রপ্ত হয়ে গেলে, তিনি দেখতে পাবেন, এক রাতে যে স্বপ্নগুলো তিনি হয়তো দেখেছেন, তার মধ্যে অচেতনের এক ধরনের রুদ্ধ ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হতে চেয়েছে। কেননা এই ইচ্ছাগুলো তৈরি হয়েছে অচেতনের এক ধরনের ইচ্ছা থেকে।

খ) এক রাতে একের বেশি স্বপ্ন দেখলে, প্রথম স্বপ্নটা সবচাইতে জটিল হয়। আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে জটিলতা। একেবারে ভোররাতে দেখা স্বপ্নের মধ্যে অচেতনের ইচ্ছা চলে আসে অনেক কম জটিলতা নিয়ে।

গ) গিরীন্দ্রশেখর মনে করতেন, একজন মানুষের একরাতে নয়, বেশ কয়েকরাতে দেখা স্বপ্নের মধ্যে অচেতন মনের এক ধরনের ইচ্ছা চলে আসে। দীর্ঘদিন নিজের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে আমার মনে হয়েছে, বেশিরভাগ সময় তাই হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও ঘটে।

স্বপ্নে কথার মারপ্যাঁচ

বয়স্ক মানুষদের স্বপ্নে অনেক সময় কথার মারপ্যাঁচ থাকে। স্বপ্নগবেষক ডব্লু. হেনজেন স্বপ্নসংক্রান্ত এক গবেষণাপত্রে বহু মানুষের স্বপ্ন উদ্ধৃত করে দেখান যে, এ সব স্বপ্নের মূল অর্থ লুকিয়ে আছে কথার মারপ্যাঁচের মধ্যে। শুধু তাই নয় এঁদের স্বপ্নে জটিলতা অন্যদের চাইতে বেশি বলেই হেনজেন মনে করতেন। আমার সংগ্রহে থাকা একটা এরকম স্বপ্নের উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। এক বৃদ্ধ স্বপ্ন দেখছেন, তিনি খালি গায়ে তেল মাখছেন। তারপর দেখলেন, গামছা গুটিয়ে তিনি তালগাছে উঠছেন। অনেক পরিশ্রমে এই স্বপ্নের অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছি। 'তেল' আর 'তিল' উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি। তাছাড়া তিল থেকেও তেল তৈরি হয়। এই স্বপ্নে তেল আসলে তিল। 'তিলকে তাল করা'—এই স্বপ্নের মূল অর্থ। প্রসঙ্গত বলি, ঐ বৃদ্ধের যে কোনও ব্যাপারকে বাড়িয়ে বলা বা অতিরঞ্জন করবার অভ্যাস রয়েছে। এই ইচ্ছা স্বপ্নে চলে এসেছে।

ছেলেবেলা স্বপ্নে এলে

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বপ্নে কখনও সব কিছু অস্বাভাবিক রকম বড় দেখালে বুঝতে হবে স্বপ্নের দর্শকের ছেলেবেলাকার কোনও অভিজ্ঞতা স্বপ্নে চলে আসছে। 'স্বপ্নে বহু পুরনো কোনও অভিজ্ঞতার ছবি এলে সাধারণত তা অনেক দূরের বলে মনে হয়। যেন দীর্ঘ একটা রাস্তার এপারে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের দর্শক ওপারের দৃশ্য দেখছেন'। বা বাইনোকুলার উলটো করে ধরে কোনও ছবি দেখা হচ্ছে।

স্বপ্ন জটিল হয় কেন?

যে কোনও স্বপ্নের লৌকিক আর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা স্বপ্নের জটিলতাকে এড়িয়ে যায়। স্বপ্নের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে এই জটিলতা এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নেই। বড়দের অনেক স্বপ্ন এত জটিল হয় কেন? কেনই বা এগুলোর অর্থ এত দুর্বোধ্য হয় স্বপ্নের দর্শকের কাছে? এর উত্তর পেতে গেলে কিছু কথা মনে রাখা দরকার। যে কোনও স্বপ্ন ঘুমন্ত অবস্থার চিন্তাভাবনার চিত্ররূপ। জেগে থাকা অবস্থায় আমাদের চিন্তা প্রকাশ পায় সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে। এই ভাবনাকে আমরা কোনও গল্পের বা কবিতার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যেখানে কথার সাহায্যে ভাবের অর্থ সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ পায়। আর তা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না।

স্বপ্নে ভাবনার চিত্রায়ন হয় স্বপ্নের নিজস্ব পদ্ধতিতে। একটা বা একটার বেশি সহজবোধ্য শব্দের অর্থ যদি একটা দুর্বোধ্য শব্দ দিয়ে বোঝাতে হয় তবে ঐ শব্দের অর্থ উদ্ধার করা বেশ জটিল হয়ে পড়ে। আর ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটে স্বপ্নে। স্বপ্ন যেন চিত্রকরের তুলিতে আঁকা একটা বা একের বেশি ছবি। বা ভাস্করের গড়া মূর্তি। বিকাশ ভট্টাচার্য বা যোগেন চৌধুরীর একক চিত্রপ্রদর্শনী। বা সোমনাথ হোরের ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। প্রকাশমাধ্যম আলাদা হওয়ায় এরকম ছবি বা ভাস্কর্যের মূল ভাব অনুভব করতে গেলে ছবি বা ভাস্কর্যের নিজস্ব ভাষাকে বুঝে নিতে হয়। বাংলাভাষা বোঝেন এমন যে কোনও একজন মানুষ নীললোহিতের কোনও গদ্য-রচনার অর্থ পড়লেই বুঝতে পারবেন। এই ব্যাপারটা আমাদের জেগে থাকা অবস্থার প্রকাশভঙ্গির মতো। কিন্তু আগে যে ছবি বা ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর কথা বললাম সেখানে শিল্পীর ভাবনাচিন্তা তাঁর ছবি বা ভাস্কর্যের মধ্যে এত সহজে ধরা যাবে না। তার জন্য শিল্প আর শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই। এরকম প্রদর্শনীকে স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যেখানে কোনও এক শ্রেণীর চিন্তাভাবনা শিল্পীর একটা সিরিজের অনেক ছবি বা অনেক ভাস্কর্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে যৌথভাবে।

স্বপ্নের জটিলতার মূল সূত্রগুলো এরকম:

(১) এক বা একের বেশি অচেতন বা অবচেতনের ইচ্ছা স্বপ্নে চলে আসতে পারে। স্বপ্নের বিবরণের অনেকটাই হয়তো ঐ ইচ্ছা বা ইচ্ছাগুলোর অর্থ বুঝতে অপ্রয়োজনীয়।

(২) স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ (Manifest Content) আর মূল ভাব (Latent Content) বেশিরভাগ সময় সম্পূর্ণ আলাদা। ধরা যাক একজন মানুষ দেখলেন ট্রেন মিস করার স্বপ্ন। এর অর্থ, স্বপ্নদ্রষ্টার মন তাঁকে বোঝাতে চাইছে, 'তুমি মরবে না।'

(৩) স্বপ্নে 'হ্যাঁ' আর 'না' আসে একইভাবে। 'হয় এটা নয় ওটা', 'যেহেতু', 'অথবা', 'কারণ'—এ সব শব্দ জেগে থাকা অবস্থার প্রকাশভঙ্গির মতো স্বপ্নে চলে আসতে পারে না।

(৪) স্বপ্নের বাক্যগঠনের বা নতুন কথা তৈরির ক্ষমতা নেই। স্বপ্নে যে সব কথা আমরা শুনি, তা কোনও শোনা বা বলা কথার একটা খণ্ডিত অংশ। অনেক সময় আবার একটা কথার সঙ্গে অন্য কথা জুড়ে তৈরি হওয়া অদ্ভুত বাক্য আসে স্বপ্নে। যার অর্থ হয়তো স্বপ্নের অর্থ বুঝতে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(৫) স্বপ্নের ছবি অনেকটা কার্টুনের প্রদর্শনীর মতো। একটার সঙ্গে আরেকটা যা ভাবের দিক থেকে তেমনভাবে সংযুক্ত নয়। কোনও কার্টুন থেকে কার্টুনিস্টের ভাবনাচিন্তা উদ্ধার করতে গেলে এই মাধ্যম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। তেমনি স্বপ্নের দেশের ভাষা না বুঝতে পারলে স্বপ্নের অর্থ বোঝা যায় না।

(৬) স্বপ্নের দৃশ্য উল্টেপাল্টে যায় যখনতখন। এর জন্য অনেকসময় স্বপ্ন জটিল হয়ে পড়ে। একজন

স্বপ্ন দেখলেন, ট্রেনে করে যাচ্ছেন। তারপরই দেখলেন, একটা রাস্তা ধরে হাঁটছেন। সোজাভাবে এর অর্থ, ট্রেন থেকে নেমে তিনি রাস্তা ধরে হাঁটছেন। উল্টোটাও হতে পারে। রাস্তা ধরে তিনি ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন।

(৭) স্বপ্নে প্রতীকের ব্যবহার স্বপ্নকে জটিল করে তোলে। একজন হয়তো একটা বাড়ির বিভিন্ন অংশে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন দেখলেন। এখানে বাড়িটা নারীদেহের আর বিভিন্ন অংশগুলো নারীর শরীরের নানা অংশের প্রতীক হতে পারে। এরকম প্রতীকায়ন (Symbolisation) স্বপ্নকে জটিল করে তোলে।

(৮) মনের প্রহরীর উপস্থিতির জন্য স্বপ্নের একজন মানুষ অন্য মানুষের চেহারা নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। আবার স্বপ্নের একজন মানুষের মধ্যে বাস্তবের দু তিনজন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারেন। স্বপ্নে এরকম ছদ্মবেশ স্বপ্নের মূল অর্থকে জটিল করে তোলে।

(৯) হয়তো অমলের ওপর আপনার রাগ। স্বপ্নে এই রাগ গিয়ে পড়ল বিমল, কমল বা ইন্দ্রজিতের ওপর। যাদের আপনি খুব ভালবাসেন। স্বপ্নে হয়তো এদের একজনকে প্রচণ্ড রেগে মেরে বসলেন। আর অবাক হলেন। স্বপ্নের এই 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপার প্রবণতা অনেক সময় স্বপ্নকে জটিল করে তোলে।

(১০) স্বপ্নের দর্শকের এমন অনেক শৈশবস্মৃতির ছবি স্বপ্নে চলে আসে যেগুলোর অস্তিত্ব জেগে থাকা অবস্থায় জানা যায় না। জেগে থাকা অবস্থায় স্মৃতি (Waking Memory)-র সঙ্গে স্বপ্নের স্মৃতি (Dream Memory)-র এই ফারাক অনেকসময় স্বপ্নের অর্থকে সহজে বুঝতে দেয় না।

স্বপ্নের দেখা আর তার অর্থকে পাশাপাশি রাখলে স্বপ্নের জটিলতাকে বুঝতে সুবিধে হবে। এখানে কিছু দৃষ্টান্ত রাখছি:

স্বপ্ন ১: এক জন স্বপ্ন দেখলেন ছুরি দিয়ে আইসক্রিম খেতে গিয়ে ছুরিতে তার জিভটা কেটে নিচে পড়ে গেল। প্রচণ্ড ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল ভদ্রলোকের।

অর্থ: কথাবার্তায় সংযত হওয়া প্রয়োজন। বেশি কথা বলার জন্য কর্মক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাই কম কথা বলতে হবে।

স্বপ্ন ২: বিবাহিত দুই ছেলের বাবা ৪৫ বছরের একজন মানুষ দেখলেন, আবার তার বিয়ে ঠিক হচ্ছে। প্রচণ্ড ভয়ে সবাইকে তিনি বোঝাতে চাইছেন, 'এসব বন্ধ করুন। বউবাচ্চা নিয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাব।' কেউ শুনছে না। বিয়ের প্রস্তুতি চলছে।

অর্থ: ভদ্রলোকের মনে আর একটা বিয়ে করবার ইচ্ছা রয়েছে। স্বপ্নের ভাবটা এরকম, 'আমি তো চাইছি না, কেউ আমার কথা শুনছে না তো আমি কি করব?'

স্বপ্ন ৩: এক জন মানুষ স্বপ্ন দেখলেন, তিনি এক জন অফিসার। এক জন মন্ত্রীর উলটোদিকের চেয়ারে বসে আছেন।

অর্থ: তিনি নিজে বাবার (মন্ত্রী=বাবা) বিরোধিতা (উলটোদিকে) করতে চাইছেন।

স্বপ্ন ৪: এক যুবক স্বপ্ন দেখলেন কোনও এক চেনা ভদ্রলোকের বাড়ির দোলনা চেয়ারে তিনি দুলছেন।

অর্থ: যৌন উত্তেজনা থেকে এই স্বপ্নের উৎপত্তি। ওই বাড়ির দোলনাচেয়ারে দোল খাওয়ার স্মৃতি স্বপ্নে চলে এসেছে। এরকম অবস্থায় স্বপ্নদ্রষ্টা বাস্তবে কামোদ্দীপনা বোধ করেছিলেন। স্বপ্নদ্রষ্টা ওই উদ্দীপনা ফিরে পেতে চাইছেন।

স্বপ্ন ৫: একজন তিরিশ বছরের পুরুষ দেখছেন, তার প্রিয়তম বন্ধুর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

অর্থ: ওই বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রীকে তিনি বিয়ে করতে চান।

স্বপ্ন ৬: বাইশ বছরের যুবক স্বপ্ন দেখলেন, তিনি ধুতি আর সাদা চাদর পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অর্থ: যুবকের অচেতন মনে থাকা বাবার মৃত্যু কামনা স্বপ্নে চলে এসেছে।

স্বপ্ন ৭: একজন ২৮ বছরের তরুণ আইনজীবী স্বপ্ন দেখলেন, তার বাড়িতে আয়কর বিভাগের অনেক অফিসার বসে আছেন।

অর্থ: আইনজীবী প্রচুর পসারওয়ালা হয়ে গেছেন। প্রচুর টাকাপয়সা রোজগার করছেন। মনের এই গোপন ইচ্ছা স্বপ্নে চলে এসেছে। অনেক টাকা আর সম্পত্তির মালিক হওয়ায় স্বপ্নে তার বাড়িতে হানা

দিয়েছে আয়কর দপ্তর।

স্বপ্ন ৮: চুয়াল্লিশ বছরের এক স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ স্বপ্ন দেখলেন, তিনি তাঁর চেম্বারে ঢুকছেন। চেম্বারভর্তি রোগীদের মাথায়, সারা শরীরে হাজার হাজার লাল রঙের পোকা। চিকিৎসক রোগীদের বললেন, চিন্তা করবেন না। সব পোকা আমি এখনই পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

অর্থ: রোগীদের 'মাথার পোকা'র অর্থ এঁরা সবাই মনোরোগী। সব পোকা তিনি পরিষ্কার করে দেবেন। অর্থাৎ তিনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার গোপন ইচ্ছা এই স্বপ্নে চলে এসেছে। (মাথায় পোকা—মাথায় গোলমাল=মনোরোগ)

স্বপ্ন ৯: সাতাশের এক যুবক স্বপ্ন দেখলেন, রাজ্যের মন্ত্রী-র পায়ের জুতো পালিশ করছেন ক্রিম দিয়ে।

অর্থ: পেশায় ব্যবসায়ী এই যুবক প্রভাবশালী এক ব্যবসায়ীকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করছেন জুতোয় (পায়ে) ক্রিম (তেল) মাখিয়ে। এই ব্যবসায়ী ইচ্ছে করলে স্বপ্নদ্রষ্টাকে বিরাট অঙ্কের অর্ডার ধরিয়ে দিতে পারেন।

স্বপ্ন ১০: পঁয়ত্রিশ বছরের এক মহিলা স্বপ্নে দেখছেন, তার হাতে একটা প্লাস্টার বাঁধা। তিনি একজন অর্থোপেডিক ডাক্তারের চেম্বারে গেছেন। ডাক্তার তার প্লাস্টার কেটে জানাচ্ছেন, হাতের ভাঙা হাড় আর জুড়বে না।

অর্থ: স্বামীর সঙ্গে প্রায় ছিন্ন হওয়া সম্পর্ককে পুরোপুরি বিবাহ-বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন স্বপ্নদ্রষ্টা। (ভাঙা হাড়=ভাঙা সম্পর্ক)

স্বপ্ন ১১: বেয়াল্লিশ বছরের এক মহিলা স্বপ্ন দেখলেন অনেক দূরে একটা দোতলা মাটির বাড়ি।

অর্থ: এখানে দূরত্ব সময়কে বোঝাচ্ছে। এই স্বপ্নে অনেক অনেক দূরের দোতলা মাটির বাড়ি আসলে মহিলার শৈশবে (বহু বছর আগে) দেখা মামাবাড়ি পাশের বাড়ি। যে বাড়িতে ছোট বাচ্চারা নানারকম হইচই আর খেলার আনন্দে মেতে থাকত। মামাবাড়িতে গেলে যে আনন্দর ভাগ পেত স্বপ্নদ্রষ্টা শিশু। মানসিক সংকটের মধ্যে তিনি ওই দিনগুলোর আনন্দকে ফিরে পেতে চাইছেন।

স্বপ্ন ১২: এক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক স্বপ্ন দেখলেন, তিনি সকালে হাসপাতাল যাবার জন্য তৈরি হয়ে গ্যারেজের দিকে হাঁটছেন। গ্যারেজে চোখ পড়তেই দেখেন মারুতির সামনের দিকটা মোটর সাইকেলের সামনের দিক হয়ে গেছে।

অর্থ: যৌবনে মোটর সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াবার উদ্দাম দিনগুলোর স্মৃতি থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। সেই দিনগুলোতে স্বপ্নদ্রষ্টার পেছনে বসে থাকতেন এক নারী। ইনি চিকিৎসকের যৌবনের প্রেমিকা। বহু বছর কোনও যোগাযোগ নেই দুজনের। এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার অচেতন মন ফিরে পেতে চাইছে একটা সময়ের সবচাইতে 'কাছের মানুষ'কে।

স্বপ্ন ১৩: এক গৃহবধূ স্বপ্ন দেখছেন, বিবাহিতা ছোট বোনের অ্যাবরশান হয়ে গেছে। নার্সিং হোমে ভর্তি আছেন বোন। উনি দেখতে গেছেন।

অর্থ: স্বপ্নদ্রষ্টার অল্পদিনের গর্ভ নষ্ট হয়ে যাক—এই ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হচ্ছে। মনের প্রহরীকে ফাঁকি দিতে মহিলার জায়গায় চলে এসেছেন বিবাহিতা ছোট বোন।

স্বপ্ন ১৪: এক ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখলেন, কেউ একজন তাঁকে কারও একটা নাম জিজ্ঞেস করছেন। নামটা কিছুতেই তাঁর মনে আসছে না।

অর্থ: এরকম একটা ভুল ভদ্রলোক স্বপ্নেও করতে পারেন না।

স্বপ্ন ১৫: একজন যুবক স্বপ্নে খবর পেলেন, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পিঠে ছুরির আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

অর্থ: তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। (পেছন থেকে ছুরি মারা=বিশ্বাসঘাতকতা)। ঘনিষ্ঠ বন্ধু আসলে স্বপ্নের দর্শক নিজে।

স্বপ্ন ১৬: এক সাংবাদিক স্বপ্নে নিজেকে দেখতে পেলেন একটা ট্রেনের কামরায়। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। কারণ সামনে অবরোধ।

অর্থ: একটা গুরুত্বপূর্ণ পদোন্নতির রাস্তায় বড় বাধা রয়েছে। (অবরোধ=বাধা)

স্বপ্ন ১৭: এক সাতাশের যুবক স্বপ্ন দেখছেন, নন্দনচত্বরে একজন পরিচিত মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছেন। ভদ্রলোকের গালে লম্বা দাড়ি। কাঁধে ঝোলা, পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি। তিনি কবিতার একটা বই হাতে পড়তে পড়তে আনমনে হাঁটছেন। পাশ থেকে একজন ওঁকে দেখিয়ে বলছে, 'মাথাটা একদম গেছে!'

অর্থ: কবি ভদ্রলোক আসলে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে। অবচেতনের কবি হবার বাসনা চলে এসেছে স্বপ্নে। 'মাথাটা একদম গেছে' যে বলছে আসলে 'পাগল' সে। এখানে স্বপ্নের কথা উলটে গেছে। (প্রচলিত বাগ্‌ধারা—'পাগলে কি না বলে')

স্বপ্ন ১৮: 'অ্যাটলাসের মতো করে আকাশটাকে দু হাতে ধরে আছি—এক যুবকের স্বপ্ন

অর্থ: স্বপ্নদ্রষ্টা আসন্ন চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাইছেন সর্বশক্তি দিয়ে। ('মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া'=চরম বিপদ বা বিপর্যয়)

স্বপ্ন ১৯: একজন স্বপ্ন দেখছেন, তিনি দেয়ালের দিকে পেছন ফিরে তার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে কানে কানে কিছু বলছেন।

অর্থ: গোপন কথা স্বপ্নদ্রষ্টা বন্ধুকে এমন ভাবে বলছেন যাতে দেয়ালও শুনতে না পায় (চালু প্রবাদ—'দেয়ালেরও কান আছে')

স্বপ্ন ২০: এক মহিলা ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতেন, 'ভগবান' একটা বিরাট শোলার টুপি পরে আছেন।

অর্থ: ছেলেবেলায় মহিলা অনেক বাচ্চার সঙ্গে খেতে বসবার সময় এরকম টুপি পরে নিতেন। যাতে পাশের বাচ্চাদের প্লেটগুলোতে দেওয়া 'ভালোভালো আর বেশি পরিমাণ খাবার' তাকে দেখতে না হয়। 'ভগবান সব দেখতে পান' এরকম শিশুসুলভ ধারণা থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। এর অর্থ, 'টুপি পরা থাকলেও খাওয়ার সময় আমি সবই দেখতে পাই।'

ইচ্ছেমতো স্বপ্ন দেখা

স্বপ্ন নিয়ে উৎসাহী যে কোনও মানুষ এটা বুঝতে পারবেন যে তাঁর নিজের দেখা স্বপ্নর ওপর তাঁর নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। আপনি ইচ্ছে করলেই আজ রাতে ওড়ার স্বপ্ন দেখতে পারবেন না। রাতে হয়তো মনে করে ঘুমোলেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রসগোল্লা খাবার স্বপ্ন দেখবেন। তাহলেও রসগোল্লা খাবার স্বপ্ন দেখা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। তার কারণ স্বপ্ন তৈরি আর স্বপ্ন দেখার পদ্ধতির ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ প্রায় নেই বললেই চলে।

'প্রায়' শব্দটা ব্যবহার করলাম এই জন্য যে, কেউ কেউ ইচ্ছেমতো নিজের স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন বলে দাবি করেন। স্বপ্ন-গবেষক মনোবিদ গিরীন্দ্রশেখর বসু নিজের স্বপ্নের গতি মাঝেমাঝে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন বলে উল্লেখ করেছেন। গিরীন্দ্রশেখর লিখছেন, 'নিজের স্বপ্ন ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা সময় সময় আমরা ইচ্ছেমতো চালনা করিয়া থাকি। আমি অনেক সময়েই স্বপ্নের গতি ইচ্ছামতো ফিরাইতে পারিয়াছি। আমার মতন আরও অনেকে বোধহয় ইহা পারেন।'

স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন বলে বেশ কয়েকজন মানুষ আমাকে জানান। ফরাসি স্বপ্নগবেষক এন. ভাসহিদ ১৯১১ সালে এরকম ক্ষমতার অধিকারী একজন মানুষের কথা এক গবেষণাপত্রে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। মারক্যুইস ডি হারভি নামের ঐ সম্ভ্রান্ত মানুষটি নিজের স্বপ্নের গতি বা স্বপ্ন দেখার হার ইচ্ছেমতো বাড়াতে পারেন বলে দাবি করতেন। ফ্রয়েড তাঁর রচনাবলীতে ১৯১৪ সালে মারক্যুইসের এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। ফ্রয়েড মনে করতেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এক জন মানুষের ঘুমোনোর ইচ্ছা বা ঘুমে শান্তি উপভোগ করার ইচ্ছা তাঁর অবচেতন মনে থাকা অনেক ইচ্ছার একটা। কোনও মানুষের মনের এরকম ইচ্ছা যদি স্বপ্ন দেখবার আর স্বপ্নগুলোকে উপভোগ করবার ইচ্ছাতে পরিণত হয়, তবে একজন মানুষ তাঁর স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ঠিক যেভাবে একজন খুব ছোট বাচ্চার মা রাত্রে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার বা ভেজা জামাকাপড় ছাড়বার প্রয়োজনে ঠিক সময়ে ঘুম ভেঙে উঠতে পারেন। ঘুমের ওপর নিয়ন্ত্রণের মতো, স্বপ্নের ওপর নিয়ন্ত্রণও সম্ভব। আরও বহু স্বপ্নবিদ এ ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেছেন নানা ভাবে।

কী সেই পদ্ধতি, যা নিয়মিত অনুশীলনে নিজের স্বপ্নকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়? এব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা মুশকিল। তবে স্বপ্ন নিয়ে বেশ কিছুদিন ভাবনাচিন্তা বা পড়াশোনা করা বেশ কয়েকজন মানুষ এসংক্রান্ত নানা ধরনের 'সমাধানের স্বপ্ন' (Solution Dream) দেখেন বলে আমি জানি। এই বই লিখতে লিখতে আমি নিজেও এরকম অনেক স্বপ্ন দেখেছি। উৎসাহী মানুষ একটানা কিছু দিন স্বপ্নচর্চা করলে তাঁর 'স্বপ্ন দেখা বাড়ে'। এর একটা কারণ স্বপ্ন বেশি মনে থাকা হলে অন্য কারণ অবশ্যই নানা ধরনের স্বপ্ন কিছুমাত্রায় হলেও বেশি দেখা। আমি স্বপ্ন নিয়ে কাজকর্ম করতে করতে এমন বেশ কিছু স্বপ্ন দেখেছি যা আগে দেখিনি বা দেখলেও পরে তা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। এসব স্বপ্নের মধ্যে 'স্বপ্নে সংখ্যা' নিয়ে ভাবতে ভাবতে অর্থপূর্ণ কয়েকটা সংখ্যার স্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলতে হয়। এছাড়া ট্রেন মিস করা বা উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্ন ঐ স্বপ্নগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে বেশ কয়েকবার দেখেছি।

তবু নিজের স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারটা খুব সহজ বলে আমার মনে হয় না। 'ওড়ার স্বপ্ন' দেখতে চাই আমি বহু দিন ধরে। এরকম ইচ্ছা সচেতন মনে তীব্র হলেও এই লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত ওড়া বা লাফ দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যাবার স্বপ্ন আমি দেখি নি। অনেকে আমাকে জানিয়েছেন, স্বপ্ন দেখবার

সময় অনেক সময় তাঁরা বুঝতে পারেন যে, এটা বাস্তব নয়, তাঁরা আসলে স্বপ্ন দেখছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের চেতনা বুঝতে পারে যে আমরা আসলে ঘুমোচ্ছি। স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে এরকম অনুভূতি না হবার কোনও কারণ নেই।

সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নের ভ্রমণে' স্বর্গে ঘুরে বেড়াবার স্বপ্নের কথা 'স্বপ্নের ভ্রমণ' অধ্যায়ে বলেছি। সুনীল আমাকে জানান, এই স্বপ্নটা তিনি দেখেছেন বেশ কয়েকবার। আর এই স্বপ্নটা দেখবার শুরুতে তাঁর মনে হয়, 'আরে! আবার স্বর্গে চলে এসেছি!' লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তার বারবার দেখা একটা স্বপ্নে একটা 'অচেনা বাড়ি' দেখতে পান। আর যখনই ঐ বাড়িটা তাঁর স্বপ্নে আসে, তখনই ওঁর মনে হয়, 'আরে! ঐ বাড়িটা আবার স্বপ্নে এসেছে।' একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন বাণী বসু ও আরও অনেকে।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্ন বাস্তবের মতো পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে বেশিরভাগ সময়। তা নইলে চোরের স্বপ্ন দেখতে দেখতে 'চোর! চোর!' বলে চিৎকার করে উঠতেন না কোনও স্বপ্নের দর্শক। বা ভয়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে মুখে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে ঘুম ভেঙে যেত না কোনও মানুষের।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে একবার রবীন্দ্রনাথের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই স্বপ্নের বিবরণ উল্লেখ করেছি 'স্বপ্নকল্পনা' অধ্যায়ে (৩৯ পাতায় রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন (গ) 'লম্বা করে দেবার শয়তানের দল' দেখুন)। মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচের কিছু অদ্ভুত মানুষ ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মাথায় কিছু একটা গুঁড়ো দিতেই তাঁরা লম্বা হয়ে উঠছেন। স্বপ্নে এরকম উদ্ভট ব্যাপার দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়, স্বপ্নে নয় তিনি বাস্তবে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখছেন। কবির কেবলই মনে হচ্ছে, 'কি আশ্চর্য, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।'

কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে সব সময় পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন যে তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন। নিজের স্বপ্নকে ইচ্ছেমতো চালনা করবার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। 'কোনও স্বপ্নের গতি খারাপ দিকে বা কষ্টকর দিকে মোড় নিতে পারে বুঝতে পারলে এঁরা স্বপ্নের গতিপথ ঘুরিয়ে তাকে একটা ভাল দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারবেন। ঠিক যেভাবে একজন জনপ্রিয় নাট্যকার, পাঠক ও নাট্যমোদী দর্শকের দাবিতে বা চাপে নাটককে শেষ পর্যন্ত বিয়োগান্তের বদলে মিলনান্ত পরিণতি দিয়ে শেষ করে দেন।' নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া এব্যাপারটা অনুভব করা কঠিন বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়।

সংখ্যা নিয়ে স্বপ্ন

স্বপ্নে সংখ্যা কখনও অর্থহীন হয় না। সংখ্যা এসেছে এমন বেশ কিছু স্বপ্নের বিবরণ অনেক স্বপ্নদ্রষ্টা আমাকে জানিয়েছেন। সংখ্যার স্বপ্ন নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কার রয়েছে। অনেকে মনে করেন সংখ্যার স্বপ্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা ভালো বা খারাপ ইঙ্গিত দেয়। ফ্রয়েড স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনায় বেশ কিছু সংখ্যার স্বপ্ন নিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। ফ্রয়েডের সমসাময়িক ইয়ুন (১৯১১), জোনস (১৯১২), মারসিনোস্কি ও আরও বেশ কয়েকজন মনোবিদ সংখ্যা রয়েছে এমন বেশ কিছু স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে ওইসব স্বপ্নে সংখ্যার গুরুত্ব আর তার অর্থ বার করে আনেন। ইয়ুনের এ সংক্রান্ত কিছু স্বপ্নের বিশ্লেষণ অঙ্কের নানা জটিল হিসেবের সাহায্যে করা। হিসাব সংক্রান্ত জটিলতা এড়িয়ে এখানে স্বপ্নে সংখ্যার ব্যাপারে স্বপ্ন-বিশ্লেষক কিছু সিদ্ধান্তের কথা বলি।

(১) কোনও সংখ্যা স্বপ্নে 'এমনি এমনি' চলে আসে না। সংখ্যা স্বপ্নে আসলে বুঝতে হবে, স্বপ্নের মূল অর্থের ব্যাপারে ঐ সংখ্যা বা সংখ্যাগুলোর কোনও তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে।

(২) স্বপ্নে সংখ্যা ভবিষ্যতের বার্তা বয়ে আনে—বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় এরকম ধারণা পুরোপুরি ভুল বলে প্রমাণিত।

(৩) স্বপ্ন তৈরির যে জটিল প্রক্রিয়া (Dream Work), তার ঠিক বা ভুল কোনও অঙ্ক করবার (Calculation) ক্ষমতা নেই।

(৪) স্বপ্নে সংখ্যা আসে নির্দিষ্ট কোনও ভাবকে প্রকাশ করতে। আমাদের স্বপ্ন পদ্ধতি (Dream Work) যখন অন্য কোনওভাবে কোনও ব্যাপারকে প্রকাশ করতে পারছে না, তখন স্বপ্নচিন্তা (Dream Thought)-র ভেতর থাকা সংখ্যাকে অর্থবহভাবে ঐ ব্যাপারটাকে প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি বেশ জটিল।

(৫) স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ছাড়া সংখ্যার স্বপ্নে নির্দিষ্ট এক বা একাধিক সংখ্যার গুরুত্ব বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। আর এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনে ঐ সংখ্যার গুরুত্ব ঠিক কোথায়, তা জানা বিশেষ প্রয়োজন। সংখ্যার স্বপ্নে সংখ্যা কী অর্থ নিয়ে আসছে তা স্বপ্নদ্রষ্টার সাহায্য ছাড়া বার করে ফেলা অসম্ভব।

(৬) স্বপ্নে টাকা বা পয়সা সংক্রান্ত কোনও সংখ্যা বেশিরভাগ সময় সময়কে বোঝায় ('টাইম ইজ মানি')।

দৃষ্টান্ত হিসেবে কিছু সহজ সংখ্যার স্বপ্ন আর তার অর্থ বলা যাক:

স্বপ্ন ১: এক ভদ্রলোক রাস্তায় আমাকে গুনে গুনে ৬৩ টাকা দিলেন—আমি বললাম, বাকিটা? বললেন, এর বেশি আর পারব না—

নিজস্ব ব্যাখ্যা: স্বপ্নদ্রষ্টার বয়েস ৫৮। এই স্বপ্ন দেখবার পর তাঁর নিজের মনে হয়, তিনি ৬৩ বছরের বেশি বাঁচবেন না। এই স্বপ্ন তাঁর আর মাত্র পাঁচ বছর আয়ুর ইঙ্গিত।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: স্বপ্ন দেখবার কয়েকমাস বাদেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই কর্মচারীর অবসর নেবার কথা। অবসরের পর প্রাপ্য থোক টাকা ভদ্রলোক কোনও নিরাপদ জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য

বিনিয়োগ করবার কথা ভেবেছেন। পেনসানের মাসিক আয়ে সংসার চালাতে কষ্ট হবে, এটা ভদ্রলোক ভালভাবেই জানেন। পাঁচ বছর বিনিয়োগে টাকা দ্বিগুণের কিছু বেশি হয় এমন প্রকল্পের পাশাপাশি ঐ থোক টাকা বিনিয়োগ করে 'মাসিক আয় প্রকল্প'তে রাখার চিন্তা স্বপ্নদ্রষ্টা করেছেন। দ্বিতীয় প্রকল্পে মাসে মাসে কিছু টাকা পেলেও তা নগণ্য। প্রথম প্রকল্পে টাকা রাখলে পাঁচ বছর কিছুটা কষ্ট হলেও তারপর অনেক টাকা পাওয়া যাবে। যে টাকা কোনও 'মাসিক আয় প্রকল্প'তে বিনিয়োগ করলে মাসিক আয় অনেক বাড়বে। পাঁচবছর একটু কষ্ট করে তেষট্টি (৫৮+৫= ৬৩) বছর বয়েস থেকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবার ইচ্ছা এই স্বপ্নে জটিলভাবে চলে এসেছে। এই স্বপ্ন সংখ্যাকে জড়িয়ে এক জটিল ইচ্ছাপূরণ।

স্বপ্ন ২: একটা সেমিনারে পি. জি. হাসপাতালের পরিচিত এক সার্জেন বক্তৃতা করছেন। বাইরে তার গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ির ড্রাইভার আমাকে তুলে নিয়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। একটু পরে গাড়িটা রবীন্দ্রসদনের উলটোদিকে পি. জি. হাসপাতালের প্রথম গেটের কাছে দাঁড়াল। আমি ড্রাইভারকে পৌঁছে দেবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে দুটো দশ টাকার নোট ওঁর হাতে দিলাম—'

এই স্বপ্নের কথা আমাকে জানান এক পরিচিত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি নিজে এই স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য বলে আমার মনে হয়।

ব্যাখ্যা: মফস্বলের এক মহকুমা হাসপাতালে কর্মরত এই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ 'হাউস-ফিজিসিয়ান' থাকবার সময় এক বছরের জন্য পি. জি. হাসপাতালে ছিলেন। মহকুমা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করবার সুযোগ সীমিত। তিনি তাই কলকাতার বড় কোনও সরকারি হাসপাতালে যেতে চান। পি. জি. হাসপাতালের এক পরিচিত শল্যবিদ-শিক্ষকের গাড়িতে ঐ হাসপাতালের সামনে পৌঁছে যাবার অর্থ কি? চিকিৎসকের মনে হয়, পি.জি. হাসপাতালে বদলি হতে পরিচিত কোনও 'প্রভাবশালী চিকিৎসক'-এর সাহায্য পাবেন—অবচেতনের এই ইচ্ছা স্বপ্নে চলে এসেছে। স্বপ্নে ড্রাইভারকে কুড়ি টাকা দেবার অর্থ এরকম। স্বপ্নদ্রষ্টার বয়স ৩৮। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তিনি আরও (৫৮—৩৮=২০) বছর চাকরি করবেন। এই কুড়ি বছর বিশেষজ্ঞ হিসেবে পি. জি. হাসপাতালে বা অন্য বড় হাসপাতালেই থাকবেন এরকম ইচ্ছা স্বপ্নে চলে এসেছে।

স্বপ্ন ৩: একজন প্রৌঢ় আত্মীয় আমাকে তার টেলিফোন নাম্বার দিলেন আমার বাড়িতে বসে। আমি শুনে বললাম, এই নম্বরটা তো আট সংখ্যার। তখন তিনি ভুল শুধরে একটা সাত সংখ্যার নম্বর দিলেন। নম্বরটা হল ৪২৪২৪৮৩।

সূত্র: কয়েকদিন আগে ওই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল স্বপ্নদ্রষ্টার। তিনি কথায় কথায় জানান তাঁর বয়স ৭৯ চলেছে। আর স্বপ্নদ্রষ্টার বাবা ওই ভদ্রলোকের চাইতে ৪ বছরের বড়। আট সংখ্যার নম্বর স্বপ্নে এসেছে মাসখানেক আগে এই বন্ধুর দেওয়া 'পেজার নাম্বার' থেকে, যার সংখ্যা ছিল ৮।

ব্যাখ্যা: স্বপ্নদ্রষ্টার বাবার বয়েস (৭৯+৪=)৮৩। তাঁর শরীরের যা অবস্থা, তাতে তিনি আর ২/৪ বছরের বেশি বাঁচবেন না। সাত সংখ্যার গুরুত্ব এরকম। আরও ৭ বছর বাঁচলে তাঁর বাবার বয়েস হবে (৮৩+৭=)৯০। স্বপ্নদ্রষ্টার পরিবারে ৮৯ বছর বয়েসের বেশি কেউ বাঁচেন নি। তাঁর বাবা তাঁদের বংশে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী (৮৯ বছর থেকেও ১ বছর বেশি) হবেন, এরকম ইচ্ছা স্বপ্নে চলে এসেছে। এই স্বপ্নের ২৪ আর ৪২ অংশের গুরুত্ব অন্য। ২৪ বছর বয়স ছিল জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড়। আর ৪২ বছর বয়সে তিনি বীমাসংস্থা থেকে প্রচুর টাকা পাবেন। স্বপ্নে তাই সংখ্যাগুলো চলে এসেছে।

এই তিনটে স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন, স্বপ্নের কোনও জটিল ভাব প্রকাশ করতে অর্থপূর্ণভাবে নানা সংখ্যা চলে এসেছে স্বপ্নে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই সংখ্যা বছরের হিসেবে সময় সংক্রান্ত

কোনও জটিল ভাবকে প্রকাশ করছে। বিশ্লেষণ ছাড়া যার তাৎপর্য বুঝতে পারা অসম্ভব। এই দৃষ্টান্তগুলো থেকে মনে হতে পারে, স্বপ্নের হিসাব করবার বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। মনোবিদদের মতে, তা সম্ভব নয়। এরকম হিসাব আসলে স্বপ্নদ্রষ্টার অবচেতন বা অচেতন মনে রয়েছে। অচেতন মনের কোনও গোপন হিসাব জটিল আকারেই স্বপ্নে চলে আসে। সচেতনে না থাকায় ঐ হিসাবের কথা স্বপ্নদ্রষ্টা জানেন না। তাই তাঁর কাছে স্বপ্নের সংখ্যাগুলোকে উদ্ভট বলে মনে হয়।

স্বপ্ন ৪: একজন মহিলা দেখলেন, তিনি রাস্তা দিয়ে দুটো ছোট মেয়ের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন, যারা একে অন্যের থেকে ১৫ মাসের ছোটবড়। মেয়েদুটো তাঁর অচেনা। [ফ্রয়েডের রোগিনীর স্বপ্ন]।

ব্যাখ্যা: ওই মেয়েদুটো আসলে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজেই। তাঁর ছেলেবেলার দুটো কষ্টকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি এই স্বপ্নে চলে এসেছে। ঐ অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল যথাক্রমে তাঁর সাড়ে তিন বছর আর চার বছর ন'মাস বয়সে। এই দুটো ঘটনা ঘটার সময়ের ফারাক (৪ বছর ৯ মাস—৩ বছর ৬ মাস=) ১ বছর ৩ মাস ১৫ মাস স্বপ্নে বাচ্চা দুটোর বয়সের ফারাক।

স্বপ্ন ৫: পাড়ার অন্ধকার রাস্তায় আমার পেছন পেছন দশটা কুকুর যাচ্ছে—দশটা বাড়ি পার হয়ে কুকুরগুলো আর এগোচ্ছে না, দাঁড়িয়ে থাকছে দশ নম্বর বাড়িটার পাশে—।

ব্যাখ্যা: স্বপ্নদ্রষ্টার দশ বছর বয়সের এক সুখস্মৃতির অভিজ্ঞতা থেকে এই স্বপ্নে দশ সংখ্যা দু'বার এসেছে। অবচেতনের ইচ্ছা—'দশ বছর বয়সটাকে যদি আবার ফিরে পাওয়া যেত'—স্বপ্নে সংখ্যার মাধ্যমে জটিলভাবে পূর্ণ হতে চাইছে।

স্বপ্ন ৬: নির্জন রাস্তায় একটা বস্তা পড়ে আছে পাশে অনেক টাকা। সব টাকা কুড়িয়ে বস্তায় ভরে লুকিয়ে বাড়ি নিয়ে এসে বাণ্ডিলগুলো খুলে মনের আনন্দে গুনছি। দেখি ১৮ হাজার টাকা। বারবাব গুনছি।

ব্যাখ্যা: স্বপ্নদ্রষ্টা ৩৪ বছরের চিকিৎসক। তাঁর শৈশবে ফিরে যাবার তীব্র ইচ্ছা স্বপ্নে চলে এসেছে (মুদ্রা বা টাকা কুড়ানোর স্বপ্ন' দেখুন)। ১৮ সংখ্যা স্বপ্নে এসেছে স্বপ্নদ্রষ্টার ১৮ বছর বয়সের আনন্দমুখর অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে। ঐ বছর হায়ার সেকেন্ডারিতে 'স্টার-মার্কস' পাবার আর জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সুযোগ পাবার স্মৃতি স্বপ্নে চলে এসেছে। শৈশবের আর ১৮ বছরের ঐ আনন্দমুখর দিনগুলোকে স্বপ্নে ফিরে পেতে চাইছেন এই স্বপ্নদ্রষ্টা চিকিৎসক।

স্বপ্ন ৭: অন্ধকার রাস্তায় একদল ডাকাত তাড়া করেছে। সবার হাতে একটা করে মশাল। মশাল গুনে বুঝলাম ১৪ জন ডাকাত। ওদের হাত থেকে বাঁচতে একটা গলিতে ঢুকতেই দেখি অনেক কুকুরের চোখ অন্ধকারে চকচক করছে। ১২টা চোখ গুনে বুঝলাম ৬টা কুকুর। ডাকাতের চাইতে কুকুর ভালো—এই ভেবে ছুটতে শুরু করলাম গলি ধরে।

—কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, বালুরঘাট।

সূত্র: স্বপ্নদ্রষ্টা ১৬ বছরের ক্লাস টেনের একজন ছাত্র। কয়েকদিন আগে স্কুল থেকে ফেরার পথে তাকে কুকুরে কামড়েছে। হাসপাতাল থেকে তাকে 'অ্যান্টি-রেবিস ভ্যাকসিন' নেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বন্ধুদের মুখে সে শুনেছে এই ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় পেটে, মোট ১৪টা। আর খুব ব্যথা হয় এতে। এক বন্ধু জানিয়েছিল, তাঁকে কুকুরে কামড়াবার পর তাঁদের হাউস-ফিজিশিয়ান তাকে ৬টা খুব দামী নতুন এক ধরনের ইঞ্জেকশান দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এটা হাতে দিতে হয়, ব্যথাও হয় না।

ব্যাখ্যা: এই স্বপ্নের অর্থ বেশ মজার। পাঠকের এটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। পেটে 'ভয়ঙ্কর' ১৪টা ইঞ্জেকশনের বদলে হাতে 'বেদনাহীন' ৬টা ইঞ্জেকশান নিতে চায় স্বপ্নদ্রষ্টা। 'ডাকাতের চাইতে কুকুর ভালো'—এই ভাবনা স্বপ্নের গূঢ় অর্থ ধরাতে সাহায্য করে।

পাঠক লক্ষ্য করবেন, ৫ আর ৭ নম্বর স্বপ্নে কোনও একটা সংখ্যা অন্য প্রেক্ষিতের একই সংখ্যাকে বোঝাচ্ছে।

স্বপ্ন ৮: ডোভার লেন বা ঐরকম কোনও মিউজিক কনফারেন্স থেকে মাঝরাতে ফিরছি। পথে পিছু নিয়েছে অনেক কুকুর। ভাবছি, যতগুলো চোখ জ্বলছে তাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কুকুরের সংখ্যা পাওয়া যাবে। তারপরই মনে হচ্ছে, যদি কোনও কুকুর কানা হয়? গুনে দেখলাম চৌষট্টিটা চোখ। মানে বত্রিশটা কুকুর। ওদের শান্ত করবার জন্য আমি 'যোগ'রাগে খেয়াল গাইতে শুরু করলাম। আর ওরা আরও খেপে উঠল। তারপর আমি দৌড়তে শুরু করলাম। সে কি দৌড়!

—অভীক ভট্টাচার্য

ব্যাখ্যা: স্বপ্নদ্রষ্টা 'আনন্দমেলা' পত্রিকার সহ-সম্পাদক। খেয়াল গান করেন। ষোলোমাত্রা বা অন্য মাত্রায় 'দ্রুত' গাইতে গেলে ওঁর ভয় হয় পাছে বন্দিশের 'মুখরা' ঠিকমতো ধরতে না পারেন। যোগরাগ এই যুবকের খুব প্রিয় রাগ। মিউজিক কনফারেন্স থেকে ফিরতে ফিরতে স্বপ্নদ্রষ্টা আসলে খেয়াল গাইছেন। কুকুরের চোখগুলোর সংখ্যা ৬৪, কুকুর ৩২টা। ৬৪, ৩২ দুটো সংখ্যাই ত্রিতাল (১৬ মাত্রাতে) গাওয়া যায় এমন তানের মাত্রা। খেয়ালের তান তালের গুনিতক (Multiple) বা ভাগে (Division) গাওয়া যায়। ১৬ মাত্রার তালে ৩২(১৬×২) বা ৬৪ (১৬×৪) মাত্রার গান গাওয়া যায়। 'যদি কুকুর কানা হয়'—এর অর্থ তানের মাত্রা গুনতে ভুল হলে 'মুখরা'য় ফেরা যাবে না। তবলার তালকে কব্জা করতে (কুকুরগুলোকে শান্ত করতে) স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁর অভ্যস্ত আর প্রিয় রাগ 'যোগ' গাইতে শুরু করলেন। 'ওরা আরও খেপে উঠল'—এর অর্থ তবলার তালকে মোটেই কব্জা করা যাচ্ছে না। তখন দৌড়ে পালানো ছাড়া আর উপায় কি!

স্বপ্নের দর্শকের সঙ্গে কথা বলে ওঁর সাহায্যে এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেছেন সুপ্তি চক্রবর্তী।

স্বপ্ন ৯: এক আত্মীয়ার বাড়ির বারান্দায় বসে আছি, আশেপাশে কয়েকজন মানুষ। দু জন পরিচিত, আত্মীয়। আমি বলছি, দাদা আমার থেকে দু বছরের বড়। দাদারই এখনও বিয়ে হল না, আমি কি বিয়ে করব!

—সমীর রায়, শ্রীরামপুর।

ব্যাখ্যা: স্বপ্নদ্রষ্টা একজন চাটার্ড অ্যাকাউন্টেট। প্রায় ৭ বছর আগে তিনি বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোকের দাদা তার থেকে প্রায় পৌনে চার বছরের বড়, বহু বছর বিবাহিত। এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার স্ত্রীর কথা চলে এসেছে তাঁর নিজের কথা হয়ে। ঐ মহিলার দাদা মহিলার চাইতে দু বছরের বড়। ভদ্রলোক অবিবাহিত। স্বপ্নের কথাগুলোর গূঢ় অর্থ, স্বপ্নদ্রষ্টার স্ত্রীর দু বছরের বড় দাদার বিয়ে না হওয়ায় ঐ মহিলারও বিয়ে হয় নি। অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে অবিবাহিত। এই জটিল স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শক তাঁর বিয়ের আগেকার 'স্বাধীন জীবন'-এ ফিরে যেতে চাইছেন। স্বপ্নে এক জনের ব্যাপার অন্য জনের ঘাড়ে গিয়ে পড়বার ('উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে') ঘটনা পাঠক বুঝতে পারবেন, এই স্বপ্ন থেকে।

স্বপ্ন ১০: একটা ট্যাক্সিতে এক বস্তা ভর্তি টাকা পেয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছি—সারা রাতে ধরে টাকা গুনছি—কুড়ি লক্ষ টাকাকে গুনছি কুড়িবার।

—সুমিত দে, কলকাতা।

ব্যাখ্যা: স্বপ্নদ্রষ্টা একজন সাংবাদিক। 'সানন্দা' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এই স্বপ্নের অর্থ 'মুদ্রা বা টাকা

কুড়ানোর স্বপ্ন অংশে দেখুন। স্বপ্নে ২০ সংখ্যাটা এসেছে ২ বার। ২০ বছর বয়সে তিনি চাকরি পান। চাকরিটার প্রয়োজন ছিল খুব। ঐ বছরটা তাঁর জীবনে তাই বিশেষ গুরুত্বের। ইংরেজি প্রবাদ 'টাইম ইজ মানি'র কথা অনেকেই জানেন। স্বপ্নে টাকাপয়সার সংখ্যা সাধারণত বয়স বা সময়কে বোঝাতে আসে।

এবার কিছু বিদেশী স্বপ্ন বিশ্লেষক মনোবিদের বিশ্লেষণ করা সংখ্যা সংক্রান্ত কিছু স্বপ্নের কথা বলি.

স্বপ্ন ১১: এক জন পুলিশ কনস্টেবল স্বপ্ন দেখছেন, যে তিনি রাস্তার ডিউটিতে রয়েছেন। এক জন পুলিশ ইন্সপেক্টর তাঁর কাছে এলেন। ইন্সপেক্টরের ইউনিফর্মে একটা নাম্বার রয়েছে, যার প্রথম দুটো সংখ্যা ২২। তারপর ৬২ বা ২৬।

এই স্বপ্ন অস্ট্রিয়ান মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. বি. ডাটনারের এক গবেষণাপত্র থেকে নেওয়া। স্বপ্নের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাও ঐ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের করা।

ব্যাখ্যা: ২২৬২ সংখ্যা বিভিন্ন অর্থ নিয়ে স্বপ্নে এসেছে। রাস্তায় ডিউটি করেন পুলিশের ইন্সপেকটর পদমর্যাদার অফিসার, কনস্টেবল নন। আগের দিন থানায় একজন ইন্সপেকটার ৬২ বছর বয়সে অবসর নিয়েছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা কনস্টেবল সেই সময় অন্যদের সঙ্গে অবসর সংক্রান্ত টাকা পয়সা পাওয়া নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন। স্বপ্নের উৎস আগের দিনের ওই আলোচনা। কনস্টেবল পুলিশবিভাগে ২২ বছর কাজ করেছেন। আরও ২ বছর ২ মাস কাজ করলে তিনি পুরো 'পেনশন' পাবার যোগ্য হবেন। স্বপ্নের ২২ সংখ্যা এসেছে এই হিসেব বোঝাতে। স্বপ্নে কনস্টেবলের রাস্তায় ডিউটি করার ছবি এসেছে তাঁর বহুদিনের ইন্সপেকটর হবার বাসনা থেকে। স্বপ্নের ২২৬২ নম্বরের ইন্সপেকটর আসলে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে। যেন ২ বছর ২ মাস কাজ করে পুরোপুরি পেনশন নিয়ে ৬২ বছরে তিনি অবসর নিতে চলেছেন। এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার দুটো সরল ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে পূর্ণ হচ্ছে সংখ্যার জটিলতার ভেতর দিয়ে।

স্বপ্ন ১২: বিদেশ থেকে অস্ট্রিয়া এসেছেন এক মহিলা। তাঁর মেয়ে পড়ে ভিয়েনার এক আবাসিক স্কুলে। আর কিছু দিন বাদে পরীক্ষা হয়ে গেলে মেয়েকে নিয়ে ফিরে যাবেন দেশে। একটা মানসিক সমস্যার জন্য এই সময়টুকুতে ফ্রয়েডের কাছে চিকিৎসা করাচ্ছেন ভদ্রমহিলা। এই অবস্থায় এক রাতে দেখেন এই স্বপ্ন।

মহিলা যেন কাউকে কিছু টাকা দিচ্ছেন। মেয়ে মায়ের টাকার ব্যাগ থেকে ৩৬৫ টাকা নিচ্ছে। মহিলা মেয়েকে বলছেন, 'এ কি করছ, দাম তো মাত্র ২১ টাকা!' [জটিলতা এড়াতে অস্ট্রিয়ার মুদ্রাকে টাকায় উল্লেখ করা হল।]

ব্যাখ্যা: আর ঠিক ৩ সপ্তাহ (২১ দিন) বাদে মেয়ের ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট বার হলে স্বপ্নদ্রষ্টা দেশে ফিরবেন মেয়েকে নিয়ে। স্বপ্ন দেখবার ঠিক আগের দিন মেয়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ওই মহিলাকে তাঁর মেয়েকে আরও একবছর (= ৩৬৫ দিন) ওই স্কুলে রাখবার কথা বিবেচনা করতে বলেন। ২১ আর ৩৬৫ টাকা স্বপ্নে এসেছে সময় (দিন) বোঝাতে। ফ্রয়েড এই স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেন নিজস্ব পদ্ধতিতে। মহিলা ৩৬৫ টাকার বদলে 'দাম তো মাত্র ২১ টাকা' বলার অর্থ, তাঁর বিদেশে থাকবার, মেয়ের পড়াশোনার আর নিজের চিকিৎসার খরচকে এক বছর (৩৬৫ দিন) থেকে ২১ দিনের খরচে কমিয়ে আনা। স্বপ্নদ্রষ্টার মনের এই ইচ্ছা তাঁর এই স্বপ্নে পূর্ণ হচ্ছে সংখ্যার মাধ্যমে।

কবি শঙ্খ ঘোষের স্বপ্নে সংখ্যা

কবি শঙ্খ ঘোষের কিছু স্বপ্নে '১২' সংখ্যা চলে এসেছে নানাভাবে। এই কবির 'লাইনেই ছিলাম বাবা' শিরোনামের কবিতার বইয়ের 'স্বপ্ন' নামের কবিতাটার কথাই ধরা যাক। এই কবিতার প্রথম লাইন ছিল 'বারোটা শহর ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও পাখি থাকবে না'। কবি আমাকে জানান, "এই গোটা লাইনটিই স্বপ্নোত্থিত। লাইনটির তাৎপর্য কী, এখনও আমি সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলতে পারি না। কেন বারো, কেন পাখি, কিছুই জানি না।"

শঙ্খ ঘোষের আরও কিছু স্বপ্নে বারো সংখ্যা ঘুরেফিরে এসেছে। 'স্বপ্নে বিখ্যাত চরিত্র' অধ্যায়ে

'কবির স্বপ্নে কবি' দেখুন। কবি জয় গোস্বামীকে নিয়ে দেখা স্বপ্নের একটা অংশ—'তিন লাইন তিন লাইন করে সাজানো বারো লাইনের কবিতা। সবটা লেখা হয়ে গেছে...'। এই স্বপ্নের প্রেক্ষিতে শঙ্খ জানান, সম্প্রতি কিছুদিন ধরে বারো/চোদ্দো লাইনের কবিতা লিখছেন তিনি।

এই কবির দেখা আর একটা স্বপ্নে '১২' সংখ্যা এসেছে জটিলভাবে। কবি এই স্বপ্ন দেখেন ১৯২৯ সালের ২৯ অক্টোবর। সেই সময় কিছু স্বপ্নের বিবরণ ঘুম ভাঙতেই লিখে রাখার অভ্যাস ছিল তাঁর। এই স্বপ্নের একটা অংশ এরকম:

"একটা সুইমিং পুল ধরনের জলাশয়, ঠিক ততটা কৃত্রিম বা সাজানো নয়, ছ-কোনা বিভঙ্গ, তার চারপাশ ঘিরে যেন বসে আছি সবাই। সেখানে অন্য কারও মুখ অবশ্য স্পষ্ট নয়। জলাশয়ের এক-একটা কোন ঘেঁষে ছিপছিপে এক-একটা নৌকা, তার প্রত্যেকটিতে বসে আছে দু জন করে লোক।" পাঠক লক্ষ্য করবেন, ছ-কোনা জলাশয়ে ছ-টা নৌকা, প্রত্যেকটাতে দু জন করে লোক। মোট লোক সংখ্যা (৬ × ২ =১২) বারো।

শঙ্খ ঘোষের জীবনে ১২ সংখ্যার তাৎপর্য বা গুরুত্ব কোথায়? ওঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, ১২ বছর বয়সে তাঁর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বছর। খুব কম বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন শঙ্খ। তবে 'কবিতার খাতা' বানিয়ে সেই খাতায় কবিতা লেখা শুরু হয় বারো বছর বয়স থেকে। লক্ষকোটি 'কবিতার মুহূর্ত' দিয়ে গড়া যে কবির সৃষ্টিশীল জীবন, তাঁর কাছে নিয়ম করে নির্দিষ্ট খাতায় কবিতা লেখা শুরুর বছরটার গুরুত্ব বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। শঙ্খের স্বপ্নে তাই বারবার 'বারো' চলে আসে সরাসরি বা কিছুটা জটিলভাবে।

'বারোটা শহর' এর সম্ভাব্য অর্থ, কবির বারো বছর বয়েস। এক জন কবির কাছে 'পাখি' হতে পারে মুক্তির রূপক। 'পৃথিবী' জীবন। 'বারোটা শহর ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও পাখি থাকবে না'র অর্থ হতে পারে এরকম—বারো বছর বয়েস অর্থাৎ কবিতা ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোনও মুক্তির জায়গা নেই। মানুষের মুক্তির একমাত্র জায়গা হল কবিতা।

চেতনায়, মননে শতকরা একশোভাগ এক কবির মনে কবিতা আর মুক্তি সমার্থক তো হতেই পারে। বিশেষ করে কবির নাম যেখানে শঙ্খ ঘোষ। যে কবির কবিতা পড়তে পড়তে হৃদয়ের ফাঁকফোকর গলে মুক্তির বার্তা পৌঁছে যায় পাঠকের চেতনায়, মননে। পাঠক উত্তীর্ণ হন শব্দোত্তর এক মুক্তির বোধে, অনুভবে।

শঙ্খ ঘোষ তো সেই কবি যিনি শুনতে পান 'হাসপাতালে বলির ঘণ্টা'। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি চাপচাপ কালো অন্ধকারে যাঁর কবিতায় বেজে ওঠে তীব্র শ্লেষ, 'কঠোর বিকল্পের কোনও পরিশ্রম নেই'! শঙ্খ ঘোষ মুক্তির কবি, যাঁর কলম নির্দ্বিধায় লিখতে পারে 'ছিপ করেছি নিজের হাতে নিজেরই শিরদাঁড়া।'

বিজ্ঞাপনসংস্কৃতির রংচং-এ আলোর এক কোণায় অন্ধকার খুঁজে নিয়ে শঙ্খ আজও অবলীলায় ঘোষণা করতে পারেন:

'খুবই দেখেশুনে বৈঠা বাইতে হবে
ওত পেতে আছে ঘাটে ঘাটে ঘড়িয়াল—
কবিতায় যদি গল্প লুকোনো থাকে
টপ করে তাকে গিলে নেবে সিরিয়াল।'

শঙ্খ ঘোষের মননে, চেতনায়, অবচেতনে 'মুক্তি', 'কবিতা' আর 'পাখি' কীভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তা বোঝা যায় অক্টোবর '৪৭ তে লেখা কবির 'অপমান' কবিতায়—

'চোখের আড়ালে অশ্বত্থের ডালে
ভেবেছ দু' পাখি মরে যাবে এক ঢিলে।

মরেওছে বটে। তবে সে আমার নয়।
আমার পাখি তো লুকোনো নৌকোজলে।'

স্বপ্নে সংখ্যা কীভাবে স্বপ্নের মূল অর্থকে কিছুটা জটিলভাবে প্রকাশ করে, সংখ্যা সংক্রান্ত এই স্বপ্নগুলোর ব্যাখ্যা থেকে তা পাঠকের কাছে পরিষ্কার হবে বলে আশা করা যায়। স্বপ্নে সংখ্যার ব্যবহার অনেকটা কার্টুন ছবিতে নানা ধরনের সঙ্কেত চিহ্ন ব্যবহারের মতো। কার্টুন ছবি দেখতে অভ্যস্ত নন, এমন মানুষের কাছে এসব চিহ্নের অর্থ উদ্ভট, দুর্বোধ্য। ওই ছবির ভাষায় রপ্ত যে কেউ কোনও সঙ্কেত চিহ্ন কি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে, তা সহজেই ধরে ফেলেন। নিজের স্বপ্নে সংখ্যা এলে এই বইযেব পাঠক নিজেই বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারবেন, সেই সংখ্যার তাৎপর্য কি। ইয়ুন তাঁব স্বপ্নসংক্রান্ত একটি বইতে স্বপ্নে চলে আসা অনেক জটিল সংখ্যার অর্থ খুঁজে বার করেছেন স্বপ্নদ্রষ্টার সাহায্য নিয়ে। জটিলতা এড়াতে এরকম স্বপ্ন এই অধ্যায়ে উল্লেখ করছি না। তবে ওই সব স্বপ্নের সংখ্যাগত জটিলতার জট ছাড়াতে প্রয়োজন হয়েছে নানা ধরনের জটিল হিসাবের। আর এই সব হিসাব নির্ভুলভাবে করতে পেরেছেন ইয়ুনের স্বপ্নদ্রষ্টা রোগীরাই। সংখ্যার স্বপ্নের মূল অর্থ বুঝতে স্বপ্ন বিশ্লেষক শুধু ধরিয়ে দিতে পারেন কিছু সূত্র। গূঢ় অর্থ বার করতে সূত্রগুলো ধরে চিন্তাভাবনা করে এগোতে হবে স্বপ্নের দর্শককেই।

স্বপ্ন সত্যি হয় কেন?

আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য। এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, ভিভ রিচার্ডস এর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। ক-দিন বাদে কানপুরে একটা এক দিনের ক্রিকেট ম্যাচ। কলকাতা থেকে ওই ম্যাচ কভার করতে যাচ্ছেন কলকাতার বেশ কয়েকজন ক্রীড়া সাংবাদিক। প্লেনে গৌতম ওঁদের বললেন স্বপ্নটার কথা। সবাই হাসল! রিচার্ডস এর সেবার ভারতে আসারই কথা নয়। আশ্চর্য ব্যাপার! রিচার্ডস এলেন খেলা দেখতে। আর গৌতমও সাক্ষাৎকার নিলেন রিচার্ডসের। স্বপ্ন সত্যি হল। গৌতমের সাংবাদিক জীবনে একই ব্যাপার ঘটেছে অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে। সেই সময় ওঁর বম্বে (তখনও 'মুম্বই' হয়নি) যাবার কথাই নয়। স্বপ্ন দেখলেন, অমিতাভের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। ক-দিন বাদে অন্য একটা কাজে বম্বে গেলেন। সুযোগ এসে গেল অমিতাভের ইন্টারভিউ নেবার। ইন্টারভিউ নিলেন গৌতম। স্বপ্নের প্রশ্নগুলোই করলেন।

এই দুটো স্বপ্ন বাস্তবে মিলে যাওয়ার কারণ কি? গৌতমের মনে হয় যোগাযোগটা নেহাতই কাকতালীয়। 'সিম্পল কোইনসিডেন্স'। এক জন দক্ষ, 'পেশা অন্তপ্রাণ' সাংবাদিক গৌতম। ওঁর অচেতনে বা অবচেতনে রিচার্ডস বা অমিতাভ বচ্চনের মতো ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার নেবার ইচ্ছা থেকে সম্ভবত এরকম স্বপ্নের জন্ম। বাস্তবে স্বপ্নের চরিত্রের সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগ এসে যাওয়ার সঙ্গে স্বপ্নের যোগাযোগ কাকতালীয়। গৌতম রিচার্ডসের ইন্টারভিউ নেবার স্বপ্ন না দেখলেও রিচার্ডস কানপুরে আসতেন। হয়তো গৌতমও নিতেন ইন্টারভিউ। একই কথা বলা যায় অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে দেখা স্বপ্ন নিয়ে।

এরকম স্বপ্ন বাস্তবে মিলে যাবার কয়েকশো দৃষ্টান্তের কথা নানা শ্রেণীর, নানা পেশার মানুষ আমাকে জানিয়েছেন। বাস্তববাদী গৌতম ভট্টাচার্যের যুক্তিনিষ্ঠ মন স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার অদ্ভুত মিলকে ব্যাখ্যা করেছে 'কাকতালীয় যোগাযোগ' হিসেবে। ভাগ্যতত্ত্ব বা 'স্বপ্ন দেখান ভগবান' তত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষের কাছে এরকম স্বপ্ন মিলে যাওয়াই হয়ে দাঁড়ায় 'অলৌকিক ব্যাপার।' অলৌকিক আর 'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না'য় তীব্র বিশ্বাসী একজন মানুষ, স্বপ্নে দেখা ঘটনা বাস্তবে ঘটলে, ব্যাপারটাকে 'কাকতালীয় যোগাযোগ' বলে কিছুতেই মানতে চাইবেন না। বলবেন, এই যোগাযোগ অলৌকিক।

যে সব স্বপ্ন বাস্তবে মিলে যায়, এমন বেশ কিছু স্বপ্নের পেছনে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে ভবিষ্যতের কোনও একটা বিষয় নিয়ে আশা, উদ্বেগ বা ভয় কাজ করে। এরকম লক্ষ লক্ষ স্বপ্ন মানুষ দেখেন যেগুলো বাস্তবে মেলে না। এগুলোর কথা আমরা ভুলে যাই। অথচ হাজারে একটা স্বপ্ন বাস্তবে মিলে গেলে আমরা তা দিয়ে প্রভাবিত হই। এটাই আমাদের স্বভাব। অলৌকিক ঘটনায় মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস-এর একটা কারণ। অন্য কারণও আছে।

রাজ্যের কোনও এক হাসপাতালের ৩৪ বছর বয়সের নার্স কল্পনা দত্ত স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর বাবা মারা গেছেন। বাবার মৃতদেহ নিয়ে শবযাত্রীরা চলেছেন শ্মশানে। পরদিন সকালে উঠে খবর পেলেন, বাবা গুরুতর অসুস্থ। নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন। সত্তরোত্তীর্ণ এই ভদ্রলোক বহুদিন ধরে নানা রোগে ভুগছিলেন। এক্ষেত্রে বাবার কাছ থেকে দূরে থাকা মেয়ের মনে বাবার শরীর নিয়ে আশঙ্কা বা উদ্বেগ স্বাভাবিক। আর এরকম উদ্বেগ থেকে তৈরি মনের 'মরে গেলে বেঁচে যাবেন' এরকম ইচ্ছা থেকে এই স্বপ্ন এসেছে। এই স্বপ্ন দেখার আগের এক বছরের মধ্যে মহিলা বাবাকে নিয়ে অন্তত তিনবার এরকম দুঃস্বপ্ন দেখেছেন বলে মনে করতে পারেন। কোনওবারই স্বপ্ন বাস্তবে মিলে যায়নি। তাঁর স্মৃতিতে ওই স্বপ্ন তাই সেভাবে দাগ কাটেনি। বারবার প্রশ্ন করে ওই স্বপ্নগুলোর কথা বার করতে হয়েছে। অথচ

এবাবের স্বপ্ন দেখার সঙ্গে বাবার অসুস্থ হওয়াকে মহিলা 'স্বপ্ন মিলে যাওয়া' ভাবেন। ওঁর মনে হয় 'এর মধ্যে কিছু একটা আছে!'

এক অধ্যাপক আমাকে একদিন সকালে জানান, গতকাল রাতে তিনি তাঁর বাবার শবযাত্রার স্বপ্ন দেখেছেন। দূরে থাকা অসুস্থ বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ থেকে এই স্বপ্নের উৎপত্তি। এর মধ্যে থাকতে পারে ভদ্রলোকের অচেতন মনে লুকিয়ে থাকা বাবার মৃত্যুকামনাও। এই স্বপ্ন দেখবার বহুদিন পরেও ভদ্রলোকের বাবা জীবিত আছেন। স্বপ্ন অনুযায়ী বাবার 'কিছু একটা হয়ে গেলে' অধ্যাপক হয়তো ভেবে বসতেন, স্বপ্ন মিলে যাবার পেছনে অলৌকিক কোনও কারণ রয়েছে। সবাইকে বলতেন ওই স্বপ্নটার কথা। বাস্তবে 'স্বপ্ন মিলে না যাওয়ায়' স্বপ্নের কথা পরে ভুলে গেছেন। ঠিক যেভাবে ভাগ্যফল বিচারে দু-একটা মিলে যাওয়া ভবিষ্যৎবাণীর কথা মনে থাকে। না মেলা হাজারটা ভবিষ্যৎবাণী মানুষ ভুলে যায়।

অনেক পাঠক আপত্তি করবেন। তাঁদের জীবনের স্বপ্ন মিলে যাওয়ার দৃষ্টান্তগুলোর কথা ভাববেন বা জানাতে চাইবেন। আমি শুধু পাঠককে তাঁর জীবনে মিলে যাওয়া স্বপ্নগুলোর পাশাপাশি না-মেলা স্বপ্নগুলোর কথা মনে করতে বলব। মিল আর অমিলের অনুপাত দেখে, পাঠক আমার বক্তব্যের আর ততটা বিরোধিতা করবেন বলে আমার মনে হয় না।

আগে বলা স্বপ্নগুলোর মতো বাস্তবে মিলে যাওয়া সব স্বপ্নকে এত সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় অনেক স্বপ্ন এত অদ্ভুত ভাবে মিলে যায় যে স্বপ্নের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকাকেই বরং অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। স্বপ্নে অচেতন মনের রুদ্ধ ইচ্ছাব প্রভাব সবচাইতে বেশি। নিজের অগোচরে স্বপ্ন বর্ণনায় তাই ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা খুব বেশি। বিশেষ করে, স্বপ্ন দেখার পর দ্রুত তা বাস্তবে ঘটতে দেখলে।

অনেক সময় নানা ধরনের স্মৃতিবিভ্রম দেখা যায় একজন মানুষের মনে। কোনও একটা ঘটনা ঘটে যাবাব পব মনে হতে পারে, এই ঘটনাটা আমি স্বপ্নে দেখেছি। আবার অনেক সময় কোনও একটা রাস্তা দেখে খুব চেনাচেনা লাগে। তবু রাস্তাটা যে কোথায় দেখেছি তা মনে পড়ে না। অনেক সময় মনে হয় এই বাস্তাটা হয়তো স্বপ্নে দেখেছি। যা বাস্তবে দেখছি বা শুনছি তা আগে কোথাও দেখেছি বা শুনেছি এবকম মনে হবার জন্য দায়ী এক ধরনের স্মৃতিবিভ্রম। মনোবিজ্ঞানে এর নাম 'প্যারামনেসিয়া' বা '*স্মৃতির আভাস*'। বহু মনোবিদ এরকম স্মৃতিবিভ্রমের কারণ খুঁজে পেতে দীর্ঘ পরিশ্রম করেছেন গত একশো বছরে। তবু সব স্মৃতিবিভ্রমের কারণ এখনও মনোবিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার নয়। এরকম স্মৃতিবিভ্রমের জন্য অনেক সময় বাস্তবের অনেক ঘটনা দেখামাত্র কারও মনে হতে পারে যে ওই ঘটনা তিনি স্বপ্নে দেখেছেন।

এক প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক আমাকে জানান, ফ্রান্সের প্যারিস শহরে পা দিয়েই তাঁর মনে হয়েছিল, শহরটা তাঁর খুব চেনা। ফ্রান্স যাবার আগে ভিসা সংক্রান্ত ঝামেলায় একটানা বেশ কিছুদিন তাঁকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে বিস্তর। শ্রান্তক্লান্ত অবস্থায় প্লেন থেকে প্যারিসে নেমে গাড়িতে উঠতেই ওই শহরের প্রথম স্মৃতির ছাপ (First Impression) মন থেকে মুছে যাওয়া তাই অসম্ভব নয়। পরমুহূর্তে অচেনা প্যারিসকে দেখে প্রথম স্মৃতির প্রভাবে শহরটাকে চেনাচেনা মনে হতেই পারে। ওই চিকিৎসক বন্ধু শহরটাকে নিয়ে কোনও সিনেমা, ছবি বা ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়েছেন বলে মনে করতে পারেন না। এক্ষেত্রে ওঁর মনে হতে পারে যে স্বপ্নে তিনি ওই শহরের ছবি কখনও না কখনও দেখেছেন। স্বপ্ন আমরা সহজেই ভুলে যাই। আর হঠাৎ করে কোনও ঘটনায় অনেক সময় কোনও একটা স্বপ্নের একটুকরো ছবি মনে ভেসে ওঠে। কোনও অচেনা জায়গা, বাড়ি বা মানুষকে কোথায় দেখেছি মনে করতে না পারলে তাই 'হয়তো স্বপ্ন দেখেছি'—এরকম মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

কলকাতার নিবেদিতা লেনের চুয়ান্ন বছরের গৃহিণী শ্রীমতী ইরা গোস্বামী তাঁর বাস্তবে মিলে যাওয়া একটা স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। বাগবাজারের রাজবল্লভপাড়ার এক মন্দিরে বান্ধবীর সঙ্গে গিয়েছিলেন ওই মহিলা। কয়েকদিন পরে স্বপ্ন দেখেন, ওই মন্দির চত্বরে বিয়েবাড়ির মতো সাজানো চেয়ার টেবিলে প্রসাদ খাচ্ছেন। ক-দিন বাদে বান্ধবী টেলিফোনে জানান ওই মন্দিরের আসন্ন এক উৎসবের কথা। ইরাদেবী উৎসবের দিন মন্দির চত্বরে গিয়ে দেখেন, স্বপ্নে যেভাবে প্রসাদ খাওয়ানো

হচ্ছিল, ঠিক সেইরকম ব্যবস্থা। যেকোনও মন্দিরের উৎসবে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় মাটিতে বসে নয়তো চেয়ার টেবিল পেতে। এক্ষেত্রে ইরাদেবীর বহুদিন আগে দেখা বা শোনা কোনও মন্দির চত্বরে উৎসবের ছবি স্বপ্নে চলে এসেছে বলে মনে হয়। অবচেতনে ঠাকুরের ভোগের প্রসাদ খাবার ইচ্ছা থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। বাস্তবে ভোগ খেতে বসে, বসার জায়গার সঙ্গে স্বপ্নের খাওয়ার জায়গার মিল খুঁজে পাবার পর আরও অনেক কিছুতে মিল খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। এর জন্য দায়ী এক ধরনের বিভ্রম।

বাঘা যতীন কলোনির জনৈক প্রৌঢ় তাঁর যৌবনে মিলে যাওয়া একটা স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন। প্রথম যৌবনের প্রেমিকাকে ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে এসে, যুবক এক দিন স্বপ্নে পেয়ে গেলেন মনের মানুষকে। 'স্বপ্ন দেখলাম, তার ভীষণ অসুখ, মলিন চেহারা। মাথার চুল নেড়া হয়ে গেছে।' ঘুম ভেঙে বিধ্বস্ত অবস্থায় যুবক ছুটে গেলেন যুবতীর কাছে। দেখেন, টাইফয়েডে ভুগে সত্যিই মাথার প্রায় সব চুল উঠে গেছে মেয়েটির। মনের মানুষকে ছেড়ে দূরে চলে আসতে হওয়ায় 'বড় অশান্তিতে' ছিলেন যুবক। 'আর দেখা হবে না দু জনের'—এরকম আশঙ্কা থেকে 'অসুস্থ, মাথা নেড়া, মলিন চেহারার' মনের মানুষকে স্বপ্নে দেখা অসম্ভব নয়। যা কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে বাস্তবের টাইফয়েডে ভোগা যুবতীর শীর্ণ চেহারার সঙ্গে। স্বপ্ন বাস্তবে মিলে গেছে বলেই ভদ্রলোক এত বছর বাদে স্বপ্নটা আজও মনে করতে পারেন। পাশাপাশি সারাজীবন ধরে শতসহস্র স্বপ্নের কথা তিনি ভুলে গেছেন, স্বপ্নগুলোর সঙ্গে বাস্তবের মিল না থাকবার জন্য। এটাই স্বাভাবিক।

শিল্পীবন্ধু উজ্জ্বল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, কোনও একটা দৃশ্য দেখে অনেক সময়েই তাঁর মনে হয়, এই দৃশ্যটা তিনি আগে কোথাও দেখেছেন। অনেক সময় মনে হয়, বহু দিন আগের দেখা কোনও স্বপ্নে দেখেছেন বলে ওই দৃশ্যটা তাঁর 'চেনা'। অনেকেরই এরকম স্মৃতিবিভ্রম ঘটে। চেনাচেনা কোনও মানুষ, বাড়ি বা রাস্তার ছবি দেখে কোনও মানুষ স্মৃতি হাতড়ে বাস্তবের স্থান আর কালের প্রেক্ষিতে ছবিটাকে মনে করতে না পেরে 'বহুদিন আগে স্বপ্নে দেখেছি'—এরকম ভাবতে পারেন। আর বারবার এরকম ভাবার ফলে ওই কল্পিত স্বপ্ন তাঁর মনে নিজের অজান্তেই পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। অনেক মানুষের স্বপ্ন মিলে যাবার পিছনে এরকম স্মৃতির বিভ্রম খুঁজে পাওয়া যাবে। অলৌকিকে অতিরিক্ত বিশ্বাসের কারণে স্বপ্ন বর্ণনায় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের ঘটনাও ঘটে।

খুব ছোটবেলায় দেখা কিছু মুখ, মানুষ বা কোনও দৃশ্য হয়তো এক জন মানুষ পুরোপুরি ভুলে গেছেন। তাঁর স্মৃতিতে ওই ছবির কোনও অস্তিত্ব নেই। স্বপ্নে শৈশবস্মৃতির নানা দৃশ্য আসে খুব বেশি। এবকম কোনও স্মৃতিকে জড়িয়ে অচেতনের ওই ছবি চলে আসতে পারে স্বপ্নে। পরে স্বপ্নের ওই দৃশ্যের কথা মনে পড়লে আর কারও মুখে শোনা বা দেখা অতীতের বাস্তব ছবির সঙ্গে তার মিল খুঁজে পেলে আশ্চর্য হওয়া স্বাভাবিক। এরকম কিছু ঘটনা স্বপ্ন মিলে যাবার কিছু দৃষ্টান্তর জন্য দায়ী। কবি জয় গোস্বামী আমাকে তাঁর এরকম একটা অভিজ্ঞতার কথা বলেন। এই দৃষ্টান্ত শুনলে পাঠক বুঝতে পারবেন ছেলেবেলার স্বপ্ন আর বাস্তব কীভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে বড় হয়ে যাওয়া একজন মানুষের স্মৃতিতে।

জয় সেই সময় কবিতার জন্ম দিতে গিয়ে আচ্ছন্ন কবিসুলভ অবস্থায় রয়েছেন একটা বাড়িতে। সন্ধেবেলা গেছেন বাথরুমে। দ্রুম দ্রুম ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে কানে। খানিকবাদে বন্ধুপত্নীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, আওয়াজটা আসছে সম্প্রতি সংস্কার করা বহু পুরনো একটা বৌদ্ধমন্দির থেকে। বাকিটা শোনা যাক জয়ের কথায়। 'শব্দের অনুষঙ্গে বাস্তবের এই জায়গাটার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল জয়ঢাক বাজার স্বপ্নটা। যেন কতকালের চেনা জায়গা, চেনা স্বপ্ন। এত বছর ধরে এর সামনে দিয়ে যাচ্ছি। অথচ কোনওদিন মনে হয়নি। ঢাকের আওয়াজে মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, এই সেই খুব ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে বহুবার দেখা মন্দিরটা। এই মন্দিরেই তো আমি আসতাম, এই মন্দিরটাকেই স্বপ্ন দেখতাম—এক লহমায় মনে পড়ে গেল সব।'

জয়ের স্মৃতি থেকে ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখা মন্দিরটা পুরোপুরি মুছে যেতে পারত। নানা সূত্রে খুঁজে না পেলে বোঝা যেত না, ওই চিকিৎসক তাঁর অতি শৈশবের সবুজ দোলনা

আর দোলানোর জন্য রাখা কিশোরীর মুখ স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্ন আর বাস্তবের এরকম মিলের আরও অনেক যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টান্ত আমি পেয়েছি।

এক চিকিৎসক বন্ধুর স্বপ্নে বারবার আসত একটা সবুজ দোলনা আর তার ওপর ঝুঁকে পড়া একটা মুখ। খুব ছোটবেলায় দেখা এই দোলনার সূত্র খুঁজে পাওয়ার কথা বলেছি 'স্বপ্নে শৈশবস্মৃতি' অধ্যায়ে।

কবি শ্যামলকান্তি দাস তাঁর একটা স্বপ্নের অংশ বাস্তবে অদ্ভুতভাবে মিলে যাবার কথা জানান। ১৯৫২-৬০ সালে স্কুলের ছাত্র শ্যামলকান্তি এই স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের দর্শক বেড়াতে গেছেন একটা মেলায়। নানা স্টলে সাজানো বইপত্র। এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক ঘুরে বেড়াচ্ছেন একটার পর একটা স্টলে। কে যেন শ্যামলকে বলল, 'ইনিই সত্যজিৎ রায়!' উচ্ছ্বসিত ছাত্রটি অটোগ্রাফ নেবার জন্য একটা খাতা বাড়িয়ে দিল সত্যজিতের দিকে। উনি তাতে লেখেন মাইকেলের একটা কবিতার চারপাঁচ লাইন—'রেখো মা দাসেরে মনে...'।

১৯৫৮ সালে শ্যামল যোগ দেন *আনন্দমেলা* পত্রিকায়। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওঁকে বললেন, পুজোসংখ্যার জন্য সত্যজিতের লেখা নিয়ে আসতে হবে। উত্তেজনায় ফুটতে ফুটতে শ্যামল গেলেন সত্যজিতের বাড়ি। সত্যজিৎ লেখা দিলেন ওঁর হাতে। চোখে পড়তেই চমকে উঠলেন যুবক। আরে এ তো স্বপ্নে দেখা ওই লেখার ছাঁচ। হুবহু একরকম! শ্যামলের প্রশ্ন, স্বপ্ন আর বাস্তবের এই অদ্ভুত মিল কি করে সম্ভব?

একটা সময়ে নানা পত্রিকায় সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ছবির নীচে তাঁর নিজের হাতের লেখায় নাম লেখা থাকত। আরও অনেকের মতো ছেলেবেলায় শ্যামলের পক্ষে তা দেখা বিচিত্র নয়। অনেক সময় কোনও পত্রিকায় ছাপা হয়েছে সত্যজিতের পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ। আর শ্যামল যেখানে থাকতেন সেই মহিষাদলে কোনও একটা কাজে বেশ কয়েক দিনের জন্য সত্যজিৎ গিয়েছিলেন একটা সময়। ওই সময় ওই অঞ্চলের বহু মানুষকে অটোগ্রাফ দেন সত্যজিৎ। যা পরে ব্লক করে মহিষাদল থেকে প্রকাশিত নানা স্যুভেনিরে ছাপা হয়। ছেলেবেলায় তাই সত্যজিতের হাতের লেখা এই স্বপ্নের দর্শকের পক্ষে দেখার সম্ভাবনা খুব বেশি। এই লেখা দেখার কথা শ্যামলের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। তাঁর স্বপ্নের স্মৃতি (Dream Momory) তে থাকা ওই লেখার টাইপ চলে আসতে পারে স্বপ্নের অটোগ্রাফ খাতায় সত্যজিতের লেখা কবিতাতে। যা মিলে গেছে ৮/৯ বছর বাদে দেখা সত্যজিতের পাণ্ডুলিপির হাতের লেখার সঙ্গে।

শৈশবের বা বহু বছর আগেকার ভুলে যাওয়া স্মৃতি কীভাবে একজন মানুষ বিশেষ কিছু অবস্থায় হুবহু মনে করতে পারেন, তার দুটো দৃষ্টান্ত দিলে পাঠকের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। এই দৃষ্টান্ত স্বপ্নগবেষক গিরীন্দ্রশেখর বসুর অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। গিরীন্দ্রশেখর তাঁর দুজন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলা রোগীর অভিজ্ঞতা লিখছেন। প্রথমজন ফিটের সময় অনর্গল বিশুদ্ধ হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন। অথচ সুস্থ অবস্থায় তাঁর হিব্রু ভাষায় সামান্য জ্ঞানের কথাও মনে করতে পারতেন না। দেখা গেল, খুব ছোটবেলায় মহিলা পালিত হয়েছেন এক পাদ্রির বাড়িতে। পাদ্রি রোজ ভোরবেলায় হিব্রুতে বাইবেল পাঠ করতেন উঁচু গলায়। যা মেয়েটির কানে পৌঁছে কিছুদিন বাদে চলে যায় তাঁর স্মৃতির অচেতনে। একমাত্র ফিটগ্রস্ত অবস্থাতে হিব্রুতে বাইবেলের ওই পাঠ মনে করতে পারতেন ওই মহিলা।

আর একজন হিস্টিরিয়ার রোগী 'ভুতে পাওয়া' অবস্থায় বলতে থাকে, সে কোনও এক গ্রামের কোনও এক মহিলার অশুভ আত্মা। সে গলায় দড়ি দিয়েছিল। মহিলার বাবা খোঁজ খবর করে দেখতে পান, বহু বছর আগে অনেক দূরের ওই গ্রামের এক মহিলা সত্যিসত্যিই আত্মহত্যা করেন। কী করে এ ব্যাপারটা ওই মহিলা জানতে পারলেন তার রহস্য গিরীন্দ্রশেখরের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় আকস্মিকভাবে। একবার ওই মহিলার চিকিৎসা করতে মনোবিদ গেছেন তাঁদের বাড়িতে। 'ফিট' চলাকালীন অপেক্ষা করছেন তাঁর ঘরে। সময় কাটাবার জন্য ঘরে থাকা অনেক দিন আগের *বঙ্গবাসী* পত্রিকার পাতা ওলটাতে গিয়ে আকস্মিকভাবে দেখতে পান একটা খবর। 'অমুক গ্রামের অমুক স্ত্রীলোক স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন।' এই খবর মহিলার ফিটগ্রস্ত অবস্থায় 'ভুতে পাওয়া'র উৎস। মহিলাকে ওই পত্রিকার ওই খবর দেখানোর পর তাঁর আর 'ফিট' হয়নি।

কিছুক্ষেত্রে স্বপ্ন সত্যি হবার সূত্র অনেকটা এরকম। অনেক সময় ওই সূত্র সহজে ধরা যায় না। হঠাৎ

কিছুক্ষেত্রে স্বপ্ন সত্যি হবার সূত্র অনেকটা এরকম। অনেক সময় ওই সূত্র সহজে ধরা যায় না। হঠাৎ করে এক একটা সূত্র ধরা পড়ে। কিছু সূত্র হাজার চেষ্টাতেও ধরা যায় না। মানুষের নানাধরনের স্মৃতিবিভ্রম বা স্মৃতিরোধ এর জন্য দায়ী। অনেকসময়ে ফিটগ্রস্ত অবস্থায় বা স্বপ্নে নানা ধরনের রুদ্ধ স্মৃতিপথ খুলে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় আবার তা হারিয়ে যায় স্মৃতি থেকে। বহু চেষ্টায় অনেক সময় স্বপ্নের ছবির বাস্তব সূত্র ধরা যায়। বেশিরভাগ সময় এই সূত্র থেকে যায় অজানা। স্বপ্ন সত্যি হবার রহস্যের সঠিক মীমাংসা তাই সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। তার মানে এই নয় যে স্বপ্ন সত্যি হবার জন্য দায়ী অলৌকিক কোনও শক্তি। এরকম ধারণা যুক্তির ধোপে অসার। অসার বৈজ্ঞানিক ভাবনা চিন্তার আলোয়।

এক ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখলেন আরথ্রাইটিসে আক্রান্ত হয়ে তিনি পঙ্গু হয়ে গেছেন। কিছুদিন বাদে তাঁর হাঁটুদুটো সত্যিই ফুলে উঠল। এরকম ঘটনার সহজ মীমাংসা সম্ভব। দিনের বেলায় বোঝা যায় না এরকম মামুলি শারীরিক কষ্ট ঘুমের মধ্যে চলে আসতে পারে অনেক বড় হয়ে। আর তা থেকে দেখা দিতে পারে নানা ধরনের স্বপ্ন। যা আকস্মিকভাবে এই ভদ্রলোকের বেলায় মিলে গেছে। জ্বরের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সকালে উঠে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে এরকম দেখার অভিজ্ঞতা অনেকের আছে। ঘুমন্ত চেতনায় শরীরের বেশি তাপমাত্রা স্বপ্নের উদ্দীপকের কাজ করায় এরকম স্বপ্ন বাস্তবে মিলে যেতে পারে। যে স্বপ্নগুলো মেলে না সেগুলোকেও পাশাপাশি বিচার করা দরকার। আমি নিজে এই বই লেখার সময় অন্তত দুবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হবার স্বপ্ন দেখেছি। কোনও বারই বাস্তবে স্বপ্নের রোগে আক্রান্ত হবার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য আমার হয়নি!

সেনাবিভাগে কর্মরত এক যুবক স্বপ্ন দেখলেন, বন্যায় তাঁর গ্রামের বাড়িঘর ভেসে গেছে। মাসখানেক বাদে খবর পেলেন, সত্যিই ওই ঘটনা ঘটেছে। এই যুবকের দেশ হুগলির আরামবাগ মহকুমায়। প্রায় প্রতি বছর বন্যা হয় ওই অঞ্চলে। যুবক অনেক দিন বাড়ির কোনও চিঠি পাননি। বাড়ির লোকদের সম্পর্কে তাঁর মনে চূড়ান্ত উদ্বেগ থাকা তাই স্বাভাবিক। পাশাপাশি ছেলেবেলা থেকে নিয়মিত বন্যা দেখার অভিজ্ঞতা থাকায়, তাঁর অবচেতন মনে বন্যায় দেশের বাড়ি ভেসে যাবার আশঙ্কা থেকে এরকম স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা খুব বেশি। যা আকস্মিকভাবে মিলে গেছে বাস্তবের সঙ্গে। এক্ষেত্রে বাস্তব আর স্বপ্নের ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। যুবক ওই স্বপ্ন না দেখলেও তাঁর গ্রামের বাড়িঘর বন্যায় ভেসে যেত। স্বপ্ন দেখা সত্ত্বেও বাড়িঘর অক্ষত রয়েছে, এরকমও হতে পারত। স্বপ্ন দেখে তা বাস্তবে মিলে গেলে, ব্যাপারটাতে অলৌকিকত্ব আরোপ করার চেষ্টা তাই আদৌ যুক্তিযুক্ত বলে আমার মনে হয় না।

স্বপ্ন বাস্তবে মিলে গেলে পাঠককে আমি তাঁর স্বপ্নের জ্ঞান আর যুক্তির আলোয় ঠাণ্ডা মাথায় ঘটনাকে বিচার করে দেখতে বলব। এরকম হলে স্বপ্নের বর্ণনা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়তে পারে স্বপ্নদ্রষ্টার অজান্তে। এ ব্যাপারেও সাবধান থাকা দরকার। 'অলৌকিক'-এ বিশ্বাস নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করলে এক্ষেত্রে অনুসন্ধানকে পাশ কাটাবার তীব্র প্রবণতা তৈরি হয়। স্বপ্ন মিলে যাওয়ার নানা অলৌকিক গালগল্পের উৎস এরকম লৌকিক প্রবণতা।

স্বপ্ন বাস্তবে মিলে যাবার সাধারণ আর কয়েকটা ঘটনার কথা বলি। সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী স্বপ্নে দেখতে থাকা একজন মানুষকে ঘুম ভেঙে চোখের সামনে দেখতে পাবার অভিজ্ঞতার কথা আগে বলেছি। রমাপদবাবু আমাকে জানান, ব্যাপারটা বহু বছর বাদে আজও তাঁর কাছে রহস্যময় লাগে। 'তবে কি ঘুমন্ত অবস্থাতেও আমাদের চেতনায় আমরা কিছু দেখি?' এ প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় সহজেই। ঘুমন্ত অবস্থাতে একজন মানুষের চেতনার বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ পুরোপুরি ছিন্ন হয়ে যায় না। এক্ষেত্রে ওই মানুষটার উপস্থিতি আর তাঁর কথাবার্তা (আলো আর শব্দ) রমাপদবাবুর ঘুমন্ত চেতনায় ওই স্বপ্নের জন্ম দিয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় চোখে পড়া আলো, কানে শোনা শব্দ নাকে আসা গন্ধ বা ত্বকে পাওয়া তাপের উদ্দীপনা যথেষ্ট জোরালো হলে তা থেকে স্বপ্ন সৃষ্টি হতে পারে। এ নিয়ে আলোচনা করেছি 'স্বপ্নের উদ্দীপনা আর উৎস' অধ্যায়ে।

এক যুবতী জানিয়েছেন, দুপুরে ঘুমিয়ে দেখলেন, বাড়িতে কিছু আত্মীয় এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে গল্প

করছেন। ঘুম ভেঙে দেখেন সত্যিই বাড়িতে স্বপ্নে দেখা আত্মীয়রা এসেছেন। বাড়িতে বেড়াতে আসা ক-জন মানুষের জোর গলায় কথাবার্তা থেকে ঘুমন্ত চেতনার পক্ষে তাঁদের চিহ্নিত করে তাঁদের সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন দেখানো এক্ষেত্রে স্বপ্ন আর বাস্তবের হুবহু মিলের কারণ। পাঠক দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নিজের দেখা স্বপ্নের দিকে নজর রাখলে এ রকম ঘটনা ঘটতে দেখতে পাবেন।

শেষ করব সিগমুন্ড ফ্রয়েডের লেখা একটা স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়ে। একটি ছোট বাচ্চা মারা যাওয়ায় তার শবদেহ কফিনে রেখে চারপাশে মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে সারারাতের জন্য। দুজন পাহারাদারকে ওই ঘরে রাখা হয়েছে কফিন পাহারা দিতে। মৃত বাচ্চার বাবা রয়েছেন পাশের ঘরে। দুটো ঘরের মাঝের দরজা সামান্য খোলা। বাবা মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন, ছেলে জীবিত অবস্থায় তাঁকে ডাকছে! বলছে, 'বাবা, তুমি দেখতে পাচ্ছো না, আমি পুড়ে যাচ্ছি!' ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে বাবা দেখেন, সত্যিই তাই! কফিনের ঢাকা দেওয়া কাপড়ের ওপর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি পড়ে তাতে আগুন লেগে গেছে। পাহারাদার দুজন অঘোরে ঘুমোচ্ছে!

সত্যি হওয়া এই স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করা খুব সহজ। সন্তানের কফিনের চারপাশে মোমবাতি জ্বালিয়ে বাবা শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর মনে এরকম আশঙ্কা আসতেই পারে যে পাহারাদার দুজন ঘুমিয়ে গেলে কোনওভাবে জ্বলন্ত মোমবাতি পড়ে কফিনে আগুন লেগে যেতে পারে। বাস্তবে কফিন ঢাকার কাপড়ে জ্বলন্ত আগুনের তীব্র আলো দরজার ফাঁক দিয়ে বাবার চোখে এসে পড়ে তাঁকে এই স্বপ্ন দেখিয়েছে। শোকার্ত বাবার মনে ছেলেকে ফিরে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এক্ষেত্রে স্বপ্নে জীবন্ত ছেলেকে বাবার কাছে নিয়ে এসে বাবার সঙ্গে কথা বলিয়েছে। এই স্বপ্ন সত্যি হওয়াকে তাই যুক্তি দিয়ে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অলৌকিকে অতিরিক্ত বিশ্বাস একই স্বপ্নের মধ্যে মৃত ছেলের আত্মার, বাবাকে সাবধান করে দেবার তত্ত্ব খুঁজে পাবে। জন্ম নেবে দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়া অলৌকিক এক আশ্চর্য কাহিনীর।

স্বপ্ন কি ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা?

এক সাংবাদিক স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর বাবা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকছেন। বলছেন, 'আমার গলায় একটা পালংশাক আটকে গেছে। তোর নাকের ড্রপটা একটু দে তো।' এই স্বপ্ন দেখবার ক-দিন বাদেই ভদ্রলোকের বাবা মারা যান। ওই স্বপ্নের দর্শক বিশ্বাস করেন, স্বপ্নটা ছিল বাবার পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগামবার্তা। যা তিনি ওই স্বপ্নটা দেখে বুঝতে পারেননি। শুধু এই সাংবাদিক নন, আদিযুগের মতো অনেক মানুষ আজও বিশ্বাস করেন, কিছু স্বপ্ন আসে ভবিষ্যতের কোনও বিপদ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করে দিতে।

মনোবিজ্ঞানের আলোয় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। ফ্রয়েডীয় মনোবিদরা মনে করেন, স্বপ্ন তৈরি হয় অতীতের, সামান্য কিছু ক্ষেত্রে বর্তমানের নানা ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে। একজন মানুষের ভবিষ্যতের কোনও ঘটনা নিয়ে কিছু বলার ক্ষমতা স্বপ্নের নেই। কারণ ভবিষ্যতে যা ঘটবে এমন কোনও ঘটনার অভিজ্ঞতা (Impression) স্বপ্নে আসা সম্ভব নয়। যদি না তা ভবিষ্যতকে নিয়ে অতীতের বা বর্তমানের কোনও ভাবনা চিন্তা থেকে চলে আসে। একজন লেখক হয়তো অবচেতনে বা অচেতনে কোনও একটা পুরস্কার পাবার কথা ভাবলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, পুরস্কারটা পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে, কখনই বলা যাবে না এই স্বপ্ন ভবিষ্যতের বার্তা নিয়ে আসছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা স্বপ্নে চলে আসতেই পারে। তার মানে এই নয় যে, ভবিষ্যতে ব্যাপারটা ঘটবে বলেই তা স্বপ্নে আসছে। মনোবিজ্ঞান বলে, একজন মানুষের মনে (চেতন, অবচেতন বা অচেতনে) নেই এমন কোনও ইচ্ছা স্বপ্নে আসা অসম্ভব। যা ঘটেনি, ঘটতে পারে, সেই সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন একজন মানুষের স্বপ্নে আসতেই পারে। সেই স্বপ্নকে ভবিষ্যতের আগামবার্তা ভাবার কোনও বৈজ্ঞানিক কাবণ অন্তত নেই।

এক ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখলেন, একটা লরি অ্যাক্সিডেন্টে তিনি মরতে বসেছেন। কদিন বাদে সত্যিসত্যিই অন্য একটা অ্যাক্সিডেন্টে তিনি মারা গেলেন। এখানে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ওই স্বপ্নটা ছিল তাঁর মৃত্যুর আগাম সতর্কবার্তা। আব্রাহাম লিঙ্কন বাস্তবে আততায়ীর হাতে নিহত হবার আগে দেখেছিলেন প্রায় একইভাবে খুন হবার স্বপ্ন। এরকম বেশ কিছু ঘটনার কথা অনেকে জানিয়েছেন। এই ঘটনাগুলো থেকে কি ধরে নেওয়া যায় যে, কখনও কখনও স্বপ্ন আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধান করে দেয়? এক কথায় এর উত্তর হতে পারে, 'না'।

ভবিষ্যতের কোনও বিপদ সম্পর্কে আগাম ধারণা বা ভাবনাচিন্তা না থাকলে তা স্বপ্নে আসা সম্ভব নয়। তা ছাড়া স্বপ্নে আমরা যা দেখি (Manifest content) আর স্বপ্ন যা বলতে চায় (Latent content), তা বেশির ভাগ সময় আলাদা। বাস্তবে যিনি লরি অ্যাক্সিডেন্টের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের উৎস ছিল আগেরদিন সকালে খবরের কাগজে ছাপা হওয়া একটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের খবর। এই স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টা দেখেছিলেন 'শাস্তি পাবার স্বপ্ন' হিসেবে। ক-দিন বাদে তাঁর অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার সঙ্গে ওই স্বপ্ন দেখার সম্পর্ক নেহাতই কাকতালীয়। ওই স্বপ্ন না দেখলেও একই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ভদ্রলোক মারা যেতে পারতেন।

ভবিষ্যতের বিপদ নিয়ে মনের ভয় বা আশঙ্কা থেকে এরকম স্বপ্ন আসতে পারে। আব্রাহাম লিঙ্কনের আততায়ীর হাতে খুন হবার আগে ওই স্বপ্ন দেখার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তাই। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের মনে আততায়ীর হাতে খুন হবার ভাবনা আসতেই পারে। কেননা তাঁকে চলাফেরা করতে হয় অদৃশ্য হাজার হাজার শত্রুর পাশাপাশি। একজন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে সব সময় থাকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা

গোয়েন্দার গোপন খবর। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে, এই বাহিনী আগাম জানিয়ে দিতে পারে তাকে হত্যার গোপন চক্রান্তের কথা। আর নিজের জীবননাশের এরকম খবর পেয়ে চূড়ান্ত দুর্ভাবনা থেকে 'সাহস বাড়াবার স্বপ্ন' হিসাবে এরকম স্বপ্ন একজন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী দেখতেই পারেন। নিজের খুন হবার স্বপ্ন না দেখলেও লিঙ্কন খুন হতেন একই জায়গায়, একইভাবে।

'প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন' অধ্যায়ে বহু মানুষের দেখা বাবা, মা, ভাই, বোন বা স্বামীর মৃত্যুর স্বপ্নের কথা রয়েছে। এরকম স্বপ্ন দেখেন অনেকেই। এরকম পঞ্চাশ জন স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্ন আলাদা করে নিয়ে তাঁদের স্বপ্নে দেখা প্রিয় মানুষের কথা জানতে চাই। দেখা যায়, মাত্র তিন জন স্বপ্ন দেখার এক মাস থেকে এক বছরের মধ্যে মারা গেছেন। তিন জনের বয়েস যথাক্রমে ৭৪, ৭৯, আর ৬৮। তিন জনই নানা ধরনের রোগে ভুগছিলেন। বাকি ৯৭ জন বহাল তবিয়তে জীবিত। এই পরিসংখ্যান থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। তা হল, স্বপ্নে আগাম সতর্কবার্তা বলে কিছু হয় না। এরকম কোনও ঘটনা ঘটলে তা নেহাতই কাকতালীয়। এটা অনেকটা অমাবস্যা পূর্ণিমায় বয়স্ক মানুষের বাতের ব্যথা বেড়ে যাবার মতো ব্যাপার।

বাতের ব্যথা এমনিতেই বাড়ে কমে। যে কেউ অঙ্কের সম্ভাবনা সূত্র (Law of Probability) দিয়ে হিসেব করে দেখলে বুঝতে পারবেন অমাবস্যা-পূর্ণিমা-একাদশীতে বাতের ব্যথা বাড়ার ঘটনা নেহাতই কাকতালীয়। একশো জন প্রিয়জনের মধ্যে তিন জনের মৃত্যু, প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন তাঁদের মৃত্যুর আগামবার্তা বয়ে আনে এরকম ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয় একইরকম ভাবে। তা ছাড়া এরকম মৃত্যুর স্বপ্ন আসে অচেতনে মৃত্যুকামনা থেকে বা অন্য কারণে। এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে এরকম স্বপ্নকে আগাম সতর্কবার্তা হিসেবে ধরে নেবার আর কোনও কারণ থাকে না।

নিজের দুর্ঘটনার দশটি স্বপ্ন 'Random Sampling' পদ্ধতিতেই বাছাই করে দেখা যাচ্ছে, স্বপ্নদ্রষ্টারা স্বপ্ন দেখার তিন মাস থেকে নয় বছর পর্যন্ত (এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম) স্বাভাবিক জীবন কাটাচ্ছেন। এই সব পরিসংখ্যান বিচার করবার পরও আপনার মনে হতেই পারে, যে স্বপ্নে আগাম সতর্কবার্তা পাওয়া যায়। যে তিন জনের প্রিয়জন তাঁদের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখার পর মারা গেছেন তাঁদের স্বপ্নের ব্যাপারটাই প্রথমে মনে আসতে পারে। বাকি ৪৭ জনের জীবিত থাকার কথা মনে আসবে না। 'ভাগ্যফল' বিচারে দু চার জনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবাণী মিলে গেলে এই ঘটনাগুলো মানুষের মনে থাকে, লোকমুখে প্রচার হয়। বেশির ভাগ না মেলা ভবিষ্যৎবাণীর কথা মানুষ ভুলে যায়। গিরীন্দ্রশেখর বসুর মতে, 'ইহাই আমাদের স্বভাব'।

স্বপ্ন ভবিষ্যতের আগামবার্তা জানাতে পারে এখনও পর্যন্ত কোনও স্বপ্ন-গবেষক মনোবিদ তা মানেননি। ফ্রয়েড তাঁর মৃত্যুর (১৯৩৯) আগে পর্যন্ত তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেছেন। ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্নে ভাবীকালের আগামবার্তা বা সতর্কবার্তা পাবার "কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বরং এটা বললে ঠিক বলা হবে যে স্বপ্ন আমাদের অতীত সম্পর্কে অজানা অনেক তথ্যকে মনের গোচরে আনে। কারণ সব অর্থেই স্বপ্ন আসে অতীত থেকে।" প্রখ্যাত স্বপ্নবিদ আলফ্রেড অ্যাডলার মনে করতেন, "স্বপ্নের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবার ক্ষমতা রয়েছে।" এরকম চিন্তা থাকে জেগে থাকা অবস্থায় অচেতন বা অবচেতন মনে। যা ঘুমন্ত চেতনায় কোনও অচেতন ইচ্ছাকে নানা ভাবে স্বপ্নে নিয়ে আসে। সেদিক থেকে অ্যাডলার যাকে স্বপ্নের 'এগিয়ে চিন্তা করবার ক্ষমতা' (To Think Ahead) বলতে চেয়েছেন, তা আসলে অবচেতনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা। স্বপ্ন ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা বয়ে আনে, তা অ্যাডলারও মনে করতেন না।

স্বপ্নের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করবার ক্ষমতা নিয়ে কারও মনে বিশ্বাস থাকতেই পারে। তিনি যদি স্বপ্নে যা দেখেছেন জীবনের দুএকটা ক্ষেত্রে তার সঙ্গে ভবিষ্যতের কোনও ঘটনার মিল খুঁজে পান, তবে তাঁর মনে এরকম চিন্তা আসা অসম্ভব নয়। প্রথমে যে সাংবাদিকবন্ধুর কথা বলেছি, তাঁর মনে এরকম বিশ্বাস জন্মেছে নানা ভাবে এরকম কিছু স্বপ্নের আপাত ইঙ্গিত ভবিষ্যতে মিলে যাওয়ায়। এরকম ধারণায় বিশ্বাসী মানুষ স্বপ্নের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ধরে তাঁর এরকম স্বপ্নকে বিচার করে দেখলে দেখতে পাবেন, স্বপ্নে যা তিনি দেখছেন আর স্বপ্নের গূঢ় অর্থ যা, তা বেশিরভাগ সময়ে

আলাদা।

এরকম ভাবে তাঁর দেখা স্বপ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করলে যে কেউ বুঝতে পারবেন, আপাতদৃষ্টিতে যা ভাবীকালের আগাম সতর্কবার্তা, আসলে হয়তো সেই স্বপ্নের অর্থ তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এরকম মানুষের এ ধরনের বিশ্বাসে কোনওরকম আঘাত করবার ইচ্ছা বর্তমান লেখকের নেই। তবে গলায় পালংশাক আটকে ছেলের কাছে নাকের ড্রপ চাইবার স্বপ্নের অর্থ আর যাই হোক বাবার আসন্ন মৃত্যু নয়। এই স্বপ্নের মনোবৈজ্ঞানিক অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডা. অশোক মুখোপাধ্যায় আমাকে বহু বছর আগে তাঁর দেখা একটা স্বপ্নের কথা জানিয়ে বলেন, এই স্বপ্ন হয়তো তাঁর কাছে আগাম কিছু খবর এনে দিয়েছিল। বিদেশে থাকাকালীন তিনি এক দিন দেখেন, তাঁর মামাবাড়ির প্রিয় কুকুরটা মারা গেছে। ক-দিন বাদেই টেলিগ্রাম যায়, তাঁর প্রিয় দাদুর মৃত্যুর খবর নিয়ে। নানা কারণে এই চিকিৎসকের দাদুর শারীরিক অবস্থা খারাপ যাচ্ছিল সেই সময়টায়। দেশ থেকে অনেক দূরে থাকায় অতি প্রিয় দাদুর শরীর নিয়ে মনে উদ্বেগ আর চিন্তা থাকা খুব স্বাভাবিক। এরকম স্বপ্নকে স্বপ্নের আগামবার্তা বলে মেনে নেওয়া যায় না। প্রায় একই ধরনের 'স্বপ্ন সত্যি হবার' কথা জানিয়েছেন অর্থনীতি ও রসায়নের দুজন অধ্যাপক।

স্বপ্নতত্ত্বের জগতে আর এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব কার্ল গুস্তভ ইয়ুন প্রথম দিকে ফ্রয়েডীয় মতবাদে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তীকালে ফ্রয়েডীয় মতবাদকে বর্জন করে স্বপ্ন সংক্রান্ত গবেষণায় সম্পূর্ণ মৌলিক এক চিন্তাধারার জন্ম দেন। ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন, স্বপ্নের কাজ অতীতকে নিয়ে। ভবিষ্যতের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে ইয়ুনের মতে, একজন মানুষের স্বপ্ন তাঁর অতীতের পাশাপাশি নানা ভাবে তাঁর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। ইয়ুন মনে করতেন, ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন দিয়ে একজন মানুষের মানসিক ব্যক্তিত্বের গঠনকে কিছুটা বোঝা যায়। স্বপ্ন মানুষকে ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব গঠনে নানাভাবে সাহায্য করে। মানসিকতার গঠনগত ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে তা শুধরে নেবার পথ দেখায় স্বপ্ন। "Dreams work out for the individual the proper path to a more actualisation of Personality and help reveal poorly developed parts of his Personality." তবে ইয়ুনের মতো ফ্রয়েডীয় মনোবিদের এরকম কথার অর্থ এই নয় যে, স্বপ্ন মানুষকে ভবিষ্যতের কোনও বিপদ সম্পর্কে আগাম সতর্ক করে দিতে পারে।

স্বপ্ন সম্পূর্ণ অন্যভাবে একজন মানুষকে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে সাবধান করে দিতে পারে। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত স্বপ্ন-গবেষকদের কাজকর্ম থেকে যা জানা গেছে তা হল—

(ক) কিছু মানসিক রোগ জেগে থাকা অবস্থায় দেখা দেবার আগেই চলে আসতে পারে একজন মানুষের স্বপ্নে। এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে 'স্বপ্ন আর মনের অসুখ' অধ্যায়ে। এরকম কিছু স্বপ্ন থেকে একজন মানুষ অবশ্যই তাঁর আসন্ন মনোরোগের আগামবার্তা পেতে পারেন।

(খ) বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, কোনও বাচ্চা একই স্বপ্ন বারবার দেখতে থাকলে তা স্বপ্নের দর্শকের মানসিক বিকাশ একটা জায়গায় থেমে থাকবার ইঙ্গিত দেয়। এরকম হলে অবশ্যই বাচ্চার অভিভাবকদের সতর্ক হওয়া দরকার। কেন না বহুদিন ধরে একই স্বপ্নে আটকে থাকা বাচ্চা ভবিষ্যতে মানসিকভাবে অপুষ্ট হতে পারে।

(গ) নানা অজানা ইচ্ছা স্বপ্নে চলে আসে যখন তখন। হয়তো অবচেতনের বা অচেতনের এরকম ইচ্ছা থেকে কোনও স্বপ্ন তৈরি হল। একই ইচ্ছা একজন মানুষকে ভবিষ্যতে কোনও কাজ করতে প্রেরণা দিল। ধরা যাক একজন চিকিৎসক দেখলেন ইংল্যান্ডে যাবার স্বপ্ন। ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে যাবার প্রস্তুতির প্রেরণা আর স্বপ্নের উৎস দুটোই হতে পারে মনে থাকা বিলেত যাবার ইচ্ছা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হয়ে ওই চিকিৎসক হয়তো আরও পড়াশোনা করতে ইংল্যান্ড যাবার সুযোগ পেলেন। এক্ষেত্রে অনেকে বলবেন, ইংল্যান্ড যাবার স্বপ্ন ছিল ভাবী ঘটনার আভাস। এরকম ঘটনার বহু দৃষ্টান্তের কথা আমি জানি। এরকম ঘটলে স্বপ্নের ভবিষ্যতে বাস্তবের সঙ্গে মিলে যাবার কার্যকারণ সম্পর্ককে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। স্বপ্ন দেখা আর বাস্তবে তা ফলে যাওয়ার পেছনে একই ইচ্ছার অস্তিত্ব এক্ষেত্রে স্বপ্নের ভবিষ্যৎ বলে দেবার কারণ। এই ভাবে অনেক সময় অনেক মৃত্যুর স্বপ্ন

ও পুরস্কার পাবার স্বপ্নকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ভাবীকালের সঠিক আভাস হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

ফ্রয়েডের এ সংক্রান্ত কিছু কথা দিয়ে এই প্রসঙ্গে ইতি টানব। ফ্রয়েড লিখছেন, "স্বপ্নের ভবিষ্যৎ বলে দেবার ক্ষমতা নিয়ে প্রাচীন বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিহীন, তা বলব না। অতীতের না মেটা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কাল্পনিকভাবে হলেও মিটিয়ে স্বপ্ন আমাদের ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু এই ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে আসে বর্তমানের ছবি হয়ে। ভবিষ্যৎ যে হাজারটা মৃত্যুহীন হাজারটা ইচ্ছার প্রভাবে অতীতের মতোই ছাঁচেঢালা।"

স্বপ্নের প্রাপ্তি

স্বপ্নে কিছু পেয়ে বাস্তবে তা মিলে গেছে এরকম অনেক ঘটনার কথা অনেকে আমাকে জানিয়েছেন। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এই ঘটনাগুলোকে বিচার করলে, এরকম সব ঘটনাকে অতিরঞ্জিত বলে ভাবার কোনও কারণ থাকে না। এক গৃহবধূ স্বপ্নে দেখলেন, দূরদেশে কর্মরত তাঁর স্বামী তাঁর জন্য সবুজ রঙের একটা দারুণ ডিজাইনের শাড়ি নিয়ে এসেছেন। দিনকয়েক বাদে স্বামী সত্যিই ছুটিতে বাড়ি এলেন একটা সুন্দর সবুজ শাড়ি স্ত্রীর জন্য নিয়ে। স্বামীর ছুটিতে বাড়ি আসবার সম্ভাবনা মহিলার অজানা ছিল না। স্বামীর অজানা ছিল না স্ত্রীর প্রিয় চাওয়া আর প্রিয় রঙের খবর। এ সব মিলে ইচ্ছাপূরণের এই স্বপ্ন বাস্তবে 'সত্যি' হবার ঘটনার মধ্যে আশ্চর্য বা অলৌকিক কিছু নেই।

স্বপ্নে অনেকে অনেক ওষুধের নাম পান। অনেকে পান কোনও গাছের শিকড়ের সন্ধান। যা মাদুলিতে ভরে নানা রোগের ব্যবহারে 'অব্যর্থ কাজ' হয়। এরকম 'স্বপ্নাদ্য মাদুলি' বিক্রি হতে দেখা যায় দেশের নানাপ্রান্তে। অষ্টধাতুর আংটিতে যেমন রাসায়নিক কারণে আটটি ধাতু থাকা অসম্ভব, এরকম 'স্বপ্নাদ্য মাদুলি'র মধ্যেকার বস্তু আদৌ স্বপ্নে পাওয়া কি না, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে। 'দৈব ওষুধ'-এর তত্ত্ব আমদানিতে 'ফল হয় অব্যর্থ'! এক হাতুড়েকে জানি যিনি এক সময়ে রাজ্য জুড়ে 'ঋতুবন্ধে দৈব ওষুধ'-এর ব্যবসায় টাকা কামিয়েছেন বিস্তর। কোন দেবতা ওই হাতুড়কে কি ওষুধের সন্ধান দিয়েছিলেন তা জানা নেই। তবে হাতুড়ের ওই ওষুধ তৈরি হত বাজারের কিছু 'হরমোন পিল' গুঁড়ো করে, এ আমার নিজের চোখে দেখা!

স্বপ্নে পাওয়া সব ওষুধ নির্ভেজাল ব্যবসায়িক ধাপ্পাবাজি তা বলব না। দেবতা ও দৈবে তীব্র বিশ্বাসী মানুষের স্বপ্নে এরকম ওষুধের বা মাদুলির খোঁজ পাওয়া অসম্ভব নয়। অসম্ভব নয় ওই ওষুধ বা মাদুলি খুঁজে পেয়ে তা ব্যবহারে 'অব্যর্থ কাজ হওয়া'। 'দেবতা রোগ দান করেন, সময়তে দেবতাই করেন এর প্রতিকারের ব্যবস্থা'—এরকম ধারণা এ দেশের মানুষের একটা বড় অংশের মনে আজও গেঁথে আছে গভীর ভাবে। রোগগ্রস্ত, দৈবে বিশ্বাসী একজন মানুষের স্বপ্নে রোগ প্রতিকারের ওষুধ বা মাদুলির খোঁজ পাওয়া তাই অসম্ভব নয়।

হুগলি জেলার একজন বয়স্ক মানুষ জানান, স্বপ্নে তিনি বাতের ব্যথা সারাবার অব্যর্থ এক শিকড়ের সন্ধান পান। পরদিন প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অচেনা, স্বপ্নে দেখা জায়গায় গিয়ে আশ্চর্যভাবে পেয়ে যান ওই গাছের খোঁজ। গাছের শিকড় এনে মাদুলি বানিয়ে পরে তাঁর বাতের ব্যথা সেরে যায় অনেকটাই। ভদ্রলোক পরিচিত হওয়ায় তাঁর কথায় অতিরঞ্জন নেই ধরে নিয়ে আমি খোঁজখবর নিতে থাকি। বহুকষ্টে শিকড়ের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বছর দশেক আগে ট্রেনে তাস খেলতে খেলতে কর্মস্থল থেকে বাড়িতে ফেরার সময় ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে বাতের ব্যথায় কাবু দুজন বৃদ্ধের আলোচনা শুনেছিলেন। বাতে আক্রান্ত হয়ে শিকড়ের খোঁজে ওই জায়গায় যাবার গল্প সবিস্তারে করছিলেন ওই দুই বৃদ্ধ।

এই ঘটনার কথা ভদ্রলোক ভুলে যান। নিজে বাতে আক্রান্ত হয়ে তীব্র দৈববিশ্বাসী মানুষটার ঘুমন্ত চেতনায় চলে আসে অন্যমনস্ক ভাবে বহুবছর আগে শোনা ওই জায়গায় যাবার বিস্তারিত পথনির্দেশ। স্বপ্ন দেখে ওই জায়গায় যেতে তাই কোনও অসুবিধা হয়নি ভদ্রলোকের। আর শিকড় মাদুলি করে পরার পর বাতের ব্যথা কমার ব্যাপারটাতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই। যেভাবে বোতলে ভরা গুড়ের

জলে শরীরের বল বাড়ে, রোগ সারে, শিকড়ের মাদুলিতে রোগের কষ্ট কমে সেভাবেই। আঙুলে লোহার আংটি বা তামার বালা পরে যথাক্রমে অর্শ ও বাতের উপসর্গ কমার মতো এক্ষেত্রেও দায়ী 'বিশ্বাসে রোগ সারা' বা 'ফেইথ হিলিং'। চিকিৎসক জীবনে বহু মানুষকে শুধু বিশ্বাসে সাময়িকভাবে হলেও উপসর্গমুক্ত হতে দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।

স্বপ্নে ওষুধের নাম পাওয়া বা মন্দিরে যাওয়ার নির্দেশ পাওয়ার জন্য বেশিরভাগ সময় দায়ী এরকম স্মৃতিলোপ বা স্মৃতিবিভ্রম। আগে অন্যমনস্কভাবে শোনা জায়গা বা গাছের কথা মানুষ ভুলে যান দ্রুত। স্বপ্নের স্মৃতি (Dream Memory) থেকে বহু বছর বাদেও এরকম জায়গা, গাছ বা ওষুধের নাম চলে আসতে পারে স্বপ্নে। স্বপ্নকল্পনায় এরকম সূত্র সব সময় ঠিক হতে পারে না। স্বপ্নে দেখা জায়গায় গিয়ে নির্দিষ্ট গাছ বা মাদুলি না পেলে দৈবে তীব্র বিশ্বাসী একজন মানুষ সেই কথা গোপন রাখেন। দশটা না পাওয়ার কথা তাই মানুষ জানতে পারেন না। প্রভাবিত হন একটা স্বপ্নাদ্য ওষুধ বা মাদুলির শিকড় পাবার ঘটনায়।

স্বপ্নে অনেক সময় স্বপ্নকল্পনার জোরে একজন লেখক পেয়ে যান অসমাপ্ত কোনও গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সূত্র। একজন বৈজ্ঞানিক হঠাৎ করে পেয়ে যান বহুদিন ধরে চিন্তায় থাকা কোনও আবিষ্কারের সূত্র। ঠিক সেই ভাবে স্বপ্নে কোনও চিকিৎসাবিজ্ঞানীর পক্ষে নতুন ওষুধের রাসায়নিক গঠনের সন্ধান পেয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সব সময় এই সূত্রগুলো কাজে লাগে তা নয়, তবে আকস্মিকভাবে কখনও স্বপ্নের এরকম প্রাপ্তি পরিণত হয় যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে। কেকিউল (Kekule)-এর স্বপ্নে 'বেনজিন রিং' এর সঠিক গঠন খুঁজে পাওয়া বা ডি.এন.এ.-র গঠন আবিষ্কারের মতো ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে স্বপ্নের অবদানের কথা আগেই বলেছি। স্বপ্নের এরকম প্রাপ্তিতে 'দৈব' বা 'অলৌকিক' কোনও ব্যাপার নেই। পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মতভাবে এরকম প্রতিটি স্বপ্নজাত আবিষ্কারকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

দেবস্থানে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ভগবানের আদেশ-সহ সমস্যা সমাধানের বা রোগ সারাবার মাদুলি বা শিকড় পেয়ে ঘুম ভেঙে কোনও মানুষ হাতে সত্যিসত্যিই মাদুলি বা শিকড় পেয়েছেন এরকম ঘটনা বিরল নয়। এবিষয়ে বিশিষ্ট ভারতীয় মনোবিদ ও স্বপ্নগবেষক গিরীন্দ্রশেখর বসুর বক্তব্য এখানে উল্লেখ করব। গিরীন্দ্রশেখর লিখছেন, "দেবতা লইয়াও ব্যবসা চলে। দেবস্থানের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক সময় মহন্ত বা দেবতার অধিকারী ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। চিন্তা-পীড়িত উপবাসক্লিষ্ট শ্রান্তক্লান্ত নিদ্রিত রোগীর হস্তে ঔষধ গুঁজিয়া দিয়া কৃত্রিম স্বপ্নাদেশ সৃষ্টি করা একেবারে অসম্ভব নহে। অত্যন্ত নিদ্রাতুর ক্লান্ত কোনও ব্যক্তির কর্ণে কোনও কথা বলিয়া তাহার হস্তে ওষুধ গুঁজিয়া দিলে নিদ্রাভঙ্গে তাহার মনে হইবে, স্বপ্নে সে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছে।—লোকটি যদি প্রত্যাদেশ আশা করিয়া থাকে ভ্রমের সম্ভাবনাই অধিক। জাগ্রত অবস্থায় হস্তে ওষুধ দেখিলে তাহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে।"

স্বপ্নের যে কোনও প্রাপ্তিকে পক্ষপাতহীন খোলামনে বিচার করলে এরকম প্রাপ্তির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাঠক অবশ্যই খুঁজে পাবেন। এরকম ঘটনাগুলো আদৌ অলৌকিক নয়। পুরোপুরি লৌকিক।

কিছু স্বপ্নের বিশ্লেষণ

প্যানে একটা বানর ফ্রাই করছি!
কাল আমার ফাঁসি, সারারাত মৃত্যুযন্ত্রণা।
রণতুঙ্গার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি, অনেকক্ষণ।
ড্রাম থেকে উঠে আসছে রক্তাক্ত শিশু।
শাবানার বাড়ানো হাতটা কুষ্ঠরোগীর!
হেমামালিনী আমার বস হয়ে এসেছেন!
ইউরিনালে পা পিছলে লোকটা মরে গেল।
সোনার গাছে রুপোর ফল, রাজপ্রাসাদে ঘুরছি!
দোকানদার মাংস কাটছে, কী যন্ত্রণা!
আয়নার সামনে সাজতে সাজতে রূপ হারালাম!
সরু পিচ্ছিল রাস্তা, আমাকে যেতেই হবে!
অ্যাকসিডেন্ট থেকে বাঁচালাম স্পেশাল ট্রেনকে!
আমি কুকুর হয়ে গেছি!
আমার বিয়ে হচ্ছে, অন্য লোকের সঙ্গে!
ছুরি হাতে দুষ্কৃতীদের তাড়া, অচেনা জায়গায়!
অপূর্ব সুন্দর দেশ, মনোরম বাতাস, ঘুরছি!
'ক' বাবু চাপা পড়েছেন সাইকেল আর লোকদুটোর নীচে!
'মড়া', ঘাড় তুলে রাস্তার লোকজন দেখছে!
অর্কিডটা হাতে নিতেই 'পাণ্ডা' হয়ে গেল!
পেয়ারার সঙ্গে উঠে এল তিনটে দাঁত!
কার্নিসে কেউটে আর অজগরের তুমুল লড়াই!
আমার ছোঁড়া ইটে কপাল ফাটল রিচার্ডসনের!
বাসে করে যাচ্ছি, স্টিয়ারিং ধরেছে বাঘ!
ছাদটা শেষ হতেই উত্তাল সমুদ্র!
বন্যার জল ঢুকছে ঘরে, আমার বালিশ ভিজছে!
বাবা মারা গেছেন, অফিস যেতে হবে না!
দৌড়ে পৌঁছে গেলাম ট্রেনের আগে!
ট্রেন মিস্, আমার জন্য স্পেশাল ট্রেন আসছে!
মারুতিতে চড়ে যাচ্ছি, সামনে রাস্তা খুঁড়ছে!
খোলা বাক্স থেকে উপচে পড়ছে মুক্তো!

স্বপ্নদ্রষ্টার দেওয়া প্রাসঙ্গিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, তাঁর সঙ্গে বারবার কথা বলে এই স্বপ্নগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। স্বপ্নগুলোর গোপন অর্থ এখানে বলব। এরকম বিশ্লেষণ থেকে পাঠক তাঁর নিজের দেখা স্বপ্নগুলোকে বিচার করে দেখতে পারেন। এই পদ্ধতি কিছুটা জটিল। মাঝেমাঝে স্বপ্নের কিছু তথ্য স্বপ্ন-বিশ্লেষণকে ভুল রাস্তায় টেনে নিয়ে যেতে চায়। তবে বেশ কিছু দিন নিজের দেখা স্বপ্নগুলোকে নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে, খোলামনে বিশ্লেষণ করতে থাকলে যে কোনও পাঠক স্বপ্নের ভাষা আর নিয়মকানুনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারবেন।

স্বপ্ন ১: দেখলাম একটা প্যানে বানর ফ্রাই করছি—ছেলেটা ক-দিন ধরে জ্বরে ভুগছে—কেন এমন একটা স্বপ্ন দেখলাম?

স্বপ্নদ্রষ্টা পঞ্চাশ পার হওয়া একজন মহিলা। তাঁর একমাত্র ছেলে ক'দিন ধরে খুব বেশি জ্বরে ভুগছে। আর তা নিয়ে মায়ের মনে রয়েছে তীব্র উদ্বেগ আর ভয়। বেশ ক'দিন চিকিৎসার পরও জ্বর না কমায় একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে। এরকম এক চিন্তাবহুল রাতে মহিলা এই স্বপ্ন দেখেন।

আপাতদৃষ্টিতে, প্যানে বানর ফ্রাই করার সঙ্গে ছেলের অসুখের কোনও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই সম্পর্ক খুঁজে পেতে, ফিরে যেতে হবে সাতাশ বছর আগের একটা দিনে। যেদিন মহিলা ছেলের জন্ম দেন কলকাতার এক নার্সিংহোমে। ছোটবেলায় একটা নির্দিষ্ট বয়সে ছেলে আক্রান্ত হয় মৃগীরোগে। মহিলা ছেলেকে নিয়ে ছোটেন বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের চেম্বারে। নানারকম ওষুধ চলতে থাকে। রোগের উপসর্গ পুরোপুরি কমে না। একটা বয়সে দেখা দেয় রোগের কিছু মানসিক জটিলতা। বহুদিন ধরে এই যুবককে নিয়মিত খেতে হয় নানা ধরনের ওষুধ। সে আজ শারীরিক ও মানসিক একজন প্রতিবন্ধী।

এরকম একটি ছেলের উচ্চশিক্ষিতা মায়ের মনে ছেলেকে নিয়ে খুব বেশি উদ্বেগ থাকা স্বাভাবিক। মনে এই প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক, কেন বা কার জন্য তাঁর ছেলের এই পরিণতি। মহিলা জানেন, কয়েকজন স্নায়ুরোগ-বিশেষজ্ঞও তাঁকে একসময় জানিয়েছিলেন, জন্মের সময় মাথায় চোট (Birth Trauma) লেগে এরকম হতে পারে। মহিলার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর একমাত্র ছেলের এই পরিণতির জন্য দায়ী সেই ধাত্রীবিদ, যিনি তাঁকে প্রসব করিয়েছিলেন। মহিলা সরাসরি জানিয়েছেন, ওই চিকিৎসককে তিনি কোনওদিন ক্ষমা করতে পারবেন না।

ওই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মুখের সঙ্গে আরও অনেক মানুষের মতো বানরের মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। বাস্তবে সরাসরি ওই চিকিৎসককে শাস্তি দেবার ক্ষমতা স্বপ্নদ্রষ্টার নেই। স্বপ্নে ভদ্রলোককে তিনি শাস্তি দিচ্ছেন। প্যানে বানর ফ্রাই করবার গূঢ় অর্থ তাই। বাস্তবে ছেলের খুব বেশি জ্বর (বেশি তাপ)-এর সঙ্গে স্বপ্নের ফ্রাই (বেশি তাপে ভাজা)-এর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

এই স্বপ্নে ছেলেকে প্রসব করিয়েছেন যে চিকিৎসক তাকে শাস্তি দেবার ইচ্ছা জটিলভাবে পূর্ণ হচ্ছে কল্পনায়। ভাজা হচ্ছে যে বানরটা সেটা আর যাই হোক জীবিত থাকতে পারে না। মহিলার অচেতন মনে ওই চিকিৎসকের মৃত্যুকামনা চলে এসেছে প্যানে বানর ফ্রাই করার এই স্বপ্নে।

স্বপ্ন ২: স্বপ্ন দেখলাম আমার ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে—'সেল'-এ রয়েছি। কাল সকালেই আমাকে

ফাঁসি দেওয়া হবে। সারারাত ধরে যন্ত্রণা অনুভব করছি আর ভাবছি, আমাকে যদি বিচারক হবার সুযোগ দেওয়া হত তবে পৃথিবী থেকে মৃত্যুদণ্ড ব্যাপারটাই তুলে দিতাম।

স্বপ্নদ্রষ্টা একজন আইনজীবী। বয়েস ৩২। বিয়ের পর প্রথম সন্তানের বাবা হবার ঠিক আগে তিনি এই স্বপ্ন দেখেন।

এই স্বপ্নের প্রেক্ষাপট এরকম। বিয়ের কিছুদিন আগে এক অচেনা নারীর সঙ্গে হঠাৎ করে যৌনসম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এই যুবক। বিয়ের পর এই সম্পর্ক নিয়ে মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন অনেক। বারবার মনে হয়েছে, ব্যাপারটা স্ত্রীর কাছে গোপন করে স্ত্রীকে তিনি ঠকিয়েছেন।

অবচেতন মনে, এই পাপের জন্য আমার শাস্তি পাওয়া উচিত—মনের অধিশাস্তা (Super Ego)-র এরকম তাড়না থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। পাঠক খেয়াল করবেন, 'সারারাত ধরে যন্ত্রণা অনুভব' করছেন স্বপ্নের দর্শক। এর মধ্যে নিজের 'পাপ'-এর জন্য নিজেকে একটানা যন্ত্রণা পেতে দেখে ইচ্ছাপূরণ ঘটছে স্বপ্নদ্রষ্টার। স্বপ্নের বাকি অংশ এসেছে স্বপ্নকল্পনার জোরে। স্বপ্নের মূল অর্থ খুঁজে পেতে যার তেমন কোনও গুরুত্ব নেই।

এই 'শাস্তি পাবার স্বপ্ন' থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন, মনের অধিশাস্তার প্রভাবে নিজে নিজেকে কাল্পনিক ভাবে শাস্তি দেওয়াও ক্ষেত্রবিশেষে এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ হয়ে স্বপ্নে চলে আসতে পারে। এরকম যে কোনও স্বপ্নকে একই ছাঁচে ফেলে অর্থ খুঁজতে গেলে কিন্তু ভুল হবে। একই স্বপ্ন, স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিকতা, ব্যক্তিত্ব ও স্বপ্নের আনুষঙ্গিক তথ্যের প্রেক্ষিত বদলে যাবার জন্য অন্যজনের ক্ষেত্রে অন্য ভাব বা অর্থ নিয়ে আসতে পারে। পাঠককে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হতে হবে। তা নইলে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের নামে স্বপ্নের অর্থের অতিসরলীকরণ ঘটবে। ভুল হবে।

স্বপ্ন ৩: সবুজ ঘাসেভরা একটা মাঠে রণতুঙ্গার ইন্টারভিউ নিচ্ছি—রণতুঙ্গা ক্রিকেট খেলার ড্রেস পরে, আমি পাশে—আমি বললাম, 'আপনি এই শরীর নিয়ে দৌড়োন কি করে?' উনি বললেন, 'মনের জোর থাকলে সব হয়।' বললাম, 'কোন বলটা ছাড়বেন আর কোনটা খেলবেন এটা এত সুন্দর বোঝেন কি করে?' বললেন, 'আমি অনেক অনুশীলন করে এটা শিখেছি।' হঠাৎ রণতুঙ্গা পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরালেন! আমি তো অবাক! কোথায় দামি সিগারেট খাবেন না বিড়ি! আমার অবাক মুখচোখ দেখে নিজেই বললেন, 'আমি তো বিড়িই খাই।'

স্বপ্নদ্রষ্টা তিরিশ বছরের এক যুবক। ছোটখাটো একটা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। নিজের কাছে তিনি 'অসফল একজন মানুষ।' ওঁর চেহারার সঙ্গে চেহারায় অনেক মিল রয়েছে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট টিমের চূড়ান্ত সফল ব্যাটসম্যান অর্জুনা রণতুঙ্গার। রণতুঙ্গা ওর 'স্বপ্নের ক্রিকেটার'। স্বপ্নের প্রথম অংশে প্রিয়তম ক্রিকেটারের ইন্টারভিউ নেবার মধ্যে ইচ্ছাপূরণের অস্তিত্ব পাঠক খুঁজে পাবেন। যদিও এই স্বপ্নের মূল অর্থ অন্য।

রণতুঙ্গা এবং তাঁর ইন্টারভিউ নেওয়া স্বপ্নদ্রষ্টা একই মানুষ। 'অসফল' স্বপ্নের দর্শকের ইচ্ছাপূরণ ঘটছে স্বপ্নের 'চূড়ান্ত সফল' রণতুঙ্গার ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা নিজেকে দেখে। স্বপ্নের শেষ অংশে রণতুঙ্গার পকেট থেকে বিড়ি বার করার ছবিটা ভাবুন। স্বপ্নের দর্শকের মতো রণতুঙ্গাও বিড়ি খায়। এই একাত্মবোধ থেকে পাঠক রণতুঙ্গার ছদ্মবেশে স্বপ্নের দর্শকের উপস্থিতি কিছুটা বুঝতে পারবেন।

ইন্টারভিউর প্রশ্নগুলোর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজেই নিজেকে বোঝাচ্ছেন, মনের জোর থাকলে আমার মতো ভারী চেহারা নিয়েও চূড়ান্ত সফল হওয়া যায়। যেমন পেরেছেন রণতুঙ্গা। দ্বিতীয় প্রশ্ন আর তার উত্তর থেকে স্বপ্নের দর্শক নিজেই নিজেকে কোনও একটা লক্ষ্য নিয়ে সফল হবার জন্য একাগ্রতা আর অনুশীলনের প্রয়োজন বোঝাচ্ছেন।

এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ কিছুটা জটিল। কেন না স্বপ্নের দর্শকের মন এখানে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

প্রথম ভাগ রয়েছে তাঁর বর্তমান চেহারার মধ্যে। অন্য ভাগ রণতুঙ্গার ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা নিজের মধ্যে। স্বপ্নে মন এভাবে খণ্ডিত হয়ে যাবার ঘটনা (Split of Mind) স্বপ্ন জটিল হবার একটা কারণ।

এই স্বপ্নের মূল অর্থকে এক কথায় বলা যায় এভাবে—'অসফল' স্বপ্নের দর্শক স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রিয়তম ক্রিকেট-ব্যক্তিত্বের ছদ্মবেশে এভাবে নিজেকে চূড়ান্ত সফল অবস্থায় দেখছেন। এই স্বপ্ন তাই জটিল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন।

স্বপ্ন ৪: দেখলাম বাথরুমে গেছি। বাথরুমে চৌবাচ্চার বদলে একটা ড্রাম—ড্রাম থেকে একটা বাচ্চা, সারা মুখ রক্তাক্ত বীভৎস—উঠে এসে রোমশ হাতে আমার গলা টিপে ধরছে—আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যায়—।

এই স্বপ্নের দর্শক ২৩ বছরের একজন সদ্যবিবাহিতা যুবতী। তার বর্তমান স্বামীর সঙ্গে যুবতীর ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে বিয়ের ছ বছর আগে থেকে। বিয়ের ছ মাস বাদে 'তারিখ পেরিয়ে যাবার' (ঋতুস্রাব শুরু না হবার) দিনকয়েক বাদে তিনি এই স্বপ্ন দেখেন।

অপরিকল্পিতভাবে গর্ভসঞ্চারের ভয় থেকে এই স্বপ্নের উৎপত্তি। বাথরুমের ড্রাম এসেছে জরায়ুর প্রতীক হয়ে। ড্রাম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসা থেকে গর্ভপাতের আভাস পাওয়া যায়। মনে হয়, অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে রেহাই পাবার ঘটনা ঘটছে এই প্রতীকী ছবির আড়ালে। যা এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। স্বপ্নের দর্শক এখনই মা হতে চাইছেন না—এই তথ্য সামনে রাখলে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। তবে কেন বাচ্চাটা বীভৎস, রক্তাক্ত? তার হাতগুলোই বা কেন রোমশ? বাচ্চাটা রোমশ হাতে যুবতীর গলা টিপে ধরছে কেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া যেতে পারে বিয়ের আগের বছর পুজোর সময় যুবতীর কিছু অভিজ্ঞতার কথা জানলে। ওই সময় ভাইয়ের এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ করে 'আশ্চর্য ভালোলাগা'র একটা সম্পর্ক তৈরি হয় মহিলার। তৈরি হয় শরীরী সম্পর্কও। পরে ওই যুবক জানতে পারেন যে, মহিলা অন্য পুরুষের স্ত্রী হতে চলেছেন। যুবতী ওঁকে বিয়ে করবেন না এটা বুঝতে পেরে যুবক যুবতীকে নানাভাবে শাসান। এমনকি খুন করে ফেলবার ভয়ও দেখান। পঞ্জাবি ওই যুবকের হাতদুটো ছিল বেশি রোমশ।

ড্রাম থেকে উঠে আসছে বীভৎস, রক্তাক্ত একটা বাচ্চা। স্বপ্নে এই বাচ্চার হাতদুটো রোমশ। এর অর্থ, জরায়ু থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে শরীরী মিলনের সন্তান। অচেতনের অবৈধ এক ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে এই অংশে। এর পর ওই রোমশ হাতদুটো স্বপ্নের দর্শকের গলা টিপে ধরছে। এর অর্থ কি? মনের অধিশাস্তার প্রভাবে স্বপ্নদ্রষ্টা ওই রোমশ হাতের যুবকের কাছ থেকে শাস্তি পাচ্ছেন।

পাঠক খেয়াল করবেন, ওঁকে যুবতী বিয়ে করবেন না বুঝতে পেরে ওই যুবক তাঁকে খুন করে ফেলার ভয় দেখিয়েছিলেন একটা সময়। যুবতীর সচেতনের এই ভয় মনের অধিশাস্তার প্রভাবে পরিণত হচ্ছে তাঁর শাস্তিতে। তাই রোমশ হাতের রক্তাক্ত, বীভৎস বাচ্চাটা যুবতীর গলা টিপে ধরছে। 'এরকম পাপের শাস্তি আমার পাওয়া উচিত'—অবচেতনের এই ইচ্ছা এই স্বপ্নে কল্পনায় পূর্ণ হচ্ছে। ভয়ের বা আতঙ্কের এই স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণ ঘটছে এইভাবে। এই স্বপ্ন তাই শাস্তি পাবার স্বপ্ন। পানিশমেন্ট ড্রিম।

সচেতনে গর্ভসঞ্চারের ভয় থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। আর অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভের হাত থেকে মুক্তি—ড্রাম (জরায়ু) থেকে রক্তাক্ত বাচ্চার বাইরে বেরিয়ে আসা অবশ্যই এই ইচ্ছার প্রতীকায়িত কাল্পনিক পূরণ। এই জটিল স্বপ্নে তাই দু-দুটো ইচ্ছাপূরণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আরও একটা ইচ্ছা এখানে পরোক্ষভাবে পূর্ণ হচ্ছে। তা হল, ওই যুবকের সন্তান নিজের গর্ভে ধারণের অনৈতিক ইচ্ছা।

এই স্বপ্ন যুবতী দেখছেন বিয়ের পর। গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা দেখা দেবার সময়। পুরনো প্রেমিক (বর্তমান স্বামী)-র সঙ্গে প্রতারণা করেছেন তিনি, এর জন্য তাঁর শাস্তি পাওয়া উচিত—এই স্বপ্নের শাস্তি পাবার অংশ এসেছে মনের এরকম ভাবনা থেকে। পাশাপাশি জটিলভাবে এসে পড়েছে রোমশ হাতের

ওই যুবককে প্রতারণার শাস্তি। এই দুরকম শাস্তি স্বপ্নে চলে এসেছে ছোট্ট এক টুকরো প্রতীকী দৃশ্যে।

মনের অধিশাস্তার প্রভাবে নিজেকে শাস্তি পেতে দেখে স্বপ্নের দর্শকের অচেতন মনের অশান্তি কমছে। অচেতন মনের এই শাস্তি সচেতনে দেখা দিচ্ছে ভয় বা আতঙ্ক হয়ে। স্বপ্নে প্রতীকের উপস্থিতি স্বপ্নের অর্থকে কীভাবে লুকিয়ে রাখতে চায়, এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে পাঠক তা বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারবেন স্বপ্নের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে স্বপ্নের দর্শকের কাছ থেকে আনুষঙ্গিক নানা তথ্য জানবাব প্রয়োজনীয়তা। এই তথ্যগুলো না জানলে স্বপ্নের এরকম গোপন অর্থ এই স্বপ্নের বিবরণ থেকে কিছুতেই বার করা সম্ভব হত না।

স্বপ্ন ৫: রবীন্দ্রসদনে একটা বড় অনুষ্ঠান হচ্ছে—শাবানা আজমি, ওম পুরী ও আরও অনেক নামীদামি চিত্রতারকা মঞ্চে বসে—আমিও মঞ্চে ওঁদের পাশে—অনুষ্ঠানের আমিই যেন সভাপতি—এক সময় দেখলাম, আমি মাইক্রোফোনে বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর নাম ঘোষণা করলাম—শাবানা আজমি এগিয়ে এলেন—আমিও ওঁর সঙ্গে করমর্দন করতে হাত বাড়ালাম—শাবানার বাড়ানো হাতটা কুষ্ঠরোগীর হাতের মতো—ঘেন্নায়, আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেল।

এই স্বপ্নের দর্শকের বয়স ৩০। সমাজের প্রতিষ্ঠিত, গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা যুবকের 'স্বপ্ন'। স্বপ্ন দেখার কয়েকদিন আগে টিভি-তে কোনও এক জনপ্রিয় ফিল্মি ম্যাগাজিন আয়োজিত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী, পরিচালকদের পুরস্কার দেবার অনুষ্ঠান দেখেছেন তিনি। এই স্বপ্নের উদ্দীপনা তৈরি হয় টিভি-র ওই অনুষ্ঠানের ছবি থেকে। আরও অনেক চিত্রতারকার মধ্যে শাবানা আজমি উপস্থিত ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে। যুবক সিনেমাপাগল। শাবানার ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য আর অভিনয় ওঁকে খুব নাড়া দেয়। শাবানা ওঁর প্রিয় অভিনেত্রী।

এই প্রেক্ষিতে দেখলে সহজেই বলা যেত, প্রিয় চিত্রতারকার সঙ্গে একমঞ্চে বসা, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে ওঁর নাম ঘোষণা করা এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ। এরকম অনুষ্ঠানে সাধারণত সভাপতিত্ব করেন সমাজেব নামজাদা কোনও ব্যক্তিত্ব। 'অনুষ্ঠানের আমিই যেন সভাপতি'র অর্থ এরকম। স্বপ্নের দর্শক স্বপ্নে নিজেকে দেখছেন সমাজের উচ্চবিত্ত মহলের নামকরা একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে। এরকম একজন 'কেউকেটা' হবার ইচ্ছা (যাঁর সঙ্গে সমাজের চূড়ান্ত সফল নামীদামি লোকদের ওঠাবসা) এই স্বপ্নে পূর্ণ হচ্ছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

স্বপ্নদ্রষ্টাব সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় এই স্বপ্ন সংক্রান্ত বেশ কিছু আনুষঙ্গিক তথ্য পাওয়া যায়। যুবক মধ্যবিত্ত। উচ্চবিত্ত এক ব্যবসায়ীর একমাত্র সুন্দরী মেয়েকে তিনি ভালোবাসেন। দুজনের সম্পর্ক রয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। মেয়েটির নাম সাহানা। শাবানার সঙ্গে ওই নামের ধ্বনি ও উচ্চারণের মিল রয়েছে। স্বপ্নের শাবানা আসলে স্বপ্নদ্রষ্টার প্রেমিকা সাহানা।

এই যুবতীর উচ্চবিত্ত বাবা যুবককে পছন্দ করেন না। ভদ্রলোকের ইচ্ছা নয়, এই সম্পর্ক আর এগোক। সম্ভ্রান্ত এক ব্যবসায়ীর একমাত্র ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন—ভদ্রলোকের ইচ্ছা তাই। সুযোগ পেলেই স্বপ্নদ্রষ্টা যুবককে নানাভাবে অপদস্থ করেন ভদ্রলোক। এরকম ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকবার। যুবতী বাবাকে খুব ভালোবাসেন। বাবার ইচ্ছার অমতে বিয়ে করায় তাঁর তীব্র আপত্তি। যুবককে তিনি নিয়মিত আরও 'ওপরে উঠতে' চেষ্টা করে যাবার কথা বলেন! মনের মানুষের এরকম কথায় যুবকের পক্ষে কষ্ট পাওয়া আর অপমানিত বোধ করা স্বাভাবিক। তবু, আরও 'বড় হওয়া'র ব্যাপারে তার চেষ্টায় এতটুকু ত্রুটি নেই।

স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শক সমাজের উপরতলার একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ। যেমনটা তার প্রেমিকা চান। তাঁর প্রেমিকা একজন প্রতিষ্ঠিত চিত্রতারকা। তাঁকে বছরের সেরা অভিনেত্রী নির্বাচন করছেন যুবক। যুবতী অভিনেত্রী হবার স্বপ্ন দেখেন—এই তথ্য সামনে রাখলে স্বপ্নের ছবির এই অংশের এই অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'একদিন আমিই তোমাকে শ্রেষ্ঠ বানাব'—যুবকের অবচেতনের এরকম ইচ্ছা স্বপ্নে চলে এসেছে।

স্বপ্নের শেষ অংশ কিছুটা জটিল। 'শাবানার বাড়ানো হাতটা কুষ্ঠরোগীর হাতের মতো।' পচা, গলা।

সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের বাইরের চেহারাটা আসলে তাদের খোলস। সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাদের নোংরা চেহারাটা। প্রেমিকার বাইরের সৌন্দর্য মেকি। ভেতরটা ওর বাবার মতোই। নোংরামিতে ভরা। স্বপ্নদ্রষ্টার অবচেতনের এরকম ভাবনা স্বপ্নের এই অংশের নির্মাণের জন্য দায়ী।

স্বপ্নে শাবানার সঙ্গে করমর্দন বাস্তবের ভাষায় প্রেমিকার সঙ্গে হাত মেলানো। বিয়ে। শাবানার ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা প্রেমিকার হাতটা কুষ্ঠরোগীর মতো পচা-গলা। এরকম হাতে হাত মেলাতে ঘেন্না হতে পারে যে কোনও মানুষের। স্বপ্নের শেষ অংশে দুই বিপরীতমুখী ভাবের সংঘর্ষ ঘটছে। একদিকে মনের মানুষকে বিয়ে করার ইচ্ছা। স্বপ্নে যা আসছে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেবার ছবিতে। পাশাপাশি, উলটোদিকের হাতটা পচা-গলা। আর যাই হোক ওই হাত ছোঁয়া যায় না। অর্থাৎ ওকে বিয়ে করা যায় না। ওই হাতের কাছাকাছি হাত নিয়ে গিয়ে যুবকের অবচেতন মনের এই ইচ্ছার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধছে সচেতনের হাত মেলানোর ইচ্ছার। যার পরিণতিতে স্বপ্নদ্রষ্টা আতঙ্কিত। ওঁর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

এই স্বপ্নের শেষ দৃশ্য সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা'র শেষ দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুটো হাত এক হতে গিয়েও যেখানে কিছুটা দূরত্বে স্থির হয়ে যায় ফ্রিজ-শটে।

স্বপ্ন ৬: দেখলাম হেমা মালিনী আমার বস হয়ে এসেছেন। আমি আমার সহকারীকে বলছি, 'মালকিনকে দেখিয়ে দাও, কাজটা হয়ে গেছে'—কথাগুলো জোরে বলায় আমার আর আমার সঙ্গে যে ঘুমোচ্ছিল দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল।

এই স্বপ্ন দেখেছেন ৩৫ বছর বয়সের এক টেকনিসিয়ান। ভদ্রলোক কাজ করেন কোনও এক কনস্ট্রাকসান কোম্পানিতে। একটা ওভারহেড ক্রেন ফিট করবার জন্য গেছেন ইসকো সংস্থায়। একটা সমস্যা কিছুতেই মিটছিল না। ক্রেনটা কিছুতেই মালপত্র ধরে রাখতে পারছে না। ভদ্রলোক অনেক চেষ্টাতেও সমস্যাটা মেটাতে পারেননি। একজন ক্যাজুয়াল কর্মী ওঁকে একটা সামান্য ব্যাপার ঠিক করতে বলে। ওটা করতেই সমস্যাটা মিটে যায়।

হেমা মালিনী স্বপ্নদ্রষ্টার প্রিয় নায়িকা। স্বপ্ন দেখবার আগের দিন সন্ধ্যায় ভদ্রলোক দেখছিলেন হেমা মালিনী অভিনীত ছবি 'মেরি আওয়াজ শুনো'। তাতে একজন অভিনেতার একটা সংলাপ ছিল এরকম, 'মালকিন কো দিখা দো, কাম হো গিয়া'। বাস্তবের এই দুটো সূত্র থেকে এই স্বপ্ন তৈরি হয়েছে অদ্ভুতভাবে। সিনেমার ওই সংলাপের বাংলা রূপান্তর চলে এসেছে স্বপ্নদ্রষ্টার মুখে।

স্বপ্নের নায়িকা হেমা মালিনী তার মালকিন—এটা অবশ্যই এক ধরনের ইচ্ছাপূরণ। বাস্তবে ক্রেনের সমস্যা তিনি নিজে বহু চেষ্টা করেও মেটাতে পারেননি। সমস্যা মিটেছে সহকারীর সাহায্য নিয়ে। স্বপ্নের দর্শকের মনের অহংবোধ (Ego) এই ঘটনায় ধাক্কা খেয়েছে। অহং-এর এই ধাক্কা স্বপ্নের দর্শক সামলে নিচ্ছে স্বপ্নে। বাস্তবে ওঁর সহকারী ওঁকে বলেছে, 'এভাবে কাজটা করুন।' স্বপ্নে চলে এসেছে এর প্রতিক্রিয়া। স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা নির্দেশ দিচ্ছেন সহকারীকে। 'মালকিনকে দেখিয়ে দাও, কাজটা হয়ে গেছে।' যেন কাজটা হয়েছে তাঁরই বুদ্ধিতে, তাঁরই নির্দেশে! 'সহকারী সামান্য একটা ব্যাপার ঠিক করতে বলল! ওটা করতেই কাজটা হয়ে গেল।' বাস্তবের এই ঘটনায় মনে ধাক্কা খাওয়া টেকনিসিয়ান তাই স্বপ্নে প্রকারান্তরে মালকিনকে বোঝাতে চাইছেন, তাঁর বুদ্ধিতেই কাজটা হয়েছে।

এই স্বপ্ন কিছুটা ব্যতিক্রমী। স্বপ্নের মধ্যে সিনেমায় দেখা কথা চলে এসেছে হুবহু। যদিও দুটোর প্রেক্ষাপট আলাদা। স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শক সাধারণত কথা বলে মনে মনে। এখানে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? হিন্দি সিনেমার ঢঙে উচ্চগ্রামে সংলাপ বলার ইচ্ছা এখানে স্বপ্নদ্রষ্টার স্বরযন্ত্রকে স্বপ্নের মধ্যেও করে তুলেছে সক্ষম। এর জন্য দায়ী হয়তো স্বপ্নের দর্শকের মনে লুকিয়ে থাকা সিনেমার অভিনেতা হবার সুপ্ত ইচ্ছা। এই ব্যতিক্রমী স্বপ্নে একাধিক ইচ্ছাপূরণ ঘটেছে আরও অনেক স্বপ্নের মতো।

স্বপ্ন ৭: একটা অচেনা ইউরিনালে গেছি—অনেক খোপকাটা পেচ্ছাব করবার জায়গা—আমি একটাতে ঢুকতে যাচ্ছি—ময়লা জামাকাপড় পরা একটা লোক আমাকে তাড়া করছে—হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়ে লোকটা মরে গেল—আমি সবাইকে বলছি, 'আমি কিছু করিনি, ও নিজেই পা পিছলে পড়ে মরে গেছে।' একটু বাদে একজন বলছে, 'পুলিশ আসছে!'—ভয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। পরদিন সকালে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

স্বপ্নের দর্শক ৪২ বছর বয়সের একজন এঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রাক্টর। ওঁর অধীনের সাব-কন্ট্রাক্টররা সরকারি কাজ করান অনেকগুলো সাইট (জায়গা)-এ। স্বপ্ন দেখার কয়েকদিন আগে এই কন্ট্রাক্টর ভদ্রলোকের নির্দেশে একজন সাব-কন্ট্রাক্টর কোনও একটা সাইটের একজন কর্মীকে বরখাস্ত করেন। বরখাস্ত হওয়া লোকটা কিছুটা মাস্তান ধরনের। ও প্রকাশ্যে জানিয়েছে, 'কন্ট্রাক্টরকে দেখে নেব!'

কন্ট্রাক্টর ভদ্রলোকের সাহায্য নিয়ে এই স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ময়লা জামাকাপড় পরা লোকটা, যে স্বপ্নদ্রষ্টাকে তাড়া করছে, সে আসলে বাস্তবের ওই বরখাস্ত হওয়া কর্মী। ওর কাজ চলে যাওয়ার জন্য দায়ী স্বপ্নের দর্শক। কাজ হারিয়ে পথে বসা এরকম একজন মানুষ ছদ্মবেশে স্বপ্নদ্রষ্টাকে তাড়া করছে। এই অংশে স্বপ্নদ্রষ্টার বিবেক তাকে শাস্তি দিচ্ছে এভাবে। স্বপ্নের এই অংশকে 'পানিশমেন্ট ড্রিম' বলা যায়।

স্বপ্নের পরের অংশ কিছুটা জটিল। 'পা পিছলে পড়ে গিয়ে লোকটা মরে গেল।' এতে স্বপ্নদ্রষ্টার কোনও দায়িত্ব থাকার কথা নয়। তবু তিনি সবাইকে বলছেন, তিনি কিছু করেননি। লোকটা মরেছে পা পিছলে পড়ে গিয়ে। এ যেন অনেকটা 'ঠাকুরঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি'র মতো ব্যাপার। এর অর্থ, স্বপ্নদ্রষ্টা ওই লোকটাকে মেরেছেন। মনের পাহারাদারের চোখকে ফাঁকি দিতে এই হত্যার দৃশ্য স্বপ্নে আসেনি। এসেছে লোকটার পা পিছলে পড়ে গিয়ে মারা যাবার দৃশ্য।

স্বপ্নের শেষ দিকে মনের প্রহরী পুরোমাত্রায় সজাগ। পুলিশ আসছে শুনে ভয় পাচ্ছেন স্বপ্নের দর্শক। তাঁর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে ভয়ে। এরপর আর বুঝতে অসুবিধা হয় না, স্বপ্নের দর্শকের কর্মচ্যুত মানুষটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছা এই স্বপ্নে পূর্ণ হয়েছে। এতে অচেতন মন আনন্দ পেলেও সচেতনে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিচ্ছে ভয়।

পাঠক লক্ষ করবেন, বরখাস্ত হওয়া শ্রমিকটি মাস্তান ধরনের। সে কন্ট্রাক্টরকে দেখে নেবার হুমকি দিয়েছিল। স্বপ্নের দর্শকের অচেতন মনে এরকম একজন বিপজ্জনক মানুষকে শেষ করে দেবার ইচ্ছা জাগা অনৈতিক হলেও অসম্ভব নয়। স্বপ্নে এই অনৈতিক ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে জটিলভাবে।

স্বপ্নে এরকম একটা ইচ্ছা চলে আসায় স্বপ্নদ্রষ্টা ঘুম ভেঙে উঠে সকালে কষ্ট পেয়েছেন। এরকম স্বপ্নের বিশ্লেষণে স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার পর স্বপ্নের দর্শকের মানসিক অবস্থার ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ সময় অন্যের মৃত্যুকামনা স্বপ্নে আসে কিছুটা জটিলভাবে, ছদ্মবেশে। এই স্বপ্নে চলে এসেছে স্বপ্নের দর্শকের অচেতন মনে বরখাস্ত হওয়া ওই কর্মীর মৃত্যুকামনা। যার প্রভাবে স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার পর অস্বস্তিতে ভুগছেন তিনি। সকালে উঠে স্বপ্নের দর্শকের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া না থাকলে এই স্বপ্নের অর্থ হতে পারত অন্যরকম। প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

স্বপ্ন ৮: স্বপ্নে প্রায়ই রাজপ্রাসাদ দেখতে পাই—বিরাট বড় প্রাসাদ, চারপাশে পরিখা দেওয়া—ভেতরে ঢুকে পড়ি। সিংহদুয়ার, বড় বড় মহল, মস্ত বড় বাগান—বাগানে সোনার গাছ—এক দিন একরকম একটা গাছ থেকে রুপোর ফল পাড়ছি দেখলাম—এক দিন দেখলাম, রাজসভা বসেছে—প্রাসাদের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াতে খুব আনন্দ পাই।

এই স্বপ্নের দর্শক আঠাশ বছরের এক গৃহবধূ। স্বপ্নের বিশ্লেষণে তাঁর দেওয়া সূত্রগুলো কাজে লাগিয়ে সহজেই স্বপ্নের অর্থ খুঁজে পাওয়া গেছে। এই ধরনের স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টা দেখেছেন বারবার। আর এরকম স্বপ্নে চলে এসেছে স্বপ্নদ্রষ্টার অদ্ভুত কিছু শৈশবকল্পনা।

জ্ঞান হবার পর থেকে স্বপ্নদ্রষ্টা ভাবতেন তিনি আসলে এক রাজকন্যা। ছোট্ট মেয়ের গায়ের রং মাখনের মতো অপূর্ব। কালো, মাথাভর্তি চুল আর টানাটানা চোখে সে ছিল খুব সুন্দরী। যে সৌন্দর্য দেখে অনেকেই তাকে ডাকত 'রাজকন্যা' বলে। রূপকথার গল্পের রাজকন্যারা যে এরকমই দেখতে হয়। মেয়েটির মা তাঁকে মজা করে বলতেন, 'তুই আসলে কোনও রাজার মেয়ে, ভুল করে আমার ঘরে চলে এসেছিস।' এইসব শুনে শিশুর মনে জন্ম নিত বিচিত্র কল্পনা। কল্পনাপ্রবণ শিশুমন সহজেই পাড়ি দেয় বিচিত্র কল্পনার দেশে। মহিলার স্মৃতিতে ছোটবেলার সেসব কল্পনার কিছু স্মৃতি আজও অটুট।

মেয়েটা বসে বসে ভাবত পরিখা দেওয়া পাঁচিল ঘেরা এক বিশাল রাজপ্রাসাদের ছবি। প্রাসাদের বাগানে রূপকথার রুপোর গাছে ঝুলে আছে সোনারুপোর ফল। বড় বড় ঘর, বিশাল বড় বড় মহল, সিংহদুয়ার। সোনারুপোর খাটপালঙ্ক। রূপকথার বাগানের মতো অপূর্ব সুন্দর বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রূপসী এক রাজকন্যা। একটা সোনার গাছ থেকে পেড়ে আনছে রুপোর ফল। দশ বারো বছর বয়স পর্যন্ত এরকম অদ্ভুত 'ফ্যানটাসি'র জগতে যখন তখন চলে যেত মেয়েটা। মহিলা জানিয়েছেন, ছোটবেলায় তিনি সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করতেন তিনি আসলে এক রাজকন্যা। ভুল করে এই বাড়িতে চলে এসেছেন। এক দিন ঠিক কোনও এক অদৃশ্য জাদুতে পৌঁছে যাবেন তাঁর বাড়িতে। রাজকন্যা চলে যাবেন রাজপ্রাসাদে!

বড় হয়ে যাওয়া একজন মানুষ বাস করে বাস্তবের কঠিন কঠোর, সমস্যাজর্জর পরিবেশে। অবচেতন বা সচেতন মনের দরজায় বারবার হানা দেয় ছেলেবেলার সোনাঝরা দিনগুলো। স্বপ্নে বারবার চলে আসে শৈশবের স্মৃতি। এ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি 'স্বপ্নে শৈশবের স্মৃতি' অধ্যায়ে।

এই স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শক ফিরে পাচ্ছেন তার শৈশব। চিত্রায়িত হচ্ছে তার ছেলেবেলার বিচিত্র কল্পনা। বিরাট বড় রাজপ্রাসাদে চলে গেছেন স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি ওই বাড়িরই মেয়ে, রাজকন্যা। পরিখা দেওয়া প্রাসাদ, বড় বড় মহল, লোকলস্কর, রাজসভা—সবই স্বপ্নে চলে এসেছে। এসেছে প্রাসাদের অপূর্ব সুন্দর বাগান, সোনার গাছ রুপোর ফল। একা একা স্বপ্নদ্রষ্টা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক মহল থেকে আর এক মহলে, এক বাগান থেকে আর এক বাগানে। স্বপ্ন দেখতে দেখতে বিচিত্রভাবে পূর্ণ হচ্ছে তার মনে লুকিয়ে থাকা রাজকন্যা হবার বাসনা।

মহিলা জানান, যখনই কোনও কারণে তার মন খারাপ থাকে, তখনই এই স্বপ্নটা বেশি দেখেন। আর দেখলেই তার মন ভাল হয়ে যায়। পাঠক তার নিজের দেখা স্বপ্নগুলোকে ভালোভাবে লক্ষ করলে এরকম কিছু স্বপ্ন পাবেন, যেখানে তিনি মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শৈশবের সোনালি দিনগুলোতে। এরকম স্বপ্নে একজন মানুষের মনের ব্যথা সারে, কিছুটা হলেও লাঘব হয় বাস্তবের কষ্ট-যন্ত্রণা।

স্বপ্ন ৯: কয়েকমাস ধরে মাঝেমধ্যেই ঘুরেফিরে এই স্বপ্নটা আসছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা মাংসের দোকানের সামনে। সামনে ঝুলছে ছালছাড়ানো একটা আস্ত পাঁঠা। অচেনা মাংসবিক্রেতা ছুরি দিয়ে মাংস কাটছে। এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে খুব কষ্ট হতে থাকে। পরদিন সকালে বড় বিষণ্ণ লাগে। কোনও কাজকর্মে মন বসে না।

স্বপ্নের দর্শক ৪৬ বছরের একজন প্রতিষ্ঠিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। নিজস্ব একটা ফার্ম রয়েছে ভদ্রলোকের। সমাজের উচ্চবিত্ত, প্রতিষ্ঠিত মহলের একজন তিনি। মেলামেশা সমাজের ক্ষমতাবান কেউকেটাদের সঙ্গে।

স্বপ্নদ্রষ্টার মন এরকম স্বপ্নে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। মাংসের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা তাঁর প্রথম সত্তা। দ্বিতীয় সত্তা লুকিয়ে আছে ছালছাড়ানো পাঁঠার শরীরে। মাংসওয়ালা পাঁঠার শরীর থেকে ছুরি দিয়ে মাংস কাটলে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন, যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছেন। কারণ শরীরটা তাঁরই।

মনের তীব্র এক পাপবোধ (Guilt) থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। মনের অধিশাস্তা (Super Ego) তাঁরই সামনে তাঁকে শাস্তি দিচ্ছে এভাবে। একটা জ্যান্ত পাঁঠাকে অমানবিক কষ্ট দিয়ে গলা কেটে মেরে ফেলে ছাল ছাড়িয়ে ধুয়ে মাংসের দোকানের সামনে ঝোলানো হয়। স্বপ্নে পাঁঠার ছদ্মবেশে থাকা নিজের অস্তিত্বকে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের অধিশাস্তা একই শাস্তি দিয়েছে। আর এটা দেখে স্বাভাবিকভাবেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে খুব কষ্ট হচ্ছে স্বপ্নের দর্শকের।

এই স্বপ্নে পূর্ণ হচ্ছে তীব্র এক পাপবোধ থেকে তৈরি হওয়া অচেতনে নিজেকে শাস্তি দেবার ইচ্ছা। পাঠক খেয়াল করবেন, এই স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টা একবার দেখেননি। কয়েকমাসে একই স্বপ্ন তাঁর ঘুমের মধ্যে ঘুরেফিরে এসেছে বেশ কয়েকবার। এরকম স্বপ্নকে তাই সাধারণ 'পানিশমেন্ট ড্রিম' এর পর্যায়ে ফেলা যাবে না। এই স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার আসন্ন মারাত্মক এক মানসিক সমস্যার ইঙ্গিত। এরকম স্বপ্ন বারবার এসেছে ভদ্রলোকের ঘুমন্ত চেতনায়। আর স্বপ্নের প্রভাবে পরদিন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন তিনি। এই স্বপ্ন একদিক থেকে 'ভবিষ্যতের সতর্কবার্তা'। মনোবিজ্ঞানের আলোয় এই স্বপ্নের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে আসন্ন মনোরোগের আভাস।

মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হবার আগে বারবার মারদাঙ্গা, খুনখারাপি, হাত পা কাটা লাশ—এ সব দৃশ্য স্বপ্নে চলে আসার কিছু দৃষ্টান্তের কথা বলেছি 'স্বপ্ন আর মনের অসুখ' অধ্যায়ে। এই স্বপ্ন অনেকটা এক ধরনের। এরকম স্বপ্ন দেখার পর দ্রুত মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য না নিলে মারাত্মক সমস্যায় ভুগতে শুরু করবেন তিনি। এ কথা এই স্বপ্নের দর্শককে জানিয়ে দেওয়া হয় স্বপ্নের গভীর অর্থ খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে।

কয়েকমাস বাদে এই স্বপ্নের দর্শকের স্ত্রী আমাকে টেলিফোনে জানান, ভদ্রলোক তীব্র মানসিক সমস্যার শিকার হয়ে প্রখ্যাত এক মনোরোগবিশেষজ্ঞের চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। এই ঘটনা থেকে কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়। কিছু মনের অসুখ বাস্তবে দেখা দেবার আগে নানাভাবে হানা দেয় স্বপ্নের দেশে। আর এই স্বপ্নগুলো থেকে মনের জগতে আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত খুঁজে পেতে পারেন স্বপ্নতত্ত্বে পারদর্শী একজন স্বপ্নবিশ্লেষক। স্বপ্নকে যাঁরা 'অর্থহীন, আজগুবি' বলে উড়িয়ে দিতে চান, এই স্বপ্নের দৃষ্টান্ত পড়ে তাঁরা হয়তো স্বপ্ন নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতে পারেন।

স্বপ্ন ১০: আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি সাজছি—হঠাৎ আমার মুখটা ডিম্বাকৃতি হয়ে গেল, চোখ, নাক, মুখ, ভ্রু সব উধাও—ছোটবেলা থেকে এই স্বপ্নটা বহুবার দেখেছি। এটা দেখলেই খুব আতঙ্ক হত।

স্বপ্নের দর্শক একজন মহিলা সাংবাদিক। তাঁর নিজের মনে হয়, ছেলেবেলা থেকে মৃত্যু তাঁর কাছে খুব পছন্দের ('ফ্যাসিনেটিং')। আর এই ব্যাপারটাই বারবার এই স্বপ্নে চলে এসেছে।

ছোট্ট মেয়েটা ছিল দারুণ ফুটফুটে, খুব সুন্দর। স্বপ্নে সাজতে সাজতে শ্রীহীন হয়ে পড়ার অর্থ সৌন্দর্য হারানো। এই দৃশ্য কম বয়সে মানসিক অধঃপতনের রূপক হয়ে স্বপ্নে এসেছে। স্বপ্নদ্রষ্টার মনে এমন কিছু ভাব বা চিন্তা আসছে যা মন মেনে নিতে পারছে না। এই অনৈতিক ভাব সচেতন মনে চলে আসায় মনের অধিশাস্তা (Super Ego) স্বপ্নে তাঁকে শাস্তি দিচ্ছে। স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে রূপ হারাচ্ছেন।

এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মেয়েটার বাস্তব অস্তিত্ব হারিয়ে যাচ্ছে তাঁর নিজের কাছে। নিজের অস্তিত্ব হারানো এক ধরনের মৃত্যু। অস্তিত্বহীন হয়ে পড়া আর মৃত্যু প্রায় সমার্থক। এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা আসলে নিজের মৃত্যু দেখছেন। আর মৃত্যুকে ভয় পায় না কে? নিজেকে শ্রীহীন হয়ে পড়তে দেখার স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে এই ভয় থেকে।

স্বপ্নের দর্শকের নিজের ব্যাখ্যা স্বপ্নবিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শিক্ষিত, সংবেদনশীল মানুষের ক্ষেত্রে। সাংবাদিকের এই স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যাকে মাথায় রেখে। তিনি নিজে স্বপ্নটাকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করলে এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ অন্যরকম হতে পারত।

স্বপ্ন ১১: একটা সরু রাস্তা—পিচ্ছিল, কাদায় ভরা—দুপাশে অনেক বাড়ি, একটা আরেকটার গায়ে—আমাকে এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে হবে—যেতে যেতে বাড়িগুলো গায়ে লাগছে—খুব অস্বস্তি হচ্ছে—ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এই স্বপ্নটা মাঝে মাঝে দেখি।

মধ্যচল্লিশের এক অধ্যাপকের স্বপ্ন। স্বপ্নে সঙ্কীর্ণ, কাদায় ভরা রাস্তা আর দুপাশের সারসার গায়ে গায়ে লাগানো বাড়ি এসেছে স্ত্রী জননাঙ্গের প্রতীক হয়ে। এই দৃশ্যের প্রতীকী অর্থ জানা না থাকলে এরকম স্বপ্নের গোপন অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্বপ্নের দর্শককে ওই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। কারণ তাঁর মনের যৌনমিলনের ইচ্ছা স্বপ্নে চলে আসছে। স্ত্রী জননাঙ্গের পথ সঙ্কীর্ণ। তাই যেতে যেতে গায়ে বাড়ি ঘরের ধাক্কা লাগছে। স্বপ্নদ্রষ্টার শরীর স্বপ্নে তাঁর জননাঙ্গ।

যে কোনও পরিণত বয়স্ক মানুষের স্বপ্নে মিলিত হবার ইচ্ছা চলে আসতে পারে সরাসরি বা প্রতীকের ছদ্মবেশে। স্বপ্নের দর্শক বিবাহিত। তবু তিনি এরকম স্বপ্ন দেখছেন কেন? ভদ্রলোকের মনে যৌনতা সম্পর্কে অদ্ভুত কিছু ভুল ধারণা এর জন্য দায়ী। 'যৌনমিলনে শরীরের ক্ষয় হয়। বেশি মিলিত হলে শরীর ভেঙে পড়ে'—উচ্চশিক্ষিত হয়েও ভদ্রলোক এরকম ভ্রান্ত ধারণার শিকার। বাস্তবে এই ধারণার বশে তাঁর যৌন জীবন অনিয়মিত।

ঘুমন্ত চেতনায় যৌনমিলনের ইচ্ছা থেকে এরকম স্বপ্নের জন্ম। যৌনজীবন অনিয়মিত না হলে হয়তো অধ্যাপক এই স্বপ্ন দেখতেন না। যৌনমিলনের ইচ্ছা সরাসরি চলে না এসে কেন এমন প্রতীকী দৃশ্যের ছদ্মবেশে স্বপ্নে আসছে? স্বপ্নের দর্শকের মানসিকতা, রুচিবোধ আর যৌনতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এর জন্য দায়ী। তাঁর মনের যা গঠন তাতে মনের পাহারাদার মিলনের দৃশ্য কিছুতেই স্বপ্নে আসতে দিচ্ছে না। পাহারাদারকে ফাঁকি দিতে সঙ্গমদৃশ্য আসছে প্রতীকের ছদ্মবেশে। সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে স্বপ্নদ্রষ্টার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। তিনি ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছেন। কারণ প্রতীকায়িত মিলনের দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর মনে কাজ করছে মিলনের ফলে 'দুর্বল হয়ে পড়ার' ভয়।

স্বপ্নপ্রতীকের অর্থ ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে পারলে এরকম স্বপ্নের গভীর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় সহজেই। তবে এত সহজ সরল প্রতীকায়িত স্বপ্ন বিরল। প্রতীকায়িত স্বপ্ন কত জটিল হতে পারে তা কিছুটা বোঝা যাবে স্বপ্ন ৪-এর বিশ্লেষণ পড়লে।

স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে এক মত বলে আমাকে জানান। এই ব্যাখ্যা জানার পর থেকে এই কপি প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত, প্রায় ন-মাসে তিনি একবারও ওই স্বপ্ন দেখেননি বলে জানিয়েছেন। কোনও স্বপ্নে চলে আসা অচেতন মনের কোনও একটা গোপন ভাব স্বপ্নদ্রষ্টা সচেতনে বুঝতে পেরে গেলে, ওই স্বপ্ন সাধারণত আর তিনি দেখবেন না। কারণ, স্বপ্নের উদ্দেশ্য অচেতনের ইচ্ছাকে গোপনে পূর্ণ করা। স্বপ্নের দর্শকের সচেতন মনকে ওই ইচ্ছাকে বুঝতে দেওয়া নয়। 'দাঁত পড়ে যাবার স্বপ্নে' প্রথম স্বপ্নের অর্থ (পাতা) স্বপ্নদ্রষ্টা বুঝতে পেরে যাবার পরও একই ব্যাপার ঘটেছে। স্বপ্নদ্রষ্টা আর ওই স্বপ্ন দেখেননি।

স্বপ্ন ১২: জেনারেল ম্যানেজার, ডিভিশানাল ম্যানেজার ও আরও কয়েকজন বড় অফিসার 'জি.এম. স্পেশাল ট্রেনে যাচ্ছেন—গাড়ি আসছে। গেট বন্ধ, লাইন ঠিকঠিক 'সেট'। 'লাইন ক্লিয়ার' দেওয়া আছে—হঠাৎ দেখি 'সিগন্যাল ইনডিকেটর' এ গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে—শুরু হল টেনশন—গেটম্যানকে

জানালাম—বলল, 'সব ঠিক আছে'। 'কন্ট্রোল' কে বলে নিজে নীচে নেমে গেলাম। দেখি, লাইনের একটা জায়গা ভাঙা—দৌড়ে কেবিনে এসে সিগন্যাল লাল করলাম, পটকা লাগালাম—লাল ঝাণ্ডা নাড়ছি—গাড়িটা এসে ভাঙা জায়গার একটু আগে দাঁড়িয়ে গেল। অফিসাররা নেমে এলেন। জানতে চাইলেন, গাড়ি কেন দাঁড়াল—সব বুঝিয়ে বললাম—ওঁরা দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবার জন্য প্রশংসা করলেন, ধন্যবাদ দিলেন। ঘুমটা ভেঙে গেল।

এই স্বপ্নের দর্শক পূর্ব রেলের সিগন্যালিং বিভাগে কর্মরত এক সুইচম্যান। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড শাখায় কোনও এক কেবিনে কাজ করেন ভদ্রলোক। স্বপ্ন দেখার আগের দিন দুপুরের একটা বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই স্বপ্নের জন্ম। ওইদিন ওই লাইন দিয়ে 'জি.এম. স্পেশাল' ট্রেন যায়। ওই ভি. আই. পি. ট্রেন পার করবার সময় স্বপ্নের দর্শক উদ্বিগ্ন ছিলেন। সিগন্যালে কিছু অসুবিধা সত্ত্বেও গাড়ি দাঁড়ায়নি। ঠিকঠাক পার হয়ে গিয়েছিল।

এরকম ভি. আই. পি. গাড়ি পার করাবার সময় কেবিনের দায়িত্বে থাকা সুইচম্যানের ঝুঁকি অনেক। যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিতে পারে যে কোনও সময়। আর কোনও গণ্ডগোলের জন্য এরকম ট্রেন দাঁড়িয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট সুইচম্যানের ঘাড়ে নেমে আসতে পারে শাস্তির খাঁড়া। এরকম গাড়ি পার করাবার সময় কেবিনম্যান বা সুইচম্যান তাই প্রবল টেনশনের মধ্যে থাকেন।

স্বপ্নের প্রথম অংশে এই মানসিক উদ্বেগ চলে এসেছে। বাস্তবে যা সিগন্যালের সামান্য গণ্ডগোল, স্বপ্নে তা আরও বড় মাপের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গেটম্যানকে বলে কাজ না হওয়ায় স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে ছুটে গিয়ে লাইনের একটা জায়গায় চিড় দেখতে পাচ্ছেন। বাস্তবে এরকম ঘটনা যে কোনও সময় ঘটতে পারে। যা থেকে ঘটে যেতে পারে মারাত্মক ট্রেন-দুর্ঘটনা। স্বপ্নের এই অংশ তৈরি হয়েছে বাস্তবের উদ্বেগকে কেন্দ্র করে ।

লাইন ভাঙা দেখে স্বপ্নদ্রষ্টা দ্রুত নানা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। যার জন্য গাড়ি লাইনের ভাঙা অংশ পার হবার আগেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অফিসাররা বেঁচে যাচ্ছেন একটা বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে। চূড়ান্ত কর্তব্যপরায়ণ আর দায়িত্বশীল এক সামান্য রেলকর্মীর তৎপরতায় প্রাণে বেঁচে গেলেন রেলের উচ্চপদস্থ অফিসাররা। স্বপ্নের দর্শকের মনের বীরোচিত প্রবণতা (Heroic Trend) বা ইচ্ছা এই স্বপ্নে পূর্ণ হচ্ছে। দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাবার জন্য 'সাহেব'রা প্রশংসা করছেন তাঁর কাজের। পুলকিত মনে ঘুম ভাঙছে স্বপ্নদ্রষ্টার। দায়িত্বশীল কাজের জন্য তিনি কতৃপক্ষের কাছ থেকে পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারতেন। এই স্বপ্নে অবশ্য তা তিনি পাননি।

স্বপ্নের দর্শকের কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তাঁকে বাহবা দেওয়া এই স্বপ্নের কাজ। বাস্তবে এরকম বাহবা বা প্রশংসা আজকাল আর তেমন জোটে না। স্বপ্নকে যাঁরা আজগুবি বা উদ্ভট ভাবেন, এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ তাঁদের প্রভাবিত করতে পারে। উদ্বিগ্ন মানুষের উদ্বেগ বাড়ানো নয়। তাঁকে চিন্তামুক্ত করা স্বপ্নের একটা বিশেষ কাজ। এই স্বপ্ন থেকে এ ব্যাপারটা বোঝা যায় সহজেই।

উদ্বেগ দিয়ে শুরু হওয়া এই স্বপ্নের প্রথমদিক দুঃস্বপ্ন। মাঝের অংশে স্বপ্নের দর্শকের চরম দায়িত্বশীলতার পুরস্কার সুইচম্যান পাচ্ছেন স্বপ্নের অন্তিম অংশে। 'আমি চূড়ান্ত কর্তব্যপরায়ণ', 'আমার জন্য এতজন ভি.আই.পি. প্রাণে বেঁচে গেলেন'—স্বপ্নের দর্শকের মনের এরকম বীরসুলভ ইচ্ছা স্বপ্নে পূর্ণ হচ্ছে। এর মধ্যে স্বপ্নদ্রষ্টার 'আমিত্ব'র তৃপ্তি পাঠক সহজেই খুঁজে পাবেন। যে কোনও স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শকের আমিত্ব কাজ করে খুব বেশিমাত্রায়। 'Dreams are basically egoistic in origin'. এই স্বপ্ন এর সুন্দর দৃষ্টান্ত।

স্বপ্ন ১৩: আমি কুকুর হয়ে গেছি—সিঁড়ি বেয়ে তিনতলা'র অফিসে উঠলাম। ঘরে ঢুকেছি, কেউ চিনতে পারছে না,—...বাবুর টেবিলের উলটোদিকের চেয়ারে উঠে বসলাম। লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন...বাবু—একের পর এক টেবিলে যাচ্ছি আর একই ঘটনা ঘটছে। বারবার বলতে চেষ্টা করছি,...'বাবু, আমি... , আমাকে চিনতে পারছেন না?'—গলা দিয়ে আওয়াজ বার হচ্ছে না—একটু বাদে সুন্দর একটা রাস্তা দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে যাচ্ছি, দুদিকে জল। ঘুম থেকে উঠে খুব অস্বস্তি

বিচিত্র এই স্বপ্নের দর্শক চুয়াল্লিশ বছরের এক ব্যাঙ্ককর্মী। চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারি হিসেবে কাজ করতেন ব্যাঙ্কের কোনও এক শাখায়। কাজের সূত্রে নিয়মিত যেতে হত ওই ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক অফিসে। তখন ব্রাঞ্চ থেকে বদলি হয়েছেন ওই অফিসেই। নতুন জায়গায় কাজে যোগ দেবার ক'দিন আগে ভদ্রলোক এই স্বপ্ন দেখেন।

স্বপ্নের দর্শক মানুষের বদলে কুকুরের রূপ ধরেছেন। এরকম হলে শৈশবের এক ধরনের অদ্ভুত কল্পনা (Childhood Fantasy) স্বপ্নে চলে আসতে পারে। 'আমি পাখি হবো, ডানা মেলে মনের সুখে উড়ে বেড়াব'— এরকম কল্পনা অনেক বাচ্চাই করে। কুকুরকে খুব ভালোবাসে এমন কোনও বাচ্চার মনে কুকুর হবার ইচ্ছা চলে আসতে পারে স্বপ্নে। যে কোনও বড় হয়ে যাওয়া মানুষের স্বপ্নে চলে আসতে পারে শৈশবকল্পনার এরকম স্মৃতি। এরকম হলে স্বপ্নের দর্শক শৈশবের আনন্দ ফিরে পান স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

এই স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শক কুকুরের রূপ ধরে শৈশবের কল্পনার আনন্দ ফিরে পেতে চাইছেন, এরকম মনে হতে পারে। স্বপ্নে এরকম মানবেতর পশুপাখির রূপ ধরা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এক ধরনের 'ডিপারসোনিফিকেশান'। স্বপ্নের শেষ অংশে মাথা নাড়তে নাড়তে দু-দিকে জল, সুন্দর একটা রাস্তা দিয়ে চলেছেন কুকুরবেশী স্বপ্নের দর্শক। এ থেকে মনে হয়, স্বপ্নে যেন তিনি শৈশবকল্পনার আনন্দ ফিরে পেয়েছেন।

যদি তাই হবে, তবে সবাই তাকে তাড়া করবে কেন? কেনই বা ঘুম ভেঙে খুব অস্বস্তি হবে? কেন স্বপ্নের মধ্যে চূড়ান্ত অপদস্থ হবেন স্বপ্নের দর্শক?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে না পেলে এই ব্যতিক্রমী স্বপ্নের গোপন অর্থ জানা যাবে না। স্বপ্নদ্রষ্টার সাহায্যে এই স্বপ্নের নানা আনুষঙ্গিক তথ্যের প্রেক্ষিতে স্বপ্নটাকে বিচার করা যাক। কুকুর ভদ্রলোকের কাছে নিকৃষ্ট মানবেতর এক প্রাণী। কাউকে 'নিচু করতে' বা গালাগালি দিতে অনেককেই 'কুকুর', 'কুত্তা'—এ সব শব্দ ব্যবহার করতে শোনা যায়। স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যাঙ্কের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। নিজের সম্পর্কে অদ্ভুত এক হীনমন্যতা কাজ করে ওঁর মনে। ব্রাঞ্চে কর্মরত অবস্থায় তেমন কোনও সমস্যায় পড়েননি। আঞ্চলিক অফিসে বদলির নির্দেশ পেয়ে হীনমন্যতা কাজ করতে শুরু করেছে ওঁর অবচেতন মনে। 'এত বড় অফিস, অত বড় বড় অফিসার! আমার মতো সামান্য কর্মচারীকে কেউ পাত্তা দেবে না। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে।' এরকম আশঙ্কা থেকে এই স্বপ্নের জন্ম।

স্বপ্নের দর্শক একের পর এক পরিচিত মানুষের টেবিলের উলটোদিকে যাচ্ছেন। ন্যূনতম সম্মানটুকুও তিনি পাচ্ছেন না। সবাই লাঠি নিয়ে তাড়া করছে তাঁকে। 'আমি অতি সামান্য এক কর্মী। বড় অফিসে আমার কোনও দাম থাকবে না।' হীনমন্যতা থেকে তৈরি অবচেতন মনের এরকম ধারণা এখানে চলে এসেছে। 'তুমি যতই ভাব জমাবার চেষ্টা করো, ওখানে কেউ তোমাকে পাত্তা দেবে না।' এরকম একটা অবস্থার সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া এই স্বপ্নের উদ্দেশ্য।

কুকুরের বেশে ঘুরে বেড়াবার এই স্বপ্নের গোপন অর্থ, স্বপ্নদ্রষ্টা নিজেকে 'খুব ছোট' বা 'অযোগ্য' ভাবছেন। একই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিকতা অন্যরকম হলে স্বপ্নের গভীর অর্থ হয়তো অন্যরকম হত। এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে পাঠক স্বপ্ন-বিশ্লেষণে স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক গঠন বিবেচনার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

স্বপ্ন ১৪: বেশ কয়েকবার এই স্বপ্নটা দেখেছি—আমার বিয়ে হচ্ছে অন্য কারও সঙ্গে। জোর করে আমাকে কনের বেশে দাঁড় করানো হয়েছে অচেনা এক পুরুষের পাশে। প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছি—চারপাশের লোকজনের মধ্যে আমার বর্তমান স্বামীও যৌবনের সেই হ্যান্ডসাম চেহারায় রয়েছেন—প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্যে ঘুম ভেঙে যায়। খুব স্বস্তি পাই জেগে উঠে—বিরাট রিলিফ।

স্বপ্নের দর্শক মধ্যচল্লিশের এক মহিলা। স্বপ্নে জোর করে তাঁকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে অচেনা এক পুরুষের সঙ্গে। স্বপ্নের ভাষাকে বাস্তবের ভাষায় আনলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এরকম 'আমি কি করব! সবাই জোর করে ওই লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ে দিচ্ছে। আমার এতে কিছু করার নেই!' অচেতন মনে কোনও একজন পুরুষকে (যিনি বর্তমান স্বামী নন) জীবনসঙ্গী করবার ইচ্ছা এই স্বপ্নের প্রথম অংশে পূর্ণ হচ্ছে।

ওই পুরুষ স্বপ্নের দর্শকের কাছে অচেনা কেন? মনের পাহারাদারকে ফাঁকি দিতে চেনা মানুষকে স্বপ্নে আনতে হয়েছে অচেনার ছদ্মবেশে। স্বপ্নের অচেনা পুরুষ স্বপ্নদ্রষ্টার অচেনা কেউ নন। তিনি এমন একজন চেনা মানুষ অচেতন মনে যাকে বিয়ে করতে চান এই মহিলা। স্বপ্নের নিয়ম ভেঙে ওই মানুষটা হুবহু স্বপ্নে আসতে পারেননি। মনের সেন্সার কিছুতেই তা মেনে নেবে না বলে।

অচেতনে অন্য পুরুষকে বিয়ে করবার ইচ্ছা এই স্বপ্নের গভীর অর্থ। তবে কেন মহিলা কনের সাজে প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন? কেনই বা ইচ্ছাপূরণের এই স্বপ্নে এত কষ্ট পাচ্ছেন স্বপ্নের দর্শক? এই প্রশ্নের মীমাংসা সহজ। স্বপ্নের উদ্দেশ্য অচেতনের অনৈতিক একটা বাসনাকে তৃপ্ত করা। এতে অচেতন মন শান্ত হচ্ছে। অচেতনের এই শান্তি সচেতনে আসছে কষ্ট হয়ে, যন্ত্রণা হয়ে। কনের চারপাশের লোকজনের মধ্যে যৌবনের সুপুরুষ স্বামীর উপস্থিতি লক্ষ করুন। স্বপ্নের এই অংশকে ব্যাখ্যা করলে স্বপ্নের যন্ত্রণার ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

স্বপ্নের দর্শকের অতীতের কিছু অভিজ্ঞতা আর মানসিকতার গঠন এখানে বিশেষ গুরুত্বের। মহিলার কমবয়সের স্বামী ছিলেন দুরন্ত সুপুরুষ এক যুবক। যাঁকে জেনেবুঝে মনের মানুষ নির্বাচিত করেছিলেন মহিলা। এত বছর পর এঁদের ভালবাসার বন্ধন আরও পরিণত, গভীর। এই দম্পতির সম্পর্কের নিবিড়তা অনেকের কাছেই ঈর্ষণীয়। মহিলা শিক্ষিতা। এতটুকু খাদ নেই স্বামীর প্রতি ভালবাসায়। মানসিকভাবে তিনি সৎ, স্নেহময়ী, নরমপ্রকৃতির মানুষ। বিবাহবন্ধন এই নারীর চোখে পবিত্র, শাশ্বত এক বন্ধন। এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে পাঠক বুঝতে পারবেন অচেতনে অন্য পুরুষকে বিয়ে করবার ইচ্ছা সচেতনে মেনে নেওয়া এই স্বপ্নের দর্শকের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বপ্ন দেখতে দেখতে মহিলার কষ্ট হচ্ছে এই কারণে। অচেতনের ইচ্ছাপূরণ সচেতন মনে তৈরি করছে তীব্র যন্ত্রণা, গভীর বিষাদ। প্রচণ্ড কষ্টে জেগে উঠে তিনি তাঁর মনের মানুষেরই আছেন বুঝতে পেরে তাই চরম স্বস্তি পাচ্ছেন মহিলা।

এই স্বপ্নের গভীর অর্থ খুঁজে পেতে স্বপ্নের দর্শকের মানসিকতা আর অতীত, বর্তমানের নানা সূত্রকে কাজে লাগাতে হয়েছে। মানসিক গঠন অন্যরকম এমন মহিলার ক্ষেত্রে একই স্বপ্নের অর্থ হতে পারে একেবারে আলাদা। এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে স্বপ্নবিশ্লেষণে স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিকতা বিবেচনার গুরুত্ব পাঠক কিছুটা বুঝতে পারবেন।

দাম্পত্যের সম্পর্ককে 'অজর, অমর, অক্ষয়' বলে ভাবতে পারা আজকের পৃথিবীতে এক চরম ব্যতিক্রম। এই স্বপ্নের দর্শক সেই বিরল ভাবনার শরিক এক ব্যতিক্রমী মানবী। অন্য পুরুষকে বিয়ে করবার মতো অনৈতিক ইচ্ছা অচেতনে পুষে রাখবার মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে স্বপ্ন দেখতে দেখতে। এরকম ঘটনার কষ্ট ঘুমন্ত চেতনায় মহিলা অনুভব করেছেন দীর্ঘসময় ধরে, তীব্রতম আকারে। মনোবিদ প্রণব বসুর কথায়, 'এই স্বপ্ন যিনি দেখেছেন তাঁর দাম্পত্য আর যাই হোক কোনওদিন ছিন্ন হতে পারে

না।'

অন্যের সঙ্গে বিয়ে হবার স্বপ্নে স্বপ্নের দর্শক মজা পেলে বা আনন্দ পেলে এরকম স্বপ্নের অর্থ পুরোপুরি বদলে যেতে পারে। এরকম স্বপ্নের বিশ্লেষণে স্বপ্নদ্রষ্টার বিয়ে, বিয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, দাম্পত্য আর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক—এসব তথ্য ভালোভাবে বিচার করে দেখতে হবে। তা না হলে এরকম স্বপ্নের ব্যাখ্যায় ভুল হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

স্বপ্ন ১৫: একটা অচেনা জায়গা, ধানক্ষেত, মাটির রাস্তা—আমি হাফপ্যান্ট পরে হাঁটছি। হঠাৎ কয়েকটা অচেনা লোক হাতে ছুরি নিয়ে আমাকে তাড়া করল—প্রাণপণে ছুটছি—একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লাম—দোকানের লোকেরা বলছে, 'কি হয়েছে? কি ব্যাপার?' বলছি, 'আমাকে বাঁচান!' ওরা এসে গেছে দোকানের মধ্যে—একজনের হাতের ছুরিটা কেড়ে নিয়ে দেখি, অ্যালুমিনিয়ামের মেকি ছুরি!

স্বপ্নদ্রষ্টা একজন শল্যচিকিৎসক। কোনও এক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। অচেনা জায়গা, ধানক্ষেত আর মাটির রাস্তা স্বপ্নে এসেছে নানা সূত্র মিলেমিশে। স্বপ্নের দর্শকের ছেলেবেলা কেটেছে গ্রামে, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে। স্বপ্ন দেখার আগের দিন পরিচিত এক চিকিৎসকের মুখে ওড়িশার এক পর্যটনকেন্দ্রে বেড়িয়ে আসার গল্প শুনেছেন। ওড়িশার ঢেঙ্কানল জেলার ওই জায়গার পরিবেশের সঙ্গে স্বপ্নের পরিবেশের মিল অনেক। শৈশবস্মৃতি আর ওই পর্যটনকেন্দ্রের গল্প শুনতে শুনতে কল্পনার স্মৃতি—এই দুই সূত্র মিলে স্বপ্নকল্পনার রসে জারিত হয়ে তৈরি হয়েছে স্বপ্নের প্রাথমিক পরিবেশ।

কাজের চাপে অনেকদিন বাইরে বেড়াতে যেতে পারেননি স্বপ্নের দর্শক। আগেরদিন সহকর্মী চিকিৎসকের মুখে শুনেছেন বেড়াতে যাবার গল্প। অচেনা জায়গায় হাফপ্যান্ট পবে হেঁটে বেড়ানোব মধ্যে পাঠক সহজেই স্বপ্নের ভ্রমণের কাল্পনিক ইচ্ছাপূরণ খুঁজে পাবেন।

স্বপ্নের পরের অংশে অচেনা কিছু লোক ছুরি হাতে চিকিৎসককে তাড়া করছে। এই লোকগুলোর পরিচয় খুঁজে পাবার মধ্যে লুকিয়ে আছে স্বপ্নের গোপন অর্থ খুঁজে পাবার চাবি। স্বপ্নের দর্শকের আর্থসামাজিক অবস্থান আর পেশাগত জটিলতা খুঁটিয়ে দেখলে এই দুষ্কৃতীরা আব সাধারণ দুষ্কৃতি থাকে না। স্বপ্নদ্রষ্টা শল্যচিকিৎসক। একজন সার্জেনের কাছে 'ছুরি ধরা' আর 'অপারেশান করা' সমার্থক। পেশাগত অনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে তৈরি হওয়া ভয় থেকে স্বপ্নে এসেছে ছুরি হাতে কিছু লোকের স্বপ্নদ্রষ্টাকে তাড়া করার দৃশ্য। স্বপ্নে সেনসারকে ফাঁকি দিতে পরিচিত অন্য সার্জেনদের মুখগুলো বদলে গেছে অপরিচিত মুখে।

স্বপ্নের দর্শককে তাড়া করছেন তাঁরই সহকর্মী বা সতীর্থ সার্জেনরা। সবাই ছুরি হাতে, কারণ সবাই সার্জেন। স্বপ্নে শেষ অংশে ভয়কে অতিক্রম করে স্বপ্নদ্রষ্টা একজনের হাতের ছুরি কেড়ে নিচ্ছেন। ছুরিটাতে হাত দিয়ে ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হচ্ছেন। কারণ ছুরিটা 'আসল' নয় অ্যালুমিনিয়ামের 'মেকি' ছুরি। একজন সার্জেনের ছুরি হয় স্টিলের ধারালো ব্লেড লাগানো। অ্যালুমিনিয়ামের ছুরি স্টিলের ছুরির পাশে সত্যিই 'খেলনা' বা মেকি!

পেশাগত প্রতিদ্বন্দ্বীদের 'ছুরি জোর' (শল্যচিকিৎসার 'হাত' বা Surgical Skill) স্বপ্নের দর্শকের কাছে নগণ্য। প্রতিদ্বন্দ্বীরা হাজার চেষ্টা করলেও তাঁকে হারাতে পারবে না—অবচেতনের এরকম ভাবনা এই স্বপ্নে চলে এসেছে ইচ্ছাপূরণ হয়ে। 'ওদের 'হাত' এর চাইতে আমার 'হাত' অনেক সবল। ওদের হাত আমার হাতের কাছে হার মানবে'। মনের এরকম ইচ্ছা এই স্বপ্নে মিটছে কাল্পনিকভাবে।

পাঠক লক্ষ করবেন, আপাতভয়ের এই স্বপ্নের মূল ভাব একধরনের পরোক্ষ ইচ্ছাপূরণের আনন্দ। স্বপ্নের দর্শকের পেশা, স্বপ্নের প্রাসঙ্গিকতা আর আনুষঙ্গিক তথ্যের হেরফের কোনও একটা স্বপ্নের অর্থ কীভাবে বদলে যেতে পারে এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে তা বোঝা যায়। স্বপ্নের দেখা অংশ (Manifest content) আর মূল ভাব (Latent content) কত আলাদা হতে পারে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা থেকে পাঠক তা বুঝতে পারবেন।

স্বপ্ন ১৬: বেশ কয়েকবার দেখেছি এই স্বপ্নটা—একটা অপূর্ব সুন্দর দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি—রাস্তার দুপাশে মনকাড়া অচেনা গাছের সারি—একটু দুরে সোনালি পাহাড়—অদ্ভুত সুন্দর রাস্তাটা দিয়ে হাঁটছি—মনোরম বাতাসের ছোঁয়ায় মনেপ্রাণে অপূর্ব শান্তি—মনে তীব্র আনন্দ হতে থাকে এই স্বপ্নটা দেখলে—শান্তির; ভালোলাগার রেশটা থেকে যায় ঘুম ভেঙে যাবার পরও।

স্বপ্নদ্রষ্টা পঞ্চাশ অতিক্রান্ত একজন অধ্যাপক। ভদ্রলোক জানান, এই স্বপ্নটা দেখতে দেখতে তাঁব মনে হয় তিনি যেন স্বর্গে রয়েছেন। রাস্তাব দুপাশের মনকাড়া গাছগুলো হয়তো কল্পনাব 'পারিজাতবৃক্ষ'। সোনালি পাহাড়, সুন্দর রাস্তা আর মনোরম বাতাস স্বপ্নে তৈরি করছে 'স্বর্গীয় আবহ'। স্বর্গ বা নরক—দুটোই মানুষের কল্পনা। স্বর্গ আছে কিনা তা আমরা কেউই জানি না। শুধু মনেমনে কল্পনা করি যে স্বর্গ মানেই সুন্দর, পবিত্র এক দেশ। যেখানে সবকিছুই সুন্দর, নিষ্কলুষ। যে দেশে অপার শান্তি।

পঞ্চাশ পার করে দেওয়া এই অধ্যাপকের মনে মৃত্যুচিন্তা আসা স্বাভাবিক। এই স্বপ্নে তিনি মৃত্যুচিন্তাকে অতিক্রম করতে চাইছেন মৃত্যুর পরে স্বর্গের শান্তি অনুভব করতে করতে। সবকিছুই তিনি দেখতে পাচ্ছেন, অনুভব করতে পারছেন। অর্থাৎ, স্বর্গে গেলেও তিনি অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েননি। পুরোমাত্রায় 'জীবন'কে অনুভব করছেন। শান্তি পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন অপূর্ব আনন্দ।

শান্ত, নির্বিরোধী এই স্বপ্নের দর্শক আজকের আধুনিকোত্তর জীবনের হাজারটা জটিলতাকে একেবারেই মানিয়ে নিতে পারেন না। ভোগেন মানসিকতা-জনিত সঙ্কটে। পড়াশোনায় ডুবে থাকতে চাওয়া এই ব্যতিক্রমী শিক্ষক আজকের জটিল শিক্ষাব্যবস্থার হাজারটা জটিলতার সামনে বড় বিপন্ন, বড় অসহায় বোধ করেন। তীব্র মানসিক অশান্তিতে ভোগেন শিক্ষাদান ও গ্রহণ সংক্রান্ত দুর্নীতিগুলোকে চোখের সামনে দেখে। এই স্বপ্নের দর্শক এরকম তীব্র অশান্তি আর দুঃখযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান এই স্বপ্নে। স্বর্গের মনোরম, নিষ্কলুষ পরিবেশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তাই স্বপ্নদ্রষ্টার মনে তীব্র আনন্দ হতে থাকে। আনন্দের রেশ থেকে যায় ঘুম ভাঙার পরও।

এই স্বপ্নের মূল অর্থ, নিজের মৃত্যুভয়কে স্বপ্নের দর্শক 'পরলোক আর স্বর্গ'র 'বাস্তব অস্তিত্ব' দিয়ে অতিক্রম করতে চাইছেন। মৃত্যুর পরও 'আমি থাকব' 'বেঁচে থাকব অপার স্বর্গীয় শান্তিতে'—স্বপ্নের এরকম ইচ্ছা আসলে মৃত্যুকে হারিয়ে দেবার, জরাকে জয় করবার ইচ্ছা। চিরজীবী হবার ইচ্ছা। স্বর্গের পবিত্রতা আর মনোরম পরিবেশ মনে অপার শান্তি আর তীব্র আনন্দ পাবার বাস্তবে না-মেটা আশা মিটিয়ে দিচ্ছে স্বপ্নে। একে একধরনের ইচ্ছাপূরণ তো বলাই যায়।

স্বপ্ন ১৭: একটা রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটছেন 'ক'বাবু। পাশাপাশি একটা সাইকেলে যাচ্ছে অচেনা দু'জন। হঠাৎ দেখলাম সাইকেল আরোহী মানুষদুটো টাল সামলাতে না পেরে 'ক' বাবুর ওপর পড়ে গেল। 'ক' বাবু চাপা পড়ে আছেন সাইকেল আর দুই আরোহীর নীচে। দেখে আমার প্রচণ্ড হাসি পেল! হাসতে হাসতে ধাক্কা খেলাম গায়ে, শুনি স্ত্রী বলছেন, 'একি! তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এত জোরে হাসছ কেন?'

স্বপ্নের দর্শক একজন আইনজীবী। 'ক' বাবু এলাকার প্রভাবশালী একজন রাজনৈতিক নেতা। স্বপ্নদ্রষ্টা আমাকে জানান, নিজের প্রতিপত্তি দেখাবার জন্য 'ক' বাবু নানা ছলছুতোয় নানা পেশার মানুষকে জনসমক্ষে অপদস্থ করেন। বারদুয়েক 'ক' বাবুর কাছে হেনস্থা হতে হয়েছে স্বপ্নদ্রষ্টা আইনজীবীকেও।

স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা নেই। স্বপ্নবিশ্লেষণে দেখা যায়, স্বপ্নে ভদ্রলোক অনুভূতির একাত্মতা অনুভব করছেন সাইকেল-চালকের সঙ্গে। সাইকেল-চালক আসলে ছদ্মবেশী স্বপ্নদ্রষ্টা। এরপর আর বুঝতে বাকি থাকে না যে স্বপ্নের দর্শক সুযোগ বুঝে ইচ্ছা করেই পড়ে গেছেন 'ক' বাবুর ওপর। একা নন, সাইকেল আর সাইকেলের সামনের রডে বসা অচেনা আরোহীসুদ্ধ। 'ক' বাবু চাপা পড়েছেন সাইকেলের নীচে। তার ওপর স্বপ্নের দর্শক আর অন্য সাইকেলআরোহী। 'ক' বাবুর এরকম নিদারুণ অবস্থা দেখে স্বপ্নদ্রষ্টার

দুঃখ বা লজ্জিত হবার কথা। স্বপ্নে কিন্তু দুঃখের বদলে প্রচণ্ড আনন্দ হচ্ছে আইনজীবীর।

এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার মনের ভাব দেখে সহজেই বুঝতে পারবেন, প্রবল প্রতাপশালী 'ক' বাবুকে হেনস্থা করে আইনজীবী ভদ্রলোক চরম 'সুখ' পাচ্ছেন। বাস্তবে 'ক' বাবুর কাছে হেনস্থা হলেও তাঁর প্রবল ক্ষমতা আর প্রতাপের জন্য তাঁকে হেনস্থা করবার সাহস বা সুযোগ ভদদ্রলোকে নেই। এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার 'ক' বাবুকে হেনস্থা করবার, অপমান করবার ইচ্ছা মিটছে স্বপ্নে। ক্ষমতাশালী একজন মানুষের ওপর 'স্বপ্নের প্রতিশোধ' নিচ্ছেন এই স্বপ্নের দর্শক। পাঠক লক্ষ করবেন, এই স্বপ্ন বড় হয়ে যাওয়া একজন মানুষের সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন।

সেদিক থেকে এই স্বপ্ন কিছুটা ব্যতিক্রমী। কেননা এরকম স্বপ্ন বাচ্চারাই দেখে বেশি। স্বপ্নে 'হাস্যরসের আবির্ভাব' বিরল। এইদিক থেকেও এই স্বপ্ন ব্যতিক্রমী। স্বপ্নদ্রষ্টার আনন্দের তীব্রতা বোঝা যায় স্বপ্ন দেখতে দেখতে তাঁর হাসির তীব্রতা থেকে। অট্টহাসির আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্নদ্রষ্টার স্ত্রীর! 'ক' বাবুকে অপদস্থ হতে দেখে আইনজীবীর আনন্দের বহরটা একবার বুঝুন!

স্বপ্ন ১৮: রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি—অবাক হয়ে দেখছি রাস্তা দিয়ে একটা 'শবদেহ' নিয়ে যাচ্ছে—অথচ লোকটা মরেনি, শুয়ে শুয়েই ঘাড় তুলে রাস্তার লোকজন দেখছে—আমি শববাহকদের সামনের একজনকে বললাম, এ কি করছেন! একটা জ্যান্ত লোককে পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন?—লোকটা মজার গলায় বলে উঠল, 'ও শ্মশানে যেতে যেতেই মরে যাবে।'—অবাক হয়ে দেখছি, শবযাত্রীরা হাসিতামাশা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে—সকালে উঠে খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিছু ভালো লাগছিল না।

ছাব্বিশের এক বেকার যুবকের স্বপ্ন। স্বপ্নদ্রষ্টার বাবা মারা যাবার কিছুদিন বাদে তাঁর ঘুমন্ত চেতনায় এই স্বপ্ন এসেছে। বাবা রোগভোগে শয্যাশায়ী ছিলেন অনেকদিন। বিস্তর পয়সা খরচা হচ্ছিল ওষুধপত্র আর পথ্যের পিছনে অথচ, 'ডাক্তাররা বলেই দিয়েছিলেন এই রোগী বাঁচবে না।'

অনটনের সংসারে এরকম একটা অবস্থায় বাবার মৃত্যু হলে উনিও বাঁচেন, সংসারটাও ভেসে যায় না—এরকম একটা চিন্তা যুবকের মনে আসা অসম্ভব নয়। গোপনীয়তার শর্তে যুবক আমাকে জানান, শেষদিকে তাঁর এরকমই মনে হত। স্বপ্ন দেখার পরদিন ঘুম ভেঙে যুবকের মনে দেখা দিয়েছে তীব্র কষ্ট। এই অনুভূতি থেকে আর বুঝতে বাকি থাকে না যে বাবার মৃত্যুর আগেকার ওই ভাবনার জন্য তীব্র পাপবোধ (Guilt) যুবকের এই স্বপ্নে চলে এসেছে। তা না হলে আপাতমজার এই স্বপ্ন দেখার পর যুবকের মনে কষ্টযন্ত্রণা হত না, তিনি অনুভূতিহীন থাকতেন।

এই প্রেক্ষিতে শবযাত্রার দৃশ্যটাকে বিচার করা যাক। 'জ্যান্ত মড়া' আসলে স্বপ্নদ্রষ্টার বাবা। না মরলেও তাঁকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্মশানের দিকে। অর্থাৎ জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে। বাবার শবযাত্রায় সামনে থাকেন ছেলে। এই স্বপ্নে রাস্তায় দাঁড়ানো স্বপ্নের দর্শকের মন দু'ভাগ হয়ে একভাগ চলে গেছে শববাহকদের সামনের মানুষটার মধ্যে। ওই মানুষটা আর স্বপ্নের দর্শক একই মানুষ। প্রথমজন অবাক হয়ে জ্যান্ত মানুষের শবযাত্রা দেখছেন। দ্বিতীয়জন মজার গলায় জানাচ্ছেন, 'ও শ্মশানে নিয়ে যেতে যেতে মারা যাবে।' বাবার মৃত্যুর আগে স্বপ্নের দর্শকের মনের ভাব তো এরকমই ছিল।

'বাবা এত তাড়াতাড়ি মরতেন না। আমি চেয়েছি বলেই জীবিত বাবা এত তাড়াতাড়ি মারা গেলেন।' স্বপ্নের দর্শকের মনের এরকম ভাবনার চলচ্চিত্রায়ন ঘটেছে স্বপ্নে। যুবক এই স্বপ্নে দেখেন, বাবার মৃত্যুর পর, বাবার চাকরিটা পাবার কাগজপত্রে সই করবার দিন রাতে। 'এই চাকরি পাবার জন্যই আমি বাবাকে মেরে ফেললাম ওঁর মৃত্যু চেয়ে।' মনের এরকম ভাবনা চলে এসেছে স্বপ্নে। সামনের সারির শবযাত্রী বা শববাহকরা সবাই মজা করতে করতে 'জ্যান্ত মড়া' নিয়ে যাচ্ছে। দুঃখের বদলে এই মজার ভাব দেখে পাঠক বুঝতে পারবেন স্বপ্নদ্রষ্টার মনের ভাব। 'বাবার মৃত্যু হবেই। এতে দুঃখের কিছু নেই। বরং বাবা মরে গেলেই সব যন্ত্রণার মুক্তি। মুক্তি সাংসারিক অনটনের। মুক্তি আমার বেকার জীবনের।'

'বাবার মৃত্যু হয়েছে আমি চেয়েছিলাম বলেই।' স্বপ্নদ্রষ্টার সচেতন মনের এরকম ধারণা থেকে তৈরি এই স্বপ্ন দেখে স্বপ্নদ্রষ্টা আসলে নিজেই নিজেকে শাস্তি দিচ্ছেন। আর এরকম 'শাস্তি পাবার স্বপ্ন' দেখে পরদিন সকালে এই স্বপ্নের প্রভাবে স্বপ্নদ্রষ্টা শাস্তি পাচ্ছেন পুরোমাত্রায়। পাচ্ছেন তীব্র মানসিক যন্ত্রণা।

ব্যতিক্রমী এই স্বপ্নে কোনও অচেতনের ভাব নেই। সচেতনের, সজ্ঞানের ভাবের জন্য এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে নিজেকে শাস্তি দিয়ে 'পাপবোধ' থেকে মুক্ত হতে চাইছেন। এই স্বপ্ন হল 'ড্রিম অব সেলফ্ পানিশমেন্ট'।

এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে পাঠক স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার ও অন্য চরিত্রদের মনের ভাব বা অনুভূতির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। যে কোনও মৃত্যুঘটিত স্বপ্নে, স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার পর স্বপ্নের দর্শকের অনুভূতি স্বপ্নের গোপন অর্থ বুঝতে কতটা সাহায্য করে, এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে তাও পরিষ্কার হয়।

স্বপ্ন ১৯: একটা নার্সারিতে গিয়েছি—জায়গাটা যেন শান্তিনিকেতন—অর্কিড আর ক্যাকটাস রাখার চাদর ঢাকা ঘরে গেলাম—দেখি বড় বড় পাত্রে অদ্ভুত অদ্ভুত মোরব্বা—শশার মোরব্বা, তরমুজের মোরব্বা, মাংসের মেটের মোরব্বা—অবাক লাগছে। একটা পাত্র থেকে শশার মোরব্বা তুলে মুখে দিলাম—তারপর খেলাম মেটের মোরব্বা, দুটোই খেতে দারুণ—একটু এগোতেই দেখি একটা পাহাড়ি রাস্তা—অনেকে মিলে ফিয়েটে করে যাচ্ছি—সামনে পাহাড়টা নিচু—আমি আর আমার স্বামী নেমে হাঁটছি—একটা পাথরের খাঁজ থেকে একটা বিরল অর্কিড তুলে নিলাম—হাতে নিতেই ওটা একটা রোমশ জীব হয়ে গেল—কাঠবেড়ালি আর পাণ্ডার মাঝামাঝি—পেছন থেকে এক ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওটা তুলে নিলেন? এই পরিবেশ ছাড়া ওটা বাঁচবে না, মরে যাবে।' স্বামী বললেন, 'তাহলে এখানেই নামিয়ে দাও, বড় হবে'—পাণ্ডা ধরনের জীবটাকে পাথরের একটা ফাটলে গাছের মতো করে পুঁতে দিলাম—আমি নিশ্চিত, ওটা লেগে যাবে।

আমার সংগ্রহে থাকা সবচাইতে বিচিত্র আর উদ্ভট এই স্বপ্নের কথা আমাকে জানান উদ্ভিদবিদ্যার এক অধ্যাপিকা। বারবার এই স্বপ্নের বিবরণ লিখিতভাবে নিয়ে আর ওঁর মুখে শুনে, এই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জটিল এক সমস্যায় পড়তে হয় এই লেখককে। বহু চেষ্টাতেও জটিল এই স্বপ্নের অর্থ বার করতে না পেরে একদিন হঠাৎ করেই স্বপ্নের গভীর অর্থ এসে যায় আমার মনে। অধ্যাপিকাও স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা মেনে নেন।

আপাতজটিল এরকম একটা স্বপ্নের অর্থ অচেতন মনের জটিল কোনও ইচ্ছা বা কামনার তৃপ্তি—এরকম মনে হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অধ্যাপিকার নানা অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি চলে এসেছে এই স্বপ্নে।

১. **নার্সারি**—নানাধরনের গাছপালায় আর বিরল উদ্ভিদে উৎসাহী স্বপ্নের দর্শক সারা দেশের বহু নার্সারিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন গত দুই দশকে। স্বপ্নের নার্সারি তৈরি হয়েছে এরকম বহু নার্সারির ছবি মিলেমিশে। মহিলা জানিয়েছেন, স্বপ্নের নার্সারি তাঁর চেনা কোনও নার্সারি নয়।

২. **শান্তিনিকেতন**—দশবছর আর আঠাশ বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে বারবার বেড়াতে যাবার স্মৃতি।

৩. **মোরব্বা**—বছর তিনেক আগে সিউড়িতে বাড়ি এমন এক ছাত্রীর বাড়ি থেকে আনা নানাধরনের মোরব্বা খাবার স্মৃতি। পাঠক লক্ষ করবেন, সিউড়ি আর শান্তিনিকেতনের দূরত্ব বেশি নয়।

৪. **পাহাড়ি রাস্তা**—দুবছর আগে বেড়িয়ে আসা পেলিং-পেমিয়াংসি-জোরথাংয়ের পাহাড়ি পথের স্মৃতি।

৫. **ফিয়েটে করে যাওয়া**— পাঁচবছর আগে একটা ফিয়েট গাড়ি ভাড়া করে হিমাচল প্রদেশের মানালির রাস্তায় বেড়াবার স্মৃতি।

৬. **অর্কিড তোলা**—নানাবয়সে পাহাড়ি ও সমতলের নানা জঙ্গল থেকে বিরল প্রজাতির নানা অর্কিড সংগ্রহের স্মৃতি।

স্বপ্নের দর্শক নার্সারিতে, অর্কিড ঘরে অদ্ভুত নানাধরনের মোরব্বার দেখা পাচ্ছেন। খাচ্ছেন শশার (উদ্ভিদ) আর মাংসের মেটের (প্রাণী) মোরব্বা। পাহাড়ি পথে তোলা অর্কিড (উদ্ভিদ) তোলামাত্র ওঁর হাতে বদলে যাচ্ছে পাণ্ডা ধরনের প্রাণীতে। শশার মোরব্বা বা মেটের মোরব্বা অবাস্তব অথবা দুর্লভ। এই দুই ধরনের মোরব্বা খেতে খুব ভাল লাগছে মহিলার। বাস্তবে দুর্লভ অর্কিড সংগ্রহের শখ রয়েছে উদ্ভিদ-অন্ত-প্রাণ এই অধ্যাপিকার। পাহাড়ি রাস্তায় ওঁর তোলা অর্কিড বদলে যাচ্ছে পাণ্ডা ধরনের বিরল প্রাণীতে। এসব সূত্র থেকে মনে হয়, এই স্বপ্নের গভীর অর্থ প্রাণী আর উদ্ভিদের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ে।

অধ্যাপিকা জানান, আদিম পৃথিবীর প্রাণের সৃষ্টিরহস্য তাঁকে খুব ভাবায়। 'অ্যালগি' ধরনের এককোষী প্রাণী থেকে 'অ্যামিবা' ধরনের প্রাণীতে রূপান্তরের রহস্য, উদ্ভিদ আর প্রাণীজগতের বিবর্তনের নানা পর্যায়, তাঁর পড়াশোনা আর ভাবনার অন্যতম বিষয়। কম বয়েস থেকে উদ্ভিদ আর প্রাণী—জীবনের এই দুই রূপ নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বিস্তর। ভেবেছেন আরও বেশি। অধ্যাপিকার চিরন্তন উৎসাহ উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে প্রাণের বিবর্তনের রহস্যকে ঘিরে। প্রাণপ্রবাহের এই বিস্ময়কে ঘিরে।

মহিলা অনেক পাহাড়ে, অরণ্যে ঘুরে সংগ্রহ করা অর্কিডকে বাড়িতে এনে বাঁচাতে পারেননি। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্বামী কয়েকবার বলেছেন, 'না তুললেই পারতে, ওখানে থাকলে বেঁচে যেত!' বাস্তবের এই সূত্র চলে এসেছে স্বপ্নে। স্বপ্নে এক মহিলা যে ওঁকে বলছেন, 'এই পরিবেশ ছাড়া ওটা বাঁচবে না।'—এটা আসছে মনের এই ভাবনা বা স্মৃতি থেকে।

স্বপ্নে পাথরের খাঁজ থেকে তোলা বিরল প্রজাতির অর্কিড মহিলার হাতে বদলে যাচ্ছে বিরল পাণ্ডা ধরনের প্রাণীতে। আগে বলা তথ্যগুলোর প্রেক্ষিতে স্বপ্নের এই ছবিটাকে বিচার করা যাক। এর অর্থ, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে প্রাণের রূপান্তরের রহস্য স্বপ্নের দর্শকের হাতের মুঠোয়। এরপর তিনি পাণ্ডা ধরনের প্রাণীকে পুঁতে দিচ্ছেন পাহাড়ের ফাটলে। এভাবে পুঁতে দিলে বড় হয় উদ্ভিদ, প্রাণী নয়। স্বপ্নের এই অংশের অর্থ, প্রাণীকে উদ্ভিদে পরিণত করবার রহস্যও জানতে পেরে গেছেন স্বপ্নের দর্শক।

বারবার জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছি, ছাত্রজীবনে প্রাণী থেকে উদ্ভিদ আর উদ্ভিদ থেকে প্রাণী তৈরি করবার যুগান্তকারী আলোড়নতোলা কোনও সূত্র তিনি একদিন খুঁজে পাবেনই—এরকম অদ্ভুত বিশ্বাস বা কল্পনা ওঁর মনে ছিল। এখনও তিনি বিশ্বাস করেন, এই রহস্যের সন্ধান তিনি একদিন হঠাৎ করেই পেয়ে যাবেন। সচেতনের এই ইচ্ছা স্বপ্নকল্পনার রসে জারিত হয়ে, নানাবয়সের নানা স্মৃতির ছবিতে সমৃদ্ধ হয়ে এই স্বপ্নে চলে এসেছে।

মহিলা জানান, স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙে অপূর্ব এক ভালোলাগায় ভরে গিয়েছিল ওঁর মন। 'আমি জীবজগৎ আর প্রাণীজগতের মাঝের যোগাযোগ (Link)টাকে আবিষ্কার করে ফেলেছি।' গবেষণাপ্রবণ অনুসন্ধিৎসু মনের এরকম সচেতন ইচ্ছা স্বপ্নে পূর্ণ হওয়ায়, বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত যোগাযোগ খুঁজে পাওয়ায়, এই আনন্দ আর ভালোলাগা আসছে স্বপ্নের দর্শকের মনে।

মহিলা জানিয়েছেন, এই স্বপ্ন দেখবার পর তাঁর খুব মনে হয়, খুব তাড়াতাড়ি একটা বড় ধরনের 'সাফল্য' আসবে তাঁর জীবনে। স্বপ্নের গভীর অর্থ খুঁজে পেতে এই অনুভূতি আর স্বপ্ন দেখার পর আনন্দের অনুভূতি—এগুলো বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

নানা দিক থেকে এই স্বপ্ন ব্যতিক্রমী। আপাতজটিল এই স্বপ্নের অর্থ সহজ সরল। অচেতনের নয়, সচেতনের বহুবছর ধরে লালিত এক ইচ্ছা স্বপ্নে পূর্ণ হচ্ছে। স্বপ্নে এই ইচ্ছা আসতে পারত অধ্যাপিকার আবিষ্কারের ছবি হয়ে, সরাসরি। তার বদলে আপাতজটিল এই স্বপ্নে চলে এসেছে সচেতনের সরল এক

ইচ্ছা। কারণ? কারণ স্বপ্নের দেশ চলে সেই দেশের আজব নিয়মকানুন মেনে। বাস্তবের হিসেব মেনে নয়।

স্বপ্ন ২০: বাজার থেকে অনেকগুলো বড় সাইজের পেয়ারা কিনে বাড়িতে ফিরছি—পাড়ায় ঢুকেছি—ক্লাবের বেঞ্চে বসে ছিল কমলদা—উঠে এসে একটা বড় পেয়ারা তুলে নিল হাতে—খুব রাগ হল আমার—বললাম, 'বা! কমলদা! পয়সা দিয়ে কেনা পেয়ারাটা নিয়ে নিলে?'—কমলদা হাসতে হাসতে পেয়ারায় একটা কামড় বসাল—দেখলাম মুখ থেকে ও আর পেয়ারাটা বার করতে পারছ না—টানাটানি করতে করতে তিনটে দাঁতসুদ্ধ ওর হাতে চলে এল পেয়ারা—- কমলদার এই দুরবস্থা দেখে প্রচণ্ড হাসি পেল আমার—হাসতে হাসতে ঘুম ভেঙে গেল।

সাতাশ বছরের এক যুবক এই স্বপ্নের কথা আমাকে জানান। অন্তিম অংশে তৈরি হওয়া হাস্যরস মজার এই স্বপ্নকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে। পাঠক আরও অবাক হবেন এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ শুনলে।

জোর করে 'পয়সা দিয়ে কেনা পেয়ারা' স্বপ্নদ্রষ্টার হাত থেকে তুলে নিচ্ছেন কমলদা। আর ওই পেয়ারা খেতে গিয়ে চূড়ান্ত হেনস্থা হচ্ছেন। স্বপ্নের এই বক্তব্যকে ধরে এগোনো যাক। বাস্তবে কমলদার সঙ্গে স্বপ্নের দর্শকের সম্পর্ক 'বেশ ভালো'। অপদস্থ হওয়া আসল মানুষটা রয়েছেন কমলদার ছদ্মবেশে। স্বপ্নদ্রষ্টার সঙ্গে কথা বলে খুঁজে পাই কমলদার ছদ্মবেশে থাকা অমলকে। পাঠক খেয়াল করবেন স্বপ্নের প্রতিস্থাপন (Dispacement) অনেকসময় ধ্বনিসাজুয্য বা নামের মিল খুঁজে নেয়। ৫ নম্বর স্বপ্নে শাবানার ছদ্মবেশে লুকিয়ে ছিল সাহানা।

অমল স্বপ্নদ্রষ্টার এক ধনী ব্যবসায়ী বন্ধু। পয়সাওয়ালা পেট্রলপাম্পের মালিকের একমাত্র ছেলে। অমল কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে করতে চলেছেন এলাকার এক অতীব সুন্দরী যুবতীকে। এই মেয়েটিকে ভালবাসেন স্বপ্নের দর্শক। কিন্তু পয়সার জোর না থাকায় হার মানতে বাধ্য হয়েছেন অমলের কাছে। এই নিয়ে সুযোগ পেলেই অমল নানাভাবে বন্ধুদের কাছে 'উপহাসের পাত্র' করে তোলেন স্বপ্নের দর্শককে। স্বপ্নে কমলদা নয়, আসলে অমল ওঁর পেয়ারা (প্রেমিকা) জোর করে তুলে নিচ্ছেন। আর পেয়ারা খেতে গিয়ে (সামলাতে গিয়ে) চূড়ান্ত হেনস্থা হচ্ছেন। স্বপ্নের দর্শকের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর এ হল 'স্বপ্নের প্রতিশোধ'।

ওই যুবতীকে 'বিয়ে করলেও সামলাতে পারবে না পয়সাওয়ালা অমল।' স্বপ্নদ্রষ্টার মনের এই ভাব স্বপ্নের গভীর অর্থ। পাঠক খেয়াল করবেন, পেয়ারা খেতে গিয়ে তিনটে দাঁত পড়ে যাচ্ছে কমলদার ছদ্মবেশে থাকা অমলের। দাঁত পড়ে বুড়ো হলে। আর বুড়ো হলে মানুষ যৌবন হারায়। এক্ষেত্রে দাঁত পড়া স্বপ্নে চলে এসেছে পৌরুষত্ব, যৌবন হারানো বা যৌনঅক্ষমতার (Castration বা Impotency) প্রতীক হয়ে। 'আর যাই হোক ঐ সুন্দরীকে সুখী করতে পারবে না অমল'—স্বপ্নদ্রষ্টার সচেতনের এরকম ধারণা থেকে স্বপ্নে চলে এসেছে পেয়ারা খেতে গিয়ে দাঁত উঠে আসার মজার দৃশ্য।

প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুর 'অক্ষম' হয়ে পড়া তাঁর চূড়ান্ত হেনস্থা। প্রতিদ্বন্দ্বীর এরকম হেনস্থায় স্বপ্নের দর্শকের মনে মজা তো হবেই! স্বপ্নে তাই হাসতে হাসতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে ওঁর।

এই স্বপ্নের প্রতিটি পর্যায় বিশ্লেষণ করেছি স্বপ্নের দর্শকের সঙ্গে কথা বলে, তাঁর দেওয়া তথ্য ধরে এগোতে এগোতে। স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নিয়েছেন স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বপ্নদ্রষ্টার দেওয়া আনুষঙ্গিক তথ্য অন্যরকম হলে এই স্বপ্নের অর্থও আমূল বদলে যেতে পারত। আমি পাঠককে এই ব্যাপারে বিশেষ সাবধান হতে অনুরোধ করব।

স্বপ্ন ২১: কেবিনের কার্নিসে একটা অজগর আর একটা কেউটে সাপ—তুমুল লড়াই হচ্ছে—হঠাৎ কেউটেটা অজগরটাকে একটা ছোবল মারতেই অজগরটা নেতিয়ে পড়ল।—আমি লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে গোটা দৃশ্যটা দেখছি।

পূর্ব রেলওয়ের এক কর্মীর স্বপ্ন। কর্মসূত্রে একটা রেলের কেবিনে প্রায়ই যেতে হয় ওঁকে। কেবিনে প্রায়ই সাপ ঢুকছে—বাস্তবের এই সূত্রকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে আপাতউদ্ভট এই স্বপ্ন।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, কেউটে সাপের ছদ্মবেশে রয়েছেন স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে। তাঁর মন দ্বিখণ্ডিত হয়েছে এই স্বপ্নে। একভাগ রয়েছে লাইনে দাঁড়িয়ে সাপের লড়াই দেখতে থাকা স্বপ্নদ্রষ্টার মধ্যে। আর একভাগ কেউটে সাপের ভেতর। অজগর সাপটা আসলে স্বপ্নের দর্শকের প্রবল প্রতাপশালী, পয়সাওয়ালা এক বন্ধু। বাস্তবে বন্ধুকে খুব ভালবাসেন স্বপ্নের দর্শক।

'নিজের যোগ্যতার নিরিখে আমি অসফল। এর চাইতে অনেক ভালো চাকরি পাবার কথা আমার। আরও ক্ষমতাবান, আরও অর্থবান, বিত্তশালী হতে পারতাম আমি।' সচেতন এরকম ধারণা থেকে তৈরি এক হীনম্মন্যতায় ভুগে মাঝেমধ্যে কষ্ট পান স্বপ্নদ্রষ্টা যুবক। অজগরের ছদ্মবেশে থাকা স্বপ্নদ্রষ্টার বিত্তবান বন্ধু পড়াশোনায়, বুদ্ধিতে তাঁর চাইতে অনেক কম যোগ্য।

বাস্তবের প্রিয় বন্ধু অজগরের সঙ্গে তাই স্বপ্নে লড়াই হচ্ছে স্বপ্নের দর্শক কেউটের। বন্ধুর অর্থ, বিত্ত, প্রতাপ প্রবল। তাই স্বপ্নে তিনি এসেছেন বিশাল অজগর হয়ে। অর্থে, প্রতাপে দুর্বল সাধারণ রেলকর্মী এসেছেন অজগরের তুলনায় অনেক ছোট কেউটে হয়ে। প্রবল লড়াই হচ্ছে। কারণ, লড়াইটা 'অযোগ্য, বিত্তবানে'র সঙ্গে 'যোগ্য, বিত্তহীনের'! শেষপর্যন্ত আচমকা ছোবলে 'যোগ্য, বিত্তহীন' হারিয়ে দিচ্ছেন 'অযোগ্য, বিত্তবান'কে। স্বপ্নের দর্শকের অচেতন মনে বন্ধুর প্রতি শত্রুতার ভাব তৃপ্ত হচ্ছে শত্রুকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করে।

এরকম স্বপ্ন বিশ্লেষণে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়। স্বপ্নের আনুষঙ্গিক তথ্য আর প্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে ভুল হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। পাঠক খেয়াল করবেন, সচেতনে যার প্রতি ভালবাসা, অচেতন মনে তাঁর প্রতি শত্রুতার ভাব, এমনকি মৃত্যুকামনাও অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে বিশদে আলোচনা করেছি 'প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন' অধ্যায়ে।

স্বপ্ন ২২: ইডেনে বিশ্বকাপের একটা খেলা দেখছি—গ্যালারিতে বসে আছি—বাউন্ডারি লাইনের ধারে ফিল্ডিং করছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের রিচার্ডসন—একবার দর্শকদের দিকে তাকালেন—আমি গ্যালারি থেকে একটা ইটের টুকরো ছুড়ে মারলাম রিচার্ডসনের কপাল লক্ষ্য করে—কপাল ফেটে রক্ত বার হচ্ছে—হাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন রিচার্ডসন—আস্তে আস্তে বসে পড়ছেন মাঠে।

স্বপ্নের দর্শক পঞ্চাশ অতিক্রান্ত একজন চাকরিজীবী। বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় এসে যৌথ পরিবারের হাল ধরতে হয়েছিল তাঁকে। চাকরি করছেন অনেকদিন। ভাইবোনদের মানুষ করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন। করেছেন বাড়িঘর। আজও বৃদ্ধা মায়ের পুরো দায়িত্ব ভদ্রলোকের কাঁধে। এত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আর বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি মানুষটার। সময় হয়নি নিজের কথা ভাবার। নিজের জন্য কিছু করার।

কম বয়েস থেকে ক্রিকেট স্বপ্নের দর্শকের প্রিয় খেলা। প্রিয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারদের জীবনকাহিনী। ক্রিকেটপাগল এই মানুষটার প্রিয়তম ক্রিকেটারদের একজন হলেন রিচার্ডসন। অতি সাধারণ পরিবার থেকে অনেক লড়াই করে ক্রিকেট খেলে খ্যাতি আর প্রতিপত্তির শীর্ষে উঠেছেন ক্রিকেটার রিচার্ডসন। পাশাপাশি, সাধারণ পরিবারের বড় ছেলে এই স্বপ্নের দর্শক কমবয়েস থেকে চরম লড়াই করেও আজও 'অতি সাধারণ', নিঃসঙ্গ। নিজের কাছে নিজে তিনি 'জীবনসংগ্রামের চাপে নুয়ে পড়া, হেরে যাওয়া একজন অসফল মানুষ'।

এরকম একজন 'অসফল' মানুষ অবচেতনে চূড়ান্ত 'সফল' রিচার্ডসনকে মেনে নিতে পারছেন না। 'আমি পারিনি, ও কেন পারবে?' মনের এরকম ভাব থেকে স্বপ্নদ্রষ্টার মনে তৈরি হওয়া রিচার্ডসনের প্রতি ঈর্ষা বদলে যাচ্ছে শত্রুতায়। 'শত্রু' সফল ক্রিকেটারকে আহত, রক্তাক্ত করে মিটছে অচেতন মনের ক্ষোভ। চূড়ান্ত সফল এক ক্রিকেটারকে আঘাত হেনে শান্ত হচ্ছে ক্রিকেটপাগল নিজের কাছে 'চরম অসফল' এক ক্রিকেট-অনুরাগীর অচেতন মনের অশান্তি, ঈর্ষা।

স্বপ্ন ২৩: একটা বাসে করে কোথাও একটা যাচ্ছি— ড্রাইভারের সিটে বসে বাস চালাচ্ছে বাঘ— আমার আশেপাশে অন্য সিটগুলোতে সিংহ, হরিণ, শেয়াল, ক্যাঙারু ও আরও অনেক বন্য জন্তু—হঠাৎ আমি বললাম, 'আমি আর যাব না। আমি নেমে যাব!'—আশেপাশের বন্যজন্তুরা জান্তব হাসি হাসতে শুরু করল—এই সময় আমার খুব ভয় করছিল।

বিচিত্র, আপাতউদ্ভট এই স্বপ্নকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। এখানে এই স্বপ্নের তিনরকম ব্যাখ্যার কথা বলব.

প্রথম ব্যাখ্যা: স্বপ্নের 'বাসযাত্রা' আসলে জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে যাত্রা। স্বপ্নে যে কোনও 'যাত্রা' (Journey) আসতে পারে মৃত্যুযাত্রার রূপক হয়ে। স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যুইচ্ছা থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। আশেপাশের বন্যজন্তুরা ছদ্মবেশে থাকা তাঁরই পরিচিত মানুষজন, বন্ধুবান্ধব। অচেতনের মৃত্যুইচ্ছা পূর্ণ হতে চাইছে স্বপ্নে। যেতে যেতে হঠাৎ করে বাস থেকে নেমে পড়তে চাইছেন স্বপ্নের দর্শক। কারণ হঠাৎ করে মৃত্যুকে ভয় পেতে শুরু করছেন তিনি। যেমন সব মানুষই পায়। আশেপাশের বন্যজন্তুরা জান্তব হাসি হাসছে। ওরা গাড়ি থামাবে না বলে। 'মৃত্যুর হাত থেকে আর রেহাই নেই'—এটা বুঝতে পেরে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন বাসের আরোহী স্বপ্নের দর্শক।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা: বাসের ড্রাইভার 'বাঘ' স্বপ্নদ্রষ্টার বাবা। বাসটা 'সংসার'। সংসারের হাল ধরে থাকেন বাবা। বাসের স্টিয়ারিং ধরে আছে বাঘ। কোনও কারণে ছেলেবেলায় বাবাচালিত সংসারের পরিবেশকে মেনে নিতে পারেননি স্বপ্নের দর্শক। 'বাড়ি থেকে পালানোর ইচ্ছা' জাগত মনে। বর্তমানেও কোনও কারণে চারপাশের পরিবেশকে মেনে নিতে পারছেন না স্বপ্নদ্রষ্টা। রেহাই চাইছেন পারিপার্শ্বিকতা থেকে। আমরা অনেকেই অনেকসময় সচেতনে চারপাশের পরিবেশকে অসহ্য মনে করি। তা থেকে মুক্তি পেতে চাই। মনোবিদ প্রণব বসুর কথায়, At times somehow we want to get rid of our environment'. শৈশবে বাড়ি থেকে পালাবার ইচ্ছার স্মৃতি চলে এসেছে স্বপ্নে। স্বপ্নদ্রষ্টা পালাতে চাইছেন তাঁর বর্তমান পরিবেশ থেকে।

তৃতীয় ব্যাখ্যা: ভদ্রলোক আসলে নিঃসঙ্গ। যাঁদের তিনি বন্ধু মনে করেন, তাঁরা কারণে অকারণে অপদস্থ করেন ভদ্রলোককে। তাঁর ভালোলাগা, শখ, দৃষ্টিভঙ্গি—কোনও কিছুর সঙ্গেই তাঁর এখনকার সঙ্গীদের পছন্দের মিল নেই। তবু পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হয়ে যাবার ভয়ে এঁদের ছাড়তে পারেন না। স্বপ্নে চলে এসেছে সচেতন মনের বর্তমান সঙ্গীদের সঙ্গ থেকে রেহাই পাবার ইচ্ছা। তিনি নামতে চাইলেও ওঁরা জান্তব গলায় হাসছে। এঁদের হাত থেকে রেহাই পাবার কোনও উপায় নেই। এটা বুঝতে পেরে স্বপ্নের দর্শক ভয় পাচ্ছেন।

আমার পবিচিত চল্লিশ বছরের এক চিকিৎসকের দেখা এই স্বপ্নকে ইচ্ছে করেই তিনভাবে বিশ্লেষণ করলাম। যাতে 'স্বপ্নের বই'-এর অন্তিম পর্বে এসে স্বপ্নতত্ত্বের প্রাথমিক পাঠ সম্পূর্ণ করা পাঠক একটা স্বপ্নকে নানাভাবে ভাবতে পারেন। প্রথম আর তৃতীয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে স্বপ্নদ্রষ্টার সাহায্য না নিয়ে, তাঁর সম্পর্কে আমার জানা তথ্যগুলোর ভিত্তিতে। এই দুটো ব্যাখ্যার কোনওটাকেই মেনে নিতে পারেননি এই চিকিৎসক। স্বপ্নের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে স্বপ্নের দর্শকের কাছ থেকে পাওয়া নানা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। তাঁর দেখা বিচিত্র এই স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন স্বপ্নদ্রষ্টা চিকিৎসক। প্রসঙ্গত বলি, এই চিকিৎসক জঙ্গলপ্রিয়। জঙ্গলে বেড়ানো ওঁর নেশা। প্রিয় ভালোলাগা বন আর বন্যপ্রাণী।

নিজের দেখা স্বপ্নের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা স্বপ্নের দর্শক মেনে নিতে না পারলে ওই ব্যাখ্যা সঠিক হতে পারে না। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সঠিক হলে স্বপ্নদ্রষ্টা তা অবশ্যই মেনে নেবেন। বিচিত্র এই স্বপ্নের তিন ধরনের ব্যাখ্যা থেকে, আশা করি, স্বপ্নোৎসাহী পাঠক এই ব্যাপারটা সহজেই অনুভব করতে পারবেন।

স্বপ্ন ২৪ : একটা বাড়ির ছাদ, বিশাল লম্বা—ছাদটা ধরে আমি এগোচ্ছি—ছাদটা শেষ হতেই শুরু হল উত্তাল সমুদ্র—ছাদের শেষপ্রান্তে কয়েকজন লালকাপড় পরা সাধু বসে আছেন—ওঁরা হাত নেড়ে আমাকে বলছেন, সমুদ্রে না যেতে—আমি ফিরে আসছি।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের একজন শিক্ষকের স্বপ্ন। ভদ্রলোক রসায়নের কৃতী ছাত্র। মনে করেন, 'নিজের পেশার চাইতে আমি অনেক বেশি যোগ্যতর'। ইংল্যান্ডের কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে গবেষণা ও অধ্যাপনার একটি সুযোগ ওঁর সামনে রয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও আধ্যাত্মিকতার তীব্র তাড়না রয়েছে ভদ্রলোকের মনে। সময় পেলেই পীর বা সাধুদের সঙ্গে আলোচনা করেন আধ্যাত্মিকতা, জীবন ও জগৎকে নিয়ে। প্রচুর পড়াশোনা করেছেন আধ্যাত্মিকতা নিয়ে।

সমতল ছাদ থেকে স্বপ্নদ্রষ্টা এগিয়ে চলেছেন উত্তাল সমুদ্রের দিকে। তাঁর বর্তমান সাদামাটা শিক্ষকজীবন আর বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সম্ভাবনাময় জীবনের প্রেক্ষিতে দেখলে, পাঠক সহজেই স্বপ্নের এই অংশের অর্থ বুঝতে পারবেন। নিস্তরঙ্গ জীবন থেকে তিনি বেছে নিতে চাইছেন নামযশের জীবন, খ্যাতির জীবন। ছাদের শেষপ্রান্তে লালকাপড় পরা সাধুরা এসেছেন ভদ্রলোকের মনের আধ্যাত্মিক চেতনা থেকে, শুভাশুভ বোধ থেকে। সমুদ্র উত্তাল, সমুদ্রের বুকে প্রচুর ওঠানামা। প্রতিষ্ঠিত নামডাকওয়ালা মানুষের জীবনও যে অনেকটা সমুদ্রের মতো।

বর্তমান নিস্তরঙ্গ জীবন থেকে যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তির জীবনে ঝাঁপ দেবার ইচ্ছা থেকে এই স্বপ্নের জন্ম। সাধুরা ওঁকে বলছেন সমুদ্রে না যেতে। সম্ভাবনাময় জীবনের ঝুঁকি অনেক। সেই জীবনে ঝাঁপ দিলে যশ, খ্যাতি বাড়লেও হারাতে হবে মানসিক শান্তি। স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনে নামডাক নেই। নেই অর্থ, প্রতিপত্তি। তবু তিনি আছেন মনের অপার শান্তিতে। বিদেশের অধ্যাপকজীবনে নামডাক হলেও উত্থানপতনের ধাক্কায় তাঁকে হারাতে হবে মনের আধ্যাত্মিক শান্তি। তাঁর মনের আধ্যাত্মিক চেতনা সাধুদেরকে দিয়ে বোঝাতে চাইছে এই কথাটাই।

উত্তাল জীবনে ঝাঁপ না দিয়ে শিক্ষক ফিরে আসছেন শান্ত বর্তমান জীবনের দিকে। এই স্বপ্নে সমুদ্র আর ছাদকে রূপক বলা যেতে পারে। স্বপ্নের মধ্যে মনের দুধরনের ইচ্ছার দ্বন্দ্ব চলে এসেছে। দ্বন্দ্ব মিটছে স্বপ্নে। স্বপ্নদ্রষ্টা ফিরে আসছেন গ্রাম্য, শান্ত, নিস্তরঙ্গ শিক্ষকজীবনের শান্তিতে। সেদিক থেকে এই স্বপ্নকে একধরনের 'সমাধানের স্বপ্ন' হয়তো বলা যায়।

এপার বাংলায় আত্মীয়ের বাড়িতে কোনও কাজে কিছুদিনের জন্য এসে তাঁর এই স্বপ্নের কথা ভদ্রলোক আমাকে বলেন। স্বপ্নবিশ্লেষণ করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে কথা বলে, তাঁর দেওয়া আনুষঙ্গিক তথ্যগুলোকে মাথায় রেখে। শিক্ষক ভদ্রলোক তাঁর এই স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন।

স্বপ্ন ২৫ : একটা একতলা বাড়ির খাটে শুয়ে আছি, বাড়িটা যেন আমাদেরই—হঠাৎ দেখি বন্যার জল ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে—খাটের ওপরকার জাজিম পর্যন্ত উঠে আসছে জল, ভিজে যাচ্ছে মাথার বালিশ—আমি তাড়াতাড়ি পাশে শোয়া স্বামীকে বললাম, ছেলেটাকে আর তানপুরাটাকে সরিয়ে নাও—স্বামী বললেন, ঘরের নালাটা খুলে দাও! খাট থেকে ঝুঁকে নালার মুখটা খুলতে গিয়ে জলে পড়ে গেলাম—মনে হচ্ছে ডুবে যাব এবার—।

ত্রিপুরার এক গৃহবধূর স্বপ্ন। আগরতলা থেকে কলকাতায় এসে, ভাইয়ের বাড়িতে ঘুমিয়ে মহিলা এই স্বপ্ন দেখেন। মহিলার একটাই ছেলে, বয়েস পাঁচ। মহিলা রবীন্দ্রসংগীত গান অনেকদিন থেকে। গান তাঁর জীবনের একটা বড় অবলম্বন। বেঁচে থাকবার রসদ। যেমন অবলম্বন তাঁর একমাত্র ছেলে।

এই স্বপ্নকে প্রাথমিকভাবে জলে ডোবার স্বপ্ন বলে মনে হয়। মহিলার সঙ্গে কথা বলে দুটো প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারি :

(১) মহিলা আর একটা সন্তান চান। প্রায়ই ভাবেন, আর একটা বাচ্চা হলে বেশ হয়! বিশেষ করে, একটা মেয়ে হলে! আবার ভয়ও হয়, দ্বিতীয় সন্তান হলে তাঁর পক্ষে দুরন্ত ছেলেকে আর গানবাজনাকে এখনকার মতো সময় দেওয়া আর হয়তো সম্ভব হবে না। এই ছেলেটা হয়তো কম নজর পাবে। বন্ধ হয়ে যাবে প্রাণের আনন্দে গান গাওয়া।

(২) মহিলা এই স্বপ্ন দেখেন ঋতুস্রাবের নির্দিষ্ট তারিখ পেরিয়ে যাবার তিনদিনের মাথায়। তাঁর মনে হয়েছিল, তবে কি সত্যিই এইমাসে...!

এরপর নিশ্চয়ই এই স্বপ্নকে আর বিশদ ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই। পাঠক সহজেই বুঝতে

পারবেন, স্বপ্নদ্রষ্টার সন্তানলাভের ইচ্ছা চলে এসেছে এই স্বপ্নে। জল বাড়তে থাকায় তিনি ছেলেকে আর তানপুরাটাকে সরিয়ে দিতে বলছেন কেন? কারণ, আর একটা সন্তান এলেও যেন তাঁর বর্তমান ছেলে আর গান গাইবার তানপুরা অক্ষত থাকে। এদের যেন কোনও বিপদ না হয়। তাঁর ছেলে পায় যথেষ্ট নজর, তানপুরা (গান)ও।

মহিলা আমার করা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনেক ভেবে পরে মেনে নেন। জলে ডোবার স্বপ্ন কত বিচিত্রভাবে চলে আসে তা জলে ডোবার স্বপ্ন নিয়ে আলোচনায় বলেছি। ওই অধ্যায়ে লেখিকা, কবি নবনীতা দেবসেনের স্কুলের ডেস্ক ধরে উঠে এসে জল থেকে উদ্ধার পাবার ছবিটা একবার ভাবুন। ঘরে বন্যার জল ঢুকে যাবার এই স্বপ্নও বিচিত্র, ব্যতিক্রমী।

আমি পাঠককে জলে ডোবার সব স্বপ্নকে একই ভাবনায় ভাবার বিষয়ে সতর্ক হতে অনুরোধ করব। আগে বিশ্লেষণ করা অনেক স্বপ্নে পাঠক দেখেছেন, আনুষঙ্গিক তথ্য আর স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিকতার হেরফেরে স্বপ্নের গভীর অর্থ কিভাবে পুরোপুরি বদলে যেতে পারে।

স্বপ্ন ২৬ : গতকালই এই স্বপ্নটা দেখলাম—বাবা মারা গেছেন, বাড়িতে অনেক লোকজন—আমি একজন আত্মীয়কে বলছি, আফিসে খবরটা দিয়ে দিতে—নানাজন নানা পরামর্শ দিচ্ছেন—একজন বললেন, লিখিতভাবে জানাও—আমি অনেকক্ষণ ধরে দরখাস্ত লিখলাম—তারপর একটি ছেলের হাতে সেটা পাঠিয়ে দিলাম অফিসে—খুব আনন্দ হচ্ছে, এখন অনেকদিন অফিস যেতে হবে না—স্ত্রীর ডাকে ঘুম ভেঙে দেখি, প্রায় আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে, আজ আর অফিস যাওয়া হবে না—খুব আনন্দ হচ্ছিল! একটুও মনখারাপ হয়নি বাবার মৃত্যু দেখেছি বলে—বাবা তো বেঁচেই আছেন।

ঘুমকাতুরে চল্লিশ বছরের এক ব্যাঙ্ককর্মীর স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে যৌগিক স্বপ্ন (Compound Dream) বলা যায়। স্বপ্নের উদ্দেশ্য আর একটু ঘুমোনো। দীর্ঘসময় ধরে স্বপ্নদ্রষ্টা এই স্বপ্ন দেখেছেন। ঘটেছে নানা ঘটনা। 'আর একটু ঘুমোনোর স্বপ্ন' এরকমই দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই স্বপ্নে আবার চলে এসেছে বাবার মৃত্যু। স্বপ্নদ্রষ্টার বাবা কিছুটা অসুস্থ। মনে হতে পারে, বাবার মৃত্যুকামনা রয়েছে এই স্বপ্নে। এই স্বপ্ন হয়তো আর একটু ঘুমানোর স্বপ্ন আর প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্নের যোগফল।

এই স্বপ্নে বাবার মৃত্যুকামনা থাকলে স্বপ্নদ্রষ্টা জেগে উঠে অনুভূতিহীন থাকতেন না বা আনন্দ পেতেন না। অনৈতিক ওই কামনার জন্য চূড়ান্ত কষ্ট পেতেন মনে মনে। 'প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন' অধ্যায়ে পাঠক এ নিয়ে সবিস্তারে জেনেছেন। মনে হয়, বাড়িতে আগেকার অন্য কোনও মৃত্যুর ঘটনার স্মৃতি, এই স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টার বাবার মৃত্যুদৃশ্য রচনা করেছে।

ওই কর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, স্বপ্নে চলে এসেছে প্রায় ত্রিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া ভদ্রলোকের ঠাকুরমার মারা যাবার স্মৃতি। ওই সময় বাড়িতে অনেক লোকজন এসেছিল। আর অনেকদিন স্কুলে যেতে হয়নি নিচুক্লাসের ছেলেটিকে।

কম বয়সে স্কুলে যেতে একটুও ভালো লাগত না ছেলেটার। এখন ভালো লাগে না দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে রোজরোজ অফিস যেতে! স্বপ্নে বাবার মৃত্যু দেখে, আনন্দ তো স্বপ্নদ্রষ্টা পাবেনই। অনেকদিন যে তাকে আর কষ্ট করে অফিস যেতে হবে না!

এই আর একটু ঘুমোনোর স্বপ্নে দুটো ইচ্ছার অস্তিত্ব পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন। আর একটু ঘুমোনোর ইচ্ছা আর একটানা অনেকদিন অফিস থেকে ছুটি পাবার ইচ্ছা। ঠাকুরমা মারা যাবার শৈশবস্মৃতি স্বপ্নে চলে এসেছে। এই স্বপ্নে বাবার মৃত্যুকামনা থাকলে, সকালে উঠে, স্বপ্নদ্রষ্টা আনন্দের বদলে কষ্ট পেতেন। স্বপ্নে শৈশবস্মৃতিও এভাবে চলে আসত না। আসত না স্বপ্ন দেখতে দেখতে আনন্দের ভাব।

স্বপ্ন ২৭ : ট্রেনটা আমি স্টেশনে ঢুকতে না ঢুকতেই বেরিয়ে গেল—আমি কি করব? শুরু করলাম দৌড়—হঠাৎ বুঝলাম, হাওয়ায় লাফ দিয়ে দিয়ে প্রচণ্ডবেগে এগোচ্ছি, যেন উড়ছি—পরের স্টেশনে

পৌঁছে গেলাম, তখনও ট্রেন এখানে পৌঁছয়নি—ট্রেন এল, উঠে বসলাম।—ঘুমটা ভেঙে গেল।

হাওড়া থেকে বর্ধমানের ট্রেনপথে নিত্যযাত্রীর স্বপ্ন। ভদ্রলোক ব্যবসায়ী। বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ। ট্রেন মিস করে প্রায় উড়তে উড়তে পরের স্টেশনে ট্রেনের আগে পৌঁছে ট্রেন ধরবার এই স্বপ্ন সত্যিই মজার। বাস্তবে আমাদের এরকম ক্ষমতা থাকলে কি ভালোই না হত!

এই ব্যতিক্রমী স্বপ্ন Compound Dream বা যৌগিক স্বপ্ন। ট্রেন মিস করা আর হাওয়ায় লাফানো বা ওড়ার দুটি স্বপ্ন এক হয়ে মিশে গেছে স্বপ্নকল্পনার জোরে।

স্বপ্নের দুটো অংশ এক হয়ে মিশে গেছে স্বপ্নকল্পনার জোরে।

স্বপ্নের প্রথম অংশে চলে এসেছে স্বপ্নদ্রষ্টার মত্যুচেতনা। ট্রেনযাত্রা এখানে মৃত্যুর প্রতীক। ট্রেন মিস করে স্বপ্নের দর্শক মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন। স্বপ্নের এই অংশ ভদ্রলোককে আশ্বাস দিতে চাইছে। বলতে চাইছে, 'আর যাই হোক তুমি মরবে না!' স্বপ্নের এই অংশের কাজ স্বপ্নের দর্শককে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সম্পর্কে আশ্বস্ত করা।

দ্বিতীয় অংশে হাওয়ায় লাফ দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায়ী। দ্রুতধাবমান ট্রেনের আগে! 'ইচ্ছে করলে আমি ট্রেনের আগেও ছুটতে পারি'—স্বপ্নদ্রষ্টার এরকম অহংবোধ থেকে স্বপ্নের এই অংশের জন্ম। হাওয়ায় লাফাতে লাফাতে বা উড়তে উড়তে ট্রেনের আগে পরের স্টেশনে পৌঁছে গেছেন স্বপ্নের দর্শক। স্বপ্নের এই অংশে পূর্ণ হচ্ছে তাঁর পেশাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। প্রসঙ্গত বলি, ভদ্রলোকের এই বয়সের শারীরিক ক্ষমতা অসাধারণ। দৌড়ঝাঁপ, পরিশ্রম করতে পারেন অবিরাম। কিছুতেই ক্লান্ত হন না। এবং ব্যবসায়ী হিসেবে ভদ্রলোক অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

পাঠক লক্ষ করবেন, স্বপ্নের শেষ অংশে স্বপ্নদ্রষ্টা ট্রেনে উঠে বসতেই স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। ঘুম গেছে ভেঙে। ট্রেন পরের স্টেশনের দিকে এগোবার আগেই। ট্রেনযাত্রা মানেই যে স্বপ্নদ্রষ্টার প্রতীকী মৃত্যু! তার মানে এই নয় যে ট্রেনে, বাসে, ট্রামে বা প্লেনে করে কোথাও যাবার ছবি স্বপ্নে এলে সবসময়তেই তা মৃত্যুর প্রতীক হয়ে আসবে। এর ব্যতিক্রমও ঘটে। আমার নিজের ও অন্যদের দেখা বহু স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে এরকম যাত্রার অন্য অর্থ খুঁজে পেয়েছি বহুবার। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করবার সময় পাঠককে সাবধান থাকতে হবে। দেখতে হবে, চিন্তাভাবনা যেন একপেশে না হয়ে পড়ে। এগোতে হবে সব সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে, মনের সব জানালা খুলে রেখে।

স্বপ্ন ২৮ : স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখি ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে—আমি ট্রেনটা ধরবার জন্য দৌড়চ্ছি—ট্রেনের গতি বেশি থাকায় উঠতে পারছি না—প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গার্ডকে চিৎকার করে বলছি, এম. বি. বি. এস. পরীক্ষা! থামান! থামান!—ট্রেনটা চলে গেল—প্রচণ্ড চিন্তা হচ্ছে! ঠিক সময়ে পরীক্ষার হলে পৌঁছতে পারব না! কি হবে—টেনশানের মধ্যে হঠাৎ দেখি ওই ট্রেনেরই গার্ড ভদ্রলোক (যাকে চিৎকার করে ট্রেন থামাতে বলেছিলাম) আমার সামনে দাঁড়িয়ে— একটুও অবাক লাগছে না—গার্ড বলছেন, চিন্তা করবেন না, এখনই একটা স্পেশাল ট্রেন আপনাকে নিতে আসছে!

'৯৭-এর অগাস্ট মাসে আমার দেখা স্বপ্ন। এই স্বপ্নে ট্রেন মিস্ করা আর ঠিকসময়ে পরীক্ষার হলে পৌঁছতে না পারা এসেছে একসঙ্গে। সেদিক থেকে স্বপ্ন ২৬ আর স্বপ্ন ২৭ এর মতো এই স্বপ্নও যৌগিক স্বপ্ন। আবার স্বপ্নের সমস্যার সমাধান হচ্ছে স্বপ্নেরই শেষ অংশে। এই স্বপ্ন তাই সমাধানেরও।

ট্রেন মিস করবার স্বপ্ন আমি স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা শুরু করবার আগে কখনও দেখিনি। বা দেখলেও মনে রাখতে পারিনি। গত দু-আড়াই বছরে এরকম স্বপ্ন আমি দেখেছি কয়েকশোবার। বেঁচে থাকতে আমি ভীষণ ভালোবাসি। আবার মৃত্যুচেতনাও আমার মধ্যে তীব্র। হয়তো এই দুই ইচ্ছার দোলাচল থেকে আমাকে বারবার মুক্তি দিতে চায় আমার ঘুমন্ত চেতনা। এটাই এত বেশি ট্রেন মিস করবার স্বপ্ন দেখার কারণ বলে আমার মনে হয়।

ট্রেনের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে গার্ডকে আমি চিৎকার করে বলছি এম. বি. বি. এস. পরীক্ষা! থামান! থামান! স্বপ্নের এই অংশে চলে এসেছে আমার (১৯ বছর বয়সে দেওয়া) ১৯ বছর আগেকার বাড়ি

থেকে দেওয়া একটা থিওরি পরীক্ষা (ফার্স্ট এম. বি. বি. এস পার্ট ১) দেবার স্মৃতি। ট্রেন মিস করবার কোনও ঘটনা তখন ঘটেনি। ওই পরীক্ষা আমি ভালোভাবেই পাশ করেছি। তবু পরীক্ষায় সময়ে হল-এ পৌঁছোতে না পারার টেনশান স্বপ্নে আসছে কেন?

আসলে এই বইয়ের জটিলতম অংশগুলো শেষ করবার মতো এখনও পর্যন্ত আমার জীবনের কঠিনতম কাজ তখন আমার সামনে। 'আনন্দ'র কর্ণধার শ্রী বাদল বসুর উৎসাহ আর প্রশ্রয়ে এই অংশগুলোকে অবাধে লেখার পুরো স্বাধীনতা আমার হাতে। চিন্তা ছিল, পারব তো! এরকম একটা জটিল অবস্থায় পরীক্ষার স্বপ্ন আমাকে নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছে। বলতে চেয়েছে, ভয় পেয়ো না! এবারও তুমি সফল হবে। যেমন সফল হয়েছিলে ফার্স্ট এম. বি. বি. এস পার্ট ওয়ান পরীক্ষায়।

স্বপ্নের শেষ অংশে, ট্রেনের সঙ্গে চলে যাওয়া গার্ড ভদ্রলোক আমার সামনে চলে এসেছেন। স্বপ্নের দেশের নিয়মে এটা উদ্ভট বা আজগুবি কোনও ঘটনা নয়। ব্যাপারটাকে আজগুবি মনে হবে বাস্তবের চোখে দেখলে। রেলের গার্ড রেলের একজন পদস্থ প্রতিনিধি। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করছেন, এখনই আমাকে নিতে স্পেশাল ট্রেন আসছে। এর অর্থ কি?

এদেশে একজন ছাত্র ট্রেন মিস করলে পরীক্ষা দিতে না পারলে কারও কিছু যায় আসে না। হোক না সে ডাক্তারি ছাত্র! তবে কেন আমার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করবেন? স্বপ্নের এই অংশের মধ্যে প্রাথমিকভাবে আমার অচেতনের 'বড় কেউকেটা গোছের একজন হবার ইচ্ছা' চলে এসেছে বলে মনে হয়। স্পেশাল ট্রেন আসে রেলের উচ্চপদস্থ অফিসারদের বা শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা বা ক্ষমতাসীন মন্ত্রীদের জন্য। পাঠককে সবিনয়ে জানাই এরকম 'বড় মাপের লোক' হবার কোনও বাসনা অন্তত সচেতনে আমার নেই। এ ব্যাপারে আমি শতকরা একশোভাগ সৎ।

এই অংশটিকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে একদিন রাতে হঠাৎ করেই এর অর্থ আমার কাছে ধরা পড়ে যায়। রাজ্যের কোনও একজন মন্ত্রী কোনও কারণে কলকাতার পথে আটকে পড়ায় মালদহ থেকে তাঁর জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অতীতের এই সংবাদসূত্র কোনও বিশেষ কারণে আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল গভীরভাবে। আমার দেখা স্বপ্নের শেষ অংশে এই স্মৃতি কাজ করেছে। এই অংশে লুকিয়ে আছে মন্ত্রী হবার ইচ্ছা।

সচেতনে এরকম কোনও ইচ্ছার কথা 'আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না'। কিন্তু স্বপ্নে এরকম ইচ্ছা চলে এসেছে জটিলভাবে। স্বীকার করে নেওয়া ভালো, রাজ্যের ওই মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও বৈদগ্ধ্য আমাকে মুগ্ধ করে। ব্যক্তিগতভাবে কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়া বা দলের পদাধিকারী হওয়া তো দূরের কথা, কোনও প্রশাসনিক পদ গ্রহণেও আমি তীব্র অনীহা বোধ করি। অথচ আমার অচেতনে লুকিয়ে ছিল মন্ত্রী হবার ইচ্ছা! যা স্বপ্নকল্পনার জাদুতে অদ্ভুতভাবে চলে এসেছে এই স্বপ্নে।

স্বপ্নের গভীর অর্থ কত জটিল হতে পারে, তা এই স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়। নিজের স্বপ্ন বলেই স্বপ্নের এই গভীর অর্থ হয়তো আমার কাছে ধরা পড়েছে। অচেতন আর সচেতনের ইচ্ছার আকাশপাতাল ফারাক পাঠক স্বপ্নের এই অংশের ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে পারবেন।

এই যৌগিক স্বপ্নে স্বপ্নের বইয়ের জটিলতর অংশগুলো সফলভাবে লেখার ইচ্ছা আর আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা চলে এসেছে একসঙ্গে। এসেছে অচেতনের মন্ত্রী হবার ইচ্ছাও।

এই স্বপ্নের এই বিশ্লেষণ আমার কাছে শতকরা একশোভাগ গ্রহণযোগ্য। বিস্তারিতভাবে এই বিশ্লেষণ রাখলাম স্বপ্নবিশ্লেষণে রপ্ত হতে উৎসাহী পাঠকের কথা মাথায় রেখে। স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা পড়ে কোনও পাঠক বর্তমান লেখকের অচেতনে মন্ত্রী হবার ইচ্ছার কথা জেনে একচোট হাসি অবশ্যই হেসে নিতে পারেন! জটিল নানা স্বপ্নের গম্ভীর ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে এই হাস্যরসটুকু উপভোগ করবার অধিকার, হে পাঠক, অবশ্যই আপনার আছে!

স্বপ্ন ২৯ : একজন বড় ডাক্তারের মারুতিতে চেপে যাচ্ছি একটা ক্লিনিকের দিকে—ডাক্তার সরকার ড্রাইভ করছেন, পাশে আমি—একটু এগোতেই দেখি কিছু লোক রাস্তা খুঁড়ছে— সামনে যাওয়া যাবে না—ডাক্তার সরকার বললেন, এদিক দিয়ে হবে না—গাড়ি ঘুরিয়ে আমরা চললাম ঘোরাপথের

রাস্তায়—এদিকে রাস্তা বেশি, তবু রাস্তাটা দিয়ে ক্লিনিকে যাওয়া যায়—ক্লিনিকের পাশে পৌঁছে স্বপ্নটা ছিঁড়ে গেল, আর মনে নেই।

উত্তরবঙ্গের এক তরুণ চিকিৎসকের স্বপ্ন। একটা আধাশহরে সবে প্র্যাক্টিস শুরু করেছেন এই যুবক। নানাকারণে তেমন একটা পসার জমেনি। স্থানীয় জেলা পরিষদের একটা আধাসরকারি ক্লিনিকে একজন ডাক্তারের পদ খালি আছে জেনে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছেন। ওই পদের জন্য দরখাস্ত করেছেন আরও চারজন। অভিজ্ঞতার দিক থেকে ওই চারজন ডাক্তারই স্বপ্নের দর্শকের চাইতে 'সিনিয়ার'। এঁদের মধ্যে দুজন স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমাধারি, স্বপ্নের দর্শক এম. বি. বি. এস. স্নাতক।

সৎভাবে নির্বাচন হলে চাকরিটা স্বপ্নদ্রষ্টা পাবেন না। এটা তিনি যেদিন জানতে পারেন, সেইরাতেই দেখেন এই স্বপ্ন। ডাক্তার সরকার এলাকার প্রতিষ্ঠিত আর প্রভাবশালী একজন চিকিৎসক। স্বপ্নদ্রষ্টাকে ছেলেবেলা থেকে চেনেন ও ভালোবাসেন। যুবক এই চিকিৎসককে ফোন করেছেন যাতে তাঁর প্রভাব খাটিয়ে চাকরিটা ওঁকে করে দেন। এরকম অবস্থায় এই স্বপ্ন এসেছে ওঁর ঘুমন্ত চেতনায়।

ডাক্তার সরকারের গাড়িতে ক্লিনিকের পথে যেতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে রাস্তা সামনে খোঁড়া। এর অর্থ, সোজা রাস্তায় যাওয়া যাবে না। একটু অন্যভাবে বললে, সোজা রাস্তায় চাকরিটা হবে না। গাড়ি ঘুরিয়ে ওঁরা অন্যপথে চলেছেন ক্লিনিকের দিকে। এই পথ দীর্ঘতর। 'তবু রাস্তাটা দিয়ে ক্লিনিকে যাওয়া যায়'। এর অর্থ পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। একটু জটিল পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তবে চাকরিটা হবেই। সামনের 'সোজারাস্তা' দিয়ে নয় ' বাঁকাপথে!'

স্বপ্নের ভাষায় রপ্ত পাঠক অবশ্যই খেয়াল করেছেন, গাড়ির স্টিয়ারিং ডাক্তার সরকারের হাতে। ক্লিনিকে যুবকের অন্যদের টপকে চাকরি পাবার জটিল পদ্ধতির চাবিও যে ওই প্রভাবশালী চিকিৎসকের হাতেই।

যে কোনও স্বপ্নে রাস্তা কাটা বা অবরোধ সাধারণত কোনও কাজে বাধা বোঝায়। মারুতিতে স্বপ্নের যাত্রা আসলে অনৈতিক পথে যোগ্যতর প্রার্থীদের টপকে চাকরি পাবার পদ্ধতি। স্বপ্নে যে কোনও যাত্রা মানেই যে মৃত্যুর দিকে যাত্রা নয় (স্বপ্ন ২৭-এর বিশ্লেষণের শেষ অংশ দেখুন) এই স্বপ্ন তার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত।

স্বপ্ন ৩০: *একটা খোলা বাক্স থেকে অনেক মুক্তো উপচে পড়ছে।*

এই স্বপ্নের বিবরণ খুব ছোট। স্বপ্নটার গভীর অর্থ স্বপ্নদ্রষ্টার সঙ্গে নানাভাবে কথা বলেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই 'অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি'র সাহায্যে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই বইতে বহু স্বপ্নের অর্থ বলতে গিয়ে এই পদ্ধতির উল্লেখ করেছি। স্বপ্নের গূঢ় অর্থ জানতে প্রথম এই পদ্ধতির সাহায্য নেন ফ্রয়েড। ইয়ুনের 'ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন টেস্ট'-এর পদ্ধতি ফ্রয়েডের এই 'ফ্রি অ্যাসোসিয়েশন টেস্ট'-এর খুব কাছাকাছি।

স্বপ্নের দর্শককে চিন্তামুক্ত অবস্থায় বিছানায় শোয়ানো হয়। ঘরের আলো মৃদু, আওয়াজ যথাসম্ভব কম হলে ভাল হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা নিশ্চেষ্ট অবস্থায় চোখ বুজে শুয়ে থাকবেন। স্বপ্নবিশ্লেষক থাকবেন তাঁর মাথার পিছনে। বিশ্লেষক স্বপ্নের এক একটা শব্দ বা কয়েকটা শব্দ তাঁকে শোনাবেন। স্বপ্নদ্রষ্টা ওই শব্দগুলো শুনে তাঁর মনে যে প্রাসঙ্গিক ভাব বা কথা উঠে আসবে তা পরপর বলে যাবেন। বিশ্লেষক খাতায় দ্রুত তা লিখে যাবেন। স্বপ্নের দর্শককে বুঝিয়ে দিতে হবে, তার মনে যা কথা ভেসে উঠবে তাই পরপর অবাধে বলে যাবেন। ন্যায়-অন্যায়, শ্লীল-অশ্লীল বোধে কোনও ভাব বা কথা গোপন করা যাবে না।

এই পদ্ধতি অনুশীলনসাপেক্ষ। স্বপ্নদ্রষ্টার মন পুরোপুরি মুক্ত না হলে স্বপ্নের আনুষঙ্গিক তথ্য তার মন থেকে এই পদ্ধতিতে বার করে আনা সম্ভব হয় না। স্বপ্নের অর্থও ধরা পড়ে না। যে কোনও স্বপ্নোৎসাহী পাঠক এই পদ্ধতিতে স্বপ্নব্যাখ্যার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। প্রথমদিকে সফল না হলেও

দীর্ঘদিনের অনুশীলনে স্বপ্নের বিচিত্র ভাষায় রপ্ত যে কোনও মানুষ ধীরে ধীরে এই পদ্ধতিতে স্বপ্নব্যাখ্যায় দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। অবশ্য এর জন্য দীর্ঘ পরিশ্রম দরকার হয়।

এই স্বপ্নের বিবরণ খুব ছোট হওয়ায় অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতিতে এটিকে ব্যাখ্যা করা সহজ। স্বপ্নদ্রষ্টা একুশের এক যুবতী। রবীন্দ্রসংগীত গান। গানের গলা বেশ ভালো। যুবতীকে স্বপ্নের এক একটা অংশ বলাব সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে যে ভাবগুলো আসে, তা এরকম:

খোলা বাক্স—পাঁউরুটি, কেক, পেস্ট্রি. কেকের দোকান, 'হ্যাপি বার্থডে' লেখা কেক, আমার জন্মদিন, ও এসেছিল, ও কেক এনেছিল।

অনেক মুক্তো—অনেক সাদা, পবিত্র, মালা, শালুকফুল, শরতের আকাশ, শোলা।

উপচে পড়ছে—অনেক মেয়ে, দুধ, অনেক মেঘ, অনেক তুলো, মেঘ, মেঘের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া।

স্বপ্নের তিনটি অংশ স্বপ্নদ্রষ্টার মন থেকে প্রাসঙ্গিক যে কথাগুলো বার করে আনল, তা পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক, একটা অন্যটার সঙ্গে সম্পর্কহীন আর দুর্বোধ্য লাগছে। এই শব্দ বা কথাগুলো আবার একইভাবে যুবতীকে শুনিয়ে যেসব কথা বার হয়ে আসে সেই কথাগুলোর মধ্যে স্বপ্নের অর্থ লুকিয়ে আছে। কথা বা শব্দগুলো এরকম:

(ক) **পাঁউরুটি**—বিস্কুট, পাঁউরুটির দোকান, কেকের দোকান, পেস্ট্রি, আর মনে পড়ছে না।

কেক—জন্মদিন, বর্ষা, ফুলের তোড়া, ও এনেছিল।

পেস্ট্রি—খুব ভালোবাসি, ফ্লুরিস, বড়দিন, জুলাই, বাবা আনত।

কেকের দোকান—না, কিছু মনে আসছে না।

'হ্যাপি বার্থডে' লেখা কেক—বাবা আনত না, ও এনেছিল, জন্মদিন,—,—,—(তিনজন বান্ধবীর নাম), আমি কেটেছিলাম, ভাই।

আমার জন্মদিন—বর্ষাকাল, মেঘ, বর্ষার গান, রবীন্দ্রসদন, গানের ক্লাস, ছিটে ছিটে বৃষ্টি।

ও এসেছিল—সাদা শার্ট, বৃষ্টিতে ভিজে, খুব আনন্দ হয়েছিল, লজ্জা লাগছিল, তোয়ালে, মাথা মুছছিল।

ও কেক এনেছিল—নার্ভাস লাগছিল, অনেকে এসেছিল, সবাই গান গাইছিল, কোরাস,—,—(দুই বান্ধবী), খুব মজা, সন্ধ্যা।

(খ) **অনেক সাদা**—বিয়ে, বিয়ের দিন, শাঁখা, টোপর, সাদা পরলে খুব সুন্দর লাগে ও বলে, আইসক্রিম, গরম ভাত, রজনীগন্ধা।

পবিত্র—সানাই, রবীন্দ্রনাথ, ভালোবাসা, আর মনে আসছে না।

মালা—জুঁইফুল, বর্ষা, দারুণ গন্ধ, রজনীগন্ধা, মালা গলায় ওর ছবি।

শালুকফুল—সাদা, জ্যোৎস্না রাত, চাঁদের আলো, ওর সঙ্গে হাঁটা, খুব প্রিয়, পুকুর, বাংরিপোসি।

শরতের আকাশ—সাদা জামা, বাঁকুড়া, দেশের বাড়ি, ঠাকুর দেখা, ওর সঙ্গে, ওর জামার মতো, বেড়ানো।

শোলা—টোপর, ও পরবে, হাসি পাবে, হালকা, খুব খুশি, হালকা, আমরা ভাসব।

(গ) **অনেক মেয়ে**—ক্লাসে ছিল, স্কুলের বন্ধুরা, কলেজ থেকে বেড়াতে গিয়েছি, বাংলাদেশ, বন্ধুরা খুব ভাল বলে, বলে ভাল গান গাই, ওর সঙ্গে, দেশবিদেশ, গান।

দুধ—সাদা, রোমাঞ্চ, অনেক, বাড়ন্ত, অফুরন্ত, উপচে পড়া, বরফ, বরফঢাকা রাস্তা, মানালি, চমরি গাই।

অনেক মেঘ—সাদা, উড়ে যায়, অনেক দূর, স্কুলের বারান্দা, আর কিছু মনে আসছে না।

অনেক তুলো—মেঘের মতো, উড়ে উড়ে বেড়ায়, হাওয়া, কতদূর চলে যায়, লেপতোশক।

মেঘ—বেড়ানো, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা, ইউরোপ, রবিঠাকুর, হারিয়ে যাওয়া।

মেঘের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া—একদেশ থেকে আর এক দেশ, আকাশ, দেখতে দেখতে, উড়তে উড়তে, গান, আরব্য রজনীর মাদুর, সুইজারল্যান্ড, জাপান, সুইডেন, আনন্দ, খুব মজা, আমার স্বপ্ন।

ক, খ ও গ চিহ্নিত অংশের কথা বা শব্দগুলো স্বপ্নদ্রষ্টার মন থেকে আনুষঙ্গিক যে কথাগুলো বার করে আনল, একটু খুঁটিয়ে দেখলে পাঠক প্রতিটি অংশে নির্দিষ্ট একধরনের ভাব খুঁজে পাবেন।

প্রথম অংশের **(ক)** কথাগুলোর মধ্যে বর্ষাকালের জন্মদিনে স্বপ্নের দর্শকের প্রেমিক ('ও') ও অন্য অন্য প্রিয়জনের উপস্থিতি, আনন্দ আর রবীন্দ্রগানের গানের প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয় অংশে **(খ)** চলে এসেছে প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ের পবিত্র, শাশ্বত বন্ধনে যুক্ত হবার ইচ্ছা আর বিয়ে সংক্রান্ত রোম্যান্টিকতা। পাওয়া যাচ্ছে বিয়ের পর দুজনের বেড়ানোর ইচ্ছার আভাস।

তৃতীয় অংশে **(গ)** স্বপ্নের দর্শকের স্বামীর সঙ্গে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানো আর গান গাওয়ার ইচ্ছা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে সহজেই।

সম্পূর্ণ স্বপ্নের অর্থ: প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে হবার পর স্বামীর সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবেন স্বপ্নের দর্শক। দারুণ রোমাঞ্চে ভরা জীবন কাটাবেন দুজনে মিলে। বিশিষ্ট শিল্পী হিসেবে দেশেদেশে গান গাইবার আর দু চোখ ভরে প্রিয়তম পুরুষের সঙ্গে বিচিত্র পৃথিবীর অপার ঐশ্বর্য্যকে দেখবার তীব্র আনন্দ কাল্পনিকভাবে এই স্বপ্নে অনুভব করছেন স্বপ্নদ্রষ্টা। এই স্বপ্ন দেখে তাই খুশিতে উপচে পড়ছে তাঁর মনের আবেগ। যুবতী জানিয়েছেন, স্বপ্নটা দেখে পরদিন অপূর্ব এক ভালোলাগায় মন ভরে গিয়েছিল। মন বসাতে পারছিলেন না কোনও কাজে।

এমন একটুকরো স্বপ্নের গোপন অর্থ যে এমন বিচিত্র হতে পারে, অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্য না নিলে তা জানা সম্ভব হত না। পাঠকের মনে এই মুহূর্তে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে, যা এই স্বপ্ন বিশ্লেষণের পর বর্তমান লেখকের মনেও জেগেছে। স্বপ্নে গোপন ইচ্ছাগুলো এত জটিল একটুকরো স্বপ্নের ছবি না হয়ে সরাসরি জন্মদিন, বিয়ে আর গাইতে গিয়ে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন হয়ে আসতে পারত। তা না হয়ে স্বপ্নটা তবে এত দুর্বোধ্য হয়ে এল কেন? এর উত্তর হয়তো একটাই। মানবমন বড় বিচিত্র এক রঙ্গমঞ্চ। আরও বিচিত্র স্বপ্নের দেশের ভাষা। নিয়মকানুন! কিছুটা অধরা বলেই না স্বপ্নকে ঘিরে মানুষের এত কৌতূহল। এত ভালোবাসা।

স্বপ্নের প্রস্তাবিত শ্রেণীবিভাগ

এখনও পর্যন্ত স্বপ্নকে শ্রেণীভুক্ত করবার কোনও প্রয়াস কোনও স্বপ্নগবেষক করেছেন বলে জানা নেই। এই কাজ বেশ জটিল। স্বপ্নসন্ধানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সবধরনের স্বপ্নের এই শ্রেণীবিভাগ বর্তমান লেখকের করা। এই প্রয়াসকে 'প্রস্তাবিত শ্রেণীবিভাগ' বলা হচ্ছে। কারণ স্বপ্নগবেষক ও স্বপ্নবিশারদ মনোবিদদের ভাবনাচিন্তার আলোয় প্রস্তাবিত এই শ্রেণীবিভাগ সংযোজন/অদলবদল ভবিষ্যতে স্বপ্নের একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রেণীবিভাগে রূপ নিতে পারে।

ক

স্বপ্নের চরিত্র অনুযায়ী

মৌলিক স্বপ্ন (Simple Dream)	যৌগিক স্বপ্ন (Compound Dream)	জটিল স্বপ্ন (Complex Dream)	ব্যতিক্রমী স্বপ্ন (Exceptional Dream)	বিশেষ স্বপ্ন (Special Dream)
ট্রেন মিস করবার স্বপ্ন	স্বপ্নে ওড়া + পরীক্ষা (একসঙ্গে)[১]	যে কোনও উদ্ভট স্বপ্ন,	বড়দের সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন[২]	ঘুম ভাঙাবাব স্বপ্ন
পরীক্ষার স্বপ্ন	একসঙ্গে ট্রেন মিস + পরীক্ষার প্রশ্ন[২]	ভয়ের স্বপ্ন	পরীক্ষার স্বপ্নে আনন্দ[৪]	আব একটু ঘুমানোর
নিজে মারা যাবার স্বপ্ন	ট্রেন মিস + ওড়ার স্বপ্ন[২]	বা অন্য জটিল স্বপ্ন	হাস্যরসের স্বপ্ন[২]	প্রযোজনীয় স্বপ্ন
ওড়ার স্বপ্ন	আর একটু ঘুমানো + ট্রেন মিস[২]		গন্ধ পাবার স্বপ্ন	মাথা গবমেব স্বপ্ন
এইধরনের অন্য স্বপ্ন	আর একটু ঘুমানো + বাবার মৃত্যু[২]		স্বাদ পাবার স্বপ্ন	সমাধানের স্বপ্ন
	পড়ে যাওয়া + ওড়া[৩]		কথার মারপ্যাঁচের স্বপ্ন	সাহস বাডাবার স্বপ্ন
			খুব বেশি টেলিফোনের স্বপ্ন বা পেশাগত স্বপ্ন[৫]	ধৈর্য হারানোর স্বপ্ন
			কবিতা লেখার স্বপ্ন	আবিষ্কারের স্বপ্ন
			গান গাওয়া বা শুনতে পাবাব স্বপ্ন	
			সিনেমা দেখার স্বপ্ন	
			গল্পের প্লট পাবার স্বপ্ন	
			বড়দের খুব বেশি ধৈর্য হারানোর স্বপ্ন[৬]	

পরের পাতায়

খ
স্বপ্ন কল্পনার কাজ অনুযায়ী

- সহজ স্বপ্ন
- উদ্ভট জটিল স্বপ্ন

গ
ইচ্ছাপূরণের চরিত্র অনুযায়ী

- সচেতন বা অচেতনের সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন
- অচেতনের জটিল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন

ঘ
স্বপ্নসৃষ্টির পদ্ধতি অনুযায়ী

- স্বতস্ফূর্ত স্বপ্ন
  (Spontaneous Dream)
  যে কোনও ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন
- কৃত্রিমভাবে তৈরি হওয়া স্বপ্ন
  (Assisted Dream)
  অজ্ঞান করবার ওষুধে তৈবি স্বপ্ন[৭]
  গাঁজা বা L S D-ব ঘোরে দেখা স্বপ্ন[৮]
  পবিবেশেব গন্ধে তৈরি হওয়া স্বপ্ন
  হেবোইন বা অন্য নাবকোটিকের প্রভাবে স্বপ্নের মতো অবস্থা
  বাইরের যে কোনও উদ্দীপনায় তৈরি হওয়া স্বপ্ন

ঙ
স্বপ্নের অনুভূতি অনুযায়ী

- আনন্দের স্বপ্ন [সরল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন, ওড়ার স্বপ্ন]
- ভয়ের স্বপ্ন [জটিল ইচ্ছাপূরণের বা সহ্যক্ষমতা বাড়াবার স্বপ্ন]
- দুশ্চিন্তার স্বপ্ন [পরীক্ষার স্বপ্ন বা ট্রেন মিস করার স্বপ্ন]
- কষ্টের স্বপ্ন [মৃত্যুকামনাযুক্ত প্রিয়জনের বা অন্যের মৃত্যুর স্বপ্ন]
- ঘৃণার স্বপ্ন [স্বপ্নে বিষ্ঠা দেখে ঘৃণা]
- হাসির স্বপ্ন
- অনুভূতিহীন স্বপ্ন
  মৃত্যুকামনাহীন মৃত্যুর বা অন্য অনুভূতিহীন স্বপ্ন
- রাগের স্বপ্ন
- লজ্জার স্বপ্ন [উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানো বা মুদ্রা কুড়ানোর স্বপ্নে লজ্জা

চ

স্বপ্নসৃষ্টির প্রাথমিক উদ্দীপনার চরিত্র অনুযায়ী

- মানসিক উদ্দীপনা
- কথার বা আওয়াজের উদ্দীপনা
- আলোর উদ্দীপনা
- ত্বকের উদ্দীপনা
- গন্ধের উদ্দীপনা
- খিদের উদ্দীপনা
- তৃষ্ণার উদ্দীপনা
- যৌনইচ্ছার উদ্দীপনা

ছ

স্বপ্নের ধরন অনুযায়ী

- যেসব স্বপ্ন অনেকেই দেখেন (Typical Dreams)
- যে স্বপ্ন অনেকে দেখেন এমন নয় (Atypical Dreams)

জ

স্বপ্নদ্রষ্টার চেতনার অবস্থা অনুযায়ী

- দিবাস্বপ্ন জেগে থাকা অবস্থায় স্বপ্নের মতো ঘোর
- ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্ন

১. 'মুশকিল আসানের স্বপ্ন' দেখুন।
২. এরকম স্বপ্নের দৃষ্টান্ত রয়েছে 'কিছু স্বপ্নের বিশ্লেষণ' অধ্যায়ে।
৩. উড়তে উড়তে পড়ে যাওয়া বা পড়ে যেতে যেতে উড়তে শুরু করাব এরকম স্বপ্ন অনেকে দেখেন।
৪. ব্যতিক্রমী এরকম স্বপ্নের দৃষ্টান্ত বয়েছে 'পরীক্ষার স্বপ্ন' অধ্যায়ে।
৫. 'স্বপ্ন আর পেশা' অধ্যায় দেখুন।
৬. 'ধৈর্য হারানোর স্বপ্ন' অধ্যায়ে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে।
৭. অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে অজ্ঞান হওয়া রোগীরা জ্ঞান ফেরানোব পরই জানতে চাওয়ায় এরকম অনেক স্বপ্নের কথা মনে করতে পারেন।
৮. এগুলো ঠিক স্বপ্ন নয়, নেশার ঘোরে স্বপ্নের মতো অবস্থায় দেখা ছবি। এই বইতে গাঁজার প্রভাবে দেখা তিনটি স্বপ্ন রয়েছে। স্বপ্নদ্রষ্টার অনুমতি থাকলেও এই স্বপ্নগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত কবা সমীচীন নয়।

নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

ক

১। স্বপ্ন সত্য রবীন্দ্রনাথ—অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, আনন্দ

২। কল্পনার হিস্টিরিয়া—শঙ্খ ঘোষ, প্রমা

৩। স্বপ্ন—গিরীন্দ্রশেখর বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

৪। শিশুমনের বিকাশ ও বিকার—ড. অমরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীভূমি পাবলিশিং, পরিমার্জিত ও পবিবর্ধিত সংস্করণ,

৫। রবীন্দ্র রচনাবলী: বিশ্বভারতী সংস্করণ

৬। রবিজীবনী—প্রশান্তকুমার পাল (১-৭ খণ্ড), আনন্দ

৭। Contribution to the Psychology of Visual Dreams, Mind, 1892

৮। The World of Dreams—Havelock Ellis, London, 1911

৯। Dream Manipulation of Numbers—Ernest Jones, New York, 1913

১০। The Theory of Symbolism—Ernest Jones, British Journal of Psychology, 1916

১১। Studies in Word Association—C.G. Jung, New York, 1918

১২। De Somnitis and De divination per somnum—Aristotle, Trans by W. S. Hett, In Volume 'On the Soul' London and New York, 1935

১৩। The Psychological Analysis of Dreams—S. Ferenezi, London, 1952

১৪। Dream and Myths: A Study in Folk Psychology: London and New York, 1955

১৫। Collective Works of C.G. Jung, 1960

১৬। Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Standard Edition, Vol. 4, 5, Edited by James Strachey.

১৭। The Interpretation of Dreams—Sigmund Freud, Penguin Freud Library, Vol 4

১৮। International Encyclopedia of Social Sciences—Edited by David L Stills, Macmillan and Free Press, Vol. 3

১৯। The Ego and the Mechanism of Defence—Freud Anna, International University Press, New York,

২০। The Freud/Jung Letters, Tans, by R Manheim and R.F.C. Hull, London and Princeton,

২১। The Man and His Symbols—C.G. Jung, Picador, London,

২২। Review of Medical Physiology—W.S. Ganong, Prentice Hall, Int. 16th edition, 1993

২৩। The Myth of the Birth of the Hero—Otto Rank, Eng Tr, London, 1914

২৪। Some Additional Notes on Dream Interpretation as a Whole—Sigmund Freud, 1925

২৫। Dreams and Folklore—D.E. Openheim and S. Freud, Eng Tr. New York, 1958

২৬। The Creative Circuit—Prof. K.G. Subramaniam, Seagull,

এ ছাড়াও বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে বহু স্বপ্নগবেষকের গবেষণাপত্র বা বই থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। মূল জার্মান বা ফরাসি ভাষা থেকে এইসব অংশ পেয়েছি ফ্রয়েডের স্বপ্নসংক্রান্ত নানা লেখালেখির ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ থেকে। উৎসাহী পাঠকের জন্য ফ্রয়েডের নিজের ও অন্য স্বপ্নগবেষকদের নাম ও গবেষণাপত্রের একটা তালিকা দিচ্ছি। এর মধ্যে ফ্রয়েডের গবেষণাপত্রগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ হওয়া নাম উল্লেখ করা আছে, অন্যগুলোর ফরাসি বা জার্মান নাম ইচ্ছাকৃতভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছে। ওই দুই ভাষা জানা পাঠক মূল গবেষণাগ্রন্থের শিরোনাম পাবেন ফ্রয়েড রচনাবলীর (পি.এফ.এল) ৪র্থ খণ্ডের উল্লেখপঞ্জী (৭৮৭-৮১৭) অংশে। বন্ধনীর মধ্যে গবেষণাপত্র প্রকাশের সাল দেওয়া আছে। শেষ বইটি গবেষণাপত্র নয়, কার্ল আব্রাহামকে বিভিন্ন সময় লেখা ফ্রয়েডের নির্বাচিত সংকলন।

১। G.F. Meier (1758)

২। L.F.A Maury (1853, 1878)

৩। K A. Scherner (1861)

৪। A. Schopenhauer (1862)

৫। P. Radestock (1879)

৬। H. Spitta (1852)

৭। J.R. L. Delboeuf (1885)

৮। C. Du Prel (1885)

৯। L Strumpell (1887)

১০। Y. Delage (1891)

১১। P. Tissie (1898)

১২। S. Freud, On Dreams (1901)

১৩। H. Swoboda (1904)

১৪। S. Freud, Jokes and their Relation to the Unconscious (1905)

১৫। W. Stekel (1909)

১৬। Otto Rank (1909): Eng Tr—The Myth of the Birth of the Hero, London, 1914

১৭। H. Silberer (1909-14)

১৮। S. Freud, A Typical Example of a Disguised Oedipus Dream (1910)

১৯। S. Freud, The Handling of Dream Interpretation in Psycho-Analysis (1911)

২০। A. Ader (1910, 1911)

২১। J.J. Putnam (1912)

২২। S. Freud, The Occurance in Dreams of Material from Fairy Tales (1913)

২৩। B. Dattner (1913)

২৪। S. Freud, Observations and Examples of Analytical Practice (1913)

২৫। C. Spittler (1914)

২৬। S. Freud, A Metapsychological Supplement to the Theory of Dreams (1917)

২৭। S. Freud, Supplements to the Theory of Dreams (1920)

২৮। S. Freud, Remarks upon the Theory and Practice of Dream-Interpretation (1923)

২৯। S. Freud, Some Additional Notes on Dream Interpretation as a Whole (1925)

৩০। S. Freud, A Premonitory Dream Fulfilled (Eng Tr 1941)

৩১। S. Freud and D.E. Oppenheim, Dreams in Folklore, New York, (Eng Tr 1958)

৩২। A Psycho Analytic Dialogue: The Letters of S. Freud and K. Abraham: Eng Tr by B. Marsh and H.C. Abraham, London.

স্বপ্নসূচি

নির্দেশিকা